স্বামী তুরীয়ানন্দের

স্মৃতিকথা

২

সংকলক ও সম্পাদক

স্বামী চেতনানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতিকথা

সঙ্কলক ও সম্পাদক

স্বামী চেতনানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

প্রাক্-সন্ন্যাস-জীবনে স্বামী তুরীয়ানন্দের নাম ছিল হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার এই প্রিয় গুরুভ্রাতার সম্বন্ধে একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন "হরির বিচিত্র ত্যাগ, স্থিরবুদ্ধি ও তিতিক্ষা আমি যখনই মনে করি তখনই নূতন বল পাই।" আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে বেদান্ত প্রচারে বিশেষ সাফল্যলাভের পর স্বামীজী ঐ অঞ্চলের কার্যভার স্বামী তুরীয়ানন্দকে দিবেন স্থির করিয়া তিনি ভক্তমণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন, "এরপর তোমাদের কাছে আমি এমন একজন গুরুভাইকে পাঠাব, যার মধ্যে কি করে আমার বাক্যগুলিকে জীবনে পরিণত করতে হয় তা দেখতে পাবে।" এ হেন মহান অবতার-পার্ষদ স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গলাভে কৃতার্থ সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলীর স্মৃতিকথার একটি সংকলন সেন্ট লুইস্ বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ প্রকাশনার্থে উপহার দিয়া আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার পূর্বেও তাঁহারই প্রচেষ্টায় আরও কয়েকটি অনুরূপ অবতার-পার্ষদ-স্মৃতিকথা উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার জন্য তাঁহাকে বিগত কয়েক বর্ষ নিরলস শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। সে সমস্তই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা ও পূজাজ্ঞানে সম্পাদন করিয়াছেন। বৎসরের পর বৎসর তাঁহার এই সেবাব্রত উদ্‌যাপনের ফলস্বরূপ এই পুস্তকগুলি শ্রদ্ধাবান পাঠকজনের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিবে—ইহা আমাদের আশা, বিশ্বাস ও ভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

মহালয়া
৫ আশ্বিন, ১৪১৩
২২ সেপ্টেম্বর ২০০৬

স্বামী মুমুক্ষানন্দ
প্রকাশক
উদ্বোধন কার্যালয়

সূচীপত্র

ভূমিকা

আজ ১৩ জানুয়ারি ২০০৬ সাল। স্বামী তুরীয়ানন্দের ১৪৪তম জন্মদিবস। এই শুভ জন্মলগ্নে সাইত্রিশটি স্মৃতিপ্রদীপ জেলে আমরা স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতিপূজা শেষ করলাম। এই স্মৃতির প্রদীপগুলি ৮৬ থেকে ১০০ বছরের পুরনো হলেও ওদের বিচ্ছুরিত আলো সদাই উজ্জ্বল। আলো কখনও মলিন ও বৃদ্ধ হয় না। সেরূপ সত্য কখনও পুরনো হয় না। তাই গীতা-উপনিষদের বাণী যুগ যুগ ধরে মানবমনে শান্তি ও আনন্দের বার্তা বহন করে চলেছে ও চলবে। স্বামী তুরীয়ানন্দের জ্ঞানের আলো চিরদিন মোহান্ধকারে মুগ্ধ মানবকে পথ দেখাবে; তাঁর অমর কথা ভেঙে পড়া মানুষকে সাহস দেবে, সাধুভক্তদের অধ্যাত্মজীবনে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যদের সম্বন্ধে সুন্দরভাবে লিখেছেন ঃ "কোন জড়বস্তুর সহিত নির্বিকার চৈতন্যের তুলনা যদি চলে, তবে সে বস্তু চিরহিমানী স্তূপ। হিমাচলের নিরুদ্দিষ্ট উত্তুঙ্গতায় চিরসংহত তুষারপুঞ্জ বিরাজমান। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ওই চিরহিমানী স্তূপ, নির্বিকার চৈতন্য; তাঁহার শিষ্যগণ নদ-নদী প্রবাহ, সক্রিয় চৈতন্য। রামকৃষ্ণের বিশুদ্ধ চৈতন্যই শিষ্য-প্রবাহে বিগলিত হইয়া প্রচণ্ডবেগে, অকৃপণ ঔদার্যে একটা সমগ্র দেশকে সিক্ত, সিঞ্চিত, গততৃষ্ণ করিয়াছে। চিরহিমানীকে মানবনিরপেক্ষ, নিষ্ক্রিয় মনে করিলেও বস্তুত তাহা নয়, আত্মবিগলিত ধারায় মর্তজনের তৃষ্ণার ঘাটে ঘাটে সে প্রবাহিত। রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যগণকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইবে, তবেই তাঁহার লীলার সমগ্র রূপ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা।"

আমরা চিত্র দেখে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অঙ্কন করি। স্বামী তুরীয়ানন্দের ভারতে ও আমেরিকায় তোলা যতগুলি ছবি আছে, কোনটিতেই দেখা যায় না যে তিনি সামনে ঝুঁকে বা পিছনে হেলিয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বুক টান করে সোজা হয়ে বসা ছবি দেখে মনে হয় ভগবান এই মানুষটির মেরুদণ্ডকে দুঃখে

বা শোকে, তপস্যার কৃচ্ছ্রতায় বা বার্ধক্যে, রোগে বা মৃত্যুতে, কোন অবস্থাতেই বাঁকতে দেননি। এমন কি মৃত্যুর সময়েও তিনি সোজা হয়ে বসে দেহত্যাগ করতে চাইলেন। তিনি সারাজীবন সোজা পথে চলেছেন, কখনও মায়ার ঘোরানো আবর্তে ঘোরেননি। তাঁর স্ফীত বক্ষ ইঙ্গিত করে স্বামী তুরীয়ানন্দের অন্তরের শক্তি ও সাহস তাঁর পাঁজরাগুলিকে ফাঁপিয়ে তুলেছে। সুদৃঢ় গ্রীবায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্থিরতা ও নিষ্ঠা। চোখের দীপ্তিতে ফুটে উঠেছে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের বহ্নি। তাঁর বিশাল কপালে জ্বল জ্বল করছে মেধা, শাস্ত্রজ্ঞান। সারা মুখে সরলতা ও পবিত্রতা, জ্ঞান ও ভক্তির গাঢ় প্রলেপ। তাঁর প্রতি পদক্ষেপ বুঝিয়ে দেয় যে তিনি মাটি নয়, মায়াকে মাড়িয়ে চলেছেন—দেহবোধশূন্য—দেহস্থোঽপি অদেহস্থঃ। আর তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হতো বেদান্তের বাণী ঃ পবিত্র হও। মায়ামোহের বন্ধন শৃঙ্খল ভেঙে ফেল। এই জীবনেই মায়াপ্রপঞ্চকে উড়িয়ে দিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ কর।

স্বামী তুরীয়ানন্দের জীবনে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় হয়েছিল। দ্বৈত ভূমিতে অবস্থানকালে তিনি "মা, মা" বলে চোখের জলে জগৎ ভাসাতেন; আবার অদ্বৈতভূমিতে উঠে "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলে জগৎ নস্যাৎ করতেন। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। এই প্রসঙ্গে স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ তুরীয়ানন্দের একটি স্মৃতি আমাকে ১৯৭৭ সালে কাশীতে বলেছিলেন ঃ "আমি একদিন হরি মহারাজের সঙ্গে হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে বেড়াতে গিছলাম। রাস্তার পাশে এক খাবারের দোকানের সামনে এক হালুইকর বড় কড়াতে জিলিপি ভেজে চিনির রসে ফেলছিল। তা দেখে হরি মহারাজ চিৎকার করে বললেন, 'সুরেন, ঐ জিলিপি আমাদের আদর্শ! ঐ জিলিপি আমাদের আদর্শ। জ্ঞানরূপ ঘিতে ভেজে ভক্তিরূপ চিনির রসে নিজেদের ডোবাতে হবে। গরম জিলিপিতে কামড় দিলে বাইরে মচমচ করে কিন্তু ভিতরটা রসে ভরা।' হরি মহারাজের কথায় এবং উদাহরণে আমার মনটা ভরে গেল। আমাকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কেবল শুষ্ক জ্ঞান নয় বা কেবল ভাবালু ভক্তি নয়—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "প্রদীপ জ্বাললে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে

আপনি আসে—ডাকতে হয় না। তেমনি যে আদেশ পেয়েছে, তার লোক ডাকতে হয় না। তার নিজের এমনি টান যে লোক তার কাছে আপনি আসে।” এই স্মৃতিকথা গ্রন্থ পড়লে বোঝা যাবে স্বামী তুরীয়ানন্দের হৃদ্‌পদ্মে জ্ঞানের দীপ জ্বলেছিল। তাই দেশ-বিদেশ থেকে অধ্যাত্মপিপাসুরা তাঁর কাছে ছুটে যেত। তিনি সাধুভক্তদের সঙ্গ দিতেন এবং সৎপ্রসঙ্গ করে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার সকলকে বিলিয়ে দিতেন।

ভক্ত ও জ্ঞানী সাধুসঙ্গ বা সৎরূপী আত্মার সঙ্গ থেকে উপকৃত হন ও আনন্দ পান। ভক্তি ভগবদ্ভক্তসঙ্গ থেকে সঞ্চারিত হয়। প্রকৃত সাধুসঙ্গ সত্যই দুর্লভ। শঙ্কর বলেছেন—দুর্লভ “মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ”[১]। ভক্তকবি তুলসীদাস গেয়েছেন ঃ “বিনু সৎসঙ্গ ন হরিকথা / তেহি বিনু মোহ ন ভাগ। মোহ গয়ে বিনু রামপদ / হোঙ্গ ন দৃঢ় অনুরাগ ॥”—সৎসঙ্গ ব্যতীত হরিকথা হয় না, হরিকথা না হলে মোহ দূর হয় না এবং মোহ না গেলে ভগবৎচরণে দৃঢ় অনুরাগ হয় না। আবার জ্ঞানী শঙ্কর আমাদের সৎসঙ্গের মহিমা শোনান ঃ “সৎসঙ্গত্বে নিঃসঙ্গত্বং নিঃসঙ্গত্বে নির্মোহত্বম্। নির্মোহত্বে নিশ্চলতত্ত্বং নিশ্চলতত্ত্বে জীবন্মুক্তিঃ ॥” —সৎসঙ্গলাভ হলে সঙ্গহীনতা আসে, সঙ্গহীন অবস্থা হলে মোহ চলে যায়, মোহ গেলে নিশ্চলতা আসে এবং নিশ্চলত্ব এলে জীবন্মুক্তি ঘটে।

এই জীবন্মুক্তি বা নির্বাণলাভের জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ জীবনের প্রারম্ভে তীব্র পুরুষকার প্রয়োগ করেন। ১৯১৬ সালের ৮ জুলাই আলমোড়া থেকে একটা চিঠিতে তিনি তাঁর আত্মকথা ব্যক্ত করেন ঃ “জীবন্মুক্তি সুখপ্রাপ্তিহেতবে জন্মধারিতম্। আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসারকাম্যয়া ॥—যখন শঙ্করাচার্যের কৃত এই শ্লোক প্রথম পড়িয়াছিলাম, কি এক অদ্ভুত আনন্দ ও আলোকের অবতারণা তখন হইয়াছিল, তাহা আর আপনাকে কি জানাইব। যেন জীবনের ইতিকর্তব্যতা তখনই জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল এবং সকল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান আপনা হইতেই হইয়া গেল। তখন বুঝিলাম যে, মনুষ্যদেহ ধারণের উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—জীবন্মুক্তি সুখপ্রাপ্তিই ইহার একমাত্র প্রয়োজন।

১ দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্‌দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥ —বিবেকচূড়ামণি, ৩

বাস্তবিকই নিত্যমুক্ত আত্মা আর কোন কারণেই এই দেহধারণ করিতে পারেন না। দেহধারণ করিয়াও যে তিনি মুক্ত এই ভাব লাভ করিবার জন্যই তাঁহার দেহধারণ।''

শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে দিয়ে যা করান সে তাই করে, যা করান তাই করে, যতক্ষণ করান, ততক্ষণ করে। ঠাকুর কৃপা করে আমাকে দিয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দের এই স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলন ও সম্পাদন করিয়ে আমার ব্রত শেষ করলেন। গত বিশ বছর ধরে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে বেরিয়েছে এক বিরাট স্মৃতি-সাহিত্যমালা ঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি', 'মাতৃদর্শন', 'স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিকথা', 'স্বামী প্রেমানন্দের জীবন ও স্মৃতিকথা', 'স্বামী অখণ্ডানন্দকে যেরূপ দেখিয়াছি', 'স্বামী সুবোধানন্দের স্মৃতিকথা', 'স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিকথা', 'শ্রীম সমীপে'। স্বামী অপূর্বানন্দ ''শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ'' তিন খণ্ডে সঙ্কলন করেন, এখন তা একখণ্ডে উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ''শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে'' ৪ খণ্ডে ও ''স্মৃতির আলোয় স্বামীজী'' সঙ্কলন ও সম্পাদন করেছেন; এবং স্বরাজ মজুমদার ও মিতা মজুমদার ''স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ'' ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

এই বিশাল স্মৃতি-সাহিত্যমালা—যা এতদিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, গ্রন্থে, ডায়েরিতে ছড়ানো ছিল, তা আজ বাঙালি পাঠকদের হস্তগত হলো। এটি তাঁদের মহা সৌভাগ্য যে তাঁরা এই অমূল্য অধ্যাত্ম সম্পদের অধিকারী হলেন। এই স্মৃতি-সাহিত্যের আধ্যাত্মিক মূল্য ছাড়া দারুণ ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। এটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

সত্যি বলতে কি আমরা ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও অন্যান্য সন্ন্যাসী ও গৃহিভক্তদের কত কথা, কত স্মৃতি, কত চিঠি ও কত বক্তৃতা হারিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। শ্রীম মাত্র ১৭৬ দিনের বিবরণী কথামৃতে লিপিবদ্ধ করেছেন। স্বামীজীর বহু বক্তৃতা আমেরিকাতে ও ভারতে রেকর্ড হয়নি, কারণ তখন তো আর টেপরেকর্ডার ছিল না। ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা তাঁদের গুরু সম্বন্ধে

খুব কমই বলেছেন বা লিখেছেন। পরবর্তী কালে যেসব সাধু ও ভক্ত ঠাকুরের পার্ষদদের সঙ্গ করেছেন, তাঁরাও সকলে স্মৃতিকথা লেখেননি বা সেগুলির যে ভবিষ্যত ঐতিহাসিক মূল্য আছে সে কথা মনে করেননি। এখন এ ব্যাপারে হাহুতাশ করে লাভ নেই। "ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হয়"—এটিই এখন আমাদের কাছে প্রবোধ বাক্য।

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়নকালে আমাকে বেশকিছু স্মৃতিকথা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে হয়েছে। স্বামী অতুলানন্দের কয়েকটি স্মৃতি অনুবাদ করবার সময় আমি স্বামী জগদীশ্বরানন্দের অনুবাদের কিছু সাহায্য নিয়েছি। কোন কোন ক্ষেত্রে আমি আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে স্বাধীন অনুবাদ করেছি। ইতির পরেও থাকে পুনশ্চ। আমার এই সঙ্কলনই যে শেষ তা বলব না। ভবিষ্যতে কেউ যদি ঠাকুরের, মায়ের ও তাঁদের শিষ্যদের স্মৃতিকথা পান, সেগুলি ঐ পূর্বে উল্লেখিত স্মৃতি-সাহিত্যমালায় সংযোজিত হবে।

যাঁরা ব্রহ্মকে প্রজ্ঞা, প্রিয়, সত্য, অনন্ত, আনন্দ ও স্থিতিরূপে উপাসনা ও উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের কথায় মানবহৃদয়ে যে ঐশীশক্তির জাগরণ হয় স্বামী তুরীয়ানন্দের বাণী ও চিঠি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা তাঁকে চাক্ষুষ দেখিনি সত্য, কিন্তু এত দীর্ঘ দিনের ব্যবধানেও আমরা যখন তাঁর উপদেশ পড়ি বা শুনি তখন মনে হয় তিনি সশরীরে আমাদের সামনে বিদ্যমান। তিনি যে কীভাবে অধ্যাত্মপিপাসুদের অনুপ্রাণিত করেছেন তার কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করলে পাঠক বুঝতে পারবেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ একবার স্বামী নির্বেদানন্দকে বলেন, "আমিটাকে একেবারে থেঁতলে না ফেললে হবে না।" নির্বেদানন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "মনোনাশ না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না; আবার ব্রহ্মজ্ঞান না হলে মনের একেবারে নাশ হয় না। কোনটা আগে হয়?" স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দেন, "Simultaneous action—দুটোই একসঙ্গে হয়।" একমাত্র অনুভূতিবান পুরুষই এমন নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর দিতে পারেন।

১৯৭২ সালের ১৩ জুলাই স্বামী পবিত্রানন্দ আমাকে হলিউডে বলেছিলেন যে তিনি ছাত্রাবস্থা থেকে হরি মহারাজের খুব নিকট সান্নিধ্যে আসেন। একদিন হরি মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "কি চাও?" স্বামী পবিত্রানন্দ উত্তরে বলেন, "কি চাই জানি না, কিন্তু কি চাই না তা জানি।" তাঁর মনে তখন একটা ঝড় বইছিল। হরি মহারাজ বললেন, "Don't fight with your own shadow—the most unsubstantial thing." অর্থাৎ তুমি নিজের ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করো না। ঐ ছায়াই মায়া—ওটি অতি তুচ্ছ পদার্থ। স্বামী পবিত্রানন্দ বলেন ঃ "আমার মন হরি মহারাজের ঐ কথা শুনে শান্ত হয়ে গেল। একটু আগে আমার মনে ম্যাকবেথ-এ ডাইনিদের বর্ণিত 'ফুটুক কড়া জ্বলুক আগুন' চলছিল। সাধুসঙ্গের ফল আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করলাম। তাঁর অদ্ভুত ত্যাগ, স্থির বুদ্ধি ও তিতিক্ষা আমি যখনই মনে করি তখনই নূতন বল পাই।"

১৯৬৪-৬৫ সালে আমরা যখন বেলুড় মঠে ট্রেনিং সেন্টারে ছিলাম, তখন সন্ধ্যায় ধ্যানজপের পর ঠাকুরের ভোগের ঘণ্টা পড়লে আধ ঘণ্টার জন্য স্বামী নির্বাণানন্দের কাছে যেতাম। তিনি আমাদের ঠাকুরের শিষ্যদের অনেক পুরনো কথা বলতেন। একদিন তিনি হরি মহারাজকে বলেন, "মহারাজ, মা-বাপ ছাড়লুম, ঘরবাড়ি ত্যাগ করলুম, আপনাদের সান্নিধ্যে এলুম—কই এখনও তো ভগবান লাভ হলো না।" হরি মহারাজ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ "দেখ, তোমরা সব কল্পতরুর নিচে এসেছ। ঐ বৃক্ষে অজস্র ফল ঝুলছে। একদিন না একদিন ঐ ফল পড়বেই পড়বে এবং তুমি যদি ঐ গাছের নিচে থাক তবে ফল [মুক্তি বা ভগবদ্দর্শন] পাবেই পাবে। তবে যদি ঐ ফল এখুনি চাও—Shake the tree, shake the tree—অর্থাৎ ঐ গাছে দারুণ ঝাঁকুনি দাও। তীব্র পুরুষকার প্রয়োগ করলে শীঘ্রই মুক্তিরূপ ফল পাওয়া যায়।" এই স্মৃতিটি আমাদের নিরাশ হৃদয়ে জাগায় আশা। আমরা কল্পতরু রামকৃষ্ণের কাছে যখন এসেছি তখন আর ভাবনা কি।

কয়লার খনিতে মজুরগুলো সর্বাঙ্গে কালিঝুলি মেখে কয়লা কাটে। ঐ

কয়লার তাপে রান্না হয়, ইঞ্জিন চলে, বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎ আমাদের সভ্যতাকে দিচ্ছে আলো, গতি, সুখ ও সম্পদ। স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি ও অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলন ও সম্পাদন ব্যাপারে আমি ঐ কয়লাখনির মজুরের ভূমিকা নিয়েছি। বহু পুরনো লাইব্রেরির ধুলো ঝেড়ে, পুঁথিপত্রের পোকা মেরে এসব মূল্যবান স্মৃতি আমি জোগাড় করেছি, নতুবা এসব অধ্যাত্মসম্পদ অতীতের কবরে ঢাকা থাকত। অধ্যাত্মপিপাসুরা এ গ্রন্থ থেকে জ্ঞানের আলো, প্রাণে শান্তি ও মনে আনন্দ পেলে আমি মনে করব আমি আমার মজুরি পেয়েছি।

স্বামী চেতনানন্দ
সেন্ট লুইস, আমেরিকা
১৩ জানুয়ারি ২০০৬

স্বামী তুরীয়ানন্দের শতবর্ষ স্মরণে

স্বামী অতুলানন্দ

অনুবাদক ঃ স্বামী চেতনানন্দ

[স্বামী তুরীয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন ৩ জানুয়ারি ১৮৬৩। তাঁর শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে স্বামী অতুলানন্দ কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তাঁর স্মৃতিচারণ করেন এবং স্বামী ধীরেশানন্দ তা লিখে রাখেন ও পরে ওটি Atman Alone Abides গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।].

একশ বছর আগে এই দিনে (৮ জানুয়ারি ১৯৬৩—জন্মতিথি) কলকাতার বাগবাজারে এক ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ পরিবারে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে। তাঁর নাম হরিনাথ। ইনি পরবর্তী কালে হন স্বামী তুরীয়ানন্দ। আজ সন্ধ্যায় আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তাঁর জীবন ও উপদেশ আলোচনা করবার জন্য।

পাঁচ বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন এবং বার বছর বয়সে তাঁর পিতা দেহত্যাগ করেন। তাঁর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল এবং উভয়ে হরিনাথকে খুব ভালবাসতেন। বড় বৌদি হরিনাথকে মায়ের মতো স্নেহ দিয়ে মানুষ করেন। তিনি স্কুলে এনট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। নয় বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন হয় এবং তিনি ব্রহ্মচারীর মতো জীবনযাপন করতেন। তিনি ভালভাবে সংস্কৃত শিখে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতেন। বালক বয়স থেকে শঙ্করাচার্যের গ্রন্থাদির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। শঙ্করের শিক্ষা—"আমি আত্মা, আমি শরীর নই"—এটা তাঁর মনে খুব দাগ কেটেছিল। গীতাদি শাস্ত্রে জীবন্মুক্তের লক্ষণ পড়ে তিনি খুব অনুপ্রাণিত হন এবং ঐরূপ হবার বাসনা করেন। সত্যানুভূতিই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

ব্রহ্মচারীর মতো তিনি নিত্য গঙ্গাস্নান করতেন এবং স্বপাকে খেতেন। একদিন গঙ্গার ঘাটে স্নানকালে লোকেরা কুমির দেখল এবং তাড়াতাড়ি জল

থেকে উঠে পড়ল। তিনিও উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হলো ঃ "কী কুমিরের ভয়! আমি সদা বলি 'শিবোঽহং, শিবোঽহং' এখন আমি শরীর বাঁচাতে চাইছি যা আমি নই!" এভাবে নিজেকে ভর্ৎসনা করে তিনি উদ্বেগহীন হয়ে স্নান করতে লাগলেন। অবশ্য কুমির তাঁকে আক্রমণ করল না।

পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষার দ্বারা নিজের জীবন গড়ে তোলেন। হরি মহারাজ আমেরিকায় ও শান্তি আশ্রমে আমাদের প্রায় তিন বছর শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর তিনি ভারতে ফিরে আসেন। আমি যখন প্রথম ভারতে বেলুড় মঠে আসি, তিনি উত্তরকাশীতে তপস্যা করছিলেন। আট মাস পরে আমাকে মায়াবতী পাঠানো হয়; সেখানে আমি দু-বছর ছিলাম। তারপর আমি কাশীতে এসে শুনলাম যে হরি মহারাজ খুব অসুস্থ। স্বামী কল্যাণানন্দ তাঁকে কনখলে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে আমি কনখলে তাঁকে দেখতে যাই। তিনি ক্রমশ সুস্থ হতে থাকেন। একদিন তাঁর সঙ্গে রাজঘাটে বেড়াতে গেলাম। সেখানে অনেক মন্দির দেখে আমি বললুম, "মহারাজ মন্দিরের ভিতর যাবেন?" তিনি বললেন, "না। আমার এখন মন্দিরে ঢোকার মনোভাব নেই।" আমেরিকাতেও তাঁকে বিভিন্নভাবে থাকতে দেখেছি।

আর একদিন হরি মহারাজের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে দেখি একটা বড় বানর পাঁচিলের ওপর আছে। তিনি বানরের দিকে তাকালে সে রেগে মুখ ভ্যাংচাতে লাগল। আমি বললুম, "মহারাজ, তাড়াতাড়ি সরে আসুন—নতুবা বানরটি আপনাকে কামড়াতে পারে।" তিনি বললেন, "না—ও আক্রমণ করবে না। আমাকে ভয় দেখাচ্ছে।" এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর সেই কাহিনি মনে পড়ে। বানররা আক্রমণ করলে স্বামীজী দৌড়ে পালাচ্ছিলেন, তখন এক সাধু বলেছিল ঃ "পালিয়ো না। দৌড়ালে এদের কাছ থেকে রক্ষা পাবে না। ঐ জানোয়ারদের সম্মুখীন হও। কখনও ভয় পেয়ো না।" এ শিক্ষা আমাদের সকলের প্রতি প্রযোজ্য। জীবনে যত বাধাবিপত্তি আসুক না কেন আমাদের তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

১৯১৭ সালে স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে পুরীতে ছিলেন।

সেখানে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আমাকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন আমি পুরী যাই। ডাক্তার দুর্গাপদ এবং অন্যান্য ডাক্তার কলকাতা থেকে তাঁর চিকিৎসার জন্য পুরীতে যান। ঐ কালে স্বামী তুরীয়ানন্দ আমাকে বলেছিলেন ঃ "তোমার আসার পূর্বে আমি দেখলুম আমার শরীর থেকে দুটি মূর্তি বেরিয়ে এল। তারা জীবন ও মৃত্যু। তারা ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে শুরু করল। উভয়েই সমান বলবান। একবার এ জেতে আবার অন্যজন জেতে। শেষে জীবন মৃত্যুকে পরাস্ত করল। আমি বুঝলুম এবার আমি মরব না যদিও আমার জীবন বিপদাপন্ন।"

পুরীতে কিছুটা সুস্থ হলে আমরা সবাই স্বামী তুরীয়ানন্দকে নিয়ে কলকাতায় উদ্বোধন বাড়িতে এলাম। তাঁর হাতে কয়েকটা ফোঁড়া দেখা দিল। ডাক্তার যখন সেগুলি অপারেশন করে, স্বামী তুরীয়ানন্দের মুখে কোন যন্ত্রণার চিহ্ন দেখা গেল না। মনে হলো তিনি দেহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মনকে তুলে নিয়েছেন। আমি তাঁকে বারবার অসুস্থ হতে দেখেছি। আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "মহারাজ, আপনি কি নিজেকে এবার ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে পারেন না?" তিনি উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, যোগাভ্যাসের দ্বারা দেহকে ব্যাধিমুক্ত করা যায়।" তারপর কয়েক মিনিট পরে বললেন ঃ "কে বলে আমি পীড়িত? তুমি বলছ আমি অসুস্থ। আমি বলছি আমি অসুস্থ নই। আমি শরীর নই—আমি অজর অমর আত্মা। আমি দেহ থেকে পৃথক সত্তা।" এই বলে তিনি গীতা থেকে এই শ্লোকটি বললেন ঃ

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ —২।২৩

—কোন অস্ত্র এই আত্মাকে কাটতে পারে না। অগ্নি একে পোড়াতে পারে না। জল একে ভিজাতে পারে না এবং বায়ু একে শুকাতে পারে না।

আমি তাঁর কথায় খুব মুগ্ধ হলাম। এটিই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। এর অল্পকাল পরে আমি আমেরিকায় ফিরে যাই। "আমি দেহ নই, মন নই—আমি আত্মা"—তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

হরি মহারাজ নিজের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা খুব কমই বলতেন। একবার শান্তি আশ্রমে একজন হরি মহারাজের কাছে অভিযোগ করে, তার ধ্যান ও আধ্যাত্মিক উন্নতি থেমে গেছে। এখন তার করণীয় কি? হরি মহারাজ বললেন ঃ "আধ্যাত্মিক উন্নতি কখনও সরলরেখায় চলে না। এ পথ শাঁখের মতো পেঁচালো। এ ক্রমাগত ওঠা-নামা করে। যেমন একজন হিমালয়ের একটা শৃঙ্গে উঠল, তারপর নিচে উপত্যকার দিকে নামল; আবার সে শৃঙ্গের দিকে উঠতে লাগল। আরোহণের পর যদিও সে অবরোহণ করছে, তবুও সে সর্বদা সুউচ্চ গন্তব্যস্থানে এগিয়ে চলেছে। আধ্যাত্মিক জীবনেও ঠিক এরূপ হয়।" তারপর তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বললেন ঃ "আমি তখন যুবক ও বরানগর মঠে বাস করছি। সে সময় আমার মনে এক দারুণ হতাশ ভাব এল। আমি ধ্যান করতে পারলুম না। আমার তখন তোমার মতো মনের অবস্থা। আমি রাতে মঠের ছাদে একা পায়চারি করতে লাগলুম। চারদিকে মেঘাবৃত গাঢ় তমিস্রা। হঠাৎ বাতাসে মেঘ বিদীর্ণ হয়ে পূর্ণচন্দ্র স্বমহিমায় বিকশিত হলো। আঁধার বিদূরিত হলো এবং জ্যোৎস্নায় সব উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এ দৃশ্য আমার ভিতর আলোড়ন জাগাল। এক ঝলকে আমার অনুভূতি হলো—আমি ঐ পূর্ণ চন্দ্রের মতো জ্যোতির্ময় আত্মা। আমার আত্মালোকে জগৎ আলোকিত। তখন আমার সকল হতাশ ভাব দূর হলো।"

অন্য এক সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ পরিব্রাজক জীবন যাপন করছিলেন। একদিন তাঁর মনে এই চিন্তা উঠল ঃ "আমি কী করছি? আমি ভবঘুরে জীবন যাপন করছি। অন্যেরা সব কাজ করছে এবং কিছু না কিছু তৈরি করছে; আর আমি নিষ্কর্মা।" এই চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসল এবং অস্থির করে তুলল। তারপর একদিন তিনি এক গাছের ছায়ায় [বৃন্দাবনে কেশীঘাটে] ক্ষুধার্ত ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়েন। নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর এক অলৌকিক অনুভূতি হলো ঃ তিনি দেখলেন যে নিজের শরীর থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন এবং ঘুমন্ত শরীর পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি দেখতে লাগলেন তাঁর শরীর ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এবং তার কোন পরিসীমা নেই। তাঁর শরীর এত বাড়ল যে সারা

পৃথিবীকে ঢেকে ফেলল। তখন তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "কী আশ্চর্য! তুমি তো ভবঘুরে নও। তুমি সারা বিশ্বের সঙ্গে এক হয়ে রয়েছ। তুমি প্রকৃত সর্বব্যাপী আত্মা।" এই ভাবনা নিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙল এবং তিনি অপূর্ব আনন্দ অনুভব করলেন। তাঁর হতাশভাব বিদূরিত হলো।

স্বামী তুরীয়ানন্দ আড্ডা, গালগল্প একদম পছন্দ করতেন না। শান্তি আশ্রমে তাঁর অনুপস্থিতিতে আমরা নানা বিষয় আলোচনা করতুম। যেই দেখতুম তিনি আমাদের দিকে আসছেন তখনই চুপ করে যেতুম। তিনি জিজ্ঞাসা করতেন ঃ "কী কথা হচ্ছিল? তোমরা কেন এখানে এসেছ? আজেবাজে কথা তোমরা শহরে (স্যানফ্রান্সিস্কোতে) গিয়ে করতে পার। এখানে তোমরা কেবল মায়ের কথা ও মায়ের চিন্তা করবে।" "মা" বলতে তিনি আত্মাকেই বোঝাতেন।

তিনি বলতেন ঃ "অধ্যাত্মজীবনে আত্মসমর্পণ বা পূর্ণ শরণাগতিই সর্বোচ্চ অবস্থা। আত্মনিবেদন ও আত্মচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে একই বস্তু। মনকে পবিত্র করবার জন্য চাই চেষ্টা। যাদের বয়স অল্প তাদের প্রচণ্ড সাধনা করা প্রয়োজন; কারণ বৃদ্ধ বয়সে নূতন সংস্কার সৃষ্টি করা কঠিন। বৃদ্ধ বয়সে কেবল চর্বিতচর্বণ অর্থাৎ পূর্ব কর্মের পুনরাবৃত্তি। উঠে পড়ে লাগ। যৌবনই সফলকাম হবার শ্রেষ্ঠ সময়। এখানে এবং এখনই সিদ্ধিলাভ কর। জীবনে কখনও সত্যলাভের পথে আপস কোরো না।"

(উৎস ঃ Atman Alone Abides, p.158-164)

শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দের শেষ দিনগুলি

স্বামী অতুলানন্দ

অনুবাদক ঃ স্বামী চেতনানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দ ক্যালিফর্নিয়ার শান্তি আশ্রমে প্রায় দেড় বছর ছিলেন। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে আশ্রমের কাজ শুরু করেছিলেন। বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন ধারণার বশবর্তী ছাত্রছাত্রীদের সর্বদা ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য তাঁর অত্যধিক মানসিক ক্লান্তি হতো। ফলে তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী দুর্বল ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হলো। সকলে তাঁর বায়ুপরিবর্তন ও বিশ্রামের আবশ্যকতা অনুভব করলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ একাধিকবার তাঁর প্রিয় গুরুভাই স্বামী বিবেকানন্দকে দেখবার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় ও স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁর স্বাস্থ্যলাভ হবে ও নতুন আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে তিনি ফিরে আসবেন—এই আশায় ছাত্রগণ তাঁকে প্রথম শ্রেণির পাথেয় দেবার ব্যবস্থা করলে স্বামী তুরীয়ানন্দ উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হলেন। যাত্রার দিন ঠিক হলো।

শান্তি আশ্রমে শেষের দিনগুলিতে তিনি স্নায়ুর চাপে ভুগছিলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি সুস্থ বোধ করতেন এবং যখন ঠাকুর, স্বামীজী ও জগদম্বার কথা বলতেন তখন আবার আধ্যাত্মিক আবেগে ও শক্তিতে পূর্ণ হয়ে যেতেন। দৈহিক দুর্বলতা কখনও তাঁর মনকে তমসাচ্ছন্ন করতে পারেনি। তিনি আমাকে বলতেন, "কেবল আমার স্নায়ুগুলি ক্লান্ত। আমার মন স্বচ্ছ ও সবল আছে। আমার বিশ্রামের প্রয়োজন। স্বামীজীকে দেখে আমি আবার ফিরে আসব।"

এক সন্ধ্যায় আমি তাঁর কেবিনে প্রবেশ করতেই স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁর এক দিব্য দর্শনের কথা আমাকে বলেন। জগন্মাতা তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে শান্তি আশ্রমে থাকতে বলেন, কিন্তু তিনি রাজি হন না। জগন্মাতা তাঁকে

বলেন যে তিনি আশ্রমে থাকলে আশ্রমের দ্রুত উন্নতি হবে এবং অনেক সুন্দর গৃহ নির্মিত হবে। তবুও তিনি অস্বীকার করেন। শেষে মা জগদম্বা তাঁকে সেখানে বহু শিষ্যের সমাবেশ দেখান। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেন, "স্বামীজীকে দেখতে আমি একবার ভারতে যাবই।" এতে মা গম্ভীর বদনে অন্তর্হিতা হলেন।

এই দর্শনে স্বামী তুরীয়ানন্দ দুঃখিত ও চিন্তিত হলেন। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "জগদম্বার আদেশ অগ্রাহ্য করে আমি ভুল করেছি, কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই।" কয়েক দিন পরে তিনি শান্তি আশ্রম থেকে স্যানফ্রান্সিস্কোতে চলে গেলেন।

শেষ দিন সকালে আমি যখন তাঁর যাত্রার ব্যবস্থা করছিলাম, তিনি আমাকে তাঁর কেবিনে ডেকে পাঠালেন। কেবিনে ঢুকে দেখলুম তিনি মেঝেতে বসে আছেন—প্রশান্তবদন। আমাকে ইঙ্গিত করে সামনে বসতে নির্দেশ দিয়ে অতি মিষ্টস্বরে তিনি বললেন, "গুরুদাস, আমি তোমার জন্য এই আশ্রমটি গড়ে তুলেছি। এখানে শান্তিতে থাকো।" ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর তিনি বললেন, "আর যারা জগন্মাতার সন্তানরূপে থাকতে চায় তাদের জন্যও এই আশ্রম। তোমার ওপর এই আশ্রমের পূর্ণ ভার রইল। আমি তোমাকে সব বলেছি। তোমার কাছে আমি কিছু গোপন রাখিনি। আমার মনের গভীর চিন্তাগুলিও তোমার নিকট ব্যক্ত করেছি। তুমি দেখেছ আমি কিভাবে জীবনযাপন করেছি। এখন সেভাবে থাকবার চেষ্টা কর।"

"কিন্তু তা আমার পক্ষে অসম্ভব, স্বামী," আমি বললুম। আমার দিকে স্নেহভরে তাকিয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন, "সব কিছুর জন্য মায়ের ওপর নির্ভর কর। তাঁকে বিশ্বাস কর, তিনিই তোমাকে চালিত করবেন। তিনি তোমাকে কখনো বিপথে যেতে দেবেন না। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত। একটা বিষয় মনে রেখো—কারোর ওপর প্রভুত্ব কোরো না। সকলকে সমভাবে দেখ এবং সমান ব্যবহার কোরো। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব কোরো না। সকলের কথা দরদ দিয়ে শুনবে এবং ন্যায়ের পথ অবলম্বন করবে।"

"আমি চেষ্টা করব। কিন্তু এ কাজ খুব দায়িত্বপূর্ণ," আমি বললুম। স্বামী

তুরীয়ানন্দ বললেন, "তুমি কেন দায়িত্বের কথা ভাবছ? মা-ই সব ভার নেন। তুমি তাঁর সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেছ। তোমার ভয় কি? খুব আন্তরিক হবে এবং তাঁকে সদা স্মরণ করবে।"

তখন তিনি সুর করে "ওঁ ওঁ ওঁ" উচ্চারণ করতে লাগলেন এবং ঐ তালে তাঁর শরীরটা দুলতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি থামলেন এবং সোজা হয়ে বসে জোরের সঙ্গে বললেন, "কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা ও অহংকার দমন কর। কারো পিছনে তার নিন্দা কোরো না। সব বিষয় খোলা মনে সামনাসামনি আলোচনা কোরো। কোনো কিছু করতে হলে তুমি প্রথম শুরু করবে। তখন অন্যেরা যোগ দেবে। তুমি প্রথমে না করলে কেউ করবে না। তুমি জান, আমি ঐ জন্য এখানে সব রকম দৈহিক কাজ করেছি।"

"কিন্তু কে ক্লাস নেবে? আমি কী শিক্ষা দেব? আমি নিজে তো ছাত্র মাত্র।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ ঃ "তুমি এখনও বোঝনি বাবা, আদর্শ জীবনযাপনই আসল কথা। জীবনই সৃষ্টি করে জীবন। সেবা কর, সেবা কর, সেবা কর—এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। নম্র হও। সকলের সেবক হও। যে সেবা করতে প্রস্তুত, সেই ব্যক্তিই শাসন করতে সমর্থ। তুমি আমাদের কাছে বহু বছর বেদান্ত অধ্যয়ন করেছ। যা তুমি জান তাই শেখাও। তুমি যেমন দেবে তেমনি পাবে।"

আমি শঙ্কিত হয়ে বললাম, "আপনি চলে গেলে আমাদের অবস্থা হবে রাখালহীন মেষপালের মতো।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমি তোমাদের কাছে সূক্ষ্মদেহে থাকব।" তারপর ঘোড়ার গাড়ি এল। স্বামী তুরীয়ানন্দ যাত্রার জন্য তৈরি। আমার মাথায় হাত দিয়ে তিনি আশীর্বাদ করে বললেন, "তুমি মায়ের এবং মা তোমার।" বিদায়কালে তাঁর চক্ষুর্দ্বয় সজল হলো; আমি মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিজের ভাব গোপন করলাম। নিঃশব্দে তিনি কেবিন ত্যাগ করে গাড়িতে উঠলেন।

এই ক্ষুদ্র কেবিনে আমরা দুজনে কী সুখে ছিলাম, এখন তা শূন্য বোধ

হলো। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি যখন কেবিন থেকে বাইরে এলাম, তখন সেই চলন্ত ঘোড়ার গাড়ির ধূলি দেখতে পেলাম। সেই আঁকাবাঁকা পার্বত্যপথে যতদূর দৃষ্টি যায়, আমি সেই গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম। শেষ বাঁকে গাড়িটা একটু থামল। আমি বুঝলাম তিনি আমাদের জন্য শেষ প্রার্থনা রেখে যাচ্ছেন।

দুঃখিত মনে আমি কেবিনে ফিরে এলাম এবং ভিতরে ঢুকে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করলাম। এর ফলে আমার ব্যথিত মনে শান্তি এল। আমি আশ্রমবাসীদের বললাম যে, স্বামী তুরীয়ানন্দ এখন আমাদের সঙ্গে আছেন এবং তাদের তাঁর প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করলাম ঃ "আমি তোমাদের কাছে সূক্ষ্মদেহে থাকব।"

(উৎস ঃ প্রবুদ্ধ ভারত, জানুয়ারি ১৯২৫)

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি

আইডা আনসেল

প্রথম পর্ব ঃ অনুবাদক—শ্রীমতী সূর্যমুখী দেবী

দ্বিতীয় পর্ব ঃ অনুবাদক—শ্রী গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস

প্রথম পর্ব

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে স্বামী তুরীয়ানন্দ কর্তৃক আমেরিকায় প্রথম বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠার একমাত্র জীবিত প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে আমাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ। দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যাবার সময় স্বামী বিবেকানন্দ এঁকে সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেন যাতে আমেরিকায় তাঁর সহকারিরূপে কাজ করতে পারেন। প্রথমে স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারত ত্যাগ করে সেখানে যেতে অস্বীকার করেন, কিন্তু শেষে যখন স্বামীজী তাঁকে মিনতি করে বললেন, "হরি ভাই, একা আমি খাটতে খাটতে মরে যাচ্ছি—তুমি কি একটু সাহায্য করবে না?" তখন তিনি যেতে সম্মত হলেন।

১৮৯৯ সালের শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ ক্যালিফোর্নিয়ায় আসেন এবং লস এঞ্জেলিস শহরে বক্তৃতা দেন। কখনও কখনও তিনি মিড (Mead) ভগিনীত্রয়ের বাড়িতে থাকতেন। এঁদেরই একজন হচ্ছেন মিসেস এলিস হ্যানস্‌বরো। স্বামীজীর কাজে সাহায্য করার জন্য তিনি তাঁর সঙ্গে স্যানফ্রান্সিস্কোতে আসেন। ডক্টর বি. কে. মিলস্-এর ইউনিটেরিয়ান চার্চে স্বামীজীর কয়েকটি বক্তৃতা হয়। এইসব ভাষণে খুব একটা উৎসাহের সাড়া পড়ে যায় এবং স্বামীজী ওকল্যান্ড, অ্যালামেডা এবং স্যানফ্রান্সিস্কোতে পর পর অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। প্রধানত তিনি অ্যালামেডায় 'হোম অব ট্রুথ' এ থাকতেন। স্যানফ্রান্সিস্কোতে একটি ছোট দল গড়ে ওঠে। এঁরা ওখানে থাকবার

জন্য স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা জানান। কিন্তু স্বামীজী তখন ভারতে ফিরে আসতে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। তিনি বললেন—"আমি এমন একজন হিন্দু সন্ন্যাসীকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব যাঁর জীবনটি তোমরা দেখতে পাবে আমার উপদেশগুলির প্রত্যক্ষ মূর্তি।" তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে মনে করেই এই কথা বলেছিলেন। তুরীয়ানন্দজী তখন নিউইয়র্কে স্বামী অভেদানন্দকে সাহায্য করছেন।

যা হোক, স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন আমাদের কাছে এলেন আমরা কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর ঐ উক্তি তাঁকে বলি। তিনি উত্তর দিলেন—"আমি হচ্ছি একটি ছোট্ট ডিঙ্গি, বড় জোর দু তিন জন লোককে পার করে দিতে পারি, কিন্তু স্বামীজী হচ্ছেন একটি বিরাট জাহাজ; বিপুল সংসার-জলধিতে হাজার হাজার লোকের তিনি কর্ণধার হতে পারেন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দকে ডেট্রয়েটে রেখে বিদায় নেবার সময় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে যে শেষ উপদেশ দিয়ে যান সে কথাও তিনি আমাদের বললেন—"ভারতকে ভুলে যাও। ঐ অঞ্চলে গিয়ে আশ্রমটি গড়ে তোল। বাদবাকি মা সম্পূর্ণ করে দেবেন।" পরবর্তী কালে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলেছিলেন যে, তিনি স্বামীজীর একটি কথা রাখতে পারেননি—ভারতকে ভুলে যাওয়া।

স্বামী তুরীয়ানন্দ স্যানফ্রান্সিস্কোতে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই সময়ে সকালে তিনি ধ্যানশিক্ষা দিতেন। সঙ্কল্পিত কাজের কোন্ দিকটাতে আগে হাত দেওয়া হবে এই নিয়ে সকলের সঙ্গে তখন বিশেষ আলোচনা চলে। শহরের বহু লোক যেখানে আসতে পারে সেই রকম একটা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে কিংবা কতিপয় খুব নিষ্ঠাবান ও আগ্রহশীল ধর্মজীবনলাভেচ্ছুর উপকারের জন্য শহর থেকে দূরে একটি আশ্রম শুরু করা হবে? স্বামী তুরীয়ানন্দ মনোযোগ-সহকারে সব রকম আলোচনা শুনে ঠিক করলেন, প্রথমে আশ্রমটাই হওয়া চাই। বললেন—"মা প্রসন্না হয়েছেন।" সুতরাং ঠিক হলো যে মিস বুক* আর মিস লিডিয়া

* মিস মিনি সি বুক (Minnie C. Booke)। স্যান অ্যান্টনিয়ো ভ্যালিতে একখণ্ড জমি ইনি স্বামী বিবেকানন্দকে দিতে চেয়েছিলেন একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য।

বেল (Lydia Bell) আশ্রম স্থাপনের প্রস্তাবিত স্থানে কিছুদিন আগেই যাবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সব করে ফেলবেন।

অল্প বয়সে স্বাস্থ্যহানির দরুণ স্বাভাবিক সর্বরকম কার্যক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি তেইশ বছর বয়সেই এক রকম অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিলাম। শরীর ছিল খুব কৃশ। কিন্তু এসব অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমি আশ্রমে যাবার জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে অনুমতি চাইলাম। আমার দিকে চেয়ে স্নেহভরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি যেতে চাইছ কেন?"

আমি বললাম—"মাখন হব বলে।"* তিনি খুব খুশি হয়ে উত্তর দিলেন, "তুমি যেতে পার, তোমার মা যদি অনুমতি দেন। আর দৃঢ় অধ্যবসায় যদি থাকে তো 'মাখন' হয়ে যেতে পারবে।"

বর্তমানে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মোটরকারে স্যানফ্রান্সিস্কো থেকে শান্তি আশ্রমে যাওয়া যায়। কিন্তু আমি বলছি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের কথা। তখন রেলগাড়িতে যেতে হতো স্যান জোসে (San Jose); তারপর চারঘোড়ার গাড়িতে করে মাউন্ট হ্যামিলটন পর্যন্ত—সেখান থেকে কুড়ি মাইল একটা সরু পার্বত্য পথ ধরে নিজেদের যানবাহনে স্যান অ্যান্টনিয়ো ভ্যালিতে পৌঁছুতে হতো।

একদিন আমাদের দলটি বিকেলের দিকে স্যানফ্রান্সিস্কো ছাড়ে—রাতে স্যান জোসের একটা ছোট হোটেলে কাটিয়ে ভোর চারটার সময় পাহাড়ের অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। দলের সকলেই ছিলেন খুব আমোদপ্রিয় ও উৎসাহী। সারা মনঃপ্রাণে এঁরা ভ্রমণটিকে উপভোগ করছিলেন। যতই এগিয়ে যাচ্ছিলাম পথের দৃশ্য ততই মনোরম এবং পরিবর্তিত হচ্ছিল। সুদৃশ্য গ্রামাঞ্চলের ভিতর দিয়ে চওড়া রাস্তাটি চলে গেছে। কোথাও গোলাবাড়ি, কোথাও ফলের বাগান—এরই

---

* পূর্বে একটি বক্তৃতায় স্বামী তুরীয়ানন্দ আত্মানুভূতির ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে আমাদের বলেছিলেন—দুধের ভেতর যেমন মাখন আছে কিন্তু মন্থন না করলে তা পাওয়া যায় না, সেই রকম প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন তাঁকে ধ্যান-সহায়ে প্রত্যক্ষ করতে হয়। 'মাখন হওয়া' মানে আমি আত্মজ্ঞানলাভ করা বোঝাতে চেয়েছিলাম।

মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। দুবার পথে ঘোড়া বদল করা হলো। বেলা দুটোয় মাউন্ট হ্যামিলটনের শিখরস্থিত লিক অবজারভেটরিতে পৌঁছানো গেল। এখানে আশানিরাশার একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের দলে সবশুদ্ধ নয় জন লোক—সঙ্গে তাঁবু, খাদ্যসামগ্রী এবং অন্যান্য জিনিসপত্রও প্রচুর। কিন্তু দেখলাম আমাদের জন্যে রয়েছে গদিওয়ালা দুটি সিটযুক্ত ছোট্ট একখানা গাড়ি, চারটি খচ্চর টানছে। স্যান অ্যান্টনিয়ো ভ্যালির অধিকাংশ জমির মালিক, মিঃ পল গারবার, গাড়িটির চালক। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর গাড়িতে ছোট একটা পুঁটলি পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে না। পাহাড়ের অন্যদিকে আমাদের গন্তব্যস্থানের দিকে চেয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দকে খুব চিন্তান্বিত দেখা গেল। তাঁর নৈরাশ্য দেখে মিসেস আগনাসস্ট্যানলি এগিয়ে এলেন এবং তাঁর কোলের ওপর নিজের টাকার থলিটি উজাড় করে তাঁকে ভর্ৎসনার সুরে বললেন—"একটা শিশুকেও যে বিশ্বাসটুকু রেখে চলতে হয়, আপনার দেখছি সেটুকুরও অভাব।" তুরীয়ানন্দজী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উত্তর দিলেন—"তুমি আমার মা, তোমার নাম দিলুম 'শ্রদ্ধা'।"

অবজারভেটরি থেকে কোন গাড়ি ভাড়া পাওয়া সম্ভবপর হলো না। কিন্তু তাঁরা দুটো ঘোড়া ধার দিলেন। সুতরাং দলের দুজন লোক—একজন হচ্ছেন মিসেস স্ট্যানলি, আর একজন ডাঃ এম. এইচ. লোগান—ঘোড়ায় উঠলেন। বেচারি মিঃ জর্জ রুরব্যাক চাপলেন তাঁর বাইসাইকেলে (বাইসাইকেলটি লটবহররূপে যাবার কথা ছিল)। দলের বাকি কয়জন কোনও মতে পূর্বোক্ত গাড়িতে উঠে পড়লেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ, চালক এবং দুজন মহিলা বসলেন সিটে। অবশিষ্ট আমরা তিন জন উঁচুর দিকে পা তুলে গাড়ির মেঝেতে বসলাম। দুজনকে দুপাশে জাপটে ধরে মাঝখানে আমি বসেছিলাম। ওঁরা দুজন আবার গাড়ির দুটো পাশ চেপে ধরে চলছিলেন। নিচের দিকে নামতে একটু বেশ আরাম লাগছিল, কিন্তু ওপরে ওঠবার সময় সাথি দুজনকে জোরে জড়িয়ে ধরতে হচ্ছিল। সরু রাস্তা—ধুলোয় ভর্তি। মাঝে মাঝে গভীর খাদ। চাষ-আবাদহীন আরণ্য অঞ্চল। কিন্তু চারপাশে নিবিড় সৌন্দর্য। খুবই গরম

লাগছিল, জলও পথে নেই। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে নীরবে বসে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। কথাবার্তা চলছিল খুব কম। বিকেলের শেষাশেষি মিসেস স্ট্যানলি গরমে মূর্ছিতা হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ খুব উত্তেজনা চলল। অবশেষে তাঁর সংজ্ঞা এলো। স্বামীজী তাঁকে গাড়িতে তুলে বসাতে বললেন। নিজে উঠলেন ঘোড়ায়। অবশেষে বাদামি রঙের একটি ঘোড়ায় সোজাভাবে উপবিষ্ট গেরুয়াবর্ণের রেশমি সুট পরিহিত স্বামী তুরীয়ানন্দকে পুরোভাগে নিয়ে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছুলাম।

জায়গায় পৌঁছে আমাদের খুশির অন্ত নেই। কিন্তু আসার পরই আর এক সমস্যা দেখা দিল। কয়েক বছর মিস বুক তাঁর এই নিভৃত বাড়িটিতে আসেননি। অনেক জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মিঃ গারবারের সাহায্যে দুই জন মহিলা সমস্ত উপত্যকাটা ঘুরে কিছু কিছু আসবাবপত্র সংগ্রহ করে ফিরে এলেন। পরিত্যক্ত কয়েকটি কেবিন থেকে এসব সংগৃহীত হলো। রাতের খাবার হলো ভাত আর লাল চিনি। খেয়ে নিয়ে আমরা আগুনের পাশে গোল হয়ে বসলাম। স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সুমিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠনিঃসৃত সংস্কৃত মন্ত্রগুলো শুনতে শুনতে আমরা সব কষ্ট ও ক্লান্তি ভুলে গেলাম। মন্ত্রের ভাবার্থ ঃ

"সেই পরম পুরুষ যিনি এই বিরাট বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন—তাঁরই জ্যোতির্ময় সত্তার আমরা ধ্যান করি। তিনি আমাদের অন্তরকে আলোকিত করুন।"

একটা গভীর প্রশান্তি আমরা অনুভব করতে লাগলাম। স্নিগ্ধ বাতাস মৃদুভাবে বইছিল। ঘন কালো রাত। উজ্জ্বল তারাগুলি যেন নুয়ে পড়ছিল আমাদের কাছে। ফেলে আসা অতীতের বিয়োগান্ত মুহূর্তগুলি—আর মূঢ় আমোদ-প্রমোদের ক্ষণগুলি সব যেন অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে—আর এই মুহূর্তেই যেন আরম্ভ হয়েছে আমাদের নূতন জীবন!

(২)

এর পর সব কিছুরই সম্মুখীন হতে আমরা প্রস্তুত রইলাম। কাঠের একখানি ছোট কুঠরি আর একটা তাঁবু পাওয়া গেল রাত কাটাবার জন্যে। এগারো জন

লোকের পক্ষে খুবই অপর্যাপ্ত; কিন্তু আমাদের সেটা সমস্যা বলেই মনে হলো না। বর্ষীয়সী দুইজনকে ঐ কুঠরিটি দেওয়া হলো। আগুনের কুণ্ডটার পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে ডাঃ লোগান শুয়ে পড়লেন। ধীরা (মিসেস বার্থা পিটারসন) আর আমি উপত্যকাটির কিছুদূর নিচে একটা খড়ের গাদা আবিষ্কার করে ফেললাম। বললাম, ঐ খড়ের গাদাতেই আমরা শোব। অপরদেরও আমন্ত্রণ জানালাম। কিন্তু মিসেস এমিলি অ্যাসপিনাল (Emily Aspinal) ও শ্রদ্ধা, মিস বুক আর মিস বেলের সাথে তাঁবুর মধ্যে থাকাই সিদ্ধান্ত করলেন। কেবল মিঃ রুরব্যাক ও আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য স্বামী তুরীয়ানন্দজী আমাদের আমন্ত্রণ রাখলেন। খড়ের গাদাটির একপাশে ওঁরা দুজন এবং অপর পাশে আমি আর ধীরা শুয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ ধরে গল্প চলল। কারো চোখেই ঘুম নেই। সুদূর এই জনমানবহীন স্থানে আমাদের দলের অভিনব পরিস্থিতি সকলেরই চিত্তে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করছিল। তন্দ্রা আদৌ আসবার কথা নয়। প্রত্যেকের একখানি করে পাতলা কম্বল ছিল; রাত কাটানোর পক্ষে যথেষ্ট, কারণ রাতটা ছিল গরম আর পোশাক-পরিচ্ছদও আমরা কেউ খুলিনি। আমাদের যেন আনন্দের সীমা ছিল না। শেষ রাতের দিকে ঘন কুয়াশা পড়েছিল, এটা ঐ সময়ে খুবই অস্বাভাবিক।

সে রাত্রি ঐভাবে কাটলো। ঠাণ্ডায় ধীরা ও আমার স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে আশঙ্কায় পরের দিন থেকে আর আমাদের বাইরে শুতে দেওয়া হলো না। অপর চার জন মহিলার সঙ্গে আমাদেরও তাঁবুতে শোবার আদেশ হলো। মিঃ রুরব্যাক ও স্বামী তুরীয়ানন্দজী কিন্তু যথারীতি খড়ের গাদার ওপরেই রাতে শুতে লাগলেন। সবদিক গুছিয়ে-গাছিয়ে ঠিক করে নিতেই কেটে গেল কয়েকদিন।

আজ বার্ধক্যের প্রান্তে এসে ভক্তদের যখন কোন ছোটখাট অসুবিধার জন্য বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখি, তখন আমার মনে মনে হাসি পায়। মনে পড়ে যায় সেই সুদূর অতীত ঘটনাগুলির কথা। কতই না অসুবিধা আমরা প্রথমে ভোগ করেছিলাম—কিন্তু ক্রমশ মোটামুটি সব অভাবই আমাদের কিভাবে পূরণ হয়ে গিয়েছিল!

ছয় মাইল দূরে একটি কুয়ো থেকে পিপে ভর্তি করে জল আনা হতো। এক পিপে জলের দাম পড়ত পঁচাত্তর সেন্ট। কয়েকদিনের মধ্যে তিনটি ঝরনার সন্ধান পাওয়া গেল। এদেরই একটাকে পরিণত করা হলো কুয়োতে। আমাদের 'বালতি-বাহিনী'র সভ্যরা রোজ সকালে প্রাতর্ভোজনের আগেই আধ মাইল সরু রাস্তা ধরে চলে যেতেন ঐ কুয়োর কাছে। সারাদিনের প্রয়োজনের জন্য প্রত্যেকেই এক এক বালতি জল বয়ে আনতেন। কাপড়জামা কাচা প্রভৃতি করতে হতো ঐ কুয়োতলাতে গিয়ে আর ওসব রৌদ্রে শুকোতে দেওয়া হতো ঝোপঝাড়ের ওপর মেলে। স্নানাদি করতে খুব ভোরেই পুরুষেরা চলে যেতেন ঐ কুয়োতে। মেয়েরা স্নান করতেন তাঁদের তাঁবুতে।

মিস লুসি বেকহাম (Miss Lucy Beckham) আর মিস ফ্যানি গাউল্ড (Miss Fanny Gould) কয়েকদিন পরেই এসে পৌঁছুলেন। মাউন্ট হ্যামিল্টনে আমাদের ফেলে আসা জিনিসগুলোও ক্রমে এসে গেল। ছোট একটি চালাতে আমাদের রান্নাঘর করেছিলাম, আর রান্নাঘরের ছাদ থেকে কাঠের ঘরটার ওপর পর্যন্ত একটা ক্যাম্বিস কাপড় ঝুলিয়ে তার তলায় আমাদের বাইরের খাবার ঘর তৈরি হলো।

মিঃ রুরব্যাক তক্তা দিয়ে কয়জন লোকের বসার মতো একটি খাওয়ার টেবিল তৈরি করে ফেললেন। রান্না-চালার তলায় জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখার জন্য মাটি খুঁড়ে ফেলে একটা ভূগর্ভ-ভাণ্ডার তৈরি হলো। প্রধানত আহারের ব্যবস্থা ছিল নিরামিষ; তবে ডিম, মাছ, পনীরও খাওয়া হতো। দুধ পেতাম মিঃ গারবারের পাঁচ মাইল দূরবর্তী খামার থেকে। আমরা দুধ ও মাখন একটা তারের জালতির বাক্সের মধ্যে পুরে দক্ষিণ দিককার একটি গাছের নিচে ঝুলিয়ে রাখতাম। আর সেগুলো ঠাণ্ডা রাখার জন্য বাক্সটির চারপাশে জড়িয়ে দিতাম ভিজে কাপড়। রান্নাবান্না, রুটি সেঁকা এবং বাসনপত্র ধোয়ার কাজ ভাগ করা থাকত। মেয়েরা সকলে কাজ করতেন দুজন দুজন মিলে। পুরুষদের ভাগে পড়তো ভারী-ভারী কষ্টকর কাজগুলো, যেমন কাঠ জোগাড় করা, কাঠকাটা এবং কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি করার জন্য মিঃ রুরব্যাককে সাহায্য করা।

প্রত্যেককে নিজের তাঁবু ঠিক রাখতে হতো। রাঁধুনিদের হাতে ছিল রান্নাঘরের দায়িত্ব। আমি দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা ছিলাম বলে আমার ওপর আচার্যদেবের তাঁবুর সমস্ত ভার ন্যস্ত ছিল। আসবাবপত্র ছিল ছোটখাট কয়েকটি ক্যাম্পখাট, টুল, চেয়ার খানকতক আর কাপড়চোপড় রাখবার জন্য কাঠের দু-একটা বাক্স। ভিতরকার আলোর জন্যে ছিল মোমবাতি আর তেলের প্রদীপ, বাইরে যেতে হ্যারিকেন ব্যবহার করা হতো।

প্রথমেই ধ্যানঘর তৈরি করার কথা হলো। অনতিবিলম্বে মিঃ রুরব্যাক এর নির্মাণকার্য আরম্ভ করে দিলেন। অমসৃণ তক্তার একটা চৌকো ঘর, তিন দিককার জানলাই বাইরের দিকে খোলা। পরে এই ঘরের মেঝে ঢাকবার জন্য খড়ের মাদুর পাওয়া গিয়েছিল। একটা গোলাকার ছোট কাঠের উনান জ্বেলে ঘরটি গরম রাখা হতো। আমাদের উপাসনার বেদি তৈরি হলো দাবাখেলার চীনা ছক-টেবিল দিয়ে। তার ওপর ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আর স্বামী বিবেকানন্দের ছবি এবং ফুলদানি আর ধূপাদি জ্বালার ব্যবস্থা। কোন আনুষ্ঠানিক পূজার্চনা হতো না। প্রাচ্য রীতির মধ্যে শুধু একটিই পালিত হতো—বাইরে জুতো খুলে রেখে উপাসনা ঘরে প্রবেশ করা।

এর পরে দুখানা বেঞ্চ তৈরি করে ঘরের বাইরে, দরজার দুপাশে পেতে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সবাই বসে জুতো খুলতে পারেন। আরও পরে বর্ষাকালে এই প্রবেশ-পথটির ওপরে ক্যাম্বিসের একটা আস্তরণ দিয়ে দেওয়া হয়। ধীরা, স্বামী তুরীয়ানন্দজীর বসবার ক্যাম্বিসের কুশনটিতে 'শান্তি'—এই কথাটি সূচিকর্ম করে তুলে দেন। শিষ্যেরা আসনপিঁড়ি হয়ে বসবার জন্যে নিজ নিজ সুবিধানুযায়ী আসন পেতে বসতেন। কেউ বসতেন নিচু বাক্সর ওপর, কেউ বা পাইন পাতায় ভর্তি বিভিন্ন আকারের কুশনে। দরজার উল্টো দিকের জানলার নিচে ছিল স্বামী তুরীয়ানন্দজীর বসবার স্থান।

আমরা সকলে দেয়ালের চারদিকে বসতাম। অশ্বচালক যেমন ঘোড়াকে আয়ত্তে রাখার জন্য রাশ টেনে ধরেন, স্তবোচ্চারণের আগে স্বামী তুরীয়ানন্দ ঠিক তেমনি করেই আমাদের এই ব্যূহটার ওপর দিয়ে নিজের দৃষ্টিকে সঞ্চালিত

করে নিতেন। তারপর সুর করে আবৃত্তি আরম্ভ করতেন; উপাসকমণ্ডলীর সব অস্থিরতা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই আবৃত্তি চলতো। একদিন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে শুধালেন—"এই আবৃত্তির তাৎপর্য কি?" তিনি উত্তর দিলেন—"এ হচ্ছে অস্থির মনের গতিকে কশাঘাত করে আপনার বশে আনা।" আবৃত্তির ঝঙ্কারের সাথে সাথে আমাদের মনও স্থির হয়ে আসত। ঘণ্টাখানেক পরে স্বামীজীর কণ্ঠে যখন আবার স্তবধ্বনি গুনগুনিয়ে উঠত তখন মনে হতো—এ সুরধারা যেন কোন এক সুদূর রাজ্য থেকে ভেসে আসছে। কদাচিৎ আমরা এই পুরো এক ঘণ্টা সময় ধীর ও শান্ত ভাবে বসে থাকতে পারতাম। মশা, মাছি এবং আরও সব পোকামাকড় আমাদের বেশ ব্যতিব্যস্ত করতো। কিন্তু স্বামী তুরীয়ানন্দকে এরা কখনও বিচলিত করতে পারত না। বাহ্যিক পরিবেশ সম্বন্ধে কোন হুঁশই থাকতো না তাঁর। একটা দারুণ বিষাক্ত পোকা একদিন তাঁর হাতে দিল হুল ফুটিয়ে। ঐ জায়গাটা পরে ফুলে উঠতে লাগলো। পরের দিন সকালে সারা হাতখানাই স্ফীত হয়ে উঠল ভীষণভাবে। আমরা সবাই অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। সবচেয়ে কাছের ডাক্তারটি তো থাকেন পঞ্চাশ মাইল দূরে। সেখানে যাবার কোন যানও নেই—একটি দু-চাকার গাড়ি ছাড়া। যে ঘোড়া ঐ গাড়ি টানবে সে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছে দূরের বিরাট মাঠগুলোয়। একে ধরে এনে গাড়িতে জুততে হলে বহু লোকের সমবেত চেষ্টার দরকার! যা হোক এই সময় হঠাৎ একটা যেন যাদুর মতো ব্যাপার ঘটে গেল। নিউইয়র্কের একটি তরুণ ডাক্তার আশ্রমে আসবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন; পত্রাদি লিখে যানবাহনের যথাযথ বন্দোবস্ত করার সময় পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে পারলেন না। লিভারমোর থেকে পঞ্চাশ মাইল রাস্তা হেঁটে ঠিক আমাদের এই বিপদের সময়টিতে তিনি উপস্থিত হলেন যেন দৈবপ্রেরিত হয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দের পীড়িত হাতখানির সেবার জন্যেই! তিনি পৌঁছে তাঁর ছোট ব্যাগটি থেকে কিছু ওষুধপত্র বের করে ওঁর হাতে লাগিয়ে দিলেন। এই তরুণ ডাক্তারটি স্বামী তুরীয়ানন্দজীর একজন অত্যন্ত অনুরাগী শিষ্য হয়ে উঠেছিলেন। আচার্য এঁর নাম দেন আত্মারাম—আত্মাতেই যার পরম আনন্দ।

(৩)

আমাদের পৌঁছোনোর প্রথম রবিবারের দু-সপ্তাহ পরেই স্যানফ্রান্সিস্কো ক্রনিকল্ পত্রিকার তরফ থেকে একজন রিপোর্টার (নাম ব্লাঞ্চ পার্টিংটন) এসে হাজির হলেন। তিনি এসেছিলেন এই আশ্রমের একটি বিবরণী তাঁদের কাগজের জন্য লিখে নিতে। এই সময়ে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং ক্লাশগুলো বেশ নিয়ম-মাফিকই চলছিল। ভোর পাঁচটার সময়ে স্বামী তুরীয়ানন্দজীর স্তবপাঠে আমাদের ঘুম ভেঙে যেতো আর নতুন উপাসনা ঘরটিতে গিয়ে আমরা এক ঘণ্টা করে ধ্যানে বসতাম। প্রাতরাশ হতো বেলা আটটায়। দশটা বাজলেই চলত এক ঘণ্টা ধরে পাঠ, আলোচনা—অতঃপর আবার একঘণ্টা ধ্যান। বেলা একটায় মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ হয়ে যাবার পর বিকাল পর্যন্ত আমাদের আর কোন সমবেত রুটিন থাকত না। দিনের শেষ দুই ঘণ্টা আবার আমাদের ধ্যানঘরেই কাটত। সকলের শয্যা নেওয়ার রীতি ছিল রাত দশটায়। প্রতিটি ব্যাপারে আচার্যদেবের সঙ্গে ছিল আমাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ। তিনি প্রত্যেক কাজে সবাইকে সাহায্য করতেন। প্রত্যেককে উৎসাহ দিতেন, আর সর্বদা থাকতেন স্তবমুখর হয়ে। সুন্দর ছন্দে, উদাত্ত সুরে এবং গুরুগম্ভীর গলায় চলত তাঁর আবৃত্তি। আমরা এর নাম দিয়েছিলাম 'স্বামী'র সমর-স্তোত্র।

কেউ যদি কখনও বলতেন, "কী আশ্চর্যের ব্যাপার স্বামী, নানা মতের ও নানান ভাবের এতগুলি পুরুষ ও নারী কী করে এমন একযোগে শান্তিপূর্ণচিত্তে জীবনযাপন করছে?" আচার্য তুরীয়ানন্দজী উত্তর দিতেন—"তার কারণ, সকলকে আমি শাসন করি ভালবাসা দিয়ে। তোমরা সকলেই প্রেমের গ্রন্থিতে আমার সঙ্গে আবদ্ধ। তাছাড়া কী করে এসব সম্ভব হতো? দেখ না, সবাইকে কী রকম বিশ্বাস করি—সকলকে কীরূপ অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছি? এ আমি করতে পেরেছি, কারণ জানি তোমরা সবাই আমায় ভালবাস। কারুর মনে কোন খটকা নেই—সকলেই বেশ ধীর স্থির ভাবে চলেছে। কিন্তু মনে রেখো সমস্তই জগজ্জননীর কাজ। আমার কিছুই করবার নেই। যাতে তাঁর কাজ চলতে

পারে সেজন্য তিনি আমাদের পরস্পরের মধ্যে দিয়েছেন ভালবাসা। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কাছে আমরা বিশ্বস্ত থাকবো ততক্ষণ কোনও রকম ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। যে মুহূর্তে তাঁকে ভুলে যাবো, সেই মুহূর্তেই ঘনাবে বিপদ। সেইজন্যই তোমাদের বারবার বলি মাকে মনে রাখতে।"

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মসংযমে আচার্যদেব খুব উৎসাহ দিতেন। প্রত্যেকের নানা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন এবং যথাযোগ্য নির্দেশ দিয়ে সবাইকে পরিচালিত করতেন। কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম (তিন দিনের বেশি নয়) অথবা কিছুকাল উপবাস কিংবা ধ্যানভজনে সারা এক রাত্রি কাটানো বা মানসিক জড়ত্ব দূর করবার জন্য নিঃসঙ্গে লম্বা একটি ভ্রমণ—ক্ষেত্রবিশেষে এসব ব্যবস্থায় আচার্যদেবের সহানুভূতি ছিল। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নীরব থাকার শপথটিও ছিল একটি সর্বজনপ্রিয় এবং উপকারী বিধান। একা অথবা সমবায়ের একযোগে আপ্রাণচেষ্টায় এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করান সম্পূর্ণ নিয়মসঙ্গত বলে মানা হয়েছিল। একদিকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারিগণের উৎপীড়ন-রীতিতে সমাবেশ হতো নানাবিধ কলাকৌশল—অন্যদিকে শপথকামীকেও নির্বাক থাকবার জন্য অবলম্বন করতে হতো তীক্ষ্ণ সচেতনতা। ধ্যান-ধারণার ক্লাশে সকলে অফুরন্ত উপদেশ ও উৎসাহ লাভ করতেন। আচার্য তুরীয়ানন্দজী প্রত্যেককে আলাদা আলাদা শিক্ষা দিতেন, এর মধ্যে কোনও লৌকিকতার বালাই ছিল না। যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারতো তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাদান, তবে সাধারণত এটা ঘটতো গোধূলিকালে বাইরের দরজার অভিমুখে বেড়াতে বেড়াতে। আবার অনেক শিক্ষোপদেশ আমরা পেতাম বিভিন্ন তাঁবুর মাচায় বসে থাকার সময় এবং প্রাতঃভ্রমণকালে।

একদিন আমরা সকালে আমাদের আশ্রমে আসবার নানা রকম কারণ নিয়ে পরস্পর আলোচনা করছি—এমন সময় আচার্যদেব সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। কী নিয়ে আলোচনা চলছে জিজ্ঞাসা করলেন। সব কথা তাঁকে বলতে তিনি উত্তর দিলেন, "তোমরা যদি নদীতে পড়ে যাও বা নিজেরা লাফিয়ে পড় কিংবা কেউ ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ফল কিন্তু একই—জলে ভিজে যাবে। আসবার কারণ

যাই থাক না কেন—পালাবার কোন উপায়ই এখন আর তোমাদের নেই। গোখরো সাপে তোমাদের দংশন করেছে—মৃত্যু সুনিশ্চিত।"

ক্লাসে তাঁর বক্তব্যের কিছু কিছু লিখে রাখতে আমায় বলেছিলেন। তদনুযায়ী প্রস্তুত হবার জন্যে একটি ভোঁতা ছুরি দিয়ে লেখার পেনসিলটি কেটে নিয়েছি, পেনসিলের মুখটা হয়ে দাঁড়িয়েছে খাঁজকাটা, অসমান। ঠিক এই সময়টিতে আচার্যদেব আমার তাঁবুতে এসে হাজির হলেন। পেনসিলটা তুলে নিয়ে মন্তব্য করলেন, "এই বুঝি তোমার কাজের নমুনা!" তারপর নিজেই ঐ অমসৃণ জায়গাটি সেই ছুরিটি দিয়ে কেটে ঠিক সমান ও সূচালো করে দিলেন। আমার হাতে ওটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "যে কোনও কাজ কর না কেন, মনে করবে জগন্মাতার পূজা করছ।"

সকালে একদিন নিজের তাঁবুতে বসে পড়ছি, আচার্যদেব এসে কী পড়ছি জিজ্ঞাসা করলেন। বইটি এমার্সনের রচনাবলী জানালাম। শুনে বললেন, "একেবারে প্রত্যক্ষ আসলটি না নিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করছ কেন? অভিষ্টপ্রাপ্তির জন্যে মাকে জোর করে ধর।"

আর একবার তাঁবুতে আসবার সময় আবৃত্তি করছিলেন কবি লংফেলোর পদ্যাংশ ঃ

যদিও বিদ্যা রয়েছে দাঁড়ায়ে অনন্ত
চঞ্চল কাল চলে যে নিয়ত মাতিয়া
যদিও হৃদয়ে শক্তি সাহস চূড়ান্ত
স্পন্দন তবু ঘোষিছে থাকিয়া থাকিয়া—
শবঢাক বাজে—জীবনের হলো বিলয় তো
জানায় কফিন, চলিছে কবরে লুটিতে—
শুনে নে এ আয়ু সেইরূপই প্রতিনিয়ত
আগায়ে ছুটিছে মৃত্যু-সাগরে ডুবিতে।

"বিসর্জনের ঢাকের বাজনার মতো," আচার্যদেব অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করতে লাগলেন, তারপর বললেন—"জীবন-সঙ্গীত।"

"আচ্ছা, তুমি কি 'জীবন-সঙ্গীত' কবিতাটি জানো?"—আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তৎকালীন আমেরিকার স্কুলগুলির প্রতিটি ছাত্রীর "জীবন-সঙ্গীত" মুখস্থ থাকতো। আমিও ঐ কবিতাটির নয়টি স্তবক তাঁকে আবৃত্তি করে শোনালাম। তিনি আমার ওপর খুব খুশি হয়ে বললেন, "বেশ, বৎসে, বেশ।"

একদিন বৈকালে আমাদের হঠাৎ দেখা হয়েছে, আচার্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "উজ্জ্বলা, তুমি গভীর চিন্তাশীলা না লঘুচিত্তা? আজীবন শুধু কি তুমি 'কথা' নিয়েই কাটাবে, না তোমার আদর্শকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে?" কী প্রত্যুত্তর দেওয়া যায় ভাবার আগেই পুনরায় বললেন, "মতামতের কথা উঠলে অপরকে সায় দেওয়ায় কোনও বাধা নেই, কিন্তু আদর্শগত বিষয়ে পর্বতের মতো অটল থাকতে হবে।" ব্যস! ঐ ক্ষণেকেই তাঁর নিকট হতে সারাজীবনের চলবার পাথেয় পেয়ে গেলাম।

দ্বিতীয় পর্ব

একবার তুরীয়ানন্দজী জনৈক ছাত্রের ওপর তাঁর বাহ্যিক রাগ সম্পর্কে আমাকে এক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বললেন—"আসলে আমি কিন্তু রাগি না; একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমি রাগের ভান করি।" আরও বললেন—"যে রেগে উঠতে না পারে সে একটি বোকা। যে জ্ঞানী সে রাগের বশ নয়। সবার সাথে এক হতে চেষ্টা কর। কারুর বিরোধিতা কোরো না। যতখানি বিরুদ্ধাচরণ করবে সেই পরিমাণেই তোমার একত্ববোধ ব্যাহত হবে। তোমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে রেগে যেও না বা বাদ-প্রতিবাদ কোরো না। খুব সাবধানে বিচার করে দেখো তার কথা সত্যি কি না। যদি সত্যি হয়, সংশোধন করে নাও; মিথ্যে হলে তাতেই বা তোমার কী আসে যায়?" অতঃপর বুদ্ধের একটি বাণী যোগ করলেন, "তার আবার দান কী যদি গ্রহীতা গ্রহণই না করল?"

অনন্তর তুরীয়ানন্দজী বুঝিয়ে দিলেন, একজন সন্ন্যাসী কিভাবে অপরের মতোই সবকিছু উপভোগ করবে, তবে অপরের ইচ্ছার ওপরই তার সব

নির্ভর। নিজের কোন চাহিদা তার নেই। সে যেন মৃত। সজ্ঞানে সে যেন মরে রয়েছে। আচার্যদেব তাঁর প্রিয় তুলসীদাসের কথা আবৃত্তি করলেন—

হে তুলসী—
চোখ মেলেছ যখন তুমি ধূলার ঘরে এই ভবে
অঝোর ঝরে কাঁদলে কেবল উঠল হেসে হায় সবে।
আসলো এখন তোমার পালা শাস্তি দেবার জগৎটায়,
বাঁচার মতো বাঁচতে হবে তৈরি কর জীবন-কায়;
শেষ-বিদায়ের পালা এবার আসলে পরে বিশ্বপার
হাসবে তুমি তোমার শোকে কাঁদবে সবে এই ধরার ॥

আবার বললেন, "হে তুলসী—চাও, সকলেরই সাথে বাস করে চলো, কারণ, কে জানে কোন্‌খানে এবং কোন্ বেশে ভগবান স্বয়ং এসে হাজির হবেন তোমারই কাছে।"

একান্ত আন্তরিকতার ওপর তিনি অত্যন্ত জোর দিতেন ঃ "মন মুখ এক কর; কিন্তু সত্য ও দয়া একসাথে পালন করবে।" ঐ সঙ্গে একটি সংস্কৃত কিংবদন্তী আবৃত্তি করে তার ইংরেজি অনুবাদ শোনালেন—"মিষ্ট কথা বলবে, কিন্তু তা যেন মিথ্যা না হয়। সত্য বলবে, কিন্তু তা যেন রূঢ় না হয়।" আবার সুন্দর একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তার তাৎপর্য বললেন—"সত্যেরই একমাত্র জয়, মিথ্যার নয়। যে পথ অবলম্বনে ঋষিগণ পূর্ণে উপনীত হন—তা-ই সত্যের সনাতন পথ। মুক্তিলাভ করার আর কোন রাস্তা নেই।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে যাঁরা শান্তি আশ্রমে প্রথম গিয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই অ্যালামেডার Home of Truth-এর শিক্ষক ছিলেন। ধীরা আর আমি ছিলাম মিস লিডিয়া বেল-এর ছাত্রী; তিনি ছিলেন স্যানফ্রান্সিস্কোর Home of Truth-এর অধিনেত্রী। ওখানে প্রাচ্যবিদ্যা ও খ্রিস্টীয় দর্শনের আলোচনা হতো, তিনি প্রথমে খ্রিস্টীয় বিজ্ঞান ও নিউইয়র্কের থিওসফি-বিষয়ে যে আন্দোলন চলছিল তার অনুরাগিণী ছিলেন। তিনি বক্তৃতাশিক্ষা দিতেন এবং মাঝে মাঝে স্যার এডউইন আরনল্ড-এর The Light of Asia থেকে

পড়ে শোনাতেন। স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য আমাকে মিস বেল-এর নিকট পাঠানো হলো; এই দুর্বলতার জন্য আমাকে স্কুলও ছাড়তে হয়েছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি স্বামীজীরা যখন এলেন তখন আমাদের দৈনিক 'গীতা'র ক্লাস হচ্ছিল। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ'ও পড়ে ফেলেছিলাম; ঘটনাচক্রে ঐ বইখানাই শান্তি আশ্রমে পড়া হয়। কিছুদিন ধীরা ও আমি স্বামী তুরীয়ানন্দজীর তাঁবুর পরের তাঁবুতেই ছিলাম—যে দিকটায় তাঁবুর আগুন জ্বালানো থাকত। সান্ধ্য ধ্যানের পর তাঁর তাঁবু থেকে তুরীয়ানন্দজী আমাকে প্রথম শিক্ষা দেন; আমিও আমার তাঁবু থেকে তা গ্রহণ করি। আমার মিস বেলের প্রতি তীব্র আসক্তি ছিল; এটা ভাঙবার জন্য স্বামীজী যে উপায় অবলম্বন করেন তাকে বলা যেতে পারে মৃদু পরিহাস ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশের মিশ্রণ। আমার ভাবভঙ্গির অনুকরণের একটু বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করে স্বামীজী বললেন, "তোমার মনের দরজায় বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখ ঃ 'প্রবেশ নিষেধ', যতক্ষণ না বলতে পার, 'এসো, সকলেই এসো।' সকলের মধ্যে মাকে দেখবার চেষ্টা কর, আর সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার কর।" কিন্তু আমার আসক্তি দূর করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য রাখতেন যাতে আমার শিক্ষাদাত্রীর প্রতি আমার সম্মান ও ভালবাসা পুরোপুরি বজায় থাকে। একদিন স্বামীজী মিস বেলের কয়েকটি ত্রুটিবিচ্যুতি শোধরাতে চাইলেন; সেদিন তিনি আমাকে ক্লাসে আসতে বারণ করেন; বললেন, "গাছের তলায় বসে তাঁর জন্য প্রার্থনা কর।"

তুরীয়ানন্দজীর শিক্ষাদানে কোন প্রাণহীন, গতানুগতিক নিয়মানুবর্তী বহিরঙ্গভাব ছিল না; তিনি আমাদের মধ্যেই যেন বাস করতেন, আর প্রত্যেকের প্রয়োজন-অনুসারে শিক্ষা দিতেন। একদিন আমি দেখলাম, তিনি ঠায় একা বসে প্রাণভরে হাসছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হাসবার কী কারণ স্বামীজী?" তিনি শুধু মাথা নেড়ে হাসতেই লাগলেন। তখন আমি বললাম, "আপনার মনে কী আছে জানতে পারলে আমি পৃথিবীতে সব কিছুই ছেড়ে দিতে পারতাম।"

মুহূর্তমধ্যে তুরীয়ানন্দজী শান্ত হয়ে বললেন, "উপরে তুমি দেখতে পাবে

এটা ওটা—তুরীয়ানন্দ—কিন্তু ভেতরে দেখবে সব রামকৃষ্ণ।" আমি মাঝে মাঝে অনুভব করেছি, এ কথা মিশনের সব স্বামীজীদের সম্বন্ধেই সত্য। বাইরের দিকে তাঁদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাক না কেন, ভেতরে তাঁরা সকলেই রামকৃষ্ণে লীন। একজন স্বামীজী বুঝিয়ে বলেছিলেন, বাইরের পার্থক্য সব দেখা যাচ্ছে স্বামীজীদের প্রারব্ধ কর্মের জন্য; ছাত্রেরা সেদিকে দৃষ্টি দেবে না।

একদিন বিকালে একদল শিক্ষার্থী একসঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছিল। তুরীয়ানন্দজী সেখানে এসে বেশ উত্তেজিতভাবে বললেন, "আমি দোলনা থেকে পড়ে গিছলাম। কেন আমি পড়ে গেলাম? যেটাকে ধরেছিলাম সেটা শক্ত ছিল না। মাকে ধরে থাক। তাহলেই আমরা নিশ্চিন্ত। সেইটিই আমাদের রক্ষার একমাত্র উপায়।"

অন্য আর একটি ঘটনা তিনি আমাদের বলেছিলেন। তিনি তখন প্রথম স্যানফ্রান্সিস্কোয় আসেন, বাস করছিলেন ডাঃ লোগানের বাড়িতে। একদিন কোন পয়সা না নিয়েই তিনি শহরের পথে বেরিয়ে পড়েন; ঠিক যখন একটা মোটর কারে উঠতে যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ মনে হলো, "তাইতো, আমি আমেরিকায় রয়েছি, কারের ভাড়া লাগবে।" তারপর তিনি আবার দৌড়ে গিয়ে ডাঃ লোগানের কাছে দরকারি খরচার জন্য কিছু টাকা চাইলেন। মোটর কারে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো; ভদ্রলোক তাঁকে চিনতেন। তিনি তুরীয়ানন্দজীর ভাড়া দিয়ে দিলেন। স্বামীজী নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য তিরস্কারের ভঙ্গিতে কপাল ঠুকে বলতে লাগলেন, "মা অনুযোগ করলেন, 'আমি কি তোমার গাড়িভাড়া দিতে পারতাম না?'"

আমেরিকাতে স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রথম অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে। ঘটনাটি আমাদের সকলের পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল। তুরীয়ানন্দজীর স্যানফ্রান্সিস্কোয় আসার প্রথম সপ্তাহেই একদিন বিকালে মিঃ অ্যালবার্ট উলবার্গ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তাঁকে একটি ফরাসি ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। রেস্তোরাঁটি Call Building-এর সবচেয়ে ওপরের তলায় ছিল। তখনকার দিনে ঐটিই ছিল শহরটির মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাড়ি। তুরীয়ানন্দজীর

তখন সব বিষয়ে একটি সানন্দ কৌতূহলী ভাব। আর আঁধার ভেদ করে আলোর ঝলক ঘন ঘন দেখা দিলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কি?" সাধারণ প্রশ্নেও গভীর জিজ্ঞাসু ভাব! মিঃ উলবার্গ বললেন, "স্বামীজী, ওটা একটা সন্ধানি আলো। ওটা চ্যুট্স্ থেকে আসছে। চ্যুট্স্ এই শহরের দক্ষিণ দিকের একটি আমোদ-প্রমোদের পার্ক। আপনি কি সেখানে যেতে চান?"

"চ্যুট্স্? শিব! শিব! হ্যাঁ, যাব", বললেন তুরীয়ানন্দজী।

ভোজের পর নানা ধরনের পাশ্চাত্য আমোদপ্রমোদের সঙ্গে স্বামীজীর প্রথম পরিচয় ঘটল। একটি নৌকার সামনের দিকে তিনি বসেছিলেন, হঠাৎ নৌকা কাত হওয়ায় তিনি হড়কে গিয়ে সাঁতারের ছোট্ট পুকুরে পড়ে যান; পড়ে গিয়েই হাবুডুবু খেতে লাগলেন, আর চারদিকে ছড়াতে লাগলেন জল। একবার তাঁর খুব উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কোন এক পাহাড়ের ঢালু পথ দিয়ে চলেছেন খোলা একটি মোটর গাড়িতে। গাড়িটি ভীষণ বেগে একবার উঠছিল, একবার নামছিল। তা দেখে আমাদের কী আনন্দের ধ্বনি!

তারপর তাঁকে 'মেরি-গো-রাউন্ড'-এর একটি কাঠের ঘোড়ায় চড়িয়ে খানিকক্ষণ ঘোরানো হলো। বয়স্ক লোকদের এইভাবে তরুণদের মতো রঙ্গতামাসায় মাতা সম্বন্ধে আচার্যদেব মনে মনে কী ভাবছিলেন তা অবশ্য তিনি বললেন না, কিন্তু তাঁর মুখে একটি আমোদের কৌতূহল ফুটে উঠেছিল। এরপর আমরা গেলাম একটি থিয়েটারে। একটি নর্তকী তার পোশাকের সন্নিবেশ অদলবদল করে অনেকগুলি আয়নার সামনে এমনভাবে বহু বিচিত্র প্রতিবিম্ব ফেলছিল যে দর্শকবৃন্দের মনে হচ্ছিল যেন গোটা একটি নর্তকীর দল রঙ্গমঞ্চে হাজির! তুরীয়ানন্দজী দেখে খুব খুশি! বলে উঠলেন—"দেখ দেখ! এরই নাম মায়া। বাস্তবিক, রয়েছে এক, অথচ অনেক বলে মনে হচ্ছে।"

আচার্যদেব যখন কথা বলতেন তখন তাঁর হাবভাবগুলি তাঁর কথার মতোই খুব জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠত এবং তিনি যা প্রকাশ করতে চাইছেন, তা যেন প্রত্যক্ষভাবে সমীপবর্তীর অন্তর স্পর্শ করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তিনি যখন তাঁর নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথাটা একটু ওপরের দিকে তুলে

আমাকে বুলডগের মতো নাছোড়বান্দা হতে বলছেন, তখন অনুভব হতো যে, তাঁর ভেতর দিয়ে যেন স্থির প্রতিজ্ঞার একটি বাস্তব তরঙ্গ বয়ে চলেছে।

তিনি এক মুহূর্তেই অপরের মনের অবস্থা বুঝতে পারতেন। একদিন সকালে আমার মনে একটা হতাশভাব চলছে। তিনি সেই সময়ে এসে হাজির। বজ্রদৃঢ়স্বরে বললেন—"তুমি বুঝতে পার বা না পার, এটা ঠিক যে, তুমি মায়ের সন্তান।" তারপর স্বর নরম করে বলছেন—"তবে যদি এটা ধারণা করতে পার তাহলে তোমার সব ভয় দূর হয়ে যাবে, সব সন্দেহ কেটে যাবে, হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হবে।"

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর ওপর আমার টান একান্তভাবে বেড়ে চলছিল। এটা কাটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাই তিনিও আমার সংশোধনের জন্য নির্মম উপায় অবলম্বন করেছিলেন। দিনের পর দিন তিনি আমার প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে চললেন, আমায় যেন গ্রাহ্যই করছেন না এবং আমি যতক্ষণ তাঁর তাঁবুতে কাজ করছি, তিনি ওদিকে আসছেনই না। তারপর আমি যখন প্রায় ধরেই নিয়েছি যে, তাঁর কাছ থেকে কোন স্নেহ পাওয়ার আশা আর নেই—তখন অকস্মাৎ একদিন তিনি বুঝিয়ে দিলেন—"তোমার বান্ধবী মিস বেলের উপর তোমার যে টান ছিল সেইটাই এখন আমার উপর পড়ছিল। তাই 'অস্ত্রোপচারের' দরকার হয়েছিল। এবার ঘা শুকোবার মলম পাবে। কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর ভালবাসার ফল দুঃখ। মা-কে যদি ধর, তাহলে সব পাবে।"

এই বিশেষ শিক্ষাটি লাভ করবার পর আচার্যদেবের সঙ্গে আমার পূর্বের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ফিরে এল। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে কয়েকমাসের জন্য আমাকে আশ্রম ছেড়ে চলে আসতে হয়। শীত আসছে। বর্ষায় তাঁবু ছিঁড়ে জল পড়ত। ঠাণ্ডা লেগে আমি সর্দিতে আক্রান্ত হলাম। আবার সামনে আসছে শীতকাল। স্বামীজী আমাকে কাঠের ঘরে শুতে আদেশ দিলেন। আমি প্রথমে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন—"অত বেশি আমেরিকান হয়ো না, একটু হিন্দু হও, বাধ্যতা শেখো।" স্থির হলো আমি স্যানফ্রান্সিস্কোতে থাকব

এবং বসন্তে ফিরে আসব। যদিও আমি শহরে গেলাম; আমার মন সব সময় আশ্রমেই পড়ে থাকত।

এই সময়ে আমি স্বামীজীর কাছ থেকে কতকগুলি চিঠি পাই। তার একটিও পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। এখানে দিলাম ঃ

শান্তি আশ্রম; পোঃ ডি ফরেস্ট
স্যান্টাক্লারা কোং
ক্যালিফোর্নিয়া
১৫ জানুয়ারি ১৯০১

স্নেহের বেবি,

তোমার সুন্দর চিঠিখানি পেয়েছি। ভাল আছ জেনে আনন্দিত হলাম। তুমি আমার কাছে যে গানটি চেয়েছ তার সমস্তটা অনুবাদ করে পাঠাচ্ছি। আমি এটা গুরুদাসের জন্য করেছিলাম। এখানে এরা সকলেই ভাল আছে। আমি শীঘ্রই শহরে যাব বলে আশা করছি। 'শ্রদ্ধা' পুনরায় ভালই বোধ করছে। এই একান্তবাস শেষ করে আমি কখন ওখানে আসব তা যথাসময়ে মিসেস উইলমট্‌কে লিখে জানাব। যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে আসছে কাল থেকে আমি এক সপ্তাহের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করবো। গত কয়েকদিন ধরে এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা সব সময় জানবে। এখানে অনুবাদটি দিলাম।

"হে আমার মন, তোমাকে বলি, যে পথই তুমি পছন্দ কর না কেন, কালীর ভজনা কর। তোমার গুরু তোমাকে যে মহৎ মন্ত্র দান করেছেন তাই দিবারাত্র জপ কর।

যখন শোবে তখন জানবে যে তুমি মাকে নমস্কার করছ।

যখন নিদ্রা যাবে, জানবে যে তুমি মায়ের ধ্যান করছ যখন খাবে; তখন, জানবে—তুমি শ্যামা মাকে নৈবেদ্য অর্পণ করছ।

তোমার কানে তুমি যা শোনো, সবই মায়ের কথা, কারণ মা সকল অক্ষরেই বিরাজ করছেন।

মহানন্দে রামপ্রসাদ ঘোষণা করছেন যে, মা সকলের শরীরেই বাস করছেন। সুতরাং তুমি যখন নগরের চারিদিকে বেড়াচ্ছ, তখন ভাববে যে তুমি শ্যামা মাকেই প্রদক্ষিণ করছ।”

এই গানের মর্ম অনুভব করবার চেষ্টা করবে, তাহলে তোমার ধ্যান ধারণা প্রভৃতি খুব চমৎকারভাবে সম্পন্ন হবে।

জগজ্জননীতে তোমাদের চির—তুরীয়ানন্দ।

কুরুক্ষেত্রে স্বামী তুরীয়ানন্দ

স্বামী অতুলানন্দ

অনুবাদক ঃ স্বামী চেতনানন্দ

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের সূর্যগ্রহণের আর কয়েকদিন মাত্র বাকি। কিন্তু সেবার কুরুক্ষেত্রের মেলায় সারা ভারত থেকে আগত ৫০,০০০ তীর্থযাত্রী সমাগম হয়েছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ ও আমি যাত্রীবহুল ট্রেন থেকে সন্ধ্যার সময় একটা ছোট স্টেশনে নামলুম। ধর্মশালা, অস্থায়ী তাঁবু ও ছাউনিগুলি নারী, পুরুষ ও শিশুদের দ্বারা ভর্তি। আমরা বিভিন্ন জায়গায় একটু আস্তানা পাবার চেষ্টা করলুম, শেষে কোথাও কিছু না পেয়ে একটা বিরাট বটগাছের নিচে অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের মতো কম্বল বিছালুম। আমাদের কাপড়ের পুঁটুলিগুলো কম্বলের নিচে রেখে বালিশ করে বিশ্রাম করতে লাগলুম।

তারপর এক ভক্তিমতী মহিলা আমাদের কাছে এসে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি কিছু খেয়েছেন?" তুরীয়ানন্দ তখন বললেন, "না"। তখুনি ঐ মহিলা নিজের তাঁবুতে ফিরে গিয়ে আমাদের জন্য কয়েকখানা আটার রুটি, একটা তরকারি ও একটু দুধ নিয়ে এলেন। আমরা সানন্দে সেই সাধারণ খাবার খেলুম।

আমি সেই বৃক্ষের শাখার ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দেখতে লাগলুম। এমন সময় তুরীয়ানন্দ উঠে বসলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কী ব্যাপার, স্বামী?"

তিনি বললেন, "গুরুদাস, এখন তুমি ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী।"

"আমি তো তাই হতে চাই," উত্তরে বললুম। তারপর স্বামীজীর 'সন্ন্যাসীর গীতি' থেকে আবৃত্তি করলুম ঃ

সুখ তরে গৃহ করো না নির্মাণ,
কোন্ গৃহ তোমা ধরে হে ধীমান্ ॥
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস;
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও,
সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও;
হউক কুৎসিত, কিংবা সুরন্ধিত,
ভুঞ্জহ সকলি হয়ে অবিকৃত।
শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে,
কোন্ খাদ্য-পেয় অপবিত্র করে?
হও তুমি চল স্রোতস্বতী মতো
স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য-প্রবাহিত।
উঠাও আনন্দে, উঠাও সে তান-
গাও গাও গাও এই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

"ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ," স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তেজিতস্বরে বললেন। "আমরা জগন্মাতার সন্তান। আমাদের ভয় নেই। তিনিই দেন, তিনিই নেন। তাঁর নাম জয়যুক্ত হোক।" তারপর তিনি স্বামীজীর মহিমা কীর্তন করে বললেনঃ "তিনি ছিলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী। ঐশ্বর্যে ও দারিদ্র্যে তিনি সমান থাকতেন। তিনি জানতেন যে তিনি সাক্ষিস্বরূপ নিত্যমুক্ত আত্মা। সুখদুঃখ তাঁকে বিচলিত করতে পারত না। পৃথিবীটা ছিল তাঁর কাছে একটা রঙ্গমঞ্চ। কী সুন্দরভাবেই না তিনি ঐ রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনয় করে গেলেন! পরার্থেই ছিল তাঁর জীবনধারণ। তাঁর ভিতর স্বার্থপরতার লেশমাত্রও ছিল না। তাঁর নিজের কোনও মতলব বা স্বার্থ ছিল না। ঠাকুরের বাণী ও সাধনপ্রচারই ছিল তাঁর জীবনব্রত। আমাদের ঠাকুর বলতেন, 'সে যা খুশি করুক না কেন, তাতে তাঁর কোন দোষ হবে না।'"

একটু থেমে তুরীয়ানন্দ আবার বললেন, "কিন্তু আমাদের সাবধান হতে

হবে। মায়ার অসীম শক্তি, আমরা সহজেই মায়ার দ্বারা আবদ্ধ ও মোহিত হই।"

আমি বললুম, "মা আমাদের মায়া থেকে রক্ষা করবেন।"

"তুমি ঠিক বলেছ। এটি কখনও ভুলো না। মাকে সদা বিশ্বাস কর। মা ছাড়া জীবনের মূল্য কী? এ সংসার তো মিথ্যা ও ফাঁকি। একমাত্র তিনিই সত্য।"

একটু থেমে স্বামী তুরীয়ানন্দ আবার বললেন, "এখন একটু ঘুমাতে চেষ্টা কর। কাল আমরা আরও ভাল জায়গা পেতে পারি।"

আমি ঘুমাতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু ঘুম এল না। এ নূতন অভিজ্ঞতা আমার মনোজগতে তোলপাড় করতে লাগল। স্বামী আবার শুলেন, কিন্তু তাঁরও আমার মতো ঘুম হলো না। মধ্যরাতের কিছু পরে তিনি উঠে পড়লেন। তিনি বললেন, "গুরুদাস, বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের অন্যত্র আশ্রয় নিতে হবে।" আমি আকাশের হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি। তারপর সেই বটপত্রের ওপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেলুম। আমরা তখুনি কম্বল গুটিয়ে পুঁটলি নিয়ে উঠে পড়লুম। কিন্তু পূর্ববৎ সকল স্থানই জনাকীর্ণ। স্বামী কোন স্থানে ঢোকবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করলেন। যাত্রীদের উচ্চ প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমরা একদিকে খোলা একটি চটিতে জোর করে ঢুকলুম। তখন শুরু হলো যাত্রীদের হৈ-চৈ, চিৎকার, গালাগালি ও আলোচনা—যার বিন্দুবিসর্গও আমি বুঝলুম না। আমি ভাবলুম ঐ চটির যাত্রীরা আমাদের ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। হঠাৎ চিৎকার থেমে গেল এবং ঠেলেঠুলে আমাদের জন্য একটু জায়গা হলো। সামুদ্রিক মাছগুলোকে যেমন বাক্সে পাশাপাশি রেখে ভর্তি করে, আমরাও তেমনি তীর্থযাত্রীদের মাঝে ঠাসাঠাসি করে শুয়ে পড়লুম। যা হোক আমরা বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেলুম এবং শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি একটা শিশু আমার পা-খানিকে বালিশ করে নিয়েছে। আমার সারা শরীরে তখন খুব ব্যথা, কারণ শক্ত মাটির মেঝেতে শোয়ায় অভ্যস্ত ছিলুম না।

এই চটিটির তিন দিকে দেওয়াল এবং ওপরে ছাদ। ঐ খোলা দিকে সকালে

সূর্যের কিরণ দেখা দিল। অধিকাংশ যাত্রী হাতমুখ ধুতে নিকটে একটা কূপের দিকে গেল; আমরাও তাদের অনুসরণ করলাম। ফিরে এসে দেখি চটির অর্ধেক খালি, কারণ তারা অন্যত্র ভাল বাসস্থানের জন্য গেছে।

আমি স্বামী তুরীয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম যে গতরাতে ঐ প্রবল বাধা সত্ত্বেও কী করে তিনি চটির মধ্যে আমাদের আশ্রয় জোগাড় করলেন। তিনি হেসে বললেন, "তুমি এখনও আমাদের (ভারতীয়দের) চেননি। আমরা খুব জোর চিৎকার করি বটে, কিন্তু এর পিছনে কিছু নেই। পাশ্চাত্যে তোমরা সব ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ কর। এখানে তুমি দেখবে, দুজন লোকে কথা বলে এবং এমন ভাবভঙ্গি দেখায় যে, যেন উভয়ে পরস্পরকে তখনই খুন করবে। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই তারা একত্রে বসে এমনভাবে তামাক খাবে যেন তারা পুরনো বন্ধু। এই হলো আমাদের ধারা। এরা শিক্ষিত নয়, কিন্তু এদের হৃদয় সৎ। এরা যখন দেখল যে, আমরা সত্যিই বিপন্ন তখন এরা আমাদের জন্য জায়গা করে দিলে নিজেদের অসুবিধা সত্ত্বেও। আমি এদের বললাম যে, তুমি বিদেশী, আমাদের দেশে এসেছ এবং তুমি সন্ন্যাসী। তৎক্ষণাৎ তারা কৌতূহলী হয়ে উঠলো এবং তোমার সম্বন্ধে সব জানতে চাইল। তখন তারা বললে, 'আপনারা আসুন। আপনাদের জন্য জায়গা করে দিই।' সর্বত্র তুমি এরূপই দেখবে। ভারতের সর্বত্র সন্ন্যাসীরা সমাদৃত হন, বিশেষত গরিব লোকদের কাছে। তারা খুব সরল ও সদয়, তথাকথিত শিক্ষিতদের মতো কপট ও কুটিল নয়। স্বামীজী দরিদ্রদের ভালবাসতেন; তাঁর হৃদয় তাদের জন্য ব্যথিত ও বিদীর্ণ হতো। তিনি বলতেন, 'দরিদ্রেরা আমার উপাস্য দেবতা।' সেজন্য আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন তাদের মধ্যে এত কাজ করে। সমগ্র ভারতে দরিদ্র নারায়ণদের সেবার জন্য আমাদের মিশনের শাখাকেন্দ্র আছে। আমরা তাদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও ঔষধপথ্যাদি দিয়ে থাকি। আমরা দরিদ্ররূপী নারায়ণের সেবা করি।"

একটু পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন, "আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছি, যেখানে কৃষ্ণ গীতা প্রচার করেছিলেন।" তারপর তিনি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় আবৃত্তি করতে লাগলেন। কয়েকজন তীর্থযাত্রী কাছে বসে শুনতে

লাগল। তিনি ভাবের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করতে লাগলেন; আমি ঐ সংস্কৃত শ্লোকগুলির মাধুর্য ও ছন্দোময়তায় মুগ্ধ হলুম।

স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন আবৃত্তি শেষ করলেন, তখন এক ভদ্রলোক এসে কর্কশ স্বরে বলল, "আপনারা আমার চটিতে কি করছেন?" স্বামী উত্তর দিলেন, "আমরা সন্ন্যাসী। এখানে আশ্রয় নিয়েছি।" আমাকে লক্ষ্য করে লোকটি জিজ্ঞাসা করল, "এ সাহেবটি কে?" (পরে আমরা জেনেছিলুম যে লোকটি আমাকে বৃটিশের গুপ্তচর মনে করেছিল।) স্বামী তাকে জানালেন আমার পরিচয় এবং বললেন যে আমি কুরুক্ষেত্রে মেলা দেখতে ও পুণ্যস্নান করতে এসেছি। লোকটি তখনই শান্ত হয়ে ভদ্রভাবে বলল, "আপনারা আমার অতিথি হয়ে এখানে বাস করতে পারেন। আমি আপনাদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দেব।" লোকটি একটি ভৃত্যকে ডেকে আমাদের কম্বলের নিচে খড় বিছিয়ে দিতে বলল। তারপর আমাদের নমস্কার করে চলে গেল।

লোকটি চলে গেলে স্বামী তুরীয়ানন্দ আমাকে বললেন, "দেখ মায়ের খেলা। এখন আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি। তুমি কি মনে কর এভাবে থাকতে পারবে?" "হাঁ, অবশ্যই আমি থাকতে পারব," আমি বললুম। একটু পরে একটি চাকর আমাদের জন্য রুটি ও গুড় আনল। প্রতিদিন সকালে চাকরটি এইরূপ খাবার আনত এবং রাতে রুটি ও ডাল। এভাবে নয় দিন কাটল। ভদ্রলোকটি কখনো কখনো এসে আমাদের সংবাদ নিত। ঐ চটিতে আরও যাত্রী ছিল; কিন্তু আমরা কম্বল বিছাবার যথেষ্ট জায়গা পেলুম। যাত্রীরা ঘরের মধ্যে মাটির উনুনে রান্না করত। ঐ ঘরে কাঠের ধোঁয়া বেরুবার কোন জানালা না থাকায় দম বন্ধ হবার উপক্রম হতো এবং চোখ জ্বালা করত। এ দুরবস্থার কোন সমাধান না থাকায় আমরা কোন অভিযোগ করিনি। রান্নার সময় আমি ঘর থেকে বাইরে থাকতুম। এ প্রকার জীবনযাপনে অনভ্যস্ত থাকায় আমার মাঝে মাঝে জ্বর হতে লাগল। জ্বরের সময় ঐ মোটা রুটি খেতে পারতুম না, তাই করুণহৃদয় স্বামী তুরীয়ানন্দ আমার জন্য এক কাপ দুধ কিনতেন।

সন্ধ্যায় অনেকে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে আলাপ ও আধ্যাত্মিক উপদেশ

নিতে আসত। অক্লান্তভাবে তিনি গভীর রাত্রি পর্যন্ত সমাগত ধর্মপিপাসুদের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ করতেন। ধর্মপ্রসঙ্গ করতে তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। সকালে স্নান ও আহার সেরে আমরা তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতুম এবং বিভিন্ন সাধু ও তীর্থস্থানগুলি দেখতুম। ঐতিহ্যগত সেই পুণ্যস্থানগুলি—যেখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন, যেখানে ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে দেহত্যাগ করেন ও অন্যান্য স্থানগুলি দেখলুম। একটা বিশাল বটবৃক্ষের বড় বড় ডালে কয়েকটি কঠোরী সাধু পাখির মতো বাসা বেঁধে বাস করছিলেন। সেবার কুরুক্ষেত্রের মেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সাধুসন্তের সমাগম হয়েছিল। সাধুদের মধ্যে কেউ নগ্ন, কেউ কৌপীনধারী, কেউ গেরুয়াধারী, কেউ পাগড়িধারী, কেউ জটাজূটমণ্ডিত, কেউ মুণ্ডিতমস্তক এবং কারো দেহ ভস্মানুলেপিত। জটাধারীদের মধ্যে কারো জটা পৃষ্ঠোপরি বা বক্ষোপরি লম্বমান, কারো বা শিরোপরি সর্পবৎ কুণ্ডলীকৃত।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সাধুরা বৃক্ষতলে বা নিজেদের তাঁবু বা তৃণকুঠিয়ার সামনে বসে ধর্মপ্রসঙ্গ ও বেদপাঠে রত ছিলেন। জনৈক সাধু চিরমৌনব্রত ও অপরজন অজগরবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। একজন রক্তবস্ত্রপরিহিত সাধু গাছের ডালে ভর করে নয় দিন একপায়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মেলার সর্বত্র আমরা এই আশ্চর্য বিষয় দেখতে লাগলুম।

তারপর সূর্যগ্রহণের পূর্ণগ্রাসের সময় পৃথিবী ক্ষীণ অন্ধকার হলে স্নানের শুভযোগ হলো। হ্রদগুলি বিশাল হলেও যাত্রীর ভিড় এত অধিক ছিল যে তাদের পক্ষে স্নান করা কঠিন হয়ে উঠল। স্বামী তুরীয়ানন্দ ও আমি ঐ শুভক্ষণে তিনবার ডুব দিলুম। হাজার হাজার যাত্রীর একত্রে ভক্তিভরে স্নান এক অপূর্ব দৃশ্য।

তারপর আমরা এই স্নানের পুণ্যফল ও অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানের বিষয় আলোচনা করলুম। স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন, "এসব নির্ভর করে মনোভাবের ওপর এবং ভক্তিবিশ্বাসের ওপর। খাঁটি ভক্তি থাকলে সুফল অবধারিত। এটি চিত্তকে শুদ্ধ করে। সারকথা—সর্বভূতে জগদম্বাকে দেখতে হবে। তাহলেই

আমরা প্রকৃত ধর্মপ্রাণ হতে পারব।" তারপর তিনি শ্রীশ্রীচণ্ডী থেকে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন ঃ

যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥—৫/১৯

—"যে দেবী সকল প্রাণীতে চেতনারূপে অধিষ্ঠিতা তাঁকে নমস্কার।" তারপর স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন ঃ "মা-ই সর্বভূতে অবস্থিতা, তিনি সব হয়েছেন। তিনিই নদী, তিনিই পর্বত, তিনিই সবকিছু। এই হলো দিব্যদর্শন, অলৌকিক অনুভূতি। আমাদের ঠাকুরের এটি লাভ হয়েছিল। তিনি গঙ্গা দেখতেন না, গঙ্গায় ব্রহ্মদর্শন করতেন।"

এই পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে আমি স্বামী তুরীয়ানন্দের দিব্য সান্নিধ্যে নয় দিন কাটিয়েছিলুম। তারপর মেলা শেষ হলে স্বামী তুরীয়ানন্দ আরও কয়েকদিন কুরুক্ষেত্রে রইলেন এবং শেষে জনৈক ভদ্রলোকের অতিথি হয়ে অনুপ শহরে গেলেন। আমি দিল্লী ও অন্যান্য স্থান ঘুরে বেলুড় মঠে গেলুম। তারপর তিন বছর পরে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে কনখলে দেখা হয়।

(উৎস ঃ প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুয়ারি ১৯২৫)

কনখলে স্বামী তুরীয়ানন্দ

স্বামী অতুলানন্দ

অনুবাদক ঃ স্বামী চেতনানন্দ

তিন বছর আগে (১৯০৭ সালে) স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণের মেলা দেখতে গিছলাম। আজ ৭ এপ্রিল ১৯১০। আমি ও স্বামী প্রেমানন্দ কাশী থেকে কনখলে এসে তাঁর দর্শন পেলাম।

স্বামী তুরীয়ানন্দ নাঙ্গোলে তপস্যা করছিলেন এবং জ্বরে দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে কনখলে আনা হয়। তিনি আস্তে আস্তে সুস্থ হচ্ছিলেন। কনখল সেবাশ্রমে পৌঁছে আমি সোজা তাঁর ঘরে গেলাম এবং দেখলাম তিনি বিছানার ওপর বসে আছেন। তাঁর শরীরের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি, কেবল তাঁর দাড়ি ও মাথার চুল পাকতে আরম্ভ করেছে এবং তালুতে টাক পড়েছে। তাঁকে দুর্বল দেখাচ্ছিল, তবে রুগ্‌ণ নয়। তাঁর চোখেমুখে প্রশান্তভাব। তাঁর স্বর ক্ষীণ কিন্তু দৃঢ়। তাঁর দুর্বল শরীরের পিছনে ছিল প্রবল মানসিক শক্তি। প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে এবং কণ্ঠস্বরেও এটি প্রকাশ পেয়েছিল।

পরস্পর অভিবাদনের পর স্বামী তুরীয়ানন্দ আমার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন ঃ "তোমাকে খুব দুর্বল ও শীর্ণ দেখাচ্ছে। কলকাতার কোন ভাল ডাক্তারের পরামর্শ নাওনি কেন? তোমার প্রয়োজন ঠিক খাবার। আমাদের দেশের খাবার তোমাদের সহ্য হয় না। আমরা জানি না কিভাবে শরীরের যত্ন নিতে হয়, তাই আমরা রোগে এত ভুগি। সবল হও, দুর্বল হয়ো না। কিন্তু শরীরের দিকে বেশি নজর দিও না। গত ছয় মাস খুব ভুগেছি, কিন্তু ওদিকে খেয়ালই করিনি। আমার কোন ভয় ছিল না। আমি মহাযাত্রার জন্য সদা প্রস্তুত। কিন্তু মা জগদম্বা সেটি হতে দেননি। আমি গভীরভাবে অনুভব করছি তিনিই সব করেন। আমরা তাঁর যন্ত্রমাত্র। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া

আমরা কিছুই করতে পারি না। আমরা যেন এটি কখনও না ভুলি।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মা আমাদের দুর্বল করেন কেন?" স্বামী তুরীয়ানন্দ ঃ "তিনিই জানেন। দুর্বলতায় ভাল হতে পারে। কিছুই একেবারে মন্দ নয়। আমরা এসব বিচার করে বুঝতে পারি না।"

এমন সময় প্রেমানন্দ ঘরে ঢুকলেন। দুই গুরুভ্রাতার মিলন দর্শনীয় ছিল। আমি হেসে বললাম, "স্বামী প্রেমানন্দ আপনাকে বেলুড় মঠে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন।" স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন ঃ "না, এখন নয়। শরীর সুস্থ করবার জন্য ডাক্তার আমাকে পাহাড়ে যেতে বলেছেন; তিনি আমাকে সমতল প্রদেশে যেতে দেবেন না। সেখানে এখন খুব গরম। আর আমার বিশ্রামও হবে না। সারাদিন লোক ভিড় করবে আমার কাছে।"

বিকালে আমি স্বামী তুরীয়ানন্দকে বললাম যে আমি প্রতীকতত্ত্বের ওপর একখানা বই পেয়েছি। তিনি বললেন ঃ "প্রতীকতত্ত্ব নিয়ে অত মাথাঘামাও কেন? আমাদের ঠাকুরের শিক্ষা খুব সোজা ও সরল। এটি সুগম পথ। একবার এক বিদগ্ধ পণ্ডিত ঠাকুরের কাছে দু-ঘণ্টা ধরে বেদান্তদর্শন আলোচনা করেন। তখন ঠাকুর বলেন, 'মশায়, আপনি যা বলেছেন তা বেশ সুন্দর হতে পারে, কিন্তু আমি ওসব বুঝি না। আমি জানি জগদম্বাকে, আর জানি আমি তাঁর সন্তান।' ঠাকুরের কথায় পণ্ডিতের চোখ খুলল। তিনি সানন্দে বললেন, 'মশায়, আপনি ধন্য!' ঠাকুরের সরলতা তাঁকে এমনভাবে স্পর্শ করল যে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

সন্ধ্যায় আমরা আমেরিকা এবং সেখানকার ভক্ত ও বন্ধুদের বিষয় আলোচনা করলাম। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন ঃ "মা কৃপা করে আমাকে আমেরিকায় নিয়ে গেছিলেন। তোমরা সকলে আমার প্রিয় ও আপনজন। প্রায়ই আমি তোমাদের সান্নিধ্য অনুভব করি। আমি চোখ বুজে কোন কোন বন্ধুকে স্মরণ করি। অবশ্য তারা তা জানে না। এটা আমার কল্পনা মাত্র। কিন্তু এরূপ কল্পনা সুখকর। সবই তো মনে। আত্মস্বরূপে আমরা সব এক।"

আমার সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যক্তিদের মনোভাব সম্বন্ধে তিনি বললেন ঃ

"এগুলি আমাদের মনেরই প্রক্ষেপ। ভালমন্দ সবই আমাদের মনে। সর্বত্র ভাল দেখাতে চেষ্টা করাই ভাল। আমরা যখন মায়ের সান্নিধ্যে থাকি তখন সবই মঙ্গল। তাঁর অভাবে জীবন দুঃখপূর্ণ।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম তিনি কাশ্মীরে যেতে ইচ্ছুক কিনা। উত্তরে তিনি বললেন ঃ "প্ল্যান করা অর্থহীন। কারণ মা পূর্বেই জানেন কী ঘটবে। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস নেই বলেই প্ল্যান করি। সঙ্কল্পশূন্য অবস্থায় থাকতে হলে গভীর বিশ্বাস চাই। কাশ্মীর বা কলকাতা—যে স্থানেই হোক তাতে কী আসে যায়। মা সর্বত্রই আছেন।"

পরদিন সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন ঃ "কেউ কেউ মনে করে আমি একলা থাকতে চাই। তা সত্য নয়। আমি অনুকূল সঙ্গ চাই।" "কিন্তু আপনি কোলাহলপূর্ণ স্থান পছন্দ করেন না," আমি বললাম। উত্তরে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন, "কোলাহলের জন্য আমি আদৌ ভাবি না যদি তারা সমমনা হয় এবং একমাত্র ধর্ম বিষয়ে অনুরাগী হয়। লোকসমাগম আমি পছন্দ করি যদি ধর্মপ্রসঙ্গ চলে। আমি যা জানি তা আমি শেখাতে চাই—এতে আমি তৃপ্তি পাই এই ভেবে যে আমি মানুষের কাজে লাগছি। অপরকে সেবা করার চেয়ে মহত্তর সুখ আর কী হতে পারে? আমেরিকায় আমি কী সুখেই ছিলাম! কিন্তু আমার আর কোন কাজের ভার নিতে ইচ্ছা করে না। কোন কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে মনে হয় যে আমি বদ্ধ হয়ে পড়লাম। আমি সদামুক্ত হয়ে থাকতে চাই, তাতে যা হবার হোক।"

পরদিন সকালে এক যুবক জয়রামবাটী থেকে এলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁকে সন্ন্যাস দিয়ে তাঁর হাতে একখানি চিঠিতে স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখেছেন ওকে আনুষ্ঠানিক হোমাদি করে দেবার জন্য। যুবকটি কনখলের পথে কয়েক জায়গায় নেমে দেখেছেন যে বাংলার বাইরের খাদ্য তাঁর সহ্য হয় না। এ কথা শুনে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন ঃ "কখনো কখনো আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি যৌবনে আমরা কী কষ্টে জীবন কাটিয়েছি! এখন ঐরূপ কঠোরতা করা খুব শক্ত, কিন্তু মনের জোরে এখনও ঐরূপ করতে পারি। অবশ্য এদিককার খাবার

তত ভাল না। তখনকার দিনে ওসব আদৌ ভাবতাম না। খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শরীরের ভাবনা তখন মনে স্থান পেত না। আমরা জীবনের আদর্শলাভের জন্য প্রাণপাত করেছি। আমরা প্রচুর জপধ্যান করতুম। দিনে একবার মাত্র খেতুম; কয়েক বাড়ি ঘুরে ভিক্ষা করে কয়েকখানি রুটি ও একটু ঘোল পেতুম; তাতেই চলে যেত। এই সামান্য আহারে সন্তুষ্ট থাকতাম এবং দেহও বেশ সবল ছিল। বোধহয়, বৃদ্ধ বয়সে একটু ভাল খাদ্যের প্রয়োজন; কিন্তু এ ধারণাও কাল্পনিক। আমরা খাদ্যকে অসার মনে করাতে তা থেকে পুষ্টিলাভ করতে পারি না। সেই দিনগুলিই সুখের যখন আমরা শরীরের কথা ভাবি না।"

একজন ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করল, "মহারাজ, ধ্যানের পক্ষে কোন্ বিষয়টি উত্তম?" তুরীয়ানন্দজী উত্তর দিলেন, "তোমার যেটা ভাল লাগে। সবই এক লক্ষ্যে নিয়ে যায়; পরে সব ঠিক হয়ে যায়।" গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি বললেন ঃ "গুরু শিষ্যকে স্নেহে আবদ্ধ করবেন। তিনি শিষ্যকে অধীন না করে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবেন। যিনি বাঁধতে চেষ্টা করেন, তিনি নিজেই বদ্ধ হন। তিনি শিষ্যকে প্রেমের দ্বারা শাসন করবেন, বুদ্ধির দ্বারা নয়। শিষ্যের মোহনাশ ও দৃষ্টি সাফ করাই গুরুর কাজ।" তারপর শিষ্যের গুরুর প্রতি আনুগত্য সম্বন্ধে বললেন ঃ "শিষ্য প্রীতিভরে গুরুর আদেশ পালন করবে, ভয়ে নয়। ভয় থেকে যে আনুগত্য আসে তা দাসত্ব। যারা প্রভুত্বের কাঙাল, তারা আনুগত্য আদায় করে—তারা শাসন করতে চায়। এটি ক্ষুদ্রতা, নীচতা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "জ্ঞানীদের কি পুনর্জন্মের ভয় থাকে না?" স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন ঃ "তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না। আর যদি জন্মও হয় তবে তাকে জন্ম বলতে পার না, কারণ তখনও তাঁরা মুক্ত। শিব, শিব, ওঁ তৎ সৎ। তাঁরা ভয়হীন। কারণ তাঁরা অনাসক্ত। মাকে জানলেই আসক্তি দূর হয়। এ দুনিয়া তখন কত তুচ্ছ, কত নগণ্য; মনে হয় যেন একটা মাটির ঢিপি।" এ কথা বলার পর তাঁর দৃষ্টি কোন অজানা দেশে চলে গেল আর তিনি চুপ হয়ে রইলেন। তাঁর মুখ এক অপূর্ব প্রভায় ভাস্বর হয়ে উঠল। আমরা সকলেই অনেকক্ষণ নীরব হয়ে রইলাম।

পরদিন তিনি তাঁর আমেরিকার অভিজ্ঞতা ও স্বামীজীর সঙ্গে ভ্রমণকাহিনি বললেন ঃ "সবই মায়ের কৃপা। শিব, শিব! মা ছাড়া সবই দুঃখময়। যখন আমরা তাঁর জন্য কাঁদি এবং আমাদের চিত্ত ব্যাকুল হয় তখনই তিনি আসেন।" একজন আমেরিকার শিষ্যার সম্বন্ধে তুরীয়ানন্দজী বললেন ঃ "সে আমার ওপর নির্ভর করত। সে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে না কেন? আমি তো তাঁরই দাস। তাঁর শরণ নিলে আর কোন ভয় নেই।"

আমি বললুম পাশ্চাত্যের কবি ও দার্শনিকেরা প্রাচ্যের ভাবধারার নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। স্বামী তুরীয়ানন্দ সহাস্যে বললেন ঃ "আমাদের শিবই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। যখন নারদ তাঁকে উমার মৃত্যু সংবাদ দিলেন, তখন তিনি বললেন ঃ 'বেশ, এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে ধ্যান করতে পারব।' ইহাই ব্যবহারিক দর্শন।"

কয়েকদিন পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন একটু চলতে ফিরতে সমর্থ হলেন, তিনি আমার ঘরে এলেন। আমার টেবিলে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি দেখে তিনি বললেন ঃ "তিনি স্বমহিমায় মহীয়ান। তিনি অতুলনীয়। কেশব সেন একদিন এক ফটোগ্রাফারকে আনেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থিরভাবে দাঁড়াতে বলেন। ঠাকুর তাঁর কথা শিশুর মতো মানলেন, তখন এই ছবি তোলা হয়।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি বেশি চিঠিপত্র পাও কি?" "বেশি না," আমি বললুম। তখন তিনি বললেন ঃ "আমরা যেমন দিই তেমন পাই। আমরা যদি অপরকে ভালবাসি, তারাও আমাদের ভালবাসবে।"

বিকালে স্বামী তুরীয়ানন্দের ঘরে গিয়ে দেখলুম তিনি প্রেমানন্দের সঙ্গে বসে আছেন এবং খই খাচ্ছেন। আমি বললুম, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন; আপনার জন্য একটু নুন নিয়ে আসি। আমি ফিরলে স্বামী তুরীয়ানন্দ বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করে বললেন ঃ 'তোমরা ধরিত্রীর সার বা লবণস্বরূপ। লবণ যদি তার লবণত্ব হারিয়ে ফেলে তবে তা আর লবণ নয়।' যিশুর কথাগুলি

কী শক্তিশালী! 'শৃগালদের গর্ত আছে, আকাশচারী পাখিদেরও বাসা আছে; কিন্তু ঈশ্বরপুত্রদের মাথা গুঁজবার স্থান নেই।' যিশু ছিলেন যথার্থ সন্ন্যাসী।"

আমি বললুম ঃ "ভারতে বাস করে আমি বাইবেল ভালভাবে বুঝতে পারছি। বাইবেলোক্ত ঘটনা এখানে নিত্যই ঘটছে। এখানে সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা দেখে আমি যিশুর জীবন আরও স্পষ্টরূপে মানসপটে চিত্রিত করতে পারি। ভারতবাসে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়।" "হাঁ, তুমি সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে সব দেখছ," বললেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। তারপর আমি তাঁকে লেডি মিন্টোর বেলুড় মঠ পরিদর্শনের কথা বললাম। তিনি বেলুড় মঠের সাধুদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী কী?" একজন সাধু বললেন, "তিনি হিন্দুশাস্ত্র মতেই উপদেশ দিতেন।" তা শুনে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন, "তাঁর উপদেশই শাস্ত্র। এমন সব কথা তিনি বলেছেন যা শাস্ত্রে নেই। কিন্তু তিনি বলতেন তাঁর সব উপদেশ শাস্ত্রে আছে।"

আমি বললুম, "ঠাকুরের বাণী শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ থেকে কি কিছু ভিন্ন নয়?" স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন ঃ "হাঁ, শঙ্কর কেবল মুক্তি বা নির্বাণলাভের পথ নির্দেশ করেছেন। আমাদের ঠাকুর প্রথম মানুষকে মুক্ত করতেন এবং তারপর শিক্ষা দিতেন কিরূপে সংসারে থাকতে হবে। তাঁর দিব্য স্পর্শে মানুষ মুক্ত হয়ে যেত; আর যাঁরা তাঁর উপদেশ পালন করবেন, তাঁরাও মুক্ত হবেন। তাঁর কথায় দারুণ শক্তি ছিল। প্রথমে মুক্ত হও। এই নামরূপাত্মক জগৎ ত্যাগ কর। তারপর সবার মধ্যে মাকে দর্শন কর এবং তাঁর খেলার সাথি হও। আমরা নির্বাণের জন্য ব্যস্ত নই, আমরা প্রভুর সেবা করতে চাই। আমরা বুড়ি ছুঁয়েছি[১], আর আমাদের চোর হতে হবে না। জীবন যখন দুর্বিষহ হয় তখন আমরা জগদম্বার সন্ধান ও স্মরণ করি, তাতেই শান্তি পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা অবলম্বন করে শিক্ষা দিতেন। সেজন্য সর্বদা তাঁর কথাই

---

১ ঠাকুর বুড়ি-চোর খেলার গল্প বলতেন। এই খেলায় বুড়িকে একবার ছুঁলে আর চোর হতে হয় না। এ জগৎরূপ ক্রীড়াক্ষেত্রে একবার ঈশ্বরদর্শন করতে পারলে মানুষ সংসারের দুঃখকষ্ট থেকে চিরতরে মুক্তি পায়।

আমাদের মনে পড়ে। গাছপালায়, পত্রপুষ্পে, কীটপতঙ্গে, নরনারীতে—সর্ববস্তুতে তিনি মাকে দেখতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। জীবিত বা মৃত অবস্থায় আমরা মাতৃক্রোড়েই অবস্থিত। প্রথমে এটি অনুভব কর ও সদা স্মরণ কর। তাহলে জগৎ আমাদের কলুষিত করতে পারবে না। মাতৃহীন জীবন কী কষ্টকর! তাঁকে পেলে জীবন মধুময় হয়। তখনই আমরা ভয়শূন্য হই।''

এমন সময় ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন এবং স্বামী তুরীয়ানন্দকে পরীক্ষা করে বললেন ঃ 'ইনি শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবেন যদি সাবধানে থাকেন। ইনি এখনও দুর্বল; সম্পূর্ণ সুস্থ হতে একটু সময় নেবেন।'' ডাক্তার চলে গেলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে তাঁর শরীর এত দুর্বল হওয়ায় মন দুর্বল হয়েছে কিনা? তিনি বললেন, ''না। মনের একটা অবলম্বন আছে।'' আমি ঃ ''সে অবলম্বন কি মা?'' স্বামী তুরীয়ানন্দ ঃ ''হাঁ। সাধারণ মানুষ মনকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করে। আমি দেখি আমার মন দেহ থেকে পৃথক, সুতরাং কিরূপে দেহমনের অভিন্নতা ভাবতে পারি? আমি আমার সঙ্কটময় অবস্থা বুঝেছিলাম, কিন্তু আমার তাতে ভয় বা দুশ্চিন্তা হয়নি।''

শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ গীতার ক্লাস নিতেন এবং ওটি থেকে আমি নোট নিতুম। ঐ দিন আমি তাঁকে আমার নোট পড়ে শুনাই। তিনি শুনে খুব আনন্দিত হলেন। তারপর তিনি আমাকে তাঁর কেদারনাথ তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতা বলেন। তিনি ও অপর দুজন সাধু কয়েকদিন অনাহারী ছিলেন। তারপর তাঁরা তুষার-ঝড়ে পড়েন ও ধ্যানে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে একটা জীর্ণ কুটির দেখেন এবং তাতে রাত কাটান। পরদিন একটা গ্রামে পৌঁছে ভিক্ষা পান।

পরে আমি আবার তাঁর ঘরে গেলে তিনি বলতে শুরু করলেন ঃ ''আমরা যা জানি তা আমাদের অন্তত একবার কার্যে পরিণত করা উচিত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেকটি বিষয় তিনবার করে অভ্যাস করতেন। সাধনার দ্বারা নূতন জ্ঞানলাভ হয়। কিছু সাধন কর, রোজ অভ্যাস কর। বন্ধন ও মুক্তি দুই-ই মনে। আত্মা মনের অতীত।

আমি প্রশ্ন করলাম, "অনুভূতিবান পুরুষ কি অন্যায় কাজ করতে পারেন?" তিনি উত্তরে বললেন ঃ "কেহ কেহ বলেন, হাঁ, সিদ্ধ পুরুষেরাও প্রারব্ধবশে অন্যায় কর্ম করে বসেন। কিন্তু তাদের পক্ষে সেটা পাপ নয়। তাঁরা অনাসক্ত। তাঁদের ক্ষেত্রে কোন নূতন কর্ম সৃষ্ট হয় না। তাঁরা স্বেচ্ছামতো কর্মে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হতে পারেন। মনের ওপর তাঁদের পূর্ণ আধিপত্য। যাঁরা মনোজয়ী, তাঁদের সঙ্গলাভের চেষ্টা কর। মনই মনকে জয় করে। ধ্যানে, গানে, পাঠে মনকে বশে আনা যায়। মনের গতি লক্ষ্য করলে মন সংযত হয়। ইন্দ্রিয় ও মনের উপর প্রভুত্ব কর। 'আমরা যেন সত্য ও শুভবাক্য শ্রবণ করি। আমরা যেন শুদ্ধ ও সুন্দর বস্তু দর্শন করি। আমরা যেন দেহমনকে আত্মবশে রাখতে পারি। ওঁ তৎ সৎ।' "

লাটু মহারাজের কথা উঠল। আমাদের সাধুদের মধ্যে একজন বললেন, "তিনি নিরক্ষর।" আমি বললুম ঃ "কিন্তু তিনি অদ্ভুত আধ্যাত্মিক পুরুষ। তিনি শাস্ত্র অনুভব করেছেন।" স্বামী তুরীয়ানন্দ কথার মাঝে বললেন ঃ "তিনি শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নন—তিনি মূর্তিমান শাস্ত্র। তিনি ঠাকুরের সঙ্গ ও সেবা করেছেন।"

সন্ধ্যার দিকে একদল তীর্থযাত্রী স্বামী তুরীয়ানন্দকে দর্শন করতে এল। তাঁদের মধ্যে একজন মন্তব্য করলেন, "গুরু ব্যতীত ধ্যানাভ্যাস বিপজ্জনক।" স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁর সঙ্গে একমত হলেন না। তিনি বললেন, "গুরুর যথার্থ উপদেশ ছাড়া প্রাণায়াম অনিষ্টকর হতে পারে, ধ্যান নয়। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানপদ্ধতি বর্ণিত আছে।"

আর একজন তীর্থযাত্রী স্বামী তুরীয়ানন্দের পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি হেসে বললেন ঃ "পাশ্চাত্যবাসীদের অধিকাংশ জড়বাদী, ভোগপরায়ণ। কিন্তু ওদেশে অনেক ভাল জিনিস আছে। ওদেশের খাদ্য এ দেশের চেয়ে অধিকতর পুষ্টিকর। রন্ধনাদি সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পন্ন হয়। স্বাস্থ্যব্যবস্থা আমাদের চেয়ে ভাল। তারা সবল ও স্বাস্থ্যবান। মেয়েদের অনেক বেশি স্বাধীনতা আছে এবং তারা শিক্ষিতা। পাশ্চাত্যে privacy (গোপনীয়তা) সুরক্ষিত এবং তাদের পোশাক কর্মোপযোগী। এ দেশে

সবকিছুই নিষ্ক্রিয়তা অভিমুখী। আমরা ওদের মতো উদ্যমশীল নই। পাশ্চাত্যবাসীরা আমাদের মতো উচ্চস্বরে কথা বলে না এবং চাকরেরা আমাদের দেশের চেয়ে ভাল ব্যবহার পায়। এমন কি সামান্য ভৃত্যেরাও ভদ্র ব্যবহার পায়। ওদেশে কোন কর্মই নিন্দনীয় নয়। মানুষ মানুষই, তার পেশা যাই হোক না কেন। কিন্তু সে সমাজের নীতি বা শাসন মানতে বাধ্য। ওদেশে কেউ অস্পৃশ্য নয়। অস্পৃশ্যতা বলে কিছু নেই। ভেবে দেখ, আমরা এ দেশে নিম্ন জাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করি!"

তীর্থযাত্রীদের মধ্যে এক যুবক নিজ কর্তব্য বিষয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দের পরামর্শ চাইল। তিনি উত্তরে বললেন, "ঈশ্বর চিন্তা কর। তিনিই তোমাকে সুমতি দেবেন।" জনৈক ব্রহ্মচারী স্বামী তুরীয়ানন্দের খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। যাত্রীরা প্রণাম করে বেরিয়ে গেল। তিনি বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করে বললেন, "মানুষ শুধু আহার গ্রহণ করেই বাঁচে না, কিন্তু ভগবৎবাক্য পালন করেই বেঁচে থাকে।" তারপর তিনি আমাকে বললেন, "সক্রেটিসের উপর যে ছোট বইখানি তুমি আমাকে দিয়েছিলে, তা খুব সুন্দর। ওটি তত আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ না হলেও সম্ভবত সে যুগের উপযোগী শিক্ষা। মানুষ গড়ার শিক্ষা। তিনি যা জীবনে পালন করতেন তা শিক্ষা দিতেন। তিনি মহাপুরুষ ছিলেন; আর তাঁকেই গ্রীকবাসীরা মেরে ফেলল।"

এক ব্যক্তি অপরের কাছে দুর্ব্যবহার পেয়েছিল। তার সম্বন্ধে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন ঃ "তার দ্বেষ ছিল না। এটা খুব ভাল—খাঁটি খ্রিস্টান ভাব। এটি মায়ের কৃপা। তিনিই লোকটির হাত ধরে আছেন। সর্বদা মনে রেখো আমাদের ভাগ্যে যা ঘটে তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই মা করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মা তাকে রক্ষা করবেন। অবশ্য মাঝে মাঝে সেও তা অনুভব করত; কিন্তু সে ভাবত যে এটা তার দুর্বলতা মাত্র। অন্যের দুর্ব্যবহারে আমরা দুঃখে ভেঙে পড়ব কেন? প্রত্যেকেই সময়ে সময়ে দুর্বল বোধ করে, তখনই তারা কষ্ট পায়। মায়ের সান্নিধ্যে থাকলে কষ্ট বলে মনে হয় না। যারা আমাদের অনিষ্ট করে তাদের প্রতি আমাদের মন্দভাব পোষণ করা ঠিক নয়। কখনও

মায়ের প্রতি বিশ্বাস হারিও না। বিশ্বাসই আমাদের ধরে থাকে। প্রত্যেকেই সময়ে সময়ে হতাশ হয়ে পড়ে, কিন্তু সকলে তা প্রকাশ করে না।"

পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ আমাকে বলেন ঃ "আমি যখন তোমার চিঠি পাই তখন তোমার মানসিক অবস্থার একটা ছবি দেখতে পাই এবং অধিক চিন্তা না করে একটা দিব্য প্রেরণার বশে উত্তর দিয়ে থাকি।" পরদিন আমি স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী কল্যাণানন্দ ও অন্যান্য সাধুদের তাঁর ঘরে দেখি। পাশ্চাত্যে স্বামীজীর কার্য সম্বন্ধে কথা উঠল। স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন ঃ "স্বামীজী ছিলেন নির্ভীক। তিনি কোন আপস না করে সর্বোচ্চ সত্য প্রচার করেছেন। তিনি কেবল দিতেন, প্রতিদানে কিছু চাইতেন না। অপরে একফোঁটা দেয় আর তার পরিবর্তে এক বালতি চায়।"

স্বামী প্রেমানন্দ বললেন ঃ "আমরা দুজন মহাপুরুষকে দেখেছি—ঠাকুর ও স্বামীজী। তাঁদের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।" স্বামী তুরীয়ানন্দ ওটি সমর্থন করে বললেন ঃ "আমি যখন প্রথম ঠাকুরকে দেখি তখন তিনি ছিলেন শীর্ণ, কিন্তু তাঁর মুখ ছিল উজ্জ্বল। তিনি কলকাতায় একটা ঘোড়ার গাড়িতে এসেছিলেন। যখন তিনি গাড়ি থেকে নামলেন তখন মাতালের মতো টলছিলেন। তখন তিনি সমাধিস্থ। আমি ভাবলুম ইনি কি শুকদেবের পুনরাবির্ভাব? সমাধি থেকে নেমে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আমি কে? আমি কোথায়?' তারপর তিনি কিছু খেতে চাইলেন। কিন্তু খাবার পূর্বেই আবার সমাধিস্থ হলেন।"

তারপর স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ কয়েকটা বাংলা গান গাইলেন, যেগুলি ঠাকুর গাইতেন। তন্মধ্যে একটি গান—

মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
যত বিষয় মধু তুচ্ছ হলো কামাদি কুসুমসকলে ॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেল।
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥
কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এতদিনে
সুখদুঃখ সমান হলো আনন্দসাগর উথলে ॥

স্বামী প্রেমানন্দ ঠাকুরের গান করবার ভাবভঙ্গি অনুকরণ করে দেখিয়ে বললেন, "ঠাকুর খুব সুন্দর গান গাইতে পারতেন। কেউ বেসুরে ভাবশূন্য হয়ে গান করলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না।"

বিকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ ভগিনী নিবেদিতার "স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি" বইখানি পড়ছিলেন। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি বইখানি একপাশে রেখে বললেন, "মাকে সর্বভূতে দেখা, সকলকে সমানভাবে ভালবাসা এবং সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করাই ঈশ্বরানুভূতি। সর্বভূতের মধ্যে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে দর্শন করাই দিব্যজীবন।"

পরদিন সকালে স্বামী তুরীয়ানন্দের শরীর ভাল ছিল না। তাঁর একটু জ্বর ও দাঁতের ব্যথা হয়েছিল। তিনি বললেন ঃ "মা দয়া করে দুঃখ দেন আমাদের মঙ্গলের জন্যই। আমরা এত সুখপ্রিয় যে তা বুঝতে অক্ষম। আমরা কেবল তাঁর উপরই নির্ভর করব—আর কারো উপর নয়।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "প্রয়োজনীয় জাগতিক বস্তুর জন্যও কি আমরা তার উপর নির্ভর করব?" "নিশ্চয়ই," তিনি উত্তর দিলেন। "সব কিছুর জন্য। আমাদের দেহ, মন, প্রাণ মাতৃচরণে উৎসর্গীকৃত। তিনি ছাড়া আর কার উপর নির্ভর করব? তিনি দেন, তিনি নেন—সবই সমান। আমাদের ভাববার কী আছে? যা আমরা দিয়েছি তা আবার ফিরিয়ে নেব কীভাবে? যিনি এটি বুঝতে পারেন—তিনিই ধন্য!"

(উৎস ঃ প্রবুদ্ধ ভারত, মার্চ ও এপ্রিল ১৯২৫)

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি

স্বামী শঙ্করানন্দ

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ

১৯০২ সালে পূজ্যপাদ হরি মহারাজ আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন। রেঙ্গুনে পৌঁছে সংবাদপত্রে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের সংবাদ জেনে একেবারে মুষড়ে পড়লেন। মঠে পৌঁছে দেখেন সব খাঁ খাঁ করছে। যেন কেউ নেই। প্রথমটা মঠে না এসে, রাস্তা থেকেই তপস্যায় চলে যাচ্ছিলেন। গুরুভায়েরা জোর করে ধরে নিয়ে এলেন। হরি মহারাজ গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন—"যদি কাছে থাকতুম, দেখিয়ে দিতুম কি করে আমাদের ছেড়ে চলে যান!" স্বামীজী তা জানতেন যে, গুরুভায়েরা কাছে থাকলে শরীর ত্যাগ করা দুর্ঘট হবে। তিনি দেখালেন বেশ ভালই আছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন। বেশ সুস্থ সবল লোকের মতো আহারাদিও করতেন। একে একে সবাইকে কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন, কর্মস্থলে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে কী ঘনীভূত প্রগাঢ় ভালবাসা! স্বামীজীর দেহাবসানের সংবাদ পেয়ে 'উদ্বোধন' থেকে শরৎ মহারাজ, 'বলরাম মন্দির' থেকে রাখাল মহারাজ—এই রকম বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সকলে এসে হাজির হলেন। রাখাল মহারাজ এসেই দৌড়ে গিয়ে স্বামীজীর দেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। সে কী কান্না! (রাজা) মহারাজের সে প্রাণবিদারী কান্না দেখে সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। সকলে চিৎকার করে কাঁদছেন। কেউ কি আর থামেন! কান্না শুনে স্বামীজী যদি জেগে ওঠেন! চারদিকে হায় হায় রব উঠল। ভাবলেন, স্বামীজী যখন সরে পড়লেন, তখন তাঁর প্রবর্তিত কর্মের এইখানেই বোধহয় অবসান ঘটল। কিন্তু তা কি হয়? স্বামীজীর প্রবর্তিত কর্ম কি কখনো অনড় অচল হয়ে বন্ধ হতে পারে?

আমি কর্মনাশা এবং ফরাসডাঙ্গা

পূজ্যপাদ হরি মহারাজ স্বামীজীকে একদিন বলেন, "আপনি ঠাকুরের বিষয়ে কিছু বলুন।" তদুত্তরে স্বামীজী একটু গম্ভীর ও ভাবস্থ হয়ে বলেন, "তাঁর কথা কী আর বলব, তিনি L-o-v-e Personified!" ঠাকুর বলতেন, "আমি কর্মনাশা এবং ফরাসডাঙ্গা।" 'আমি কর্মনাশা' অর্থাৎ মানুষের কর্মক্ষয় করে তাকে মোক্ষের অধিকারী করে দিই। আরও বলতেন, 'আমি ফরাসডাঙ্গা' অর্থাৎ ইংরেজ রাজের কোন প্রজা অপরাধ করে যদি পালিয়ে তথায় আশ্রয় করে, তাহলে ইংরাজ যেমন কিছু করতে পারে না—সেইরূপ আমাকে আশ্রয় করলে সম্পূর্ণ নিরাপদ।...

হরি মহারাজ স্বামীজীর ভাবে মেতে থাকতেন। একবার তাঁর ইচ্ছা হলো এক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করার। সুরেশ (স্বামী শাশ্বতানন্দ), পশুপতি (স্বামী বিজয়ানন্দ), জ্ঞানেশ্বর (স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ), হেমেন্দ্র (স্বামী সদ্ভাবানন্দ) তখন কাশীতে। হরি মহারাজ প্রায়ই তাদের কাছে ছাত্রাবাসের কথা তুলে ধরতেন। এরা তখন নূতন এসেছে, কয়েক বছর সঙ্ঘে যোগদান করেছে। শিক্ষিত ছেলে। ভেতরে উৎসাহ যথেষ্ট। কিন্তু এ রকম নূতন কাজ আরম্ভ করার সাহস পায় না। এই কাজের সফলতা, এর ভবিষ্যৎ, এর পরিণাম শুভ কি অশুভ—এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় করতে পারছে না। এরা কেবলই ইতস্তত করে। হরি মহারাজ একদিন সুরেশকে ধরেই বসলেন। সুরেশ বললে—"আমি কি পারব এ কাজ?" হরি মহারাজ সুরেশের হাতটা চেপে ধরে বললেন—"আমি কি এমনি তোমায় বলছি? তোমার ভেতর শক্তি আছে আমি দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই তুমি পারবে।" অগত্যা সুরেশ রাজি হলো। সুরেশ বলল—"এর দুটো প্রধান কাজের দিক আছে। একটা ভেতরের, আর একটা বাইরের। আমি ভেতরের কাজটা দেখতে পারি, হেমেন্দ্র যদি বাইরের দিকটা—টাকাকড়ি সংগ্রহ করা প্রভৃতির ভার নেয়, ভাল হয়।" হরি মহারাজ হেমেন্দ্রকে ডেকে বললেন। সে তখন সবে ঢাকা থেকে এসেছে সাধনভজন করবার জন্য। ঢাকায় কাজ করে তার বিতৃষ্ণা এসে গেছে। সেখানে শুধু কাজ, কাজ, কাজ! সে

উত্তর দিল—"কর্মে আমার বিশ্বাস নাই, কর্মের দ্বারা সমাধি হয় না, মুক্তি হয় না। যে কর্মে মুক্তি হয় না, সে কর্ম করার সার্থকতা আছে কি কিছু?" হরি মহারাজ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন—"এ কর্ম স্বামীজীর কর্ম, এর দ্বারা সমাধি, মুক্তি অনিবার্য। আমি বলছি, তুমি কাজে লেগে যাও, হাতে হাতে ফল দেখতে পাবে।" হরি মহারাজের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। হেমেন্দ্র মুগ্ধ, তার প্রাণসত্তা নবচেতনায় সঞ্জীবিত, সে স্বীকৃত হলো কাজে নামতে। টাকাকড়ি সংগ্রহে সে ওস্তাদ। পরের দিন সকলে মিলে ছাত্রের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন নানা স্থানে ঘোরাঘুরি করল, নিষ্ফল হয়ে ফিরে এল। শরীর মন ক্লান্ত। গঙ্গার ধারে তিন বন্ধুতে উপবিষ্ট। বিরস বদন, চুপচাপ উদাসভাবে কাল যাপন করছে। অদূরে নজরে পড়ল একটি তের চৌদ্দ বছরের বালকের প্রতি। বালকটি গাছের তলায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পশুপতিই প্রথম দেখে। তিন জনেই তার কাছে উঠে গেল। আলাপের পর জানতে পারল সে গরিবের ছেলে। পয়সার অভাবে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। ওরা ছেলেটির অধ্যয়নের ভার নিল। সেবাশ্রমে থেকে পড়াশুনা করবে, সেখানে থাকবে ও খাবে, তার অন্যান্য খরচও তারা নির্বাহ করবে। পরের দিন সে সেবাশ্রমে এল। তার নাম শ্রীহরিহর মুখার্জি। পরে আরও কয়েকটি ছাত্র জুটল। পাঁচ ছয় মাস বেশ চলল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে রাজা মহারাজের শরীর খারাপ হতে সকলে মঠে চলে এল। ধীরে ধীরে ছাত্রাবাস উঠে গেল।

কাশী অদ্বৈত আশ্রমে হরি মহারাজ অনেকদিন ছিলেন। শেষের দিকে সনৎ সেবা করত। একদিন সন্ধ্যায় তাঁর ঘরে গেছি, উনি যে-ঘরে থাকতেন, সেই ঘরে। দেখি একটা ছোট উনুনে মটর সিদ্ধ হচ্ছে। সিদ্ধ তো হয়ে গেছে, জল সমস্ত শুকিয়ে গিয়ে পড়পড় শব্দ হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে ফেলা দরকার। সেবক সেখানে নাই। তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন, সাঁড়াশি কিম্বা কিছুই পাচ্ছেন না যে বাটিটা নামিয়ে ফেলেন। আমায় দেখেই তাঁর নিরুপায় অবস্থার কথা বললেন। দেখলাম বাটিতে মটর পুড়ছে। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে, খালি হাতে ধরে বাটিটা নামিয়ে দিলাম। আঙুল কটা চড়চড় করে পুড়ে গেল। হরি

মহারাজ আঁতকে উঠলেন। ওঃ, তাঁর সে কী কষ্ট! বারবার আমায় বললেন—"অমূল্য, কী করলে বল দিকিনি! তোমার আঙুলগুলো পুড়ে গেল! আমার মটর পুড়লে আর কী হতো?"

হরি মহারাজ ও গোলাপ-মা

(হরি মহারাজের সঙ্গে গোলাপ মায়ের এই কথোপকথনটি বলেছিলেন শঙ্করানন্দজী।)

গোলাপ মা ঃ দেখো হরিভাই, তোমাকে একদিনের ঘটনা বলছি। আমরা তখন যুবতী। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রায়ই যাই। একদিন ঠাকুরের ভাবাবেশ হয়েছে। আমরা একঘর মেয়ে বসে আছি। তিনি হঠাৎ আমাদের সামনে এসে একেবারে দিগম্বর হয়ে দাঁড়ালেন। পরিধানের কাপড় বগলে। এসেই বললেন, "তোমরাও যা আমিও তা। কেবল দাড়িগুলো রয়েছে। এই তো—এই তো।" ক্রমে তিনি ভাব সম্বরণ করে বিছানায় গিয়ে বসলেন। দেখো হরিভাই, আমরা তো সকলেই তখন যুবতী। কিন্তু ঠাকুরকে দেখে কারও কোনও লজ্জা হতো না। অন্য কেউ এমন উলঙ্গ হয়ে এলে আমরা কোথায় পালাতুম ঠিক ছিল না। কিন্তু ঠাকুরকে দেখে কোন সঙ্কোচ এল না। এখনই যত সঙ্কোচ হচ্ছে।

হরি মহারাজ ঃ শ্রীশ্রীঠাকুরই সেই আদ্যাশক্তি। স্ত্রী-শরীরে আসেননি। তার কারণ প্রচারে অসুবিধা হতো। তিনি কালী ভিন্ন আর কে?

গোলাপ মা ঃ প্রত্যক্ষ না করে বিশ্বাস করি কী করে?

হরি মহারাজ ঃ সে তো ঠিক কথা। তবে তুমি যে সবই প্রত্যক্ষ করে বুঝে নেবে তাও কি সম্ভব? ধরো, তুমি বিলাত যাও নাই, বিলাত প্রত্যক্ষ কর নাই, যাঁরা গেছেন তাঁদের কথাই তোমাকে মানতে হবে, কারণ বিলাত যে আছে সে কথা অস্বীকার করার উপায় নাই। তেমনি ভগবান যে আছেন, তা যাঁরা ঈশ্বরদর্শন করেছেন তাঁদের আপ্তবাক্য হতেই বিশ্বাস করে নিতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঈশ্বরদর্শন করেই তো সকলকে বললেন, "আমি দেখেছি, তোমাদেরও সাধন-ভজন এবং ব্যাকুলতা থাকলে দর্শন হবে।"

দেখো, তোমাদের ঐরূপ অবিশ্বাস আসবে বলেই তো এই বিজ্ঞানের যুগে ঠাকুর এলেন এবং হাতেনাতে তপস্যা করে মাকে প্রত্যক্ষ করে তবে বললেন, "ঈশ্বর আছেন, তোরা সাধন ও ব্যাকুলতা দ্বারা তাঁকে লাভ কর।" এমনকি তিনি ভবতারিণীর নাকের কাছে তুলো নিয়ে দেখলেন যে মায়ের নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা। যখন দেখলেন তুলো শ্বাসের সঙ্গে উড়ে গেল, তখন বিশ্বাস করলেন—হাঁ, মা সত্যই জাগ্রতা, চিদানন্দময়ী।

মরবে সাধু, উড়বে ছাই

হরি মহারাজ বলতেন—"মরবে সাধু, উড়বে ছাই, তবে সাধুর গুণ গাই।" প্রশ্ন করলেন, "এর আসল সূত্রটা জানিস?" উত্তর দিলাম—"না।" এইবার শুরু হলো ঐতিহাসিক তথ্য—রাজপুত কাহিনী। যেমন ভাববিহ্বল, তেমন মাধুর্যরসমণ্ডিত! "আকবরের রাজত্বকালে তার সভাসদদের মধ্যে নয় জন ছিলেন রত্ন। হাস্যরসিক বীরবল তাদের অন্যতম। বাদশা একদিন বীরবলকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার মায়ের কি কাম গেছে?' তিনি মহা ফাঁপড়ে পড়লেন। মাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করবেন কি করে? চিন্তায় আকুল। বাড়ি ফিরে কেবলই ভাবছেন—বাদশা হঠাৎ এ রকম বিদঘুটে প্রশ্নই-বা কেন করলেন? তাঁর মনে কী আছে কে জানে! তিনি খেতে বসেছেন, খাওয়ায় মন নেই। সর্বদা আনমনাভাব। স্নেহশীলা বুদ্ধিমতী মা সন্তানের রকম সকম দেখে, পাশে বসে, মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে আসল কারণটা জানতে চাইলেন। বীরবল মাতৃভক্ত। নির্মম কঠিন প্রশ্ন হলেও মাতৃসন্নিধানে সে তার বক্তব্য নিবেদন করল। মা অতি সহজে সমস্যাটির সমাধান করলেন। তিনি পুত্রকে আদেশ দিলেন কুড়িঘর-বিশিষ্ট এক কৌটা আনতে। কুড়িঘর কৌটা হচ্ছে—একটা বড় কৌটার ভেতর পর পর বড়র বড়, ছোটর ছোট, কুড়িটা কৌটা থাকে। আদেশ অনুযায়ী কৌটা আনা হলো। মা সর্বকনিষ্ঠ কৌটার মধ্যে কিছু

ছাই ভরে দিয়ে পরের পর সাজিয়ে এঁটে দিলেন। বীরবল বাদশার কাছে সেগুলো নিয়ে হাজির করল। তিনি কৌটাগুলো একটির পর একটি খুলতে খুলতে শেষেরটিতে ছাই পেলেন। অল্প চিন্তার ফলে বাদশা বুঝলেন এর অর্থ কি। আবিষ্কার করলেন—'মরবে নারী উড়বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই।' ঠাকুর যেমন 'আমি'র সঙ্গে পেঁয়াজের খোসার তুলনা করতেন, বীরবলের মা ও তেমনি কৌটাগুলোর সঙ্গে মনুষ্যদেহের তুলনা করলেন। ছাই ভস্মীভূত-দেহের পরিণতি। রাজপুত রমণীর সতীত্বের নিদর্শন—তার সহমরণ বরণ। স্বামীর দেহনাশে স্ত্রীর দেহনাশ। সেই ক্ষত্রিয়োচিত-বীরত্ব, স্ত্রীর সতীত্বের বাক্য—প্রবাদ বাক্যে দাঁড়াল। হরি মহারাজ ঐ শ্লোকটিকে সাধুদের বিষয়ে প্রয়োগ করতেন।"

জপ-ধ্যান-পাঠ

পূজনীয় হরি মহারাজ একটি শ্লোক বলতেন এবং নিজে কীভাবে সাধন-ভজন করতেন তার উল্লেখ করে বলেছিলেন ঃ "জপ-ধ্যান-পাঠ এই তিনটি in rotation (অনুবর্তন) চলিত। শাস্ত্রেও বলিয়াছে—

জপাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্জপেৎ।
জপধ্যানপরিশ্রান্ত আত্মানং চ বিচারয়েৎ ॥

জপ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে সাধক ধ্যান করবে, ধ্যানেতে শ্রান্ত হয়ে পুনরায় জপ করবে। জপ ও ধ্যান এই উভয় বিষয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে আত্মতত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হবে।"

(উৎস ঃ স্বামী শঙ্করানন্দের গল্পকথা ও স্বামী শঙ্করানন্দ;
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বামুনমুড়া, বাদু, উত্তর ২৪ পরগণা)

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতিচারণ

স্বামী যতীশ্বরানন্দ

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে বেলুড় মঠে পূজনীয় স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে প্রথম দর্শন করি। তখন আমি সাধু হইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। তৎপূর্বে তাঁহার কঠোর ত্যাগ-তপস্যার কথা তদীয় গুরুভাইদের মুখে শুনিয়াছিলাম। প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই এবং মঠে আসিলে তাঁহার সহিত ধর্মবিষয়ে আলাপ ও তাঁহার সেবাদি করিবার সুযোগ খুঁজিতাম। তিনি এত স্বাবলম্বী স্বাধীনচেতা ছিলেন যে, তখন অসুস্থ হইলেও সহজে অন্যের সেবা লইতে সম্মত হইতেন না। মাঝে মাঝে তিনি অবশ্য সামান্য সেবা লইতেন; কিন্তু তাহা অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বে।

সাধু হইবার জন্য তিনি আমাদিগকে খুব উৎসাহ দিতেন এবং সময় সময় স্বামীজীর এই কথাটি বলিতেন, "Young men of Bengal, to you I especially appeal." (বাংলার তরুণগণ, তোমাদিগকেই আমি বিশেষভাবে আবেদন করি।) "স্বামীজী কত আশা করে গেছেন, তোমাদের মতো অনেক যুবক তৎপ্রবর্তিত সেবাধর্ম গ্রহণ করবে। তোমরা সাধু হয়ে তাঁর কাজ করে ধন্য হও।"

উক্ত বৎসরের অক্টোবর মাসে পুরীধামে স্বামী তুরীয়ানন্দকে পুনরায় দর্শনলাভের সুযোগ হয়। ঐ সময়ে আমি পুরীতে পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে যাইয়া সঙ্ঘে যোগদান করি এবং তাঁহাদের সহিত 'শশী নিকেতনে' থাকি। তাঁহাদের পূত সঙ্গে মাসাধিক কাল কাটাইবার পর আমি মাদ্রাজ মঠে প্রেরিত হই। পুরীতে হরি মহারাজ শঙ্করাচার্যের প্রকরণ-গ্রন্থাবলী প্রথমে পড়িতে আমাকে উৎসাহিত করেন। তথায় উচ্চ রাজকর্মচারী শ্রীঅটলবিহারী মৈত্রের বাড়িতে সেইবার জগদ্ধাত্রীপূজার আয়োজন হয়। মহারাজ আমাকে পূজক

নির্বাচিত করেন এবং পূজার পূর্বে আমাকে পূজা-পদ্ধতি ভালরূপে অম্বিকানন্দজীর দ্বারা শিখাইয়া লন। উক্ত পূজায় পূজনীয় হরি মহারাজ প্রধান তন্ত্রধারক এবং স্বামী অম্বিকানন্দ সহকারী তন্ত্রধারক ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজও পূজার স্থানে উপস্থিত ছিলেন। জগদ্ধাত্রীপূজা খুবই বিস্তৃত এবং বহু ঘণ্টা ব্যাপিয়া চলে। এত বড় পূজা আমি সেই প্রথম করি। আনুষ্ঠানিক পূজার দীর্ঘ ন্যাসাদি করিতে অনভ্যস্ত আমার মন মাঝে মাঝে ক্লান্তিবোধ করিতেছিল। কিন্তু ধ্যানকালে আনন্দ পাইতেছিলাম, সেইজন্য কিছু বেশিক্ষণ ধ্যান করিতেছিলাম। হরি মহারাজ দুই-এক বার ইহা লক্ষ্য করিলেন, পরে দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ধ্যান হয়ে গেছে, এবার পূজা আরম্ভ কর।"

যথাকালে মায়ের পূজা আরম্ভ হইল। খানিকক্ষণ পরে ঔপচারিক পূজায় মনে একটু অবসাদ আসিল। কিন্তু ধ্যানের সময় আসিতেই তাহা কাটিয়া গেল। আমি বেশ আনন্দে ধ্যান করিয়া যাইতেছি, সময় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে আমার খেয়াল ছিল না। এবার হরি মহারাজ পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়তর কণ্ঠে ও কতকটা তিরস্কারের সুরে বলিলেন, "অনেকক্ষণ ধ্যান হয়ে গেছে, এবার পূজা আরম্ভ কর। অধিক ধ্যানে পূজার বিলম্ব করিয়া ভক্তদের অসুবিধা করিও না।" তৎপরে সাধারণ পূজা ও কুমারীপূজা সমাপ্ত হইল।

পূজায় যাঁহারা ব্যাপৃত ছিলেন তাঁহারা সকলে জলযোগ করিতে বসিলেন। হরি মহারাজ নিজের থালা হইতে ভাল ভাল জিনিসগুলি আমার পাতে সস্নেহে তুলিয়া দিলেন। পূজাকালে তাঁহার ভর্ৎসনার জন্য আমার মনে যে একটু কষ্ট হইয়াছিল তাহা এখন মুছিয়া গেল এবং তাঁহার কৃপায় আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল।

পূজার শেষে আমরা সকলে 'শশী নিকেতনে' ফিরিয়া গেলাম। হরি মহারাজ আমাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "পূজার সময় তোমার যে ধ্যানের ভাব আসিয়াছিল তাহা উত্তম। কিন্তু অধিক ধ্যান করিলে পূজা এবং ভোগরাগ ও ভক্তদের প্রসাদগ্রহণ প্রভৃতি শেষ হইতে খুব বিলম্ব হইত; ইহা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে।" তিনি আরও বলিলেন, "জান আমাদের আদর্শ কি? যখনই

ধ্যানের ইচ্ছা হইবে তখনই ভিতরে ঢুকিয়া বাহিরের দ্বার বন্ধ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইব। আবার আবশ্যক হইলে ধ্যান ছাড়িয়া সহজভাবে বাহিরে আসিয়া কাজ করিব।'' তিনি সাধুজীবনের উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিতে আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন। মাদ্রাজ যাইবার পূর্বে তিনি ও মহারাজ পরামর্শ করিয়া আমাকে ব্রহ্মচারী নিত্যচৈতন্য নাম দিলেন এবং খুব আশীর্বাদ করিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দকে দর্শন করিবার পর হইতে তাঁহার পূতসঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলাম। ইহা পূর্ণ করিবার সুবর্ণ সুযোগ আসিল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। শ্রীশ্রীমা সেই সময়ে বাগবাজার মঠে অন্তিম অসুখে শয্যাশায়িনী। আমি কাশীতে সকালে পৌঁছিয়া বিকালে যখন হরি মহারাজকে দর্শন করিতে যাই তখন তিনি আপনা হইতেই বলিলেন, ''তুমি আমার কাছে থাকো না কেন? সনৎ শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে কলকাতা যাইতেছে।'' তখন হইতে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত তাঁহার পূতসঙ্গ ও সেবা করিবার অধিকার পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। আমি মাঝে মাঝে পূজনীয় হরি মহারাজের সঙ্গে খুব ধর্মপ্রসঙ্গ করিতাম। আমি একদিন তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেছিলাম। আমার ধারণা ছিল, আত্মসমর্পণ করা তত কঠিন নহে। কিন্তু হরি মহারাজ বলিলেন, ''ঠিক ঠিক আত্মসমর্পণ তখনই করা যায় যখন ঠাকুরের সেই উপমার 'মাস্তুলের পাখি'র মতো উড়িয়া উড়িয়া ডানা দুটি এত ক্লান্ত হইয়া পড়িবে যে, আর উড়িবার শক্তি থাকিবে না। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যখন সাধক দেখে তাহার আর চেষ্টা করিবার সামর্থ্য নাই, তখনই শরণাগতির ভাব ঠিক ঠিক আসে।''

পূজনীয় হরি মহারাজ তাঁহার সেবকদের সর্বাঙ্গীণ বিশেষত আধ্যাত্মিক মঙ্গল সর্বদা কামনা করিতেন এবং তাহাদের জন্য খুব দায়িত্ববোধ করিতেন। কখনো কখনো বলিতেন, ''এরা আমার শরীরের সেবা করে, আর আমি এদের মনের সেবা করি।'' সময় সময় আমরা নানা কারণে মন খারাপ করিয়া অজ্ঞানতাবশত তাঁহাকে চিন্তিত করিয়া তুলিতাম। কচিৎ কখনো বিরক্ত হইয়া তিনি বলিয়াও উঠিতেন, ''সময় সময় তোমাদের মনের সেবা করিতে গিয়া

আমাকে প্রাণান্ত হইতে হয়।" আমাদের মন যাহাতে উচ্চ সুরে, ভগবদ্‌ভাবে বাঁধা থাকে ও আমরা আনন্দে থাকি, তাহার দিকে তিনি খুব দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার জনৈক সেবক তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। আমাদের মনে হইত তাঁহার উপর হইতে মন তুলিয়া লইয়া সেই ভালবাসা ঈশ্বরে অর্পণ করাইবার উদ্দেশে তিনি উক্ত সেবককে সময়ে সময়ে খুব বকিতেন। সন্ধ্যার পর সেবাশ্রমের স্কুলবাড়িতে তিনি শুইতে যাইতেন এবং একজন সেবককে সারারাত তাঁহার কাছে থাকিতে হইত। একদিন রাত্রে তাঁহার কাছে আমার থাকিবার পালা পড়িল। আমি নিজে না যাইয়া উক্ত সেবকটিকে যাইতে বলিলাম। আমার কথায় সেবকটি যাইয়া হরি মহারাজের বকুনি খাইয়া ফিরিয়া আসিল। তবু আমি নিজে না যাইয়া আর একটি সেবককে যাইতে অনুরোধ করিলাম এবং বলিলাম, "আমি তাঁহার কাছে যাইয়া ভর্ৎসনা খাইতে চাহি না।" দ্বিতীয় সেবকটি রাত্রে তাঁহার কাছে গিয়া রহিল। কিন্তু পরদিন ভোরে আমাকে সেবার জন্য হরি মহারাজের নিকট যাইতে হইল। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমার কাছে আসতে ভয় পাচ্ছিলে শুনে কাল রাত্রে আমার প্রাণটা ছ্যাঁক করে উঠল।" তিনি একজনকে প্রয়োজনবশত বকিতেন তাহার কোন দোষ দূর করিবার জন্য। ইহাতে অন্য কেহ ভীত হইলে এইরূপ স্নেহের স্পর্শ দিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিতেন।

পূজনীয় হরি মহারাজ তখন বহুমূত্ররোগে ভুগিতেছিলেন। একদিন আমি তাঁহার গা হাত পা টিপিয়া দিতেছিলাম। অনবধানতাবশত আমার হাতের নখ লাগিয়া তাঁহার গায়ের সামান্য একটু চামড়া উঠিয়া গেল। আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি হয়ত এইজন্য আমাকে বকিবেন। কিন্তু এই বিষয়ে কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তিনি অন্য একটি সেবককে বলিলেন, "এই জায়গায় একটু অ্যালকোহল (alcohol) লাগাইয়া দাও।" আর আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "অসুখে আমার শরীরটা একেবারে পচে গেছে!"

ডাক্তারের পরামর্শমত এই সময় হরি মহারাজ ঠাণ্ডা শরবতাদি পান করিতেন। বাদাম ও পেস্তা বাটিয়া এবং উহার সঙ্গে গোলমরিচ গুঁড়া করিয়া

মিশাইয়া শরবত প্রস্তুত হইত। তখন আমিই উক্ত প্রকারে তাঁহার জন্য পানীয় তৈয়ার করিতাম। একদিন উহা খাইয়া বলিলেন, "আজকে বুঝি যথেষ্ট গোলমরিচ দাওনি! মন দিয়ে কাজ কর না?" আমি যথাসাধ্য ভালরূপেই শরবত প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল। তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "এই সামান্য ব্যাপারেই মন খারাপ করে বসলে?"

হরি মহারাজের শারীরিক উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক হইতেছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর উত্তাপ দেখিবার জন্য ডাক্তার বলিয়াছিলেন। হরি মহারাজ আমাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "উত্তাপ লইবার সময় তোমাকে ডাকিব।" আমি ঘুমাইবার পূর্বে মনকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, "তিনি ডাকিলেই উঠিতে হইবে।" রাত্রি প্রায় একটার সময় হরি মহারাজ আমাকে ডাকিতেই আমি সজাগভাবে তাঁহার কাছে গেলাম এবং তাঁহার উত্তাপ লইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুমের আবেশ আছে নাকি?" আমি উত্তর দিলাম, "না, মহারাজ।" এইরূপ সত্বর সেবায় তিনি বিশেষ প্রীত হইলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে আবার বলিলেন, "এজন্য যেন গর্ববোধ করো না।"

একদিন সকালে দেখিলাম, যে সেবকটিকে তিনি খুব বকিতেন সে বৃষ্টির জন্য মাথায় কম্বল চাপা দিয়া সেবাশ্রমের অফিসের দিকে যাইতেছে। অনেক সময় কাটিয়া গেল, কিন্তু সে ফিরিল না। হরি মহারাজ তাহার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "দেখ দেখি ছেলেটি কোথায় গেল। সেকি অন্যত্র চলিয়া গেল, না আত্মহত্যা করিল? তার জন্য মনটা খুব চিন্তিত। তুমি আর কাউকে নিয়ে তাকে খুঁজে বের করে সঙ্গে করে নিয়ে এস।" এই উক্তি হইতে বোঝা যায়, তিনি সেবককে কত ভালবাসিতেন এবং তাহার কত মঙ্গল কামনা করিতেন। আমি অন্য দুই-তিন জনের সহিত তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে গঙ্গার ধারে গেলাম। সেখানে দেখি উক্ত সেবকটি গঙ্গার ঘাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া ধ্যান করিতেছে। তাহার দুঃখের কারণ আমি জানিতাম। তাই তাহাকে আরও কিছুক্ষণ মনের শান্তিতে বসিয়া থাকিবার অবকাশ দিয়া

সেবাশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। হরি মহারাজের স্নানের সময় হইয়াছে, আমাকে তাঁহার কাছে থাকিতে হইবে। ঘাটস্থ অন্যান্য সাধুকে বলিয়া আসিলাম, সেবককে সঙ্গে করিয়া হরি মহারাজের কাছে আনিতে। আমাকে সেবাশ্রমে একাকী ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায়?" আমি সব সংবাদ দিলাম। আমার উপর তাঁহার আদেশ ছিল সেবককে সঙ্গে করিয়া আনিবার। আমি তাহা না মানিয়া নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া সেবককে গঙ্গাতীরে অন্য সাধুদের নিকট রাখিয়া আসিলাম; ইহাতে হরি মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আমাকে ভীষণভাবে বকিতে লাগিলেন। আমি বিষণ্ন হইয়া পড়িলাম। তাহা দেখিয়া তিনি খুব শান্তভাবে ইংরেজিতে বলিলেন, 'Don't you feel nervous!' (ভয় পাইও না)। আমি যেই নিজেকে একটু সামলাইয়া লইলাম আবার তাঁহার ভর্ৎসনাবর্ষণ আরম্ভ হইল। আমি তো এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক! বাহিরে তাঁহার যে রাগের ভাব ছিল তাহা উপর উপর, তাহার পশ্চাতে ছিল সুগভীর শান্ত ভাব। ইহা দেখিয়া তাঁহার বকুনির জন্য আমি আর দুঃখিত হইলাম না। সেবকটি কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল। হরি মহারাজ আমাদের সকলের ওপর, বিশেষত তাহার ওপর, অশেষ করুণা দেখাইলেন।

ধর্মজীবনের প্রথমেই বেদান্তশাস্ত্র রীতিমত প্রণালীবদ্ধভাবে পড়িবার ইচ্ছা হয়। কি কি গ্রন্থ পড়া উচিত সে সম্বন্ধে হরি মহারাজকে পত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি ৫।৫।১২ তারিখ কনখল হইতে আমাকে লিখিয়াছিলেন—"বেদান্ত সম্বন্ধে উপনিষদ্, গীতা ও শারীরক ভাষ্যই প্রস্থানত্রয়। ইহাতেই বিশেষ গতি থাকার প্রয়োজন, প্রকরণগ্রন্থও অনেক। সকল পুস্তক দেখা কঠিন। পঞ্চদশী, যোগবাশিষ্ঠ, বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থও খুব প্রসিদ্ধ। পঞ্চদশী বেশ ভাল করিয়া পড়িলে অদ্বৈতমতের মোটামুটি তথ্য বেশ ভাল জানা যায়। সর্বোপরি সাধনার বিশেষ অপেক্ষা। বেদান্তে—অনুভূতিই আসল। তাহা সাধনসাপেক্ষ। পঠন তাহার সহায়ক মাত্র।"

আর এক পত্রে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "আমার খুবই মনে হয় আমরা

চারিদিকে গণ্ডি কাটিয়া নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখি এবং তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ বন্ধ করি।" তদুত্তরে তিনি কনখল হইতে ২৫।৩।১২ তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন—"তুমি আপন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ আমার বোধ হয় রোগনির্ণয়ে তাহা ঠিকই হইয়াছে। শুধু যে উহা তোমারই পক্ষে সত্য তাহা নহে, উহা সকলের পক্ষেই একরূপ। গণ্ডি কাটিয়াই আমরা আমাদের উন্নতির পথ প্রতিরোধ করি। অবশ্য গণ্ডির আবশ্যক নাই, এরূপ কহিতেছি না। তবে কখন আবশ্যক আছে, কখন নাই—ইহা জানা খুব আবশ্যক। গীতায় (৬। ৩) আছে—

আরুরুক্ষোঃ মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥[১] ইত্যাদি

যাহা একবার যত্ন করিয়া আবাহন করিতে হয় তাহারই আবার সময়ান্তরে বিসর্জন অত্যাবশ্যক হয়। অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ—এই আর কি। তবে ইহা ঠিক করা বড়ই কঠিন সন্দেহ নাই। প্রভুর হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে আর কিছুরই জন্য অনুশোচনা করিতে হয় না, ইহা নিশ্চয়। প্রভুর কৃপায় সকলই ঠিক হইয়া যাইবে, ভাবনা নাই। ভগবচ্ছরণম্, ভগবচ্ছরণম্।"

অন্য পত্রে আমি এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম ঃ "বীজমন্ত্রের ঠিক ঠিক অর্থ কি? বেদোপনিষদে প্রণব ছাড়া অন্য মন্ত্র দেখি না। তদুপরি ইহাও শুনি যে, অন্যান্য যেসব বীজমন্ত্র আছে তাহাদের উদ্ভব প্রণব হইতে। বিশেষ বিশেষ বীজমন্ত্র যদি জপ করা যায় তাহা হইলে সাধকের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে সেগুলি প্রণবে লীন হইবে কি?" তদুত্তরে তিনি আমাকে কাশী হইতে ২০।১১।১২ তারিখে লিখিয়াছিলেন, "যেমন বীজে বৃক্ষের ভাবী উৎপত্তি ও বৃদ্ধি এবং ফুলফলাদির সম্ভাবনা নিহিত থাকে, সেইরূপ যে শব্দসহায়ে সাধকের আধ্যাত্মিক

---

১ যে মুনি যোগারূঢ় হইতে ইচ্ছুক তাঁহার পক্ষে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক আর যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন তাঁহার কর্মত্যাগ প্রয়োজন।

উন্নতির শক্তি উৎপন্ন হইয়া তাহাকে চরম উৎকর্ষপ্রাপ্তি করায়, তাহাই বীজমন্ত্র। মহাজন বলিয়াছেন—

মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে ভক্তিবারি তায় সেঁচ না।
আপনি যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা ॥
কালীনামে দেও রে বেড়া মন, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না ॥"

মানব-জমি, গুরুদত্তবীজ, বীজরোপণ, ভক্তিজল-সেচন আর কালীনামের বেড়া দেওয়া—এইরূপে সাধন করে আপনাকে পর্যন্ত নিবেদন—এই হলো সঙ্কেত। ঠাকুর বলতেন, 'রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা।' এর মানে অহংবুদ্ধি—আমি রামপ্রসাদ অথবা অমুক—এ পর্যন্ত ভুলে যাওয়া। একেবারে তন্ময়ত্বলাভ করা, এই হলো সাধনের পর্যবসান। ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রকাশিত মূর্তি মাত্র—ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত—সাধকের অভীষ্টপূরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত। সুতরাং বীজও ভিন্ন ভিন্ন হইবে না কেন? তন্ত্রশাস্ত্রে এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবে।

"সমস্ত হিন্দুমত এক বেদকেই আশ্রয় করিয়া (স্থিত) আছে। সুতরাং কোন মতই অর্থাৎ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি কিছুই অবৈদিক নহে। ইহাদের সকলেরই ভিত্তি বেদে। সাধকের বুঝিবার সুবিধার জন্য কেবল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঋষিরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও সাধনপদ্ধতি বাঁধিয়া দিয়াছেন, এই মাত্র। শাস্ত্র প্রণেতারা বলেন, বেদেই তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের উল্লেখ আছে। আমরা সমস্ত বেদ না পড়িয়া 'ওসব বেদে নাই' এইরূপ বলিলে অন্যায় করিব, সন্দেহ নাই। শব্দমাত্রই যেমন প্রণবসম্ভূত, তখন সমস্ত বীজই যে প্রণবাত্মক, তাহাতে আর কথা কি? অনাহত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, শুনিয়াছি। বীজমন্ত্রও জ্যোতিঃ—অক্ষরে দৃষ্ট হয় ও কখনো কখনো শ্রুতও হইয়া থাকে। বীজ প্রণবে মিলিত হইয়া যায় কিনা জানি না। তবে মন্ত্র ও দেবতা অভেদ, ইহা শুনিয়াছি। মন্ত্র যেন দেবতার শরীরের

অধিষ্ঠানস্বরূপ। এসব ব্যাপার কেবল জিজ্ঞাসা করিয়া সিদ্ধান্তিত হয় না, সাধন করিতে হয় এবং গুরুকৃপায় ক্রমে উপলব্ধ হইয়া থাকে। ঠাকুরের কথা—'সিদ্ধি সিদ্ধি' বলিলে নেশা হয় না। সিদ্ধি আনিয়া তাহাকে ধুইতে, পরে বাটিতে হয়, তৎপরে পান করিলে তবে নেশা হয়। তখন 'জয় কালী', 'জয় কালী' বলে আনন্দ কর। শাস্ত্রেও বলিয়াছেন, হেতুনিষ্ঠ হওয়া ভাল নহে। অবশ্য বুঝিবার জন্য কিছু কিছু প্রশ্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধন করিতে করিতেই ক্রমে সকল আপনিই উপরত হইয়া যায়। সাধন বিনা প্রশ্নের বিরাম অসম্ভব।

"প্রশ্নও যেমন ভিতর হইতে হয় সেইরূপ সাধন দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় হইলে, তবে ভিতরেই সকল সন্দেহের অবসান হইয়া যায় এবং ইহারই নাম শান্তি বা বিশ্রান্তিলাভ। ভগবৎকৃপায় যাহার হয় সেই-ই জানিতে পারে। নচেৎ প্রশ্ন করিয়া কোনকালে কাহারো সেই অবস্থা লাভ হয় না। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ'[১] ইত্যাদি শত শত শাস্ত্রবচন ইহার প্রমাণ। লেগে যাও খুব, প্রভুর কৃপা হবেই। তখন 'জয় কালী' 'জয় কালী' বলিয়া কেবলি আনন্দ করিবে।"

আমি পত্রে হরি মহারাজকে অনেক প্রশ্ন করিতাম। উদ্ধৃত পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "হেতুনিষ্ঠ হওয়া ভাল নহে। অবশ্য বুঝিবার জন্য কিছু কিছু প্রশ্ন করা যাইতে পারে ইত্যাদি।" ইহার পরবর্তী পত্রে কোন প্রশ্ন করি নাই। শুধু লিখিয়াছিলাম, "সমাধি না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহ দূর হইবে বলিয়া মনে হয় না।" ইহার উত্তরে তিনি কাশী হইতে ২।১।১৩ তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "এবার কোন প্রশ্ন কর নাই। ঠিক বলিয়াছ, যতদিন সমাধি না হয় ততদিন সন্দেহের সম্পূর্ণ অবসান হয় না। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বিনা পড়িয়া বা শুনিয়া ঠিক ঠিক নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। তবে বিচারের দ্বারা অনেক উপলব্ধি হয়। শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রপাঠ অনেক সাহায্য করে। সৎসঙ্গের তো কথাই নাই।"

---

১ এই আত্মাকে বেদাধ্যাপনা দ্বারা লাভ করা যায় না।—কঠোপনিষদ্-১।২।২৩ বা মুণ্ডকোপনিষদ্-৩।২।৩

জীবন্মুক্তি লাভ করিতে হইলে পুরুষকার বা ভগবৎকৃপা কোন্‌টির উপর অধিক নির্ভর করিতে হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে কাশী হইতে ২০।২।১৩ তারিখে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, "মানুষ যন্ত্রমাত্র, প্রভুই যন্ত্রী। ধন্য সেই যাহার দ্বারা তিনি আপন কার্য করাইয়া লন। সকলকে এই সংসারে কার্য করিতে হয়, না করিয়া কাহারও যাইবার যো নাই। তবে যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্ম করে, তাহার কর্ম তাহাকে পাশ হইতে মুক্ত না করিয়া বন্ধন ঘটায়। আর তাঁহার জন্য কাজ করিয়া কুশলী পুরুষ কর্মপাশ ছিন্ন করিয়া থাকে। আমি নই, তিনিই কর্তা—এই বোধে পাশ ছিন্ন হয়। আর ইহাই অতিশয় সত্য। 'আমি কর্তা'-বোধ ভ্রান্তিমাত্র। কারণ 'আমি'কে খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। 'কে আমি' বিচার করিলে ঠিক ঠিক 'আমি' তাঁহাতেই পর্যবসিত হয়। দেহ-মন-বুদ্ধি এ সকলে 'আমি'বোধ অবিদ্যা-কল্পিত ভ্রান্তিমাত্র। শেষ পর্যন্ত টেকে কই? কিছুই তো আর বিচারে থাকে না। সব চলে যায়, থাকে মাত্র এক সত্তা, যাঁহা হইতে সমস্ত নির্গত হইতেছে, যাঁহাতে সমস্ত স্থিত এবং অন্তে যাঁহাতে সব লীন হয়। সেই সত্তাই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, অহংপ্রত্যয়সাক্ষী, আবার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী, অথচ নির্লিপ্ত বিভু। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই জগৎ-যন্ত্র তাঁহার শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। লীলাময় তাঁহার লীলা দেখিতেছেন ও আনন্দ করিতেছেন। যাহাকে তিনি বুঝাইতেছেন, সেই বুঝিতেছে। অন্যে বুঝিয়াও বুঝিতেছে না, আপনাকে তাঁহা হইতে ভিন্ন ভাবিয়া মুগ্ধ হইতেছে। এই তাঁহার মায়া। তাঁহার শরণাগত হইয়া কর্ম করিলে এই মায়া অপগত হয়। কর্তা বোঝে যে, সে কর্তা নহে, যন্ত্রমাত্র। ইহার নাম করিয়াও না করা। ইহাই অকর্তানুভূতি, ইহাই জীবন্মুক্তি। এই জীবন্মুক্তিসুখ ভোগ করিবার জন্যই আত্মার দেহধারণ। নতুবা নিত্যমুক্ত আত্মার সংসারকামনা করিয়া জন্মগ্রহণ কোনরূপেই সঙ্গত হয় না। এই দেহ থাকিতেও অদেহবোধলাভ করাই মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য। ইহা লাভ করিতে পারিলেই মানুষ কৃতার্থ হয়। প্রভুর নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা—এই জীবনেই যেন আমরা তাঁহার কৃপায় সেই জীবন্মুক্তিসুখ লাভ করিতে পারি। এই জীবনই যেন আমাদের শেষ জীবনধারণ হয়। অর্থাৎ আর যেন আপনার স্বার্থসাধন জন্য দেহ ধরিতে না

হয়। তাঁহার জন্যই যেন আমাদের জীবন, অন্য কিছুর জন্য নহে—এই ধারণা, বিশ্বাস, অনুভূতি এই জীবনেই বদ্ধমূল হয়। প্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। জয় শ্রীগুরু মহারাজকী জয়।"

আমাদের এক গুরুভ্রাতা পূর্বে সঙ্ঘে যোগ দিতে একবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হয় নাই। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিয়া সে সফলকাম হয় এবং মাদ্রাজ মঠে যাইয়া সঙ্ঘে যোগদান করে। তখন তাহার সম্বন্ধে আমি মাদ্রাজ হইতে হরি মহারাজকে লিখিয়াছিলাম। তিনি কনখল হইতে ১৪।৫।১৩ তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "তাহাকে আমাদের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানাইবে। গীতায় (৬।৫) আছে—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥

তাঁহাকে মনে করাইয়া দিবে—

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতাচ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রো দারং ন জ্ঞাতিঃ ধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥

ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে বলিবে। প্রভু তোমাদের সহায়। কোন চিন্তা নাই, সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। খুব দৃঢ়, খুব অনুরক্ত থাকিবে। কোন ভয় নাই।"

অনেকদিন হরি মহারাজকে চিঠি দিতে পারি নাই। তৎপরে একখানি পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, সাধুজীবনে এ পর্যন্ত বিশেষ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। তাই নিরানন্দে দিন কাটিতেছে। তদুত্তরে তিনি আলমোড়া হইতে ২৭।৭।১৫ তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "যদি ভগবানলাভ হইল না বলিয়া সত্যসত্যই নিরানন্দ বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার শুভদিনের সমুদয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যত এইরূপ বোধ ঘনীভূত হইবে ততই প্রভুর কৃপা সন্নিকট জানিবে। আর যদি অন্য কোন বাসনা অভ্যন্তরে থাকিয়া এইরূপ নিরানন্দ ভাব সৃষ্টি করে, অবিলম্বে তাহাকে মন হইতে দূরে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিবে। কোনমতে অবহেলা করিবে না। কারণ উহাই পরমার্থপথে প্রধান

পরিপন্থী জানিবে। সর্বদা যোগ্যতা লাভ করিবার প্রযত্ন করিবে। তাহা হইলেই ভগবান প্রসন্ন হইয়া সকল সুখের অধিকারী করিয়া দিবেন। 'গুরুকে ঘরমে গৌ জ্যায়সে পড়া রহনা,' ইহাই স্বামীজী কোন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের[১] নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ উহা শুনাইয়াছিলেন। আর একটি পরম হিতোপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এই—'গুরুভাইকো গুরু জ্যায়সা জাননা।' প্রভুর দ্বারে পড়িয়া থাকাই আসল কাজ। পড়িয়া থাকিতে পারিলে তাঁহার দয়া হইবেই হইবে। নিরানন্দ ঘুচিয়া মহানন্দ দেখা দিবে। আমাকে তিনি তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকিতে দিলেই তাঁহার মহাকৃপা। যিনি উহা উপলব্ধি করিতে পারেন তিনি শীঘ্রই প্রভুর পূর্ণ কৃপা লাভ করেন, সন্দেহ নাই। সমস্ত প্রাণমন দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে চেষ্টা করিবে। আপনার আনন্দ-নিরানন্দ-সন্ধান কেন? তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি যেমন রাখেন তাহাই মঙ্গল—এই ভাব যাহাতে হৃদয়ে বদ্ধমূল ও সদা জাগরিত থাকে তাহার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিবে। তাহা হইলেই সকল মঙ্গল হইবে।"

আমাদের কোন কোন সাধুভ্রাতা বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট সন্ন্যাস লইয়া মাদ্রাজ মঠে ফিরিয়া যান। হরি মহারাজ তখন আলমোড়ায় ছিলেন। সাধুদের সন্ন্যাসগ্রহণের সংবাদ তাঁহাকে পত্রে আমি জানাইয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি ২১।৪।১৬ তারিখে আমাকে লিখিয়াছিলেন, "তাহারা সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, ঠিক ঠিক উহা পালন করিয়া মনুষ্যজীবন ধন্য করিবার শক্তি যেন তিনি দেন; নতুবা শুধু নামে সন্ন্যাস লইলে যথেষ্ট হয় না। সন্ন্যাস বড় কঠিন সমস্যা। ঠাকুর বলিতেন, 'যাহারা গাছের উপর হইতে হাত পা ছাড়িয়া পড়িতে পারে তাহারাই সন্ন্যাসের অধিকারী।' বড় সোজা কথা নয়। সম্পূর্ণ ভগবানে নির্ভর না হইলে আর ওরূপ করা সম্ভব হয় না।"

পূজনীয় হরি মহারাজ সর্বদা তাঁহার অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাব দ্বারা আমাদের সম্মুখে সাধুজীবনের উচ্চ আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়া রাখিতেন এবং

---

১ গাজীপুরের পওহারী বাবা।

সেইরূপেই আমাদিগকে উপদেশ ও প্রেরণা দিতেন। একদিন আমরা অনেকে সারনাথদর্শনে গিয়াছিলাম। সেখানকার অশোকস্তম্ভ, স্তূপ এবং যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীন স্মৃতিদ্রব্যাদি (relics) দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া সোৎসাহে হরি মহারাজের নিকট সব বলিতে লাগিলাম। তিনি সব শুনিয়া শেষে বলিলেন, "তোমাদের বেশ একটা 'চকড়বা' হয়ে গেল।" এই বাক্যে তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন—"ঘোরাঘুরি প্রভৃতি মানসিক অস্থিরতার ফলেই হয়। মন স্থির হইলে একস্থানে বসিয়া ভাগবত আনন্দলাভ করা যায়। নানাস্থানে ছুটাছুটি করিবার আর প্রয়োজন থাকে না।"

একদিন তিনি নিজের অবস্থা সম্বন্ধে বলিলেন, "গভীর ধ্যান করছি। এক পা এগুলেই ব্রহ্মে লীন হয়ে যাই। কিন্তু ঠাকুর আমাকে তা করতে না দিয়ে টেনে আনলেন। তিনি তাঁর লীলার জন্য নূতন recruitও (সেবকগ্রহণও) করেন।" কোন কোন সাধককে বিলীন হইতে না দিয়া ভগবান জগতের কল্যাণার্থ ভগবদ্ভাবে বিভোর বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাখিয়া দেন। ইঁহারা সমাধির আনন্দ ত্যাগ করিয়া নানাভাবে জগতের কল্যাণসাধনে ব্যাপৃত হন। স্বামী তুরীয়ানন্দ সেইপ্রকার মহাপুরুষই ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ঠাকুর হরি মহারাজ সম্বন্ধে বলিতেন, "সে গীতোক্ত যোগী।" শাস্ত্রে সিদ্ধপুরুষের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা হরি মহারাজের জীবনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের দিব্যজীবন এবং অনুভূতিপ্রসূত উপদেশ সাধককে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইতে প্রেরণা দেয়। তাঁহার অলৌকিক জীবন ও অমৃতবাণী পড়িয়া পাঠক-পাঠিকার পরমার্থকল্যাণ হউক—এই প্রার্থনা।

(উৎস ঃ স্বামী তুরীয়ানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়)

স্বামী তুরীয়ানন্দের কথাসংগ্রহ

স্বামী রাঘবানন্দ

[শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) বাল্যকাল হইতেই কঠোর তপস্বী। গীতা ও বেদান্তের ভাবগুলি দৈনন্দিন জীবনে কার্যে পরিণত করাই ছিল তাঁহার সাধনা। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজী তাঁহাকে বলেন, "হরি ভাই, ঠাকুরের কাজে তিলে তিলে আমি আমার জীবন দিচ্ছি, তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করবে না?" গুরুভ্রাতার এই আবেদনে স্বামী তুরীয়ানন্দ নির্জন সাধনা স্থগিত রাখিয়া স্বামীজীর সহিত ইংলন্ড হইয়া আমেরিকায় উপস্থিত হন। 'বেদান্তের জীবন্ত মূর্তি'—তুরীয়ানন্দের এই পরিচয় স্বামীজী দিয়াছিলেন আমেরিকাবাসীদের নিকট। বেদান্ত-প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়া স্বামীজীরই নির্দেশে আমেরিকায় প্রথম নির্জন সাধনার কেন্দ্র ক্যালিফর্নিয়ার 'শান্তি-আশ্রম' স্থাপন স্বামী তুরীয়ানন্দের এক অপূর্ব কীর্তি। পাশ্চাত্যে বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে আত্মজ্ঞানলাভে উদ্বুদ্ধ করিয়া ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং উত্তর ভারতের নানাস্থানে নির্জন তপস্যায় কিছুকাল অতিবাহিত করেন। পরে কয়েক বৎসর আলমোড়া শহরে অবস্থান করিয়া নিগূঢ় আধ্যাত্মিক আলোচনা ও স্বীয় জীবনাদর্শ দ্বারা বহু জিজ্ঞাসু ভক্ত ও আশ্রমস্থ সন্ন্যাসিগণকে ধর্মজীবনে অনুপ্রাণিত করেন। যাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহাদের পক্ষে সহায়ক হইবে ভাবিয়া আমরা তাঁহার অমূল্য কথাগুলির কতকাংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতেছি। উঃ সঃ]

মোহনলাল সাহার বাটি, চিল্কাপেটা, আলমোড়া
৭ জুন, ১৯১৫

স্বামী শিবানন্দ—হাজার সমাধি ও ধ্যান হোক না, তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধটা যেন থাকে; এটা যেন না যায়, আর তা না হলে দেহ যাক।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—এ বলতেই হবে, 'দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽহং জীববুদ্ধ্যা অংশোঽহং আত্মবুদ্ধ্যা সোঽহম্।' যে মানুষ গলায় কাঁটা ফুটলে বেড়ালের পায়ে পড়ে, সে ভগবানকে মানবে না?

'কথামৃত' পাঠ হইতেছে।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আহা! দক্ষিণেশ্বর যেন কৈলাস ছিল। সকাল থেকে একটা পর্যন্ত ঠাকুরের কাছে অনবরত ভগবৎপ্রসঙ্গ হচ্ছে, আর লোক বসে আছে। Atmosphere-এ (আবহাওয়াতে) ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। যা ফষ্টিনষ্টি তাও তাই নিয়ে। প্রসঙ্গ-শেষে তাঁর সমাধি হচ্ছে। তিনি কেবল খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করতেন অল্প সময়ের জন্য। তাছাড়া সব সময় ভগবৎপ্রসঙ্গ। সন্ধ্যাবেলা কালীঘরে গিয়ে মাকে দর্শন ও ব্যজন করতেন ও খুব নেশার মতো (ভাবস্থ) হয়ে টলতে টলতে ফিরে আসতেন। যারা সাধন-ভজন করত তাদের জিজ্ঞাসা করতেন, 'হ্যাঁ রে, সকাল সন্ধ্যা কি একটু নেশার মতো হয়?' রাত্রে তাঁর ঘুম তো ভারি! একটু পরেই উঠে পড়তেন। যারা তাঁর ঘরে থাকত, তাদের 'ওরে এত ঘুম কিরে? ওঠ, ধ্যান কর' বলে উঠিয়ে দিতেন। তারপর একটু শুতেন, পরে ভোর হলেই উঠে পড়তেন ও মধুরকণ্ঠে ভগবানের নাম করতেন। তখন আর সকলে উঠে জপ-ধ্যান করতে লেগে যেত। তিনি মাঝে মাঝে কাউকে একটু সোজা করে বা উঁচু করে বসিয়ে দিতেন।

১০ জুন ১৯১৫

আত্মার সাক্ষাৎ কর। তার জন্য you have to ascend the highest peak of renunciation (ত্যাগের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে হবে)।

১১ জুন ১৯১৫

চিত্তকে সব জিনিস থেকে উপরত করা কি সহজ ব্যাপার? এটি বীরের কাজ। বাইরের জিনিস তো খালি মনের ভিতর প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে এবং জোর করে তোমায় পেড়ে ফেলতে চাইছে। মনের ভিতর কত রয়েছে—স্তবকের পর স্তবক। বাইরে চোখ কান বুজলে কি হবে?

১৩ জুন ১৯১৫

স্বামী তুরীয়ানন্দ—(বেড়িয়ে এসে) অমুক 'রাজযোগ' পড়ে তাড়াতাড়ি শেষ করতে চায়। আমরা ওতে প্রাণ বের করেছি। ছেলেবেলা থেকে তো ওই করছি। তবু কই চিত্তশুদ্ধি হলো? কই রাগ-দ্বেষাদি গেল? তব দাসঃ—দাসস্য দাসঃ কুরু মাং প্রভো! অভিমান কি ভাল? ভারি খারাপ। 'অভিমানং সুরাপানং', জ্ঞান হারিয়ে যায়। ঠাকুর বলতেন, "নিচু জায়গায় জল জমে।" সব গুণ 'সুনীচ' জনে প্রকাশ পায়। "শুষ্কং কাষ্ঠং মূর্খবৎ বিদ্যতে, ন তু নমতে।" অহংকার ঘাড় উঁচু করে রাখে। যেটা steel (ইস্পাত)-এর মতো elastic (নমনীয়) অথচ ভাঙবে না, সেটাই strength (শক্তি)। সেই রকম যে compromising (আপোসী), অনেক লোকের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারে, সেই strong (শক্তিমান)। তাঁর (ঈশ্বরের) হয়ে গেলে আর কি ভয়? স্বামীজী বলতেন, "যদি জন্মালে, একটা দাগ রেখে যাও।" বরাহনগর মঠে বলেছিলেন, "দেখবি আমাদের নাম historyতে (ইতিহাসে) পর্যন্ত উঠবে।" যোগীন স্বামী প্রভৃতি ঠাট্টা করতে লাগলেন। স্বামীজী বললেন, "যা শালারা, পরে দেখবি। আমি বেদান্ত সকলকে convince করাতে (বুঝিয়ে দিতে) পারি। তোরা না শুনিস, আমি হাড়ি-পাড়ায় গিয়ে শুনাব।"

প্রচার করতে হলে কিছু দেওয়া চাই। এ তো ক্লাশ পড়ানো বা বই পড়ানো নয় যে পড়িয়ে যাবে, কিছু দিতে হবে না। সেইজন্য আগে কিছু জমাতে হবে, পরে প্রচার। "আমি কিছু রিপু দমন করেছি" বলে অহংকার করতে নেই। তখনই তারা জেগে উঠবে। বলতে হয়, "হে ভগবান, আমায় ওসব থেকে রক্ষা কর।"

"ধ্যান-বিঘ্নানি" চারটি। যথা—লয়, বিক্ষেপ, কাষায় ও রসাস্বাদ। "লয়ে" মন enters into (প্রবেশ করে) তামস—ঘুমিয়ে পড়ে, consciousness (বাহ্যজ্ঞান) থাকে না। বেশিরভাগ লোকই এতে আটকে যায়। "বিক্ষেপে" মন নানা বিষয়ে ছড়িয়ে পড়ে। "কাষায়ে" ধ্যান করা তিক্ত বোধ হয়, ভাল লাগে না। তখনও persist (জেদ) করতে হয়, আবার মনকে ধ্যানে লাগাতে

হয়। "রসাস্বাদে" কোন ভগবৎরূপে আনন্দ বোধ হয়, মন আর উপরে উঠতে পারে না। শম হচ্ছে equilibrium, balance of mind (মনের সাম্যাবস্থা)। "শমং প্রাপ্য ন চালয়েৎ।" যতদিন শরীর থাকে ততদিন রিপু থাকে। তবে তাঁর কৃপায় তারা দেবে থাকে, মাথা তুলতে পারে না।

১৫ জুন ১৯১৫

"খালি কাজ করলে কি হবে? ভাব ব্যতীত ও তো মুটেগিরি; drudgery (মুটেগিরি)-তে অভাব 'স্নেহের'—যার দ্বারা মাখবে। উপনিষদে আছে, স্তব্ধ অনুস্যূত—একেবারে গুম হয়ে রয়েছে।"

১৬ জুন ১৯১৫

'কথামৃত' পড়া হলো। এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন ঃ কাজের দ্বারা যে তাঁকে পাওয়া যায়, তা নয়। তবে কাজ করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাঁর জন্য ব্যাকুলতা আসে। সেই ব্যাকুলতা হলে তাঁর কৃপা হয়। তখন তাঁর দর্শন হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—অমনি একটু পড়লে, একটু ধ্যান করলে কি তাঁকে পাওয়া যায়? তাঁর জন্য ব্যাকুল হওয়া চাই, প্রাণ আটুপাটু করবে। ঠাকুর আমাদের বলেছিলেন, "দেখ, আমার ব্যাকুলতা ছিল বলে মা সব জোগাড় করে দিলেন। এই কালীবাড়ি ও মথুরবাবু—জুটে গেল। এখানে (হৃদয়ে) ব্যাকুলতা থাকাই আসল। তাহলে সব জুটে যায়।" ভক্তি ছাড়া উপায় কই?

স্বামী শিবানন্দ—আবার কি? তাঁর পাদপদ্ম ধ্যান করতে বসলে ইন্দ্রিয় সব অন্তর্মুখী হয়ে যায়, মন গিয়ে তাঁতে তন্ময় হয়। রামপ্রসাদের কথা, ভক্তি সবার মূল। রামপ্রসাদ ঠাকুরের ideal (আদর্শ)। ঠাকুর বলেছিলেন, "রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমায় দেখা দিবিনে?" ঠাকুরের এবার শিক্ষাই হচ্ছে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

২০ জুন ১৯১৫

স্বামী তুরীয়ানন্দ—(স্বামী শিবানন্দের প্রতি) "যখন হরি বলতে ধারা বইবে,

এমন দিন কবে বা হবে!” আপনার কি কান্না পায়? কি অবস্থা বলুন দেখি, হরিনাম করতেই অশ্রু পড়বে!

স্বামী শিবানন্দ—ঠাকুরের কাছে যখন যেতাম খুব কান্না পেত। একদিন রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে পোস্তার ওপর দিয়ে (বকুলতলার কাছে) খুব খানিকটা কাঁদলুম। ঠাকুর এদিকে জিজ্ঞাসা করছেন, তারক কোথায় গেল! তারপর যখন তাঁর কাছে ফিরে গেলাম, ঠাকুর বললেন, “ব্যস। দেখ, শ্রীভগবানের কাছে কাঁদলে তাঁর ভারি দয়া হয়। আর জন্মজন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুরাগ-অশ্রুতে ধুয়ে যায়। তাঁর কাছে কাঁদা খুব ভাল।”

—আর একদিন পঞ্চবটীতে বসে ধ্যান করছি, খুব জমেছে। এমন সময়ে ঠাকুর ঝাউতলার দিক থেকে আসছেন। যেই তিনি আমার দিকে চেয়েছেন, অমনি হু হু করে কান্না পেল। ঠাকুর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, আর আমার বুকের ভিতর সুড়সুড় করে উঠল এবং আমার এমনি কাঁপুনি হলো যে, তা আর থামে না। ঠাকুর জনান্তিকে বলছেন, কান্না এমনি এমনি নয়, এ একটা ভাব হয়েছে। একটু পরে তাঁর সঙ্গে গিয়ে তাঁর ঘরে বসলাম, তিনি কিছু খেতে দিলেন। কুণ্ডলিনী জাগরণ টাগরণ তাঁর হাতের ভিতর ছিল; না ছুঁয়ে কেবল কাছে দাঁড়িয়েই করে দিতেন!

২১ জুন ১৯১৫

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামীজী যেখানে “আমি” বলছেন, সেখানে সেই তাঁর সঙ্গে এক হয়ে বলেছেন। মানুষ নিজে সুখী হবার জন্য কত চেষ্টা করছে। কিন্তু তিনি না কৃপা করলে কি কিছু হয়? Freedom (স্বাধীনতা) এক আছে, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে থাকা। আর এক প্রকার হচ্ছে, তাঁর শরণাগত হয়ে থাকা। তা থেকে আলাদা হয়ে Freedom of will (ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য) কখনও নেই। আমি “যদু”—এইটার ওপর বিশ্বাস নিজেকে ডুবাবার একটি উপায়। আমি সব জানি, এ ভাবটা বড় খারাপ। আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয় মানে সেই পরমাত্মার ওপর বিশ্বাস। “আমি যা আছি তা আছি। আমি যা বুঝেছি, আমায় কেটে

ফেল, মেরে ফেল, তবুও কিছু বদলাচ্ছি না।”—নিজেকে এইরূপ important (বড়) ভাবা খুব খারাপ।

—কথার ঠিক ঠিক জবাব দেবে। যে কথাটা “হাঁ” বলবে সেটা “হাঁ” হয়ে যাবে। একটার জন্য তিন চারটে কথা বলবে কেন? সাধুর সরলতা থাকবে, সাধু বালকের মতো হয়ে যাবে।

২২ জুন ১৯১৫

ভালবাসার শক্তি চাই। আমরা ছেলেবেলায় কি ভালবাসতুম—উন্মত্তের ন্যায়! ভাইদের প্রতি এত ভালবাসা ছিল যে, সন্ন্যাসী হয়ে তাদের ছাড়তে হবে বলে কাঁদতুম। তারপর ঠাকুর সব পটপট করে কেটে দিলেন। ঠাকুর শ—কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “তুই কাকে ভালবাসিস?” সে বলল, “মহাশয়, আমি কাউকে ভালবাসিনে।” ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বললেন, “দূর! শুকনো শালা।”

ঈশ্বর আছেন কিনা, এ সন্দেহ আমার কখনও হয় নাই।

২৪ জুন ১৯১৫

মানুষে মানুষ-বুদ্ধি থাকলে কখনও মুক্তি হবে না, ঈশ্বরবুদ্ধি থাকা চাই। একজন মহা উন্নত পুরুষ, জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি ঐশ্বর্যে বিভূতিমান—তাঁকে উপাসনা করলেও মুক্তি হবে না, যদি ঈশ্বর-বুদ্ধি না থাকে। ঐসব ঐশ্বর্য—জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণ তোমাতে আনতে পারে এই পর্যন্ত। কিন্তু যিনি স্বয়ং ঈশ্বরাবতার—তাঁকে যদি জানতে, অজানতে বা ভ্রান্তে উপাসনা করা যায়, তিনিই শেষে ঈশ্বরবোধ দিয়ে দেন। যেমন কৃষ্ণলীলায় শিশুপাল প্রভৃতির ‘দ্বিষান্ হৃষীকেশমপি’ (হৃষীকেশকে দ্বেষ করেও) ঊর্ধ্বগতি হয়েছিল। গোপীরা জারবুদ্ধি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে approach (বরণ) করা সত্ত্বেও শেষে তাঁদের তাঁতে ঈশ্বরবুদ্ধি হয়েছিল। এক গোপীকে তার স্বামী গৃহে বদ্ধ করে রেখেছিল। তখন বিরহ-দুঃখে তার পাপ নাশ হলো, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানানন্দে পুণ্য নাশ হলো এবং সে মুক্তি পেল।

প্রশ্ন—তবে যে বলে, "ঈশ্বর-জ্ঞান" চলে যায়, সে কি?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—যিনি ঈশ্বরদর্শনের পর অধিকতর নৈকট্য অনুভব করতে চান তিনি ঐশ্বর্য-জ্ঞান যত্নে পরিহার করেন। গোপীরা সাধারণ মানুষ নয়, তাঁদের ভাগবতী তনু।

* * *

বীর্যধারণ হচ্ছে প্রধান উপায়। আঠাশ বৎসর বয়সে বীর্য পরিপক্ক হয়। যে বীর্য ধারণ করতে পারে তার জ্ঞান ভক্তি সব হয়। কামের নাম মনসিজ। মনেতে কামের জন্ম হয়। যে বীর সেই পারে ইন্দ্রিয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং অতীন্দ্রিয় রাজ্যে যেতে।

Stubbornness (একগুঁয়েমি)-কে যদি strength (শক্তি) বল, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। Stubbornness (একগুঁয়েমি) দুর্বলতার একটা আবরণ। দুর্বল বলে বাইরে একটা stubborn (একগুঁয়েমি) ভাব রেখে দিয়েছে as a covering (আবরণরূপে)। Real strength (প্রকৃত শক্তি) সব দিকে যাবে, সব দিকে নুইবে; আবার নিজের strength regain (শক্তি পুনর্লাভ) করবে।

২৬ জুন ১৯১৫

বাবুরাম মহারাজ লিখেছেন, "আমরা অনুমানে নেই, বর্তমানে আছি।" কি জন্য সব ছেড়েছি, মধ্যে মধ্যে স্মরণ করতে হবে এবং নিজেকে test (পরীক্ষা) করতে হবে, ঠিক উন্নতির পথে যাচ্ছি কিনা।

২৭ জুন ১৯১৫

তাঁর (ঠাকুরের) দীক্ষা তো সামান্য ছিল না, একেবারে (কুণ্ডলিনী) জাগিয়ে দিতেন। আর একেবারে তরতর করে বুকের ভিতর যেন ঢেউ খেলত। আমায় বলেছিলেন, তুই অভিষিক্ত হবি? আমি বললাম, জানিনে। তিনি বললেন, তবে থাক। একদিন কালীঘর থেকে নমস্কার করে আসছি। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য

করে অন্যকে বললেন, "এর উঁচু শক্তির ঘর, যেখান থেকে নাম রূপ হচ্ছে।" মুমুক্ষুত্বটা আমার খুব এসেছিল। এ জীবনেই শেষ করতে হবে, এ ভাবটা আমার আজন্ম খুব ছিল। তা ঠাকুর ঘুরিয়ে দিয়েছেন। এখন শরীর থাকল বা গেল।

২৮ জুন ১৯১৫

আমরা এই চক্ষে দেখেছি, এই কর্ণে শুনেছি। স্বামীজীর উদ্দীপনা দেখে, ঠাকুরের এত উৎসাহ সত্ত্বেও ভাবতাম, এই জীবনে বুঝি কিছু হলো না! জীবন বুঝি বৃথা গেল! অর্থাৎ যা মনে করেছিলাম তা বুঝি হলো না! তারপর ঠাকুর সুসময় দিলেন। আমায় স্বামীজী তখন লিখেছিলেন ঃ ভুক্তং মানবিবর্জিতং পরগৃহে আশঙ্কয়া কাকবৎ। এই করে দিন কাটছে।

"দূসরা ন কোঈ।" তিনি সর্বস্ব—এইটি যখন বোধ হবে, সম্পূর্ণ নির্ভরতা হবে, তখন ঠিক। এখন খালি এটাতে ভরসা, ওটাতে ভরসা, ধন-জন-বিদ্যায় ভরসা। মহা মহা পণ্ডিতকেও দেখা গেছে, screw (স্ক্রু) একটু খারাপ হয়ে যেতেই পাগল হয়ে গেল। আমার ধন-জন, friends (বন্ধু-বান্ধব) আছে, এই ভাব থাকলে ঈশ্বরে নির্ভরতা আসে না। এই "অকিঞ্চনানাং নৃপস্তদ্ধনং বিদুঃ।" যখন তোমার এবং তাঁর মধ্যে আর কিছুই থাকবে না, তখন হবে। গোপীদের সব পাশ তিনি কেটে দিয়েছিলেন। শেষে তাঁদের খালি লজ্জা ছিল, তাও তিনি নিয়ে নিলেন। তিনি যখন দেখেন যে, কেউ তাঁর জন্য কিছু ছাড়তে পারছে না তখন তিনি নিজেই সেটা কেড়ে নেন।

> **"তুমি সব কেড়ে নাও আমায় কাঁদায়ে।**
> **যত কিছু নিভৃত হৃদয়ে রেখেছি লুকায়ে ॥"**
> **"যদি ভবে পার হবে, ছাড় বিষয়-কামনা।"**

ঠাকুর বলতেন, "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।" অর্থাৎ তাঁকে তোমার অন্তরাত্মা জেনে—তোমার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু জেনে তাঁকে ভক্তি কর। তাছাড়া যে ভক্তিতে "হে প্রভু! এই দাও, ঐ দাও"—ভাব, তা সকাম। এতটুকু কামনা বাসনা থাকলে পরাভক্তি লাভ হয় না।"

* * *

স্বামীজীর 'My Master' পড়া হলো। একস্থানে আছে ঃ Can a man sleep without struggling if he knows that God, the mine of infinite bliss, is near at hand। —কেউ যদি জানে যে, অনন্ত আনন্দের আকরস্বরূপ ঈশ্বর হাতের কাছে আছেন, সে কি তাঁকে পাবার চেষ্টা না করে ঘুমুতে পারে? এই দেখ, আমাদের 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করা একটা কথার কথা। খানিক ধ্যান করলাম বা খানিক জপ করলাম—এ তো কোন রকমে দিন কাটানো। তাঁর জন্য প্রাণ ফেটে যাবে, একটা মহা যাতনা উপস্থিত হবে, প্রাণ আটুপাটু করবে। তবে তো! তুলসীদাস বলেছেন, "অ্যায়সা গরিবকা ধাম, কব হোগা মেরা রাম?"

কামুক লোক একটা মেয়ে-মানুষকে পাবার জন্য কি রকম করে! তার পিছু পিছু কি রকম যায়! বিল্বমঙ্গল সাপ ধরে দেওয়ালে উঠছে! তাঁর হাতে সব না ছেড়ে দিলে কিছুই হবে না। এদিকে তাঁকে অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান বলছে, আবার তাঁর হাতে যেতে ভয়? রামও বলবে, আর কাপড়ও তুলবে? দ্রৌপদী যতক্ষণ না সব ছেড়ে তাঁকেই স্মরণ করলেন, ততক্ষণ তাঁর মনে হচ্ছিল কাপড় বুঝি ফুরুলো। তারপর অফুরন্ত কাপড়।

মনে করেছ, "কপট ভক্তি করে শ্যামা মাকে পাবে। এ ছেলের হাতে মোয়া নয় যে, ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে।" তাঁকে কি ঠকাতে পারবে? তিনি সব দেখছেন। "তুমি কর্তা, আমি অকর্তা। তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।" —এই ভাবটি the alpha and omega of religion (ধর্ম-জীবনের আদি ও অন্ত)। "I thy God am a jealous God." (Bible)—আমি হিংসুক ঈশ্বর। আর কিছু জিনিস যদি ভালবাসলে, তাঁর জন্য সব না ছাড়লে, কিছু রেখে দিলে—তাহলে তাঁকে পাবে না।

৩০ জুন ১৯১৫

তাঁকে কে চায়? কেউ নয়। নিজের দুঃখ নিবারণ করবে, স্ফূর্তি করবে, এইসব চায়। তাঁর প্রতি অহৈতুক ভক্তি হওয়া বড়ই দুষ্কর। একজন লোক

'নির্জন চাই, নির্জন চাই' করত; একদিন সে বলে, আর একটা বিয়ে করব নাকি?

১ জুলাই ১৯১৫

স্বামীজী যখন 'আমি' বলতেন, তখন সবটা নিয়ে যে 'আমি' সেই 'আমি' বুঝতেন। আমরা 'আমি' বললে এই দেহ-মন-ইন্দ্রিয় নিয়ে যে 'আমি' সেটা এসে পড়ে; সেইজন্য আমাদের বলতে হয়, দাস আমি, ভক্ত আমি। স্বামীজী 'আমি' বলতে উপাধি গ্রহণ করতেন না। তিনি পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে 'আমি' বলতেন। 'আমি' বললে তিনি মন-বুদ্ধির পারে চলে যেতেন। এইটা তাঁর প্রধান ভাব। এই ভাবে তিনি প্রধানত থাকতেন। আমাদের তা আসে না। আমরা তা থেকে আলাদা একটি হয়ে বসে আছি। সেইজন্য আমাদের 'তুমি' 'তোমার' বলতে হয়।

প্রশ্ন—সেই বড় 'আমি'টা আনবার জন্য তাদের দ্বৈত সাধন তাদের অদ্বৈত গ্রন্থাদি পড়া সঠিক কিনা?

উত্তর—ঠাকুর বলতেন, "অদ্বৈত ভাব আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।" যে ভক্ত 'তুমি' 'তোমার' করে, অর্থাৎ বলে, 'হে প্রভু, তুমিই সব, তোমারই সব,' তা থেকে আর অদ্বৈত তফাত কি? যে ভক্ত 'আমি' 'আমার' করে, তা থেকে আলাদা ভাবে, এ মহা অনিষ্টকর দ্বৈত। সে মহা মায়ায় পড়েছে, মোহগ্রস্ত হয়েছে।

ঠাকুর জপ করতেন—"নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ, দাসোঽহং দাসোঽহং।" ভক্তের পক্ষে 'আমি' 'আমার' ভাব একেবারে ত্যাজ্য। শ্রীরামপ্রসাদ মা-র সঙ্গে কত আবদার অভিমান করেছেন। এই রকম একটা জমাট-বাঁধা ভাব চাই, যেমন জল জমে বরফ হয়। তবে তো শ্রীভগবানের রূপ দর্শন হবে। গোপালের মা-র সঙ্গে সঙ্গে গোপাল কাঠ কুড়াতেন। রামলালা ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ফিরতেন।

* * *

ভাবই তো সব—সাকার বল আর নিরাকার বল—ভাবই আসল।

নলিনী লো, এ তো নহে পিরিতি বিধান।
গগনে তপন বঁধু, হেসে তারে তোষ শুধু,
মধুকরে কর মধু দান ॥

এদিকে ভগবানকে সর্বস্ব বলছ, আবার কি রকমে স্ত্রীসম্ভোগ হতে পারে?

প্রশ্ন—রাগদ্বেষাদি কি করে যায়?

উত্তর—রাগ (আসক্তি) দ্বেষ (বিরক্তি) কেন হতে দেবে? তুমি তো আর অপরকে নিগ্রহ করতে পারবে না? অতএব আত্মনিগ্রহ কর।

৩ জুলাই ১৯১৫

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই চারেতে মানুষ পশুর সমান। জ্ঞানেতেই মানুষ ভালমন্দ বিচার করতে পারে। Life (জীবন) যত low (নিচু) হবে, তত sense-এ (ইন্দ্রিয়ে) pleasure (আনন্দ); যত উন্নত হবে তত philosophy (দর্শন) জ্ঞানে সূক্ষ্ম আনন্দ। নিম্নস্তরের লোকেরা এসব আনন্দ বুঝতে পারে না। দেখ না, মদ খাচ্ছে, শিকার ইত্যাদি কচ্ছে। এ তো একেবারে পশুর মতন। পশুরাও তাই করছে। মানুষজীবন পেয়ে বৃত্তিকে আরও উচ্চ না করলে কি হলো? যাদের মন উঁচুতে রয়েছে তাদের মন এসবে নামে না। Impossible (অসম্ভব)!

ওলা মিছরির পানা খেলে চিটা গুড় ছ্যা হয়ে যায়। বিলাত যাবে? কি হবে গিয়ে—বহির্মুখ করে বৃত্তিকে? খুব ধ্যান জপ করে তাঁতে মগ্ন হয়ে যাও। তদ্গতান্তরাত্মা হও, তদ্গতান্তরাত্মা হও। খালি ঠাকুরকে নিয়ে যদি পাঁচ বৎসর থাকতে পার তাহলে ঠিক হয়। বিলাত, এখান—সব এক হয়ে যাবে।

* * *

বৈকাল বেলা পড়া হচ্ছে। তুরীয়ানন্দ মহারাজ বললেন, I do not care a fig for history or other things (আমি ইতিহাস বা অন্য কোন বিষয়ের

জন্য আদৌ ভাবি না।) "ভগবানই সব"—কি সুন্দর কথা! সচ্চিদানন্দ-সাগরে অহং-রূপ লাঠি পড়ে আছে বলে দুই ভাগ দেখাচ্ছে। বাসনার দ্বারা অহং সৃষ্ট হয়। বাসনা বা কামনাই তো আলাদা করে রেখেছে। এক সময়ে "নির্বাসনা" হতে হবেই হবে। সমস্ত বাসনা উপড়ে ফেলে তাঁকে ডাকতে হবে। বাসনাশূন্য হবার পর তাঁর ইচ্ছায় আবার কাজ করা যায়। তবে মহাপুরুষদের দ্বারা প্রেরিত হয়ে যারা কাজ করে তারা ঠিকই করছে। যাঁর কাছে সব দিয়েছ তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমারই কল্যাণসাধন করা। তাতে আর পাক লাগে না। উল্টে পাক খুলে যায়, তাতে বন্ধন আনে না।

তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে, "প্রভু! তোমায় যেন না ভুলি। এমন কাজ দিও না যাতে তোমায় ভুলে যাই। যেখানেই রাখ তোমায় যেন মনে থাকে।" তবে বোলো না, "আমায় এই দাও, ও দিও না।" এটা সকাম। "আমার এটা করতে ইচ্ছা করে, ওটা ইচ্ছা করে না।" এতে "আমি" এসে পড়ল।

কেউ কেউ কাজে ভয় পায় এবং বলে, কাজ যেন না করতে হয়। তাতে গাঁট থেকে যাবে, ওতে মতলব থেকে যাবে। তাঁর কাছে ভক্তি প্রার্থনা করবে। আর তিনি যা করাবেন তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বলবে—"সব অবস্থায় তোমায় যেন মনে থাকে, আর সর্বদা যেন তোমার ভক্তের সঙ্গ হয়, আর কারুর সঙ্গ নয়।"

৪ জুলাই ১৯১৫

এটা পাকা করে জানতে হবে যে, তাঁর ইচ্ছায় সব হচ্ছে। আবার তাঁর ইচ্ছায় সব যাচ্ছে। জগতে কত লোক উঠলেন, কত সেয়ানা এলেন। কিন্তু দেখ তাদের পরিণাম কি? সব তাঁর ইচ্ছায় হয়, যায়। এই যে আমাদের সঙ্ঘ, এও কি চিরকাল সমান থাকবে? এরও অবনতি হবে, তাঁকে আবার আসতে হবে।

* * *

যে ব্রাহ্মণ সে spiritual beggar (আধ্যাত্মিক ভিক্ষুক), তার দুদিনের সংস্থান থাকলেও হবে না। তাকে খালি ভগবান নিয়ে থাকতে হবে।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদের ঠাকুর তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। বলতেন, তাদের কোন পদার্থ নেই। মেয়েমানুষের কাছে তারা এত দীন হীন হয়ে যায় যে হাত জোড় করে। আরও কত কি শুনেছি। যাক সেসব কথা।

যাদের reason (বিচার) নেই তারা শীঘ্র একদিকে biased (পক্ষপাতী) হয়ে পড়ে, একতরফা শুনেই। বোঝবার শক্তি ও সপ্রেম হৃদয়—স্বামীজীর সমান ছিল। তিনি জেনে শুনেই লোককে ক্ষমা করতেন।

* * *

প্রশ্ন—এমন হয় না যে, আপনি আপনি সজাগ থাকব?

উত্তর—তা অমনি হবে? আগে কিছু সাধন কর। আগে নিজে সাবধান হবার চেষ্টা কর। তারপর আপনিই আপনার monitor (চালক) হয়ে যাবে। লোকে একেবারে এইটেই চায় বটে।

তোমারই মধ্যে শুদ্ধ যেটা—সেটা তিনি, আর খারাপ যেটা—সেটা তুমি। 'আমি' বললে তুমি সেই খারাপটাকেই বোঝ। যত তাঁকে চিন্তা করবে তত তিনি তোমার মধ্যে বেড়ে উঠবেন, আর তোমার খারাপ ভাবটা পালিয়ে যাবে। কেউ কেউ আছে চাপা, নিজের চারপাশে বড় বড় পাঁচিল তুলেছে, কাউকে দেখতে দেবে না ভিতরটা, নিজেও গোপন করতে চেষ্টা করবে। ও বড় খারাপ। সরল না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

৭ জুলাই ১৯১৫

যতই অহঙ্কার-বর্জিত হয়ে তাঁর হাতে ক্রীড়াপুত্তলিকার ন্যায় হয়ে যাবে, ততই শান্তি লাভ করবে। তিনি কর্তা, আমি অকর্তা—এই ভাব যতই আয়ত্ত হবে, ততই প্রাণ শীতল হবে।

৯ জুলাই ১৯১৫

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আমরাও আগে নির্বাণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জেনেছিলাম। তারপর ঠাকুরের কাছে কত ধমক খেয়েছি। তিনি বলেছেন, তোরা হীনবুদ্ধি।

শুনে অবাক হয়েছি, নির্বাণলাভকে হীনবুদ্ধি বলছেন! তবে এইজন্য তাঁর ওপর খুব শ্রদ্ধা ও খুব বিশ্বাস ছিল।

১৮ জুলাই ১৯১৫

স্বামীজীর Lecture on Vedantism (বেদান্তবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা) পড়া হলো।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—তাঁর কথা সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এই তোমরা এত সব লেখাপড়া শিখে এলে—সব ত্যাগ করে। কি করছ? দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, কোন রকমে দিন যাপন হচ্ছে। ঠাকুর যেমন বলতেন, "মা দিন তো গেল, এখনো তোমার দেখা পেলুম না"—সেই রকম কে বলে? সে রকম ইচ্ছা কই? Damp, spiritless (ম্যাদাটে, নিস্তেজ) নিরুদ্যম হয়ে বসে আছ। এসব পড়ে রক্ত গরম হয় না? তোমাদের যেন মাছের রক্ত। "জীবন্মৃতঃ কোঽবা? নিরুদ্যমো যঃ।"

জীবনের সাতাশ বৎসর কেটে গেল। স্বামীজী বলেছিলেন, উনত্রিশ বৎসরের মধ্যে সব সেরে নিয়েছি। তা তোমাদের কোন দোষ নেই। আমাদের যেমন দেখছ, তেমনি তো তোমরা করবে। ভক্তদের কাছ থেকে টাকা আসছে, আর কোন রকমে দিন কাটছে। আমরা কি আর এখন সে রকম পরিশ্রম করছি? বলছি, বুড়ো হয়েছি—diabetes, nonsense (বহুমূত্র হয়েছে, বাজে কথা)! ও সব excuse (ওজর)। স্বামীজী শেষ দিন পর্যন্ত খেটে গিয়েছেন। দেখেছি, শেষ অসুখের সময় বুকে বালিশ দিয়ে হাঁপাচ্ছেন; কিন্তু এদিকে গর্জাচ্ছেন। বলছেন, "ওঠ, জাগ, কি করছ?" আমরা excuse (ওজর) দিচ্ছি ঃ diabetes (বহুমূত্র); শরীর তো যাবেই, না হয় যাক না খেটে খেটে, পরিশ্রম করে, rousing divinity in yourself and in others (নিজের মধ্যে ও অপরের মধ্যে সুপ্ত ব্রহ্মভাবকে জাগ্রত করে)। এই তো সার। যদি তাই ঠিক ঠিক জেনে থাকো তো লেগে যাও, বেরিয়ে পড়। এখন আর সব চাপা থাক। Now or never—(এখন না হলে কখনো হবে না)। উত্তরকাশী গিয়ে গঙ্গার

ধারে পড়ে পড়ে তাঁকে ডাক, এই বলে—"মা তোমায় চাই, আর কিছু চাই না।" সেই রকম করবার জন্য এখন মনটা তৈয়ার করে নাও। তারপর দেখা যাবে কাজকর্ম।

২০ জুলাই ১৯১৫

কি সাহায্য চাও? নিজেকেই সব করতে হবে। না তাও করে দিতে হবে? তোমার মনকে তো তোমায় খাটাতে হবে। সেটা তো আর কেউ করবে না। ঠাকুর একশ বার বলেছেন, "কিছু করতে হবে। তারপর গুরু বলে দিবেন, এই এই।" এ আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ দেখা যে, তাঁর দিকে এক পা এগোলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন। এ আমাদের প্রত্যক্ষ। নিজে কিছু না করলে কারো সাধ্য নেই যে কিছু করে দিতে পারে।

মহাপুরুষেরা রাস্তা দেখিয়ে দেন, পথ বাতলে দেন। এই কি কম সাহায্য? তোমার মনের ভাব খুলে বললে আমরা বলে দিতে পারি, আমরা এই রাস্তা দিয়ে এসেছি! সাহায্য করতে পারি। মাখন তুলে ওঁর মুখে ধর—তাও উনি মুখ বুজে আছেন! আবার খাইয়ে দিতে হবে!

ওসব মনের ব্যাধি। একে 'স্ত্যান" বলে। মন কিছু করতে চায় না, খাটতে চায় না। যদি বল, ভগবান কি তাঁর ভক্তের জন্য কিছু করবেন না? তা নিশ্চয়ই করেন। কিন্তু আগে ভক্ত হতে হবে, তাঁকে ভক্তি করতে হবে। আর ভক্তিও সামান্য নয়। তাঁকে মনপ্রাণ সমস্ত দিতে হবে। তা না পার তো কাঁদতে হবে এই বলে যে, তোমায় পেলাম না, তোমাতে ভক্তি হলো না। লোকে এক ঘটি কাঁদে টাকার জন্য, তবে তো টাকা হয়। তা না করলে ভগবান বা কেন করবেন? ভগবানের জন্য যে নিরানন্দ হয় তারও তিনি অতি নিকট হন, তার ঈশ্বরদর্শন আর দেরি নেই। সে আনন্দ পেল বলে। Mind (মন)কে খুব analyse (বিশ্লেষণ) করতে হয়, তন্ন তন্ন করে দেখতে হয়।

ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, "কাম আরও বাড়িয়ে দাও।" আমি তো শুনে অবাক! বলেন কি, আবার বাড়াতে হবে? তখন বললেন, "কাম আর কি?

প্রাপ্তির কামনা তো? তাঁকে পাবার জন্য কামনা কর, খুব কামনা বাড়িয়ে দাও। তখন অপর কামনাগুলি উপে যাবে।"

ভজন-টজন তো কর না? খালি কাজ। আমার সেবা করছ? ঘোড়ার ডিম করছ! আমি বলি, তুমি জেনো যে, প্রভুর কৃপায় আমি নিজে এখনও সব করতে পারি। তোমার সেবার কিছু দরকার হয় না।

আমি তো কতবার বলেছি, ও কি কচ্ছিস? ও যে চার টাকার একটা চাকরেও করতে পারে। নিজের মনের কথা কিছু আমায় বলবে না, নিজের মনের ভাব চেপে রাখছে, খালি আড়াল দিচ্ছে। প্রথম বৎসর খুব কথা কয়েছিলুম। তখন আমি নিজে ওকে (সেবককে) টানতুম। cell (গুহা) থেকে কি ওকে টেনে বার করতে হবে? তাহলে কি হলো? উনি নিজের সেলের ভিতর ঢুকে থাকবেন। সব মানুষের এই স্বভাব যে, খালি নিজের ভালটি লোককে দেখাবে, আর খারাপটি লুকিয়ে রাখবে। যে নিজের দোষগুলো টপটপ করে বলে দিতে পারে, তার দোষগুলো শীঘ্র কেটে যায়। নিজের খারাপটা বলা বড় সোজা নয়। যে নিজের দোষগুলো বলতে পারে, জেনো তার ভিতর কিছু আছে।

সকলকে আপনার করে নিতে হবে। সব আপনার হয়ে যাবে। যত তাঁর দিকে যাবে তত সরল উদার হবে। ঠাকুর সরলতার প্রতিমূর্তি। ভাঙা হাত ঢেকে রেখেছিলেন। তা ডেকে বললেন, "ও মধুসূদন, এই দেখ।"

* * *

একজনকে চিঠি লিখলেন ঃ যদি ভগবানের জন্য নিরানন্দ হয়ে থাকো তাহলে ঐ ভাব যত ঘনীভূত হবে, তত তাঁর কৃপা পাবে। ঐ ভাব আরও বাড়িয়ে দাও। আর যদি অন্য কোন কারণে ঐ ভাব হয়ে থাকে তাহলে তা সযত্নে পরিহার কর।

* * *

যে সগুণ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করেছে সে নির্গুণ ভাব ইচ্ছা করলেই লাভ

করতে পারে। কিন্তু সে ইচ্ছা করে রসাস্বাদনের জন্য আমিটা রেখে দেয়। তাদের হৃদয়ের গ্রন্থিভেদ হয়েছে যাদের স্ব-স্বরূপ বোধ হয়েছে। তারা নির্বাণমুক্তি চায় না। তাদের সংসারে ভয় নেই। নির্বাণমুক্তি চাওয়াকে ঠাকুর হীনবুদ্ধি বলতেন। ও নিজেকে বাঁচিয়ে চলা।

ভক্তের ভগবান প্রীত হন, আবার রুষ্ট হন। ঠাকুর বলতেন, "যার অভিমান আছে তার দিকে চাইতে পারি না।" যারা নির্বাণ না নিয়ে ঈশ্বরের দিকে গেল, তারাই ঈশ্বরকোটী।

২৯ জুলাই ১৯১৫

স্বামী তুরীয়ানন্দ—কেন হবে না? নিশ্চয়ই হবে! না হবে তো এসেছ কেন? কেঁদে কেটে তাঁকে অস্থির করবে। মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলবে। তাঁকে বলবে, তুমি ভিতর দেখ, যদি কিছু থাকে। এই বলতে পারা কি কম?

৩০ জুলাই ১৯১৫

ঠাকুর একদিন তাঁর গলার অসুখের কথা বলেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার কি ওসব অনুভব হয়? তিনি বললেন, "তুমি কি কথা বললে গো? শরীর কি কখনও সাধু হয়? মনটাই সাধু হয়ে যায়।" তা না হলে শুধু idiot (মূঢ়)-এর মতো শান্ত ভাব হবে। কষ্ট অনুভব হচ্ছে; খালি চেপে রয়েছি—ও বড় কিছু নয়। তবে এই বোধ যদি হয় যে এসব শরীরের—আমার নয়, আমি শরীর থেকে আলাদা, তবেই ঠিক।

"যাবৎ জরা দূরতঃ" তাবৎ ভজন টজন করে নিতে হয়। "সন্দীপে ভবনে কিং কূপ-খননম্?"—প্রহ্লাদ বলেছিলেন। শুধু suppression -এ (চাপলে) কিছু হয় না। সংযমের সঙ্গে সঙ্গে একটা উচ্চ ভাব থাকা চাই। তা না হলে আর একদিক দিয়ে বেরুবে। আর একদিকে direction (মোড়) দিতে হয়। তাহলে আপনি সরে যায়। "তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ" (গীতা, ৪।৩৯)—তাঁকে পরম অবলম্বন করে সংযম। যেমন কাম সম্বন্ধে ঃ আমি তাঁর ছেলে, আমি

কেন এত হীন হব? আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা। এতে কাম জয় হয়। নিজের পায়ে দাঁড়ানো মানে তাঁকে নিয়ে যে আমি, সেই আমিতে দাঁড়ানো। তা না হলে আমি অমুক, বি. এ. পাস, কি এম. এ. পাস, এতে দাঁড়ানো কিছু নয়। কর্ম যেন একটি যজ্ঞ। প্রত্যেক কাজটি perfectly (নিখুঁতভাবে) করতে হবে, প্রত্যেকটি যেন সুসম্পন্ন হয়। প্রত্যেক কাজটিকে সাধন ভাবতে হবে। তবে তো একটি character (চরিত্র) তৈরি হবে।

ধ্যান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়াও ভাল। বিষ্ণুর এত গভীর ধ্যান হতো, কিন্তু ঠাকুর যেমনি ছুঁতেন অমনি জেগে উঠত তাঁর দিকে চেয়ে। নিত্যগোপালের তো অত ভাব হতো, চোখ উলটে যেত, বুকখানা একেবারে লাল হয়ে উঠত। আর যখন ধ্যান করত সমস্ত রক্তটা মুখে উঠত, মুখ লাল হয়ে যেত। ঠাকুর বলতেন, "ওরে অত নয়, অত নয়, লোকব্যবহার রাখতে হবে।"

ঠাকুরের জ্যোতির্ময় শরীর ছিল। বোধ হতো যেন তাঁর একটুও জড়তা নাই। তাঁর কাছ থেকেই তো কষ্টসহিষ্ণুতা শিখেছিলুম। বিডন স্কোয়ার গার্ডেনে ও হেঁদোয় রাতভোর ধ্যানভজন ও তাঁর নাম করে কাটিয়ে দিতাম; কখনো বা কালীঘাটে, কখনো বা কেওড়াতলায়।

আমি হৃদয় থেকে বলছি যে, এখনি আমি এই অবস্থায় উঠে যেতে পারি—কোন দিকে চেয়েও দেখব না যে কোথায় কি পড়ে রইল, এখনও মাধুকরী করে খেতে পারি। এ বিশ্বাস না থাকলে তো আমি গেলুম! লোকে খালি নিজের সুবিধা খুঁজছে। সুবিধা খোঁজা শুধু এ জন্মে কেন, শত শত জন্ম করে আসছে। আর এই সুবিধা খোঁজা ছেড়ে দেওয়াই হলো মুক্তি। কেউ কষ্ট করতে চায় না; প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচাচ্ছে। স্বামীজী বলতেন, "একটা জীবন কি চারটিখানি কথা? কত সন্তর্পণে থাকতে হয়। চার দিকে নজর রাখতে হয়।" লোকে অনিষ্ট করলেও আমি অনিষ্ট করব না। সব সহ্য করে নিতে হবে। কারণ কিছু করলেই আবার rebound (প্রত্যাঘাত) করবে। ছেলেখেলার কথা? খালি জন্মমরণ, জন্মমরণ। এ যে একেবারে সব জীবনের বাইরে যাবার চেষ্টা! যে সচ্চিন্তা করে যাবে, সে বেঁচে যাবে।

২০ আগস্ট ১৯১৫

যখন ধ্যান ধ্যেয় এক হয়ে সামনে দাঁড়ায় তখনই ঠিক ধ্যান হয়। যখন জপ আপনা আপনি হচ্ছে, মনের একটা অংশ সর্বদাই জপ করছে তখন জপের কিছু হয়েছে। সবেতেই "আমি" ভুলতে হবে। যখন তোমার মন elated (উৎফুল্ল) হয় কোন ভাবে, তখনি জানবে তাতে depress (অবসন্ন) করবার শক্তিও আছে। কোন ভাবের সঙ্গে identified (একীভূত) হলে চলবে না। ওদের পারে থাকতে হবে। একবার বুড়ি ছুঁতে হবে, তারপর আর কেউ ছুঁলেও তোমাকে "চোর" হতে হবে না। এক সময়ে আমার এমন বোধ হয়েছিল এই যে, পা-টি ফেলছি—এও তাঁর শক্তিতে; আমার কোন শক্তি নেই, আমি ঠিক এটা দেখতে পেতুম। এই ভাব ছিল কিছু দিন।

কারো কাছে কিছু আশা রাখবে না, কিন্তু সকলকে দেবে। তা না হলে শুকনো ভাব এসে পড়বে। এইটি ঠাকুরের ঘরে পাবে। তা না হলে আমি অনেক সাধু দেখছি—যারা ভাবে আমি সাধু হয়েছি, আমার কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। "আপনাতে আপনি থাকো মন, যেও না মন কারু ঘরে"—এই ভাব মনে সদা জাগ্রত রাখবে। অর্থাৎ মন কাউকে দেবে না; মন তাঁকেই দেবে। সেই জন্যই তো বিয়ে করিনি। মন কাউকে দিতে নেই। তাঁকে কেঁদে কেঁদে বলতে হয়, "প্রভু! তোমায় পাঁচ সিকে পাঁচ আনা মন দিয়ে যেন ভালবাসতে পারি।" ঠাকুর আমাদের শেখাতেন—সব কাজ করবে হাত দিয়ে, কিন্তু মন তাঁর কাছে পড়ে থাকবে। "তুলসী অ্যায়সা ধ্যান করো য্যায়সী বিয়ান কী গাই। মুহ্সে তৃণ চাম চাটে—চখে বছাই।"

আমরা যে দূরে দূরে থাকি এ খুব ভাল। রাজা মহারাজ আজকাল একান্তে থাকেন। কারো সঙ্গে বেশি মেশেন না। মনের পারে একবার না গেলে ত্রাণ নাই। পরশমণি একবার ছুঁতে হবে, লোহা যতই ভাল হোক না কেন। বুড়ি ছুঁলে পর জানা যায় যে, এসব আমি নই। ভালমন্দ এসব মনের, আমি (আত্মা) আলাদা। সগুণ ঈশ্বর শেষ নয়। সব ভাবের অতীত, গুণাতীত হয়ে যেতে হবে। অভেদ ভক্তি, অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যে ভক্তি, সেই শুদ্ধা ভক্তি। নতুবা যার সদ্ভাব আছে তার অসদ্ভাবও আছে।

ভগবান পক্ষপাতী নন, তাঁর দয়া শিষ্ট দুষ্ট সকলের ওপর। যেমন সর্বত্র বৃষ্টি পড়ছে; যে ভূমি কর্ষিত থাকে সেই ফল লাভ করে। যদি কেউ বলে, "আমি তাঁর বিশেষ কৃপাপাত্র" সে তার নিজের ভাবের কথা। সে নিজের জীবন দেখে হয় তো বলছে যে আমার ওপর তাঁর বিশেষ কৃপা। আবার এক ভাব আছে ঃ তিনি কাউকে বদ্ধ কাউকে মুক্ত করেছেন। যে সব "এক" দেখেছে সে মহা দুঃখে পর্যন্ত তাঁর কৃপা দেখতে পায়।

আর একভাব আছে ঃ যা ভাল তাঁর, আর যা খারাপ তা আমার—নিজের কর্মফলের দোষ। এই রকম করতে করতে আবার "আমি"টা চলে যায়। ওসব চালাকিতে কি হবে? কাক চতুর, কিন্তু বিষ্ঠা খায়। আমরা সব বুঝতে পারি। সময় সময় এত বুঝি যে, মনে ভয় হয়। মনে হয়, অত বুঝে দরকার নেই। এই জগৎটা একেবারে পচা, দেখতে পাচ্ছ না? নিঃস্বার্থ ভাব বড়ই বিরল! স্বার্থভাবে এ ভরা। লোকের মন ঈশ্বরে কতটা, অন্য জিনিসেই বা কতটা, দেখছ না? জগতের ওপর বৈরাগ্য না থাকলে জ্ঞানও হবে না। "ভ্রাতঃ যদিদং পরিদৃশ্যতে জগৎ তন্মিথ্যৈব।" তবে এও আছে, তিনি সত্য বলে জগৎ সত্য। জগতের সব জিনিসই যে তুচ্ছ মনে করতে পারে, সেই বীর।

ঠাকুর বলতেন, "সংসারের গোড়ায় দুইটি বস্তু—কামিনী ও কাঞ্চন।" কামিনীতে মাতৃবুদ্ধি, আর কাঞ্চনে ধূলিজ্ঞান—সচ্চিদানন্দ লাভের এই একমাত্র উপায়। দেখ না, মন কত সৃষ্টি করছে—Building castle in the air (আকাশকুসুম ভাবছে) এবং তাতে একেবারে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে—যেমন নিদ্রাতে। মনই আমাদের প্রত্যেকের জগৎ সৃষ্টি করছে বিচিত্রভাবে। মনই মায়া। এক মনেই স্ত্রীকে একপ্রকার ভালবাসছে, মেয়েকে আর একপ্রকার। যদি আত্মার স্বরূপ নিশ্চয় করতে পার তাহলে মনের নানাপ্রকার ভাবতরঙ্গ থাকতেও তা থেকে আলাদা হতে পারবে। তখন সব জিনিস থাকলেও কিছু নেই মনে হবে। জিহ্বা ও উপস্থ—এই দুইটিকে মনু প্রবল ইন্দ্রিয় বলেছেন, এই উভয়ের মধ্যে জিহ্বা প্রধান। জিহ্বা বশ না হলে রক্ষা নাই। অপরিমিত আহারকে ব্রহ্মহত্যার সামিল বলা হয়েছে।

৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৫

যারা জ্ঞানী তারা মস্তকে ধ্যান করে। যারা ভক্ত তারা হৃদয়ে ধ্যান করে। We generally—(আমরা সাধারণত এইরূপ দেখি)। হৃদয়ে ধ্যান করতে করতে যখন ভাব বিস্তীর্ণ হয়, তখন কোন জায়গায় location (সীমাবদ্ধ) থাকে না। ঠাকুরের দুই ভাব আছে। কোন সময়ে তিনি বলছেন, রূপটুপ ভাল লাগছে না, সব কেটে দিচ্ছেন। কালীও ভাল লাগছে না, মন অখণ্ডে লীন হয়ে যাচ্ছে। আবার কখনও রূপ না হলে তাঁর চলে না, বলছেন—চাইনে মা তোমার নিরাকার, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান। যে খালি নিরাকার দর্শন করেছে এবং তাতে লয় হয়ে গেল সব বাদ দিয়ে, সেও একঘেয়ে। জ্ঞানীর ভয় আছে—পাছে জন্মাতে হয়, পাছে অজ্ঞানে পড়ে যায়। সাকার খেলোয়াড় কিছুকেই ভয় করে না। যে খালি সাকার রূপ দর্শন করেছে—সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাবাতীত ভাব দেখেনি, সেও একঘেয়ে; যেমন গোঁড়া ভক্তেরা। তাদের পরব্রহ্ম বা নিরাকার বললে বলে, বাপ রে! পুরাণে আছে, সমস্ত জগৎ লয় হলে ভগবান সাকার স্বরূপে থাকেন। যেমন ঠাকুর বলতেন, এমন জায়গা আছে যেখানে বরফ গলে না। সাকার নিরাকার সাক্ষাৎ হবার পর ভগবানের ভাব ও রূপ নিয়ে থাকলে এই বোধ হয়। এটি নিত্য সাকার। আমরা আগে কিছু মানতুম না, ঠাকুরের কাছে এসে এসব মানতে শিখলুম।

* * *

প্রথমে কারো কাছ থেকে কিছু নেবে না। কারণ কিছু নিলেই তার দ্বারা influenced (প্রভাবিত) হতে হয়, independence (স্বাতন্ত্র্য) চলে যায়। সে নিতে পারে, যে হজম করতে পারে; নিলেও তার মনের কিছু হবে না। ভাল লোকের কাছ থেকে জেনে নিতে হয়, যে তোমার independence-এ (স্বাতন্ত্র্যে) হাত দেবে না বা তোমাকে control (বশ) করবার চেষ্টা করবে না।

সাধারণত কি হয়? এ জীবনে কিছু একটা stage (অবস্থা) পর্যন্ত গিয়ে সেইখানে বসে পড়ে, আর উঠতে পারে না। এ জীবনের জন্য ঐ নিয়ে satisfied (সন্তুষ্ট) থাকে। নিজের মনকে ধরতে হলে খুব সাবধান না হলে পারে

না। মন কত রকম প্রতারণা করছে। কেউ যদি ধরিয়ে দেয় তবু excuse (ওজর) দেয়। আমাদের কত রকম self-love (আত্মপ্রীতি) আছে বুঝতে পারি না। তা পারা কি কম? বাইরে নয়, ভিতরে—in spirit (ভাবে), তা করা খুব শক্ত। ঐ সব হলো character (চরিত্র)।

স্বামীজী এক সময়ে নিরামিষ আহার করে বাইবেল পড়ছিলেন। তখন যিশুর মাংসাহার তাঁর ভাল লাগল না। তিনি ভাবলেন ঃ ও! আমি নিজে নিরামিষ আহার করছি বলে অমনি একটু অহঙ্কার হয়েছে। খালি পাতা পাতা পড়ে যাচ্ছি, ধারণা হচ্ছে কই?

গিরিশ ঘোষকে ঠাকুর যখন বললেন, "ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কি বলছ? শুকদেব ব্রহ্মসমুদ্র দর্শন স্পর্শন করেছেন। আর শিব তিন গণ্ডূষ জল পান করে শব হয়ে পড়ে আছেন।" গিরিশ ঘোষ বললেন, "মহাশয় আর বলবেন না, (মাথায় হাত দিয়ে) মাথা ফেটে যাচ্ছে।"

প্রথম বয়সে বুড়ো হওয়াটাকে ঘৃণা করতুম। তারপর কিন্তু একটা মহাশক্তির অধীনে থাকতে ইচ্ছা হলো।

আমি এসব বলতে excited (উত্তেজিত) হচ্ছি। মনে করো না, এসব এখন excited (উত্তেজিত) না হয়ে বলতে পারি না। Nerves (স্নায়ুমণ্ডলী) বড় weak (দুর্বল) হয়ে গেছে, কিন্তু ভিতরটা ঠিক আছে। আগে আরও বেশি ছিল। Nerves (স্নায়ুসমূহ) খুব fine (সূক্ষ্ম) ছিল; বুঝবার শক্তি খুব ছিল। কোন প্রশ্ন করলে প্রশ্নের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে পেতুম। আর এক একটা কথায় flood of light (আলোকের প্লাবন) থাকত। Nerves (স্নায়ুসমূহ) আবার শক্ত হওয়াতে সে শক্তি চলে গেল।

ফাঁকি দেবে কাকে? আপনি ফাঁকে পড়বে। যে যত শক্তি বার করতে পারবে, সে তত পাবে। যতটুকু দেবে ততটুকু পাবে। বরাহনগর মঠে যখন খাওয়ার কিছু থাকত না, তখন দোর বন্ধ করে খুব কীর্তন হতো। রাতকে রাত ধ্যান ভজন চলত। সহজে কি আর মন স্থির হয়েছে। এখন লোক মঠে গিয়ে চোখ ভরে দেখে।

ঠাকুর! আমার বৈরাগ্যটুকু নষ্ট করো না। মনকে নূতন সংস্কার পাওয়াতে হবে। বৈষ্ণবদের মধ্যে মন্ত্র নেবার পর খুব জপ করিয়ে নেয়, ষোল আঠার ঘণ্টা জপ করায়! আমাদের মধ্যে ধ্যানটা খুব। রাজা মহারাজকে কত ধ্যান করতে দেখেছি বৃন্দাবনে। সুখের ভিতর থেকে জ্ঞান হয় না বলেই তো বৈরাগ্য করে থাকতে হয়। ভাল থাকবার জায়গা ইত্যাদি হলে আর জ্ঞান হয় না। বৈরাগ্য সাধুর শোভা। তা না হলে বিষয়ের ভিতর থাকলে duplicity (কপটতা) প্রভৃতি সাংসারিক ভাব এসে পড়ে।

কালীঘাটে ত্রিকোণেশ্বর মন্দিরে থাকাকালে নবরাত্রির সময় মৌন ছিলাম। একটা নেশার মতো হয়েছিল; সর্বদা এক দিকে মন থাকত। মনুষ্যজীবনে যা করা উচিত তা করেছি। এই উদ্দেশ্য ছিল যে জীবনটা বিশুদ্ধ করতে হবে। খুব পড়তুম, আট নয় ঘণ্টা দিনে। পুরাণ-গ্রন্থ অনেক পড়েছি, শেষে বেদান্ত, বেদান্তে মন বসে গেল। ঠাকুর আমার সঙ্গে পরিহাসাদি করতেন। বলতেন, 'কি গো! কিছু বল বেদান্তের কথা। বেদান্তে এই তো বলে—ব্রহ্ম সত্য; জগৎ মিথ্যা; না আর কিছু? তবে আর কি? মিথ্যা ছেড়ে সত্য নাও।' এই আমার life-এর (জীবনের) turning-point (দিক পরিবর্তন) হলো।

আলমোড়া

৪ নভেম্বর ১৯১৫

স্বামী তুরীয়ানন্দ ঃ স্বামীজী বলতেন, "মনটাকে একেবারে কাদার মতো করতে হবে।" কাদা যেমন যেখানে মারবে সেখানে থেকে যাবে, মনটা তেমনি যে বিষয়ে দেবে, সে বিষয়ে লেগে থাকবে, উঠাবার কি জো আছে?

কারো শরীর কাজের জন্য তৈরি, কারো বা ভজনের জন্য। কাজের জন্য একটা hankering (বাসনা) না হলে কাজ হবে না, তামসিকতা যাবে না, স্বামীজীর কাজ এলে তাতে পেছ-পা হবে না, খুব করবে। আবার যখন ধ্যানে বসবে, তখন কাজের কথা ভুলে যাবে। শরৎ প্রভৃতি খুব কাজ করতে পারে, আবার ধ্যান-ধারণাও পারে। আমারও ঐ রকম ছিল।

মনে কিছু গ্রহণ করাও পরিগ্রহ। যেমন তুমি বলছ, এখন ছ-মাস তো চলুক এ টাকায়; এটা পরিগ্রহ। মনে মনে একটা ঠিক করে রেখেছ যে, এই রকম। এই পরিগ্রহ থেকেই জন্ম-টন্ম (দেহপরিগ্রহ) যা কিছু। তোমার মন যেখানে রয়েছে সেখানে তুমি রয়েছ।

পরিগ্রহ না করলে তোমায় কোথায় থাকতে হবে? তোমাকে আত্মায় থাকতে হবে। একটা practice (অভ্যাস) তোমায় highest (সর্বোচ্চ) স্তরে নিয়ে যাবে। মহাপুরুষরা মনে কিছু মতলব রাখেন না। যেখানে রয়েছেন সেখানেই থাকেন। কেউ নিয়ে গেল তো গেলেন। তাঁদের কোন আঁট থাকে না, তাঁদের মন যেন এলিয়ে গেছে।

এই ঝগড়া হলো তো এই ভাব, মহাপুরুষদের যেন ছোট ছেলের স্বভাব। সাংসারিক লোকের কারো সঙ্গে ঝগড়া হলো তো জন্মে আর তার সঙ্গে কথা হবে না, সে দিক দিয়ে যাবে না।

আমার কতগুলো সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। শরীর ভাল পেয়েছিলাম, মনও তিনি দিয়েছিলেন ভাল এবং সহ্যও হয়ে গিয়েছিল। পরিগ্রহ করতাম না। ঠাকুর বলতেন, "খুব সরল উদার হবে।" মন open (খোলা) হবে। যত গোপন করবে, চাপবে—যত প্যাঁচ মারবে তত প্যাঁচ লেগে যাবে, তত বসে যাবে। অনেক তপস্যার ফলে মন সরল উদার হয়। যদি মনে করলাম, বাড়ি না গেলে নয়, তবে আমায় যেতেই হবে—এ পরিগ্রহ।

আমি টাকাকড়ি লোকের কাছে চাইতে পারি না, আর চাইতে কখনও হয়নি। কারণ এ সাহস মা সব সময় রেখেছেন যে, "নারায়ণ হরি" বলে লোকের বাড়ি ভিক্ষা করে খেতে পারি। এ সাহস এখনও আছে, এখনও ভিক্ষা করে খেতে পারি। তবে তা হলে পাতাল দেবীতে* থাকতে হবে। যার যেটা শোভা পায়। তা না করে ট্রাঙ্ক সঙ্গে রাখা ও রেঁধে বেড়ে খাওয়া—এসব সাধুর ঠিক নয়। সর্বদা হুঁশিয়ার থাকতে হয়। উপনিষদে (কঠ, ১।৩।৬) আছে, "...যুক্তেন

* আলমোড়া শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত মন্দির।

মনসা সদা... সদশ্বা ইব সারথেঃ।" তা কি সোজা ব্যাপার? তোমরা ভাল আশ্রয়ে এসে পড়েছ। তোমাদের সাত খুন মাপ। তবে অকপট হতে হবে। যিশু বলেছিলেন ঃ যে মুখে শুধু 'প্রভু' 'প্রভু' বলে সে নয়, যে প্রভুর ইচ্ছানুসারে কাজ করে—সেই তাঁকে পাবে।

ঠাকুর কামিনী কাঞ্চন স্পর্শ করতে পারতেন না। এ দুটো থেকে বাঁচতে হবে। আমরা কত দিন পয়সা ছুঁইনি। রসনার, জিভের সেবা করেই কি দিন যাবে? জিভকে চোখ রাঙিয়ে রাখতে হবে। এই দিচ্ছি, খুব। পাঁচ ব্যঞ্জন খাওয়া ভারি রাজসিক। ডাল চচ্চড়ি অম্বল, যথেষ্ট। আমার শরীর খুব ভাল ছিল, কিছুতেই পেছ-পা নয়। মনটা খুব strong (শক্ত) ছিল; শরীর তাই সব মেনে নিত। আর একটু একটু করে করতে পারতাম না। করতে হবে তো একেবারে। এমন মনে হতো না যে, এত করলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে কিনা। ঐ ভাব মনে পড়তই না। আমার বন্ধুরা বলত, তুই মরে যাবি। আমি বলতাম, যা শালারা, তোরা বড় বেঁচে যাবি। পাঁচ-শ বৈঠক ও এক-শ ডন দিতাম। সাধু হয়ে বেশি হিসাব বুদ্ধি ভাল নয়, দু-আনার জন্য মিনমিন করা ঠিক নয়।

১২ নভেম্বর ১৯১৫

ঠাকুর বলতেন, সংসারটা খালি কামের ব্যাপার। সংসার থেকে চলে আসা চারটিখানি কথা নাকি? কটা লোক আছে যারা স্ত্রী-সঙ্গ করেনি। ঠাকুর excited (উত্তেজিত) হয়ে বলতেন, "কি বলছ? মা এই কটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাই বেঁচে আছি।"

সংসারকে ঠাকুর বলতেন কূপ। এতে পড়লে আর ওঠবার জো নেই। চৈতন্যদেব রঘুনাথকে আলিঙ্গন করে বললেন, "তুমি সংসার-কূপ হতে বেঁচে গেলে।"

১৩ নভেম্বর ১৯১৫

একবার বুড়ি ছুঁতে হবে। বুড়ি না ছুঁলে বড় ভয়ের কারণ; নাম, যশ, বিষয় ইত্যাদি এসে পড়বে। শেষকালে চোর হয়ে বাড়ি ফিরতে না হয়। বুড়ির কাছে

থাকবো—বলাতে ঠাকুরের ধমক। জগৎটাকে মিথ্যা বোধ হওয়া চাই। তা না হলে অত ধ্যান-ভজনে কি হলো?

কিছুদিন কোমর বেঁধে লেগে বুড়িটা ছুঁয়ে ফেল না? খালি আশীর্বাদে কিছু হবে না।

* * *

লোককে জব্দ করা মহা সংসারী বুদ্ধি। তুমি জব্দ করছ, কিন্তু তোমার ওপর একজন আছেন। তিনি যখন তোমাকে জব্দ করবেন, তখন পালাবার পথ থাকবে না। দিনে যেসব ভ্রম হয়েছে, রোজ রাত্রে তা খতাবে। তবে তো ভ্রমসংশোধন হবে। যেখানেই যাও সেখানেই তুমি যা তাই। তোমার ভিতর যেমন, বাহিরটা সেই রকমই দেখবে—তা স্বর্গেই যাও না কেন! নতুন অবস্থায় পড়লে প্রথমে একটু উদ্বেগ হয়, যেমন জলে ঢিল ফেললে হয়। তারপর তুমি যে রকম তদনুরূপ অবস্থা হবে। তাঁর চরণ ছাড়া আর কোন গতি নেই। আমরা এখানে সেখানে comfort (স্বাচ্ছন্দ্য) খুঁজছি। কিন্তু তাঁর চরণ ছাড়া আর কোন জায়গায় শান্তি নেই। এক রাজা বলেছিল, চামড়া দিয়ে জগৎ মুড়ে দেবে, পায়ে ধুলো লাগবে না। মন্ত্রী এক জোড়া জুতো তৈরি করে দিল, তাইতেই সমস্ত জগৎ চামড়া-মোড়া হয়ে গেল।

যতদিন তোমার আসক্তি রয়েছে—তুমি অনাসক্ত নও, ততদিন তুমি কুত্তা—খড়কুটো; তোমার কোন পদার্থ নেই। খুব ত্যাগ বৈরাগ্য থাকা চাই, আর পাণ্ডিত্য। আজকাল যারা আসছে তাদের না আছে ত্যাগ, না বৈরাগ্য, না পাণ্ডিত্য—হট্টগোল করছে, কোনও রকমে দিন গুজরান। দোষ-ত্রুটি খালি নিজের দেখতে হবে, পরের দিকে তাকালেই ভুল করবে। যাক শালা শরীর। একটু পরিশ্রম করে মনটাকে ওপরে তুলে দাও। তারপর শরীর চুরমার হয়ে যাবে।

তাঁর ওপর সব ছেড়ে দিতে হবে। একেবারে তাঁতে ঝাঁপ দিতে হবে। নইলে হবে না, হবে না। তারপর তিনি যেমন রাখেন। লোকে কেবল দেহের সুখ চাচ্ছে। কিসে ভাল থাকবে, ভাল খাবে—এই চিন্তা। কেউ কি তাঁকে চায়?

এই তো সব এরা বি. এ. পাস করে এসেছে; কেউ কিছু করছে না। তাঁর জন্য প্রাণ বার করতে হবে, তাঁকে দিতে হবে ষোল আনা মন; তারো ওপর কিছু থাকে, "পাঁচ সিকে পাঁচ আনা" মনপ্রাণ তাঁতে অর্পণ করতে হবে। তিনি যখন যে কাজ দেবেন এই রকম "পাঁচ সিকে পাঁচ আনা" মন দিয়ে তা করে ফেলতে হবে। সে কাজ ফুরুলে তিনি আবার অন্য কাজ দেবেন। সেটিও প্রাণ দিয়ে করতে হবে। তা এইরূপে তাঁর কাজে প্রাণ বের করতে হবে। তাহলেই দু-চারটা কাজ করলে তিনি ছুটি দেবেন। ফকির হতে হলে ফিকির ছাড়তে হবে, মতলব ছাড়তে হবে। সম্পূর্ণ তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে, তাঁতে ঝাঁপ দিতে হবে ঝুপ করে। নিজের হাতে কিছু রাখলে চলবে না। দেহ মন প্রাণ আত্মা—সব তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে হবে, তিনি যা করেন—এই বলে। শরীরকে দেখতে হয় তিনি দেখবেন। লাঙ্গলে* যখন ছিলাম খুব অসুখ। গঙ্গারাম বললে, মঠে খবর দেব। আমি বললাম, "খবরদার! চিঠি লিখেছ যদি শুনি তো এই অবস্থায় এখান থেকে চলে যাব।" ঐখানেই বলেছিলাম, "ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ।" সে কি ঢং করে বলেছিলাম? তা নয়। ভিতর থেকে ঠিক ঠিক জানতাম।

* * *

প্রশ্ন—মনে অন্য চিন্তা আসে, কি করে তাড়ানো যায়?

উত্তর—যতই তাঁর চিন্তা করবে ততই অন্য চিন্তা চলে যাবে।

ঠাকুর বলতেন, যতই পুব দিকে এগোবে ততই পশ্চিম দিক পেছিয়ে পড়বে। গঙ্গার স্রোত যেমন তরতর করে বইছে তেমনি মনও তাঁর দিকে তরতর করে বইবে। কিছু দিন এমনি চালাতে পারলেই ব্যস! তারপর আপনি চলবে।

মনের ওপর বড় বড় অক্ষরে লিখে দাও, "NO ADMISSION"—(প্রবেশ নিষেধ)। তারপর এমন এক সময় আসবে যখন বলতে পারবে,

---

* কনখলের নিকট গঙ্গাতীরে অবস্থিত।

Come one and all—(সকলে এসো)। আমি ঘরের দুয়ার খুলে রাখি বলেই তো লোক আসে; নতুবা বন্ধ করে রাখলে লোক কি করে আসবে? মনে কেন অন্য চিন্তা আসতে দেবে? তুমি দাও বলেই তো আসে।

প্রথম প্রথম শুধু ধ্যান জপ করতে পারবে না। তাই ঝালে ঝোলে অম্বলে খেতে হবে। মাছেরই ঝাল ঝোল অম্বল, অন্য কিছুর নয়। খানিকটা জপ, খানিকটা ধ্যান, খানিকটা পাঠ, খানিকটা গান—এইভাবে নানা রকমে তাঁরই চিন্তা করতে হবে। কিছুদিন ঐরূপ করবার পর "এক" চিন্তা করতে পারবে। শুধু জানলে হবে না, করা চাই। আমরা জানি সব, করি না কিছু। স্বামীজী বলতেন, "আমরা এত বেশি জানি যে, আর একটু কম জানলে ভাল হতো।" কিছু কর, কর, কর। কেউ কিছু করে না। তোমাকেই খাটতে হবে, অপর কেউ তো তোমার হয়ে করে দিতে পারবে না। একটা শ্লোকে আছে ঃ তোমার বোঝা অপরে নামিয়ে নিতে পারে, কিন্তু খিদে পেলে তোমাকে নিজেই খেতে হবে, অপরে খেলে হবে না। ঠাকুর গাইতেন ঃ

জলে কি রত্ন মিলে? মন কর প্রাণ অবধি,
ডুব দাও অগাধ জলে সহজ মানুষ ধরবে যদি।

আমরা এক সময়ে খুব করেছি। এখনও এমন অভ্যাস আছে যে, একটু মন দিলেই সেটা আবার ফিরে আসে।

১৭ নভেম্বর ১৯১৫

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়ের মোড় ফিরানো যায় কি করে?

উত্তরে প্রথমে বললেন, আমি কি জানি? এই বলে চুপ করে রইলেন। পরে এই তিনটি গান গাইলেন ঃ

(১) নামেরি ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।

(২) শ্রীদুর্গা নাম ভুল না।

(৩) কেন মন ভোল, শ্রীদুর্গা বল।

মালিশ শেষ হইলে স্বামী তুরীয়ানন্দ উঠিয়া বসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন ঃ

কখনো কখনো কথাবার্তা বন্ধ করে খুব তাঁর জপ করতে পার? দেখ কিছু না থাকলে কিছু জমে না। যে দিন আনে দিন খায়, সে কিছু জমাতে পারে না। কিন্তু একবার খেটেখুটে কিছু জমালে তারপর হু হু করে বাড়তে থাকে। ধর্মজগতেও তাই। দিন কতক খুব খেটে কিছু জমিয়ে নাও। সদা সর্বদা খেতে শুতে বসতে তাঁর নাম কর। কথাবার্তা বন্ধ করে এই নিয়ে লেগে থাক। ঠাকুর কম্পাসের কাঁটার কথা বলতেন। কাঁটা সর্বদাই উত্তর দিকে থাকে। কেউ যদি হাত দিয়ে সরিয়ে দেয়, তবে যাই ছেড়ে দেয় অমনি আবার উত্তরে গিয়ে দাঁড়ায়। তোমার মনও সেই রকম হবে। কেউ এসে যদি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়, তবে যাই সে ছেড়ে দেবে অমনি আবার তাঁর নাম জপ চলতে থাকবে। এই দেখ না, এতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। যাই চুপ করেছি অমনি মনে মনে গান চলছে—"কেন মন ভোল, শ্রীদুর্গা বল"—যা আগে চলছিল। তোমাকে বোঝাবার জন্যে নিজের একটা কথা বললাম। আর খুব গোপনে জপ করবে, যেন কেউ জানতে না পারে।

লোকে বলে তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে। আরে, তাঁর ইচ্ছা কি অমনি হয়? আগে তোমার খানিকটা ডানা ব্যথা হোক, তবে মাস্তুলে এসে বসবে।

প্রশ্ন—কিভাবে নাম করব?

উত্তর—ভাব আর কি? আমি ছেলে, তুমি মা। তাঁর নাম করছি; যেমন আমার সঙ্গে কথা কইছ, এমনিভাবে তাঁর সঙ্গে কথা কইবে। তিনি অন্তর্যামী; ভিতরেই রয়েছেন।

প্রশ্ন—প্রার্থনাও কি করব?

উত্তর—হাঁ, প্রার্থনাও খুব করবে। প্রার্থনা আর তো কিছু নয়, শুধু তাঁতে যাতে মন থাকে, তাঁকে যাতে না ভুলি, এই প্রার্থনা। তা বলবে বই কি? খুব বলবে, কেন তোমাকে ভুলব? তোমাকে ডাকব বলেই তো সব ছেড়েছি। তুমি কৃপা করে তোমাকে ভুলতে দিও না।

প্রশ্ন—ভজনও করব?

উত্তর—হাঁ, এই রকমের ভজন। নইলে একঘেয়ে বোধ হতে পারে। তবে প্রথম জপটার দিকেই বেশি লক্ষ্য দেবে। এক-একটা করে অভ্যাস করতে হবে।

খুব লেগে যাও। মনটাকে একবার বাগিয়ে নিতে পারলে আর ভাবনা কি? মন ব্যাটাই তো যত গোল করে। হাতে কাজ করবে, মনে সর্বদাই তাঁর নাম জপ করবে। শুধু জিহ্বা নাম উচ্চারণ করছে, কিন্তু মন বেগুন পাড়ছে, তাহলে হবে না। জিহ্বা ও মন একসঙ্গে তাঁর নাম করবে। এরই নাম—মন মুখ এক করা। মানস জপই ভাল।

প্রশ্ন—লোকসঙ্গে মিশলে সব গোল হয়ে যায়।

উত্তর—যতদিন ঠিক না হয় ততদিন লোকসঙ্গ করবে না। তারপর অভ্যাস হয়ে গেলে লোকসঙ্গ করলেও ক্ষতি নেই।

আমরা যা করবার খুব করেছি; এখন তোমরা কর তো। আমরা আরও কিছুদিন বেঁচে থেকে দেখি। তখন ঐ একভাবে ছিলাম। এখনও বেশ আছি; তোমাদের সঙ্গ হচ্ছে।

তাঁকে ডাকা তো একটা কাজ। পাঁচ সিকে পাঁচ আনা মন দিয়ে তাঁকে ডাকতে হবে। ডেকে ডেকে তাঁকে অস্থির করে ফেল। ছেলে যখন একটু একটু কাঁদে, তখন মা আসে না। যখন চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, কিছুতেই থামে না, তখন মা এসে কোলে নেয়।

সব তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে।

যশ অপযশ সুযশ কুযশ সকলই মা তোমারি।
রসে থেকে রস ভঙ্গ কর কেন রসেশ্বরী॥

আমার অসুখের কথায় রামদয়ালবাবু* বললেন, "কর্মফল।" তৎক্ষণাৎ আমি বললাম, "তুমি কর্ম ধর্মাধর্ম...।" চণ্ডীতে আছে, "কর্ম-টর্ম যা কিছু সব তাঁ থেকেই হচ্ছে।" তিনিই এক অনাদি অনন্ত। আর কিছু অনাদি আছে কি?

* 'উৎসব' পত্রিকার সম্পাদক রামদয়াল মজুমদার

লোককে বোঝাবার জন্য ও-সব বলতে হবে যে, কর্ম অনাদি—ইত্যাদি। অসুখ বিসুখ ভাল মন্দ—সব তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে যাচ্ছে। এই হলো সিদ্ধান্ত। তিনি যাকে বোঝান সেই বোঝে। তুমি "না" করলে আমার সাধ্য নেই যে, বোঝাই।

কিছু ইচ্ছা করতে নেই। কিছুদিন থেকে দেখছি, যা ইচ্ছা করছি তাই হয়ে যাচ্ছে। তিনবার scraping (ক্ষতস্থান চাঁচা) হয়েও কিছু ফল হলো না দেখে মনে হয়েছিল, সুরেশ ভট্টাচার্য এলে বেশ হয়। অমনি মন বললে, আসবে। তা দেখ, এসে গেল। আরও কয়টা কি কি দেখেছি। সব তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে। এটা একবার উপলব্ধি করা চাই। শুধু বিচারে কিছু হয় না। ঐটে হলো আমাদের resting place (বিশ্রামের স্থান)। কোন ধাক্কা-টাক্কা খেলে আমরা ঐখানে গিয়ে শান্তি পাই।

সাধন-ভজন আর কি? একটা জিনিস রয়েছে, তার সঙ্গে নিজেকে identify (একাত্ম) করে দেওয়া। দুটো তো নেই, একটাই রয়েছে। এক জানাই জ্ঞান, বহু জানাই অজ্ঞান। আমরা তাঁর থেকে নিজেকে আলাদা করেই যত গোলে পড়েছি। তাঁর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেই শান্তি। শান্তি আর কোথাও নেই। তাঁর দিকে যতই এগিয়ে যাবে ততই শান্তি। শেষে তাঁতেই rest (বিশ্রাম) করতে হবে। তুমি কি আর আলাদা? আলাদা ভাবলেই আলাদা। নইলে তুমি তো তিনিই। হার জিত সব তাঁর হাতে।

* * *

একজনের স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছিল। তাঁকে খুব সান্ত্বনা দিয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন ঃ

তাঁকে চিন্তা করুন। ঠাকুরের একটা গল্প শুনুন। একজনের ছেলে কলেরায় মরে গেল, তখন সে রাত জাগার পর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। স্ত্রী এসে জাগালে। বললে, "তুমি কি নিষ্ঠুর! একটু কাঁদলে না? নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুলে?" ঘুমিয়ে সে একটা স্বপ্ন দেখছিল ঃ সে রাজা হয়েছে, তার রানী ও দশ ছেলে আছে ইত্যাদি। তাই সে বললে, "একটু থামো ভেবে দেখি, কার জন্য কাঁদব—তোমার ঐ এক ছেলের জন্য, কি আমার এই দশ ছেলের জন্য?"

পরে তুরীয়ানন্দ মহারাজ বলছেন ঃ শয়তান ও ভগবানের ঝগড়ার কথা শোন। ভক্তকে প্রলুব্ধ করতে ভগবান শয়তানকে পাঠালেন। শয়তান বড় বড়াই করছিল। শয়তান ভক্তের কাছে গিয়ে বললে, "আমাকে ভজ। আমি তোমায় আরও ধন দৌলত দেবো।" ভক্তটি বললে, "শয়তান, এখান থেকে দূর হও।" তাতে শয়তান একে একে তার সব নষ্ট করলে। ছেলেগুলোকে মারলে। শেষে ভক্তের কুষ্ঠ হলো। তখনও শয়তান তাকে প্রলুব্ধ করতে লাগল। তাতে ভক্ত বললে, "ভগবানই দেন, আবার নিয়ে নেন। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

কারো অঙ্গুলি-নির্দেশের মধ্যে যেতে নাই। খুব গোপনে তাঁকে ডাকতে হয়, যেন কেউ জানতে না পারে। দশজন জানলেই তোমার পেছনে লেগে তোমাকে নষ্ট করে দেবে। আর স্বাধীনতা চলে যায়।

২৭ ডিসেম্বর ১৯১৫

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলছেন ঃ

সন্ত ওহি হ্যায় যো রাম-রস চাখে।

তুলসীদাস বলেছেন ঃ জগতে চারটি জিনিস সার; "সাধুসঙ্গ, হরিকথা, দয়া, দীন-উপকার।"

সঙ্গ থেকেই তো সব। "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ।" Tell me what company he keeps and I will tell you what he is! (আমাকে যদি বল তার সঙ্গী কারা, আমি বলে দেব সে কিরূপ লোক)। সাধু-সঙ্গে মন শুদ্ধ হয়। অবশ্য ঠিক ঠিক সাধু চাই; ভেকধারী হলেই সাধু হয় না। সাধু সেই যে ভগবানকে আপনার করেছে। ভগবান লাভ হলে "জগদিদং নন্দনবনং সর্বেঽপি কল্পদ্রুমাঃ"—(এই জগৎ নন্দনবন, সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ)।

স্বামী তুরীয়ানন্দ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "বৈজ্ঞানিক জগৎ" বইখানি পড়ছিলেন, সেই প্রসঙ্গে বলছেন ঃ

"Survival of the fittest" theory (যোগ্যতমের উদ্বর্তন মতবাদ) অনুসারে সকলে বৃদ্ধি পাচ্ছে—ইনি এইটি দেখিয়েছেন। হ্যাঁ amoeba

(অ্যামিবা) থেকে মানুষ হওয়া পর্যন্ত ঐ theory true (মত সত্য) বটে, কেননা এতদিন স্বার্থটাই ছিল প্রধান লক্ষ্য; কিন্তু মানুষ হওয়ার পর আর এক theory (মতবাদ) হয়; এখন লক্ষ্য ভগবান। এখন স্বার্থকে যে যত ভুলতে পারবে, সে তত তাঁর দিকে এগোবে।

স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, একে তো জগতের কিছু বুঝা যায় না। তাও যদি আজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করে মনে হলো যেন কিছু বুঝেছি এবং যাই জগৎকে সেটা দেব ভাবছি—অমনি বললেন, "চলে আয়, চলে আয়। আর দিতে হবে না।" খেলাটা ফুরিয়ে যায়, এটা বুড়ির ইচ্ছে নয়।

সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীত) মঠ ছেড়ে বাড়ি যেতে চাইলে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তাকে বুঝাচ্ছেন, "কেন যাবি? নরেনকে ছেড়ে কোথায় যাবি? এত ভালবাসা আর কোথায় পেয়েছিস? আমিও তো ইচ্ছা করলে বাড়ি গিয়ে থাকতে পারি। আমি তবে কেন পড়ে রয়েছি? ঐ এক নরেনের ভালবাসার জন্যে।"

সাপ ডিম পেড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা ধরে বসে থাকে। কিন্তু যেই ডিম ফুটতে থাকে অমনি এক একটি করে খেয়ে ফেলে। যেটি ছটকে বেরিয়ে যায়, সেইটেই বেঁচে থাকে। সেইরূপ মহামায়াও জগৎ প্রসব করে ফণা ধরে বসে আছেন। যে তার নিকট থেকে ছট্‌কে পালাতে পারে, সেই বেঁচে যায়।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৬০ বর্ষ ৯, ১০, ১১ ও ৬১ বর্ষ ১ সংখ্যা)

স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কাশী

১ জুলাই ১৯২০

আমাদের ঠাকুরের কথা হচ্ছিল ঃ

স্বামী তুরীয়ানন্দ—ঠাকুর বলেছিলেন, "মা, কাম যদি হয় গলায় ছুরি দেব।" কি কথা! ঠাকুরের বুকে একবার একটু [কামভাব] ছাঁৎ করে উঠেছিল। অমনি আছাড় পিছাড় খেয়ে, এসে মার কাছে পড়লেন। ওঁর যে মন তাতে তিনি নিশ্চয়ই ওরূপ করতেন—যা বলা তা করা। যিনি এরূপ বলতে পারেন তাঁকে কি মা ওতে ফেলেন? এরূপ বলতে পারলে নিশ্চয়ই হয়। কে জানে!

কামাদিদোষরহিতং কুরুমানসপঞ্চ—কি কথা!

বুড়ো বয়সে কাম হলে তো ভারি বিপদ! একজন বলেছিল বুড়ো বয়সে নাকি ওসব বেশি হয়। ইচ্ছা আছে অথচ ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি শিথিল, সে তো ভারি বিপদ। রোধ করবার strength (শক্তি)ও তখন কমে যায়।

আচ্ছা এই কামটা কি? একটা বৃত্তি বিশেষ বইতো নয়!

ভক্ত—দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের একটা আনন্দ বিশেষ।

স্বামী তু—এর ভিতরে তো একটা Psychology (মনস্তত্ত্ব) আছে? সেটা কি—না এক হয়ে যাবার ইচ্ছা। এটাও সেই প্রেমের একটা aspect (প্রকাশবিশেষ)। তবে মানুষ ভুল করে। Gross (স্থূল) থেকে আরম্ভ করে বলে এটাকে সেই শুদ্ধ বস্তুতে নিয়ে যেতে পারে না। কারো কারো কিন্তু এ থেকেও হয়েছে, যেমন চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের কথা শুনেছ তো?

"রজকিনীরূপ কিশোরীস্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়"—কামগন্ধ নাহি তায়।

কেমন কথা! আর বিল্বমঙ্গল, তুলসীদাস। তুলসীদাস বড় স্ত্রৈণ ছিলেন। স্ত্রী বাপের বাড়ি যাচ্ছিলেন আর তুলসীদাস তার পেছনে পেছনে যাচ্ছিলেন। স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললেন, "এর এক তিলও যদি ভগবানে দিতে পারতে তবে তাঁকে লাভ করতে পারতে।" অমনি বিবেক এসে গেল। ওঁদের ও থেকেই বিবেক এসে যায়। প্রেম ও কাম দুটো খুব পাশাপাশি কিনা। তাই ঠাকুর বলতেন, "কাম অন্ধ, প্রেম নির্মল ভাস্কর।" মানুষবুদ্ধি থাকলে কাম, আর ভগবদ্বুদ্ধি থাকলেই প্রেম।

ভক্ত—আচ্ছা গোপীদের তো আর প্রথমে ভগবদ্বুদ্ধি ছিল না, প্রথমটা তো তাদের স্থূলেতেই আসক্তি ছিল?

স্বামী তু—তা তো নয়। ভাগবতে গোপীদের স্তবে দেখা যায় যে গোড়া থেকেই গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভগবদ্ভাব ছিল। গোপীরা যখন তাঁর কাছে যান, তখন তিনি তাঁদের চলে যেতে বললে তাঁরা বললেন, "আমরা স্বামী, পিতাপুত্র, আত্মীয়, বান্ধব সব পরিত্যাগ করে তোমার কাছে এসেছি, আর যাবই বা কোথায়? তুমি যে অন্তরাত্মারূপে সকলের ভিতর।"

গোপীদের শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ concentration (মনের একাগ্রতা) হয়েছিল। একটাতে concentration হলেই ভগবদ্ভাব প্রকাশ পায়। কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, এর যে কোনটার দ্বারা তন্ময়তা হতে পারে। কাম—যেমন গোপীদের, ক্রোধ—যেমন কংসের, ভয়—যেমন শিশুপালের, স্নেহ—যেমন মা যশোদার ইত্যাদি।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহং ঐক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥

—ভাগবত ১০।২৯।১৫

কিন্তু মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হলে কি ওসব হয়? তুমিও যেমন।

প্রেম যদি হয় তবে অবশ্য ভাজন,
আছে ক্ষুধা নাহি অন্ন না হয় এমন।

২ জুলাই ১৯২০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আজ বেদান্ত হলো?

ভক্ত—আজ্ঞে হাঁ।

স্বামী তু—কি হলো? "তত্তু সমন্বয়াৎ?"

ভক্ত—আজ্ঞে হাঁ। "পরিণামী নিত্য" ও "কূটস্থ নিত্য" নিয়ে যে বিচার, সেটাই হলো।

স্বামী তু—"পরিণামী নিত্য" কথাটাই সোনার পাথর বাটির মতো। সাংখ্যের মতো বুঝি এটা? সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ, তমের বিকারই সৃষ্টি। ডাক্তার সুরেশ ভট্টাচার্য একদিন ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করেছিল, তিন গুণ নিয়ে প্রকৃতি। গুণের যদি বিকার হলো, তবে প্রকৃতির প্রকৃতিত্ব থাকে কই? আমি বললুম, সবটাই তো আর বিকার হচ্ছে না, কতকটা নিয়ে বিকার হচ্ছে। প্রকৃতি আর বিকৃত-প্রকৃতি। যেমন দুধ দই হলেও সব দুধ তো আর দই হয়নি—কোথাও না কোথাও দুধ থাকেই। বেদান্ত পুরুষ আর প্রকৃতিকে অভিন্ন বলেছেন। (নিজ শরীর দেখাইয়া) এখানেই দেখ না, প্রকৃতি ও পুরুষ দুই-ই রয়েছেন। যেমন—একটা ছোলার ভিতরেই দুইটা দানা। "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি" ইত্যাদি শ্লোক, "য এবং বেত্তি পুরুষং" ইত্যাদি। সাধন আর কি? এই প্রকৃতিকে শুদ্ধ করা। বৈষ্ণবেরা বলেন, এক কৃষ্ণই পুরুষ আর সবই প্রকৃতি। মহাপ্রভু বলতেন, "প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ"—প্রকৃতি কি কখনও প্রকৃতিকে চায়? প্রকৃতিকে পুরুষপর করতে হবে। মীরাবাঈ বৃন্দাবনে গিয়ে সনাতনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি স্ত্রীলোক বলে সনাতন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অসম্মত হলেন। তিনি মহা বৈরাগী ছিলেন কিনা। তা শুনে মীরা বললেন, "বৃন্দাবনে এক শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ জানি। আবার কে পুরুষ এলো? তাকে দেখতেই হবে।" তারপরে দুজনের দেখা হলো। উভয়ই উচ্চ সাধক কিনা, খুব আনন্দ হলো। সনাতন এই বলে তাঁকে প্রণাম করলেন, "শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানও আমার জন্মস্থান।" নিজের সঙ্গে না মিলিয়ে পড়লে বেদান্ত পড়া কিছুই হয় না।

এইসব কথা হচ্ছে এমন সময়ে একজন যুবক তথায় এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণত হলো। যুবক কুমিল্লা দেশীয়। তত্রত্য কোন মহাপুরুষের নিকট হতে ব্রহ্মচর্য ও মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে ১১ বৎসর চট্টগ্রামে কয়েকজন গুরুভাইয়ের নিকটে থেকে ভজন ও সৎসঙ্গে কালাতিপাত করেন।

(যুবকের প্রতি) তোমাতে বৈরাগ্যের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তোমার কি রকম বৈরাগ্য? ঠিক বৈরাগ্য, কি "কারণ" বৈরাগ্য? যদি কোন কারণে বৈরাগ্য হয়ে থাকে তবে সে কারণটা চলে গেলেই বৈরাগ্যও চলে যায়। তোমাকে intern (অন্তরীণ) করেছিল নাকি?

যুবক—আজ্ঞে না।

স্বামী তু—যা হোক, বৈরাগ্য হওয়া, সে তো সৌভাগ্যের কথা। বৈরাগ্য আর কি? আত্মানাত্মবিবেক। আত্মানাত্মবিবেক, প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক—এইগুলো সব Synonimous terms (একার্থক শব্দ)।

যুবককে কাশীতে থাকার কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, "সুবিধা হলে সে কাশীতেই থাকবে।"

স্বামী তু—সদ্ভাব থাকলে ভারতবর্ষের তো কথাই নাই, সব দেশে থাকা যায়।

সভী ভূমি গোপালকী জহাঁ মে অটক কহাঁ।
জাকে মনমে অটক হৈ তাকে অটক রহা ॥

—এটা খুব বড়লোকের কথা। জান কার? রঞ্জিত সিং-এর সেনাপতি হরি সিং-এর কথা। আফগানরা Frontier-এ (সীমান্ত প্রদেশে) নানা উৎপাত করতে আরম্ভ করে। তাদের তাড়া করলে তারা আটক পার হয়ে থাকত। আটক পার হলে ধর্ম নষ্ট হবার ভয়ে তাদের দমন করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তখন হরি সিংকে ডাকিয়ে তার প্রতিবিধানের পরামর্শ চাইলে তিনি ঐ কথা বলেন। তিনি আটক পার হয়ে ওদের রীতিমত শিক্ষা দিয়ে আসলেন। হরি সিং বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু কেমন জ্ঞানের কথা, পরমহংসের মতো কথা! সদ্ভাব নিয়ে

যেখানেই থাকবে, সেখানেই ভাল থাকবে। তিনিই তো সৎ—তিনি ছাড়া সৎ কিছু কি আর আছে? আর একটি ছোট গল্প তোমাদের বলছি। মনে আছে তো, দণ্ডকারণ্যে সীতা-হরণের পর ভ্রমণ করতে করতে রাম-লক্ষ্মণ একটি মনোরম স্থান দেখতে পান। সেখানেই চাতুর্মাস্য যাপন করতে ইচ্ছুক হয়ে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, "লক্ষ্মণ, দেখে এস, এখানে কেউ আছেন কিনা! তাঁর বিনা অনুমতিতে কেমন করে থাকি?" লক্ষ্মণ ইতস্তত ভ্রমণ করে বন মধ্যে একটি শিবমন্দির দেখতে পেলেন, কিন্তু লোকজনের চিহ্নমাত্র দেখতে পেলেন না। ফিরে এসে রামকে বলায়—রাম সানন্দে বললেন, "বেশ হয়েছে, শিবই এই স্থানের অধিষ্ঠাতা! তাঁর অনুমতি নিয়ে এস।" লক্ষ্মণ রামের আদেশে মন্দিরে গিয়ে অনুমতি চাইলে লিঙ্গ হতে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ বের হয়ে এলেন এবং এক বিশেষ ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ নৃত্য করে অন্তর্হিত হলেন। লক্ষ্মণ অবাক হয়ে ফিরে এসে রামকে সকল বিষয় বললে রাম বললেন, "কুটির বাঁধ, অনুমতি হয়েছে।" লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কিরূপ?" রাম বললেন, "রসনা ও কাম আপন বশে রেখে এখানে কেন, যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আনন্দে থাক।"

পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থনিমিত্তক।
জিহ্বোপস্থ পরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিং প্রয়োজনম্ ॥

যত কিছু গোল তা তো ঐ রসনা ও কাম নিয়ে। হিমালয়ে কত নির্জন সাধনার অনুকূল স্থান আছে, সাধুরা সেখানে থাকতে পারে না কেন? জিহ্বার দায়ে। খাবার লোভে তাদের সেসব স্থান ত্যাগ করে আসতে হয়। আর দেখ না, সাধুরা যে এক স্থানে নিরুপদ্রবে থাকতে পারে না, তার কারণ কি? হয়ত জিহ্বার দোষে লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে, না হয় খাবার লোভ, না হয় কামের তাড়না। সেই জন্যই সাধু যদি এক স্থানে নিরুপদ্রবে বার বৎসর থাকতে পারে, তবে সে "আসন সিদ্ধ"। বার বৎসরের সংযম সে কি কম কথা! ইন্দ্রিয় জয় বড় শক্ত কথা। "মরবে নারী উড়বে ছাই তবে নারীর গুণ গাই।" একটি গল্প আছে। আকবর বাদশা একদিন বীরবলকে বলেছিলেন, "তোমার মার কাম গেছে কিনা জিজ্ঞাসা করে এস।" বীরবলের মার বয়স তখন আশি

বৎসরের ওপর। আর বীরবল কি করেই বা মাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে? অথচ বাদশার হুকুম। বীরবল মহা মুশকিলে পড়ে গেল। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করল। বীরবলের মা মহা বুদ্ধিমতী—বীরবলের মা, বুঝতেই পার—তিনি কিন্তু সব বুঝলেন। বীরবলকে বললেন, "কোন চিন্তা নাই, তুই খা-দা। যখন দরবারে যাবি, আমার কাছ থেকে জবাব নিয়ে যাবি।" দরবারে যাবার সময় মা বীরবলের হাতে একটা বিশ-কৌটা দিয়ে সেটা বাদশাকে দিতে বললেন। কৌটা পেয়ে বাদশা সেটা খুললেন। তার মধ্যে একটার ভিতরে আর একটা করে অনেক কৌটা ছিল—সব শূন্য। সকলের শেষ কৌটাতে দেখলেন, একটু ছাই রয়েছে। বুঝলে তো?

রসনা আর কামকে জয় করলেই সব গোল মিটে গেল। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস নিতে কেশব ভারতীর কাছে গেলেন, তখন কেশব ভারতী তাঁকে দেখে বললেন, "তোমার এই উদ্দাম যৌবন ও অতুলনীয় রূপ, তোমাকে কে সন্ন্যাস দেবে?" প্রভু বললেন, "আপনারা তো অধিকারী দেখে সন্ন্যাস দিয়ে থাকেন। আমি যদি অধিকারী হই তবে আমাকে সন্ন্যাস দিতেই হবে। আপনি পরীক্ষা করে দেখুন, আমি অধিকারী কিনা।" ভারতী মহাপ্রভুকে বললেন, "তোমার জিব দেখি।" মহাপ্রভু জিব বার করলে তিনি খানিকটা চিনি তাঁর জিবে দিলেন। যেমন চিনি তেমনি রইল। একটুও ভিজল না। ফুঁ দিতেই সব চিনি জিব হতে উড়ে পড়ে গেল। আর অপর পরীক্ষার দরকার হলো না।

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্বং জিতে রসে ॥ —ভাগবত, ১১।৮।২১

জিহ্বা জয় হলেই কামও জিত হয়। ইন্দ্রিয়সংযম না হলে কিছুই হবার যো নেই। সমগ্র গীতাতে এ কথা বারবার আছে—

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ —গীতা, ৩।৪১

একটা ইন্দ্রিয়ও অসংযত থাকলে সব তপস্যা, সব আয়াস পণ্ড হয়ে যায়। যেমন কলসিতে একটি মাত্র ফুটো থাকলে সব জল তা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ঠাকুরের সেই চাষার আখের ক্ষেতের জল দেওয়ার গল্প জান তো? ঘোগ দিয়ে সব জল বেরিয়ে গেল, এক ফোঁটা জলও ক্ষেতে যায়নি।

ইন্দ্রিয়াণাং হি সর্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্ ॥—মনু, ২।৯৯

"রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।" জোর করে কি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হয়? তাঁকে পেলে তবে সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-সংযম হয়। তবে প্রথমটা জোর করে চেষ্টা করে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হয়। পরে সেটা স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু সাহস করতে নেই।

বুদ্ধিমান ব্যাধ যেমন মৃগকে ধরে তাকে বেঁধে রাখে সেই রকম ইন্দ্রিয়-সংযম করে, শমদম অবলম্বন করে সাবধানে থাকতে হয়।

সিদ্ধাই সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা হলো।

জিজ্ঞাসায় জানা গেল আগন্তুক যুবক অসিঘাটে থাকেন। কথায় কথায় মগ্নীরাম বাবার কথা উঠল। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর একনিষ্ঠ হয়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রতের অনুষ্ঠান করে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। সম্প্রতি সন্ন্যাস নিয়ে দুর্গাবাটির নিকটে একটি বাগানে আছেন। মহা ত্যাগী, কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা বড় একটা বলেন না।

তারপর নিষ্ঠার কথা এল। স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন—"দৃঢ় নিষ্ঠা না থাকলে বস্তুলাভ হওয়া অসম্ভব।"

অপর একটি যুবক সাধুর কথা উঠল। তিনিও কঠোর তপস্বী। কিছুদিন পূর্বে এখানে এসেছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৌনী হয়ে আছেন। তাঁর কথা হতে লাগল।

স্বামী তু—সে এখানে প্রায়ই আসত, কিন্তু মৌনী। আমি বললাম, "মৌনী টৌনী এসব তো দেখে নিলে, আর কেন? এখন কথা-টথা বল। সিদ্ধাই টিদ্ধাই—চাই না কি?" সে হাসত। খুব দৃঢ়তা তার। আর খুব Sincere (অকপট)।

(আগন্তুক যুবকের দিকে চেয়ে) একে দেখে মনে হচ্ছে এ অভ্যাসী ছেলে। (অপর সকলের দিকে চেয়ে) তোমরা কিছু বুঝতে পারছ না? আমি কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি। মন স্থির হওয়ার একটি লক্ষণ—দৃষ্টি স্থির হওয়া। মন স্থির হলেই দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়। আকার প্রকারে চাঞ্চল্যের ভাব থাকে না।

(যুবকের প্রতি সহাস্যে) তোমার কি চাই! সিদ্ধাই টিদ্ধাই চাই না তো?

(সকলের প্রতি) শেষ রক্ষা হলেই রক্ষা। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা শক্ত। সাধকের এইসব আপনা থেকেই কখনো কখনো আসে। কিন্তু ঐটের দিকে মন দিলেই ব্যস, তার সব হয়ে গেল। সেটাও কিন্তু থাকে না। নিজের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করলে তো কথাই নেই, অন্য রকমেও তা থাকে না। মানুষ বাড়ি থেকে বেরুল সাগরের রত্ন নেবে বলে। তীরে এসে নানা রকম রঙ-চঙে পাথর, ঝিনুক, শামুক দেখতে পেয়ে কোঁচড় ভরে তাই নেয়, সমুদ্রের রত্ন নেওয়া আর হয় না। মহামায়া সব ভুলিয়ে দেন।

কঠোপনিষদে নচিকেতাকে যম বলেছেন—

ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মাঽনুপ্রাক্ষীঃ ॥

—কঠ, ১।১।২৫

আর দেখ নচিকেতা কি বলেছেন—

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ, সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব, তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥

—কঠ, ১।১।২৬

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো, লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং, বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥

—কঠ, ১।১।২৭

যম যেমন নচিকেতাকে ভোলাতে চেষ্টা করেছেন, সেইরূপ মহামায়া সকলকে ভুলিয়ে দিচ্ছেন। ঠাকুরের সেই কথা জান তো? হৃদয় একদিন ঠাকুরকে বলেছিলেন—"মার কাছ থেকে কিছু সিদ্ধাই চেয়ে নাও না।" তাঁর

বালকের স্বভাব—তিনি মার কাছে গিয়ে চাইতে, মা ভাবে দেখিয়ে দিলেন—একটা বেশ্যা মলত্যাগ করছে, আর মা সেই বিষ্ঠার দিকে দেখিয়ে বলছেন—এই সিদ্ধাই, নেবে? ঠাকুর ফিরে এসে হৃদয়কে খুব গালাগাল দিলেন। কি ব্যাপার বোঝ একবার! বাস্তবিকই তো এসব অত্যন্ত ঘৃণিত বস্তু নয়ত কি? এতে আছে কি? ঠাকুর বলতেন—"ধোপা ভাঁড়ারী"—এতে তোমার কি? তাঁরই তো জিনিস, তোমার ভিতর দিয়ে একবার pass করিয়ে চালিয়ে নিচ্ছেন বই তো নয়। সেই হাতি মরা-বাঁচার গল্প। হাতি মরল বা বাঁচল তাতে তোমার কি? (যুবকের প্রতি) ওসব নয়। চাই ভক্তি। ভক্তি যদি হলো তবে আর কি চাই? নারদ একবার খুব কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তখন তিনি দৈববাণী শুনতে পেলেন,

অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥ ইত্যাদি। (নারদ-পঞ্চরাত্র)

যদি অন্তরে বাহিরে হরি সর্বদা বিরাজিত থাকেন তবে তপস্যা বৃথা। শরীর পোষণাদি—করবে আর কিসের জন্য? আর অন্তরে বাহিরে হরি যদি না রইলেন তবে তপস্যার দ্বারা কি হবে? অর্থাৎ তাকে অবলম্বন করে তপস্যা করতে হবে। আমাদের দেশে কিন্তু এখন তপস্যার বড় অভাব হয়েছে। কই, সে রকম তপস্যার কথা আর শুনতেই পাওয়া যায় না। বেদান্ত-চচ্চড়ি হয়ে এসব হয়েছে আর কি! তপস্যা না করলে কি বেদান্তের তত্ত্ব বোঝা যায়? এ "বিচার সাগর" না "বিগাড় সাগর"—তাইতে দেশকে বিগড়ে দিয়েছে। মুখে লম্বা লম্বা কথা, "সোই তো হ্যায়, জগৎ তো তিন কালমে হ্যায় নহী।" আরে রাম, তুমিও যেমন! এগুলো কি একটা কথা? তপস্যা না করলে কি বেদান্ত বোঝার জো আছে?

স্নানের সময় হলো। (যুবকের প্রতি) মাঝে মাঝে এস। যুবকটিকে একটি আম দেওয়া হলো।

৩ জুলাই, সন্ধ্যা ৫ ঘটিকা ১৯২০

বাইরের লোক এলে অনেক সময়ই মহারাজ শ্রোতার উত্থাপিত বিষয়ে আলাপ করতে থাকেন। দুর্গাচরণবাবু রাজনীতি বিষয়ের কথা পাড়লেন। ঐ কথাই চলতে লাগল। এমন সময় বৃদ্ধ রক্ষিত মহাশয় আসলেন। প্রণামান্তর রক্ষিত মহাশয় বললেন, "আপনাদের কি প্রসঙ্গ হচ্ছিল?"

হরি মহারাজ—উনি দেশের রাজনীতির কথা বলছিলেন। রক্ষিত মহাশয় ধর্মপ্রসঙ্গ উত্থাপনোদ্দেশ্যে বললেন, শেষ করে ফেলুন না।

হরি মহারাজ—যার আরম্ভ নেই, তার আর কি শেষ থাকবে?

মনু বলেছেন—

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্বিধম্ ॥ —১২।৬

অর্থাৎ বাঙ্ময় পাপ হচ্ছে এই চারটি—কটু কথা, মিথ্যা কথা, বাজে আবোল তাবোল বকা ও পেঁচাও কথা।

উপনিষদেও বলেছেন, "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের আলোচনা ব্যতীত অন্য আলাপ সব ত্যাগ কর—

গোবিন্দ! গোবিন্দ!

ফল preserve করা (কৃত্রিম উপায়ে বহুদিন রাখা) সম্বন্ধে কথা উঠল। দুর্গাচরণবাবু ঐ প্রসঙ্গে বললেন, বড় ডুমুর হালুয়ার মতো খাওয়া যায়।

হরি মহারাজ—মাউন্ট আবুতে প্রথম শাকসবজি শুকিয়ে রাখতে দেখি। তারপর যখন অন্যান্য পাহাড়ে বেড়াই, তখন তো বিস্তরই দেখেছি। রান্নার আগে কিছু জল দিয়ে নেয়।

মধুতে ভিজিয়ে রেখে ফল রক্ষা করার কথা হলো।

হরি মহারাজ—কলকাতায় দেখেছি, দেশী লোক maple syrup (খেজুর রসের মতো একপ্রকার মেপল গাছের রস—তা থেকে চিনি প্রস্তুত হয়) খাচ্ছে।

ওরাও (সাহেবরা) লুচি, কচুরি, পোলাও খাচ্ছে, সন্দেশও খাচ্ছে। এই হচ্ছে আদান প্রদান।

তবে এখন কথা হচ্ছে—আমাদের বর্তমানে কি রকম করে চলতে হবে। কেউ কেউ বলছে পাঞ্জাবের এই কাণ্ডের (জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের) পর আর কি মিলন সম্ভবপর হবে? মোট কথা হচ্ছে, নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে হবে।

(দুর্গাচরণবাবুর প্রতি) আপনি অরবিন্দ ঘোষের লেখা টেখা পড়েন? ওঁরা বলছেন, ধর্মকে এসবের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। আমি বলি এও কি কখনও হয়? ওঁরা বলেন, বেদে ওসব কথা যদি না থাকে, নূতন বেদ তাঁরা তৈরি করে নেবেন।

নিজেদের প্রবুদ্ধ হতে হবে। পরের দিকে বেশি চাইলে চলবে কেন? দেশে তেমন লোক নেই। সারা দেশে এক গান্ধী শিবরাত্রির সলতের মতো টিম টিম করছে। আমাদের দেশে অন্নকষ্টে লোক না খেতে পেয়ে মরছে—আবার শুনছি ছ-টাকা সুদে লোন তুলছে। ব্রাহ্মণদের, সাহেবদের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। ব্রাহ্মণেরা যে সকলের ওপর অত্যাচার করেছে, এ কথাটা এরাইতো নানা রকমে আমাদের শিখিয়েছে। প্রকৃত কথা তো ঠিক তা নয়। প্রজার জন্যই তো রাজা। রঞ্জনাৎ রাজা—প্রজারঞ্জন করার জন্যই রাজা। আমাদের তো আর রাজা নেই। তার জন্যই তো নাম দিয়েছে Bureaucracy (আমলাতন্ত্র শাসন)। এই যে Reform (শাসন সংস্কার) এতে Democracyর (গণতন্ত্রের) নামটিও নেই। এত কষ্ট রাজা থাকলে কি হতো? এক মাথা সিধে করে আছে গান্ধী। Moderateরা (নরমপন্থীরা) তো অনেকটা Bureaucracyর (আমলাতন্ত্রের) দলে। তিলকও moderate partyর মতো বলছেন, Co-operation when necessary and opposition where required (প্রয়োজন হলে গভর্নমেন্টের সহযোগিতা আবার আবশ্যক হলে বিরুদ্ধাচরণ)।

সব তো দেখা গেল, এখন আমাদের একমাত্র গতি হচ্ছে education, education (শিক্ষা, শিক্ষা)। স্বামীজী কি বলে গেছেন? দেখাই তো যাচ্ছে,

national line এ education চাই (জাতীয়ভাবে শিক্ষা)—ওদের line এ education দিলে হবে না। Dr. P. C. Roy বলছেন বহু B. A., B. Sc. দেশে হয়েছে, আর High education (উচ্চশিক্ষা) দিয়ে কি হবে? এমন শিক্ষা দাও যা দিয়ে পেট ভরে দুমুঠো খেতে পায়। খেতে দাও। কেবল টাকা টাকা করে লোকের কি দুর্দশাই হয়েছে।

পূর্বে দেশের অবস্থা কেমন ছিল!

গঙ্গা নাইতে দেখা হলো, কত বিশ্বাস একের প্রতি অপরের হয়ে গেল। এখন বাবা, কাগজ লিখে দিলেও নিস্তার নেই। সুরেশ ডাক্তার বললেন, কলকাতায় কত জোচ্চোরেরা যৌথ কারবার খুলছে। এ দিকে খাতাপত্রে সব ঠিক রেখেছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দেদার টাকা খেয়ে নিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করে। এসব ওদেশের মন্দ লোকদের অনুকরণ বই আর কিছুই নয়। ভারি মুশকিল। ওদের গুণগুলো আমরা শিখতে পারিনি, দোষগুলো চট করে শিখে নিয়েছি। দেশের অবস্থা শোচনীয়। ভাল লোক জন্মাচ্ছে না।

দৈবের প্রতি নির্ভর করে উপযুক্ত নেতার অপেক্ষা করা উচিত কি না—এ প্রসঙ্গে দুর্গাচরণবাবু বললেন, "ভূদেববাবু কল্কি অবতারের কথা বলে গেছেন। সেই প্রসঙ্গে বলছেন, দেশে সুলোকের প্রয়োজন। এক Voltaire ও Rousseauর লেখার চোটে কি সব কাণ্ড হলো। দেশের লোকের যখন সুমতি হবে ও তারা এককাট্টা হতে পারবে, তখন দেশে প্রকৃত নেতার আবির্ভাব হবে। বঙ্কিমবাবুও লিপিকুশলতার কথা বলেছেন। কিন্তু লিপিকুশল লোক তেমন জন্মাচ্ছে না। হিমালয়ের পাঁচটা শৃঙ্গের মধ্যে যেমন একটা শৃঙ্গ সবচেয়ে উঁচু, তেমনি একজন অতি শক্তিশালী নেতার দরকার।"

হরি মহারাজ—রুশিয়ার বিপ্লববাদের মূলে টলস্টয়ের লেখনিচালনাকে অন্যতম প্রধান কারণ বলা যেতে পারে। তিনি একজন খুব সাধুপুরুষ ছিলেন এবং সাধারণ প্রজাদের যাতে কল্যাণ হয়, রাজশক্তি তাদের দাবিয়ে যাতে তাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট না করে দিতে পারে, তার জন্য তাঁর বিশেষ চেষ্টা ছিল। এমন কি তিনি নিজে সর্বস্ব ত্যাগ করে সামান্য কৃষকজীবন যাপন করতে

আরম্ভ করেছিলেন। রুশিয়ার রাজশক্তি শেষে রুশিয়া থেকে তাঁকে নির্বাসিত করলে। কিন্তু দেখছ না প্রজাশক্তি এখন চারিদিকে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে জগৎ গ্রাস করতে চাচ্ছে। এসবকে আমরা অবশ্য অবিমিশ্র ভাল বলছি না। এটা একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। তবে কিনা কতকগুলো খারাপ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে বলে এরও একটা সার্থকতা আছে। এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে একটা সহজ স্বাভাবিক অবস্থা দাঁড়াতে পারে। আবার এখনকার বিপ্লববাদীরা টলস্টয়কেও ছাড়িয়ে চলেছে। কথায় বলে না, বিশ্বকর্মার বেটা বেয়াল্লিশকর্মা—বাপের চেয়ে ছেলে দড়—কালে সব ঠিক হয়ে যাবে।

উপস্থিত—জনৈক ব্রহ্মচারী এবং অনাথাশ্রমের একটি বয়স্ক ছাত্র।

স্থান—সেবাশ্রমের বটগাছতলায় মাঠের বেঞ্চ।

সময়—সন্ধ্যা ৭টা।

হরি মহারাজ—বড় গরম।

ব্রহ্মচারী—এখন কিছু বৃষ্টি তো পড়েছে।

হরি মঃ—কই, বেশি বৃষ্টি কোথায় হলো? আজ বাইরে শোব। কাল রাত্রিতে দুটো অবধি বাইরেই ঘুমিয়েছিলাম। ওরা মশারির ওপর একটা চাদর দিয়ে দিয়েছিল। তারপর যখন মশারির ভেতর থেকে টপ টপ করে জল পড়তে শুরু হলো, তখন ওপরে উঠে গেলাম। শরীরের সুখের জন্য লোক কত করে। দিনরাত ঐ কচ্ছে। তবু কি আর শরীর ভাল থাকে?

ব্রহ্মচারী—মহারাজ, Elizabeth Hemansএর (এলিজাবেথ হিম্যানের) একটা কবিতার ভাব এই যে, দুটি ছেলে দুই বিভিন্ন অবস্থাতে জন্মালেও যদি উভয়কে একই প্রকার শিক্ষা দেওয়া যায় ও একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেতর রাখা যায়, তাহলে ফল একই রকম হয়। ওরা তো সংস্কার-টংস্কার মানে না। শরীরও প্রথম সকলেরই এক প্রকার থাকে—তারপরই যে যত প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে, সে তত ভোগে এবং তাইতেই শরীরের ভেদ হয়ে যায়।

হরি মহারাজ—তা কি সবসময় হয়? একসঙ্গে পাঁচটি ছেলে থাকলেও

তারা পাঁচ রকম হয়ে যায়। ওদের পুনর্জন্ম ইত্যাদির ধারণা নেই কিনা—তাই সংস্কার-টংস্কার বোঝে না। কেউ কি একটা Tabula rasa (দাগশূন্য ফলক অর্থাৎ কোন প্রকার সংস্কাররহিত মন) নিয়ে আসে?

ব্রহ্মচারী—আমাদের শাস্ত্র বলে, আত্মা ক্রমে হীন দেহ থেকে উচ্চতর দেহ আশ্রয় করে। ডারউইনের মত থেকেই ওদের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে ক্ষীণ আভাস এসেছে।

একটি শুদ্ধাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বালককে কেউ ডারউইনের অজুহাতে বানরের বংশধর বলায় হরি মহারাজ বললেন—

কি পাগলের মতো বকছো? ও সুসংস্কার সম্পন্ন ব্রাহ্মণের ছেলে—বানরের বংশধর হতে যাবে কেন? পাণ্ডিত্যের বা আধুনিক বিজ্ঞানের মত বলেই কি তা সত্য বলে ধরে নিতে হবে? বিজ্ঞান তো দেখছি, আজ যে সিদ্ধান্ত করে কালই তার কত উড়ে যায়। ডারউইনের মত যারা মানে মানুক, আমাদের শাস্ত্রে মানব সৃষ্টির দুটো মতবাদ পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে তবে মনুষ্যজন্ম পাওয়া যায়। এটা অনেকটা ডারউইনের মতের মতো। তবে ডারউইন হচ্ছেন জড়বাদী আর আমাদের শাস্ত্র হচ্ছেন আত্মবাদী। ডারউইন বলেন, এই স্থূলশরীরটারই ক্রমবিকাশ হয়। আর একটা হচ্ছে ভগবান থেকে নেবে আসা। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা প্রথমত সনৎকুমার প্রভৃতি কুমারদের সৃষ্টি করলেন। তাঁদের তখন ব্রহ্মা বললেন, "সংসার কর।" তাঁরা ভগবান থেকে নেবে এসেছেন কিনা, তাই তাঁরা বললেন, "ও কি কথা। আমাদের দ্বারা সংসার হবে না।" তারপর ব্রহ্মা প্রজাপতিদের সৃষ্টি করলেন। তাঁরা সংসার করতে রাজি হলেন। এ তো সোজা কথা, এ তো আমরাই দেখতে পাচ্ছি। এখনও দেখতে পাওয়া যায়, কত লোকের জন্মাবার পর থেকেই বিয়ে-টিয়ের ভাব-টাব নেই। এরাই হচ্ছে কুমার। যাদের পুত্রোৎপাদনের শক্তি জন্মেনি তাদেরই সাধারণত বলে—কুমার। ঐ কুমারবৎ অবস্থা সাধন বলে যে আজীবন বজায় রাখতে পারে, তাকেই যথার্থ কুমার বলা যায়। শাস্ত্রের এই দ্বিতীয় মতটাই সুন্দর। আমরা অমৃতের সন্তান, বানরের সন্তান হতে যাব কেন? "যদিচ্ছন্তো

ব্রহ্মচর্যং চরন্তি।" ঠাকুর হোমাপাখির কথা বলতেন—শোননি? ওরা আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম পড়তে পড়তে আকাশেই ফুটে যায়। আরও পড়তে পড়তে পাখিটা যেই দেখে যে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে অমনি তার মনে পড়ে যায়, তার বাপ মা উপরে আছে। অমনি উপর দিকে চোঁ চাঁ দৌড়। আর মাটিতে পড়তে পারে না। তেমনি অনেক মানুষও আছে যাদের একটু বয়স হতে না হতেই সংসারে আসক্তিশূন্য হয়ে ভগবানের দিকে দৌড়ে যায়। একটা হচ্ছে দৃষ্টান্ত, আর একটা হচ্ছে দ্রার্ষ্টান্তিক। আমার মনে পড়ছে আমার বয়স যখন দশ বছর—আরও কম, বোধ হয় আট বছর—তখন আমার বন্ধুকে বলেছিলাম, আমি বিয়ে করব না। সে বন্ধুও সাধু হয়ে গেল—আমিও সাধু হয়ে গেলাম।

(বালকটির প্রতি) তুই সাধু হবি কি গৃহস্থ হবি বল?

বালক—সাধু হব।

হরি মহারাজ—নিশ্চয়, সাধু হবি বৈ কি। এখন থেকে চেষ্টা করলে ঠিক ঠিক ভগবান লাভ হয়ে যাবে। মনের মধ্যে একটা প্রতিজ্ঞা থাকা চাই—তাঁকে পাবই পাব। এখন থেকে খুব জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হলে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হয়ে যাবে। আর যদি সাধারণ লোকের মতো হতে চাস তবে চারটি চারটি খাবি, ছেলেপুলে হবে, টাকাকড়ি করবি, মরে যাবি—ব্যস শেষ হয়ে যাবে। গৃহস্থের মান যশ চাস, না, সাধু হতে চাস?

বালক—সাধুর কি মান যশ নেই? সাধুরও তো মান যশ আছে।

হরি মহারাজ—নিশ্চয়ই সাধুর মান যশ আছে। দেখ দেখি স্বামীজীর যশ—কি বীরের মতো জগৎটা জয় করে গেলেন। কি বীর ভাব! কি জিতেন্দ্রিয়তা! তেমনি হলে তো হয়েই গেল। উঁচু উঁচু বিষয়ে মন ছিল বলে নিচু দিকে যেতেই পায়নি। ঠাকুর বলতেন ঃ লোকের মন বেশি পায়ু, উপস্থ আর নাভিতেই থাকে। সাধকের মন হৃদয়ে উঠে যায়, তারপর আরও উপরে—কণ্ঠে, তারপর ব্রহ্মরন্ধ্রে মন উঠে গেলে সমাধি হয়ে একুশ দিনের মধ্যে দেহত্যাগ হয়ে যায়। ঠাকুর আরও বলতেন ঃ আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাকলেও সোনা, ঘরে থাকলেও সোনা।

গোখানেই ফেলে দাও, শক্তি থাকলে প্রকাশ হবেই হবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাঁর কাছে ভক্তি চাইবি।

অনেক—মহারাজ, ও শিবের কাছে পাশুপত অস্ত্র চায়।

হরি মহারাজ—তুই পাশুপত অস্ত্র নিয়ে কি করবি? তুই ক্ষত্রিয় নোস, তুই যে ব্রাহ্মণ। তুই তাঁকে সন্তুষ্ট করে ব্রহ্মজ্ঞান চেয়ে নিবি। ব্রাহ্মণের এর চেয়ে বড় অস্ত্র কিছু নেই। বিশ্বামিত্র আর বশিষ্ঠের গল্প জানিস? রাজা বিশ্বামিত্র একদিন ধনুর্বাণাদি দিয়ে বশিষ্ঠের একশ ছেলে মেরে কামধেনু নিয়ে চললেন। কিন্তু বশিষ্ঠ সব দেখেও কিছু না বলে ব্রহ্মদণ্ড হাতে নিয়ে বসে রইলেন। তখন বিশ্বামিত্র জোড়হাতে তাঁর পায়ে পড়ে বললেন—ক্ষত্রিয় বল ধিক্। এই বলে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন।

বালকটি সন্ধ্যাবন্দনার জন্য বিদায় নিলে হরি মহারাজ বললেন—ছেলেটার বেশ শুদ্ধসংস্কার। ওর রজঃ মিশ্রিত সত্ত্ব, আর অ—বেশ সত্ত্বগুণী। এখন ঠিকমত চললে ভাল হবে, নইলে আর পাঁচজনের মতো হয়ে যাবে। অদৃষ্ট বলে কিছু নেই। সবটাই বলতে গেলে পুরুষকার, যোগবাশিষ্ঠে পুরুষকারের খুব প্রশংসা করেছে। দৈব যে একেবারে নেই তা নয়। "দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।" দৈবও পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তির অনুকূল হয়ে যায়। God helps those who helps themselves (যে নিজে চেষ্টা করে, ঈশ্বর তাঁকে সাহায্য করেন)। দৈবের ওপর নির্ভর করে লোকে নিচের দিকে যেতে বসে। লোকে নিজ দোষে গোল করে বসে, তারপর দৈবের দোষ দেয়। বুঝতে হবে—আছাড় খাওয়াটা accident (আকস্মিক)—গতিটাই স্বাভাবিক। ভুলভ্রান্তি হওয়াটা accident, ওপরে ওঠাই স্বাভাবিক।

ব্রহ্মচারী—কাঁচির দুখানা ফলার মধ্যে কোনটা যে কাটা ব্যাপারের জন্য কতটা দায়ী তা যেমন আমরা জানি না, সেই রকম আমাদের কার্যসিদ্ধির জন্য আমাদের দৈব অথবা পুরুষকার কোনটা যে কতটা দায়ী, তা ঠিক ঠিক নির্ধারণ আমরা করতে পারিনে। তবে আমরা ধরে নিই যে, দুখানা ফলাই কাটার ব্যাপারে সমান দায়ী। আমাদের পুরুষকারের ফলাটা আমাদের হাতে। এটাকে

ধার করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত। দৈবের ফলাটা আমাদের সাধ্যের বাইরে—কাজেই নিজের আয়ত্ত ফলাটা ধার দিয়ে অপরটার অপেক্ষায় থাকাই আমাদের উচিত।

হরি মহারাজ—ঠিক কথা, ঐ তো উপায়। ঐ রকম না হলে তো কোন ফলই হয় না। তবে ভক্তের নির্ভর বলে একটা জিনিস আছে। সেটা দুর্বলতা নয়। সে যেমন—"তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হক।"

সময়—১৯২০ খ্রিস্টাব্দ, ৪ জুলাই, রবিবার অপরাহ্ণ—বেলা ৫টা

একঘর লোক মহারাজের বাক্যালাপ শ্রবণ-পিপাসু হয়ে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একজন ভদ্রলোক এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে আসন গ্রহণ করলেন। ভদ্রলোকটি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছু। আলাপ পরিচয়াদির পর তিনি তাঁর মনোভাব প্রকাশ করে বললেন। মহারাজ তাঁর মুখে তাঁর স্ত্রী পুত্রাদি বিদ্যমান জানতে পেরে বললেন ঃ

সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে এলেন? নিজে ভোগটোগ করে সরে পড়লেন? ওদের একটা ব্যবস্থা না করে সরে পড়া যে cruel and cowardly (নিষ্ঠুরতা ও কাপুরুষতা) তা বুঝতে পাচ্ছেন না? ফস করে ত্যাগ করলেই হলো?

ভদ্রলোক—এ তো ব্যবহারিক, এ তো অজ্ঞানের কাজ।

মহারাজ—আর পালিয়ে আসাটা বুঝি পারমার্থিক হলো—এটা বুঝি জ্ঞানের কাজ হলো? সংসারে থাকলে কি ধর্ম হয় না? একবার নারদ ভগবানের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আপনার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে?" ভগবান তাঁকে বলে দিলেন "অমুক গ্রামে একজন চাষা আছে, সেই আমার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যাও দেখে এসো গে।" নারদ সেখানে এসে উপস্থিত। এসে দেখেন, চাষা তখন মাঠে চলে গেছে। সারাদিন বাদে চাষা বাড়ি এসে একবার ভগবানের নাম নিয়ে রাতে ঘুমিয়ে পড়ল। এই দেখে নারদ ভগবানের কাছে এসে বললেন, "এ কেমন প্রভু? এ লোকটি সারাদিন বাজে

সংসারকর্মে থেকে একটিবার তোমার নাম নিয়ে কি করে শ্রেষ্ঠ ভক্ত হলেন?” ভগবান বললেন, “আচ্ছা নারদ, তোমার প্রশ্নের উত্তর পরে পাবে। এখন এই তেল পূর্ণ বাটিটা নিয়ে পৃথিবীটা ঘুরে এস দেখি।” নারদ অতি সন্তর্পণে ভূ-প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসলে ভগবান বললেন, “কেমন নারদ, এখন বুঝলে তো ঐ চাষা কেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত? তুমি বাটির তেল না পড়ে যায় এই চিন্তায় একবারও আমায় স্মরণ করনি, কিন্তু ঐ চাষা এত কর্মে নিযুক্ত থেকেও দিনান্তে প্রতিদিন আমায় স্মরণ করে থাকে।”

ঠাকুর বলতেন—একবার দক্ষিণেশ্বরে এক মুখুয্যে ঘরবাড়ি ছেড়ে সদাব্রতে খেয়ে কালীবাড়িতেই পড়ে থাকত। একদিন ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—“তুমি বিয়ে করেছ—ছেলেপুলে আছে?” সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে ঠাকুর বললেন, “তাঁদের কে দেখছে?” মুখুয্যের মুখে যেই শুনলেন যে তার পরিবার শ্বশুরবাড়ি পড়ে আছে, অমনি বলে উঠলেন, “তবে রে বেটা, বিয়ে করবার বেলায় তুই, ছেলেপুলের বেলায় তুই, আর ভাত কাপড়ের বেলায় শ্বশুর? আর এখানে থেকে গরিবের জন্য যে অন্ন দেওয়া হয় তাই ধ্বংস করছিস!” এসব কথা শুনেই মুখুয্যে বাড়ি গিয়ে মন দিয়ে ঘরসংসার করতে লাগল।

শাস্ত্রেও চতুরাশ্রমের কথা আছে। আগে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করে বিদ্যাভ্যাস করতে হতো। তখন গুরুশুশ্রূষা, অটুট ব্রহ্মচর্য, অধ্যয়ন ইত্যাদি কর্তব্য সে গ্রহণ করত। কর্তব্য শেষ হলেই ছুটি। গুরুগৃহে পাঠ শেষ হবার পরে তারা আত্ম-পরীক্ষা করে দেখত সংসারে ফিরে আসবে কি না। যাদের মনে সংসারভাব বেশি আছে বলে মনে করত, তারা সমাবর্তন স্নান করে সংসারে প্রবেশ করত। এখানেও দারপরিগ্রহ, পুত্রোৎপাদন, অতিথিসেবা, পরিবার পালনাদি কতকগুলি কর্তব্য তার আছে। এগুলো করে শেষ করতে পারলেই ছুটি। এক জিনিস কি চিরকাল ভাল লাগে? ভোগবাসনা যখন কমে গেল, আর এ দিকেও আবার গৃহস্থের কর্তব্য শেষ হলো, তখন বানপ্রস্থ আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করতো। স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতো। তবে কি না তাদের ভাই বোনের মতো থাকতে হতো, কামভাবে নয়।

উপনিষদেও রয়েছে যাজ্ঞবল্ক্য—মৈত্রেয়ী-সংবাদ। যাজ্ঞবল্ক্যের বিদ্বৎ-সন্ন্যাস হয়েছিল। তিনি দুই স্ত্রীকে বললেন, "আমার এখন প্রব্রজ্যার সময় এল, কাজেই আমার যা আছে তোমরা দুজনে বেঁটে নাও।" তখন মৈত্রেয়ী বললেন—"যা নিয়ে আমি অমৃত হব না তা দিয়ে আমি কি করবো? এ ঘটি বাটি তো আমাকে অমৃতত্ব দেবে না।" এ কথা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "মৈত্রেয়ী, আমি আগেও তোমাকে ভালবাসতাম, কিন্তু এখন তোমাকে আরও ভালবাসছি।" এই বলে তাকে উপদেশ করলেন। উনিও সন্ন্যাস নিলেন।

কিন্তু সংসার ভাল লাগছে না অথচ স্ত্রী পুত্র করে বসেছি, তখন কি ছাড়া চলে? ওদের কি হবে? এ তো ভারি স্বার্থপরতা! সংসারে থেকে তাদের পালন করা, নিজের কর্তব্য পালন করা—এও যে ধর্ম। ঝট করে ছেড়ে দিলে কিছু হবে না। ধপ করে ছাতে ওঠা যায় না, ধাপে ধাপে যেতে হয়। ঠাকুর বলতেন, "ফল কাঁচা অবস্থায় পড়লে পচে নষ্ট হয়ে যায়। কাঁচা ঘায়ের মামড়ি তুললে রক্ত পড়ে, শুকিয়ে গেলে আপনিই খসে যায়।" কি চমৎকার কথা, দেখ একবার। মন ছাড়া তো কিছুই নয়। বিবাহ করে ফেলেছে, তারপর আপশোস করছে, সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছা ঠাকুরকে জানাচ্ছে। ঠাকুর বলতেন, "সবুর ছাড়িসনে, আন্তরিকতা থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে। যেমন নিয়ম বাঁধা আছে, সেই মতো ঠিক ঠিক চলে গেলেই হলো।" বেশ মজা! ছেড়ে ছুড়ে দিলে চলবে কেন? ছেলেপুলে করেছ তুমি—কর্তব্য করে যাও, নিঃস্বার্থ ভাবে কর। ভগবানকে ডাকব বলে সংসার ছাড়ছি, এ যে বিলকুল মিথ্যা কথা।

প্রথমে বর্ণাশ্রমবর্ণিত কর্তব্য সম্পন্ন করে যখন চিত্ত শুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সদ্‌গুরুর নিকট যাবে। কর্তব্যটা না করে ছুটি নেই। একটা ঠিক করলেই অপরটা চলে আসে। তবে বালককাল থেকে যারা সংসারে মোটেই প্রবেশ করল না, তাদের কথা পৃথক।

অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্ ॥ —মনু, ৫।১৫৯

তোমরা যে সংসারে গেলে না, পূর্ব সংস্কার। আগে আগে যে সব করা

রয়েছে। কেন যাবে? সব বুঝেছ, তাই ছেড়েছ। তোমরা যে অধিকার নিয়েই এসেছ। দেখছ না—পৃথিবীটা পাগল হয়ে রয়েছে! টাকা ধার করেও বিয়ে করবে। ঋণ শোধ করতে না করতে হয়ত মরেই গেল। কেউ গৃহত্যাগের কথা বললে ঠাকুর বলতেন, "তোর যদি আন্তরিক হয়—সব সুবিধা হয়ে যাবে।" তবু ঠাকুর বলছেন না, "ছেড়ে আয়।" "তোর যদি আন্তরিক হয়"—টের পেতেন কিনা, তাই এ রকম বলতেন। জোর করে করতে গেলে ভারি দোষ হয়। তিনি অন্তর্যামী, সকলের মধ্যে আছেন। তিনি নষ্ট মেয়ে মানুষের গল্প বলতেন। তারা সংসারের সকল কাজই করছে, কিন্তু মনটা ফেলে রেখেছে উপপতির ওপর। এ রকম করে যখন উপপতিতে সব মনটা চলে গেল, তখন সে সংসার ছেড়েছুড়ে তার সঙ্গে চলল। দেখছ না কি চমৎকার গল্প! এক হাতে কাজ কর, অপর হাতে ভগবানের সেবা কর। সময় আসলে দুহাতেই তাঁর সেবা করতে পারবে। যদি আন্তরিক হয়, সময় এসেই যায়।

> **অনাদিকালোঽয়মহংস্বভাবো জীবঃ সমস্তব্যবহারবোঢ়া।**
> **করোতি কর্মাণ্যপি পূর্ববাসনঃ পুণ্যান্যপুণ্যানি চ তৎ ফলানি ॥**
>
> —বিবেকচূড়ামণি, ১৮৬

মন-মুখ এক হওয়া চাই। মুখ এক কথা বলে, মন অন্য রকম বলে—তাহলে হবে না। মনও যা বলবে, মুখও তাই বলবে; মুখ যা বলবে, মন তাই করবে। একবার যা বলেছে তা করা চাই-ই। তার কাছে সব সুবিধা হয়ে যায়। তুমি যে কাল Predestination-এর (অদৃষ্টবাদের) কথা বলেছিলে, ও কিছু কাজের কথা নয়। তাহলে তো কোন কাজই চলে না। পাপ-পুণ্যও থাকে না। আছে এক, পরম ভক্তের Resignation-এর (নির্ভরের) কথা। যন্ত্রচালিত হয়ে সে কাজ করছে। তার ইচ্ছা ও ভগবদিচ্ছায় তো তফাত নেই। কিন্তু তারও Test (পরখ) আছে—তার দ্বারা কোন খারাপ কাজ হতে পারে না। তার পা বেতালে পড়ে না।

> উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
> আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ —গীতা, ৬।৫

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ —গীতা, ৬।৮

ঠাকুর অন্য আশীর্বাদ করতেন না, বলতেন, "মা, এদের চৈতন্য হোক, হুঁশ হোক।" রাখাল মহারাজ তখন ঠাকুরের কাছে থাকতেন। তাঁর সম্বন্ধীরা তাঁকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু যখন তারা দেখল উনি সংসার ছেড়ে দেবার মতো হয়েছেন, তখন আর তাদের ভাল লাগল না। প্রথম ঠাকুরকে বললে ঠাকুর তাতে বড় একটা কান দিলেন না। সুরেশ মিত্তির তখন ঠাকুরের এখানে কিছু টাকা পয়সা খরচ করত। একদিন মনমোহন যেই বলেছে, "রাখাল যে এখানে থাকে সুরেশবাবু তা ভালবাসে না।" অমনি ঠাকুর বলে উঠলেন "কি, সুরেশ কে? সুরেশ এখানে কি? ওরে, দে তো ওসব (তাকিয়া প্রভৃতি) ফেলে দে, বার করে দে। (ঠাকুর যখন চটে উঠতেন তখন সকলের থরহরি কম্প হয়ে যেত। কেউ এগুতে পারত না) আমি বলি, মা, এসব ছেলের লক্ষণ ভাল তাই কাছে রাখি। এদের হুঁশ হোক, এদের একটু চৈতন্য হোক। আমি বলি হুঁশ হয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাক।" সুরেশ শেষে হাতে পায়ে ধরে কেঁদে বলল যে, সে ও কথা বলেনি, ওরা মিথ্যা বলেছে।

এখন না জেনে ডুবে যাচ্ছ—জেনে সংসার কর—বদ্ধ হবে না। সংসারটা কি খারাপ? না জেনেই তো গোল। পালাচ্ছ কোথায়? তাহলে তো 'ইতোনষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হয়ে যাবে। কিছুই হবে না। যোগবাশিষ্ঠে আছে, বিশ্বামিত্র যখন দশরথের কাছে রামকে চাইলেন তখন দশরথ বললেন যে, রামের শরীর দিন দিন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় তার বৈরাগ্য উপস্থিত। এ অবস্থায় তাকে কি করে আপনার সঙ্গে রাক্ষস বধে পাঠাই? রাজার আদেশে রাম সভায় এসে সকলকে প্রণাম করে বসলে বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "হে রাম, তোমার যদি বৈরাগ্য উপস্থিত হয়ে থাকে, সে তো অতি সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু বল দেখি, তুমি দিন দিন শীর্ণ ও মলিন হয়ে যাচ্ছ কেন? ওতে তো মলিন হবার কথা নয়।" রামের মনোগত ভাব জেনে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বললেন, "দেখ, তোমার আমার যুদ্ধের পর ব্রহ্মা আমাদের যে উপদেশ দেন তা রামকে উপদেশ কর। জ্ঞানলাভ করে সংসারধর্ম পালন করুক।"

ঠাকুর বলতেন, "সোনা হয়ে আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাক। তাহলে সোনাই থেকে যাবি।"

সুখ হলো না, তাই বলে সংসার ছাড়া ঠিক নয়। জেগে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

আসলে মানুষের জ্ঞান হতে কি বেশি সময় লাগে? "ঘুমিয়ে পড়ে," এর অর্থ হচ্ছে—সংস্কার প্রবল। দাঁতে দাঁতে জোর করে পুরুষকারের সহিত উঠে পড়তে হয়। স্বপ্নেতে স্ত্রীমূর্তি দেখছে, কিন্তু বিপরীত সংস্কার এত প্রবল যে সে স্বপ্নেই রেগে উঠছে। স্বপ্নেতে পর্যন্ত সজাগ। আমরা তো আর Machine (যন্ত্র) নই—সব অবস্থাতে আমরাও সজাগ হতে পারি। হবে কি হবে না, তার পরীক্ষা আন্তরিকতা বা আন্তরিকতার অভাব।

তোমার সাক্ষী তো তুমিই। যা ভুল হয়েছে তা হয়েছে—দৃঢ় করে বল, "আর করবো না।" যদি আর না কর, ব্যস হয়ে গেল।

যেমন যেমন দুষ্কর্মে ঘৃণা হবে, অমনি দৃঢ়ভাবে তা ত্যাগ করলে সে তা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। "নৈতৎ কুর্য্যাম" খুব তেজের সঙ্গে বলতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত করে আবার পাপ করলে কিছুই হবে না। ঠাকুর মেদাটে ভাব ভালবাসতেন না। যেমন লেজে হাত দেওয়া, অমনি তিড়িং করে ওঠা।

স্বামীজী সম্বন্ধে বলতেন, "দেখ কি বীরের ভাব, যেমন মনে হওয়া অমনি বদ্ধপরিকর।" সুবিধা অসুবিধা যা হবার হোক, কোমর বেঁধে করতে হবে। At any cost (যাই হোক না কেন) করবো—এ ভাব থাকলে মহা বিপত্তি। যা তোমাকে গ্রাস করবে মনে করছ, শেষে দেখবে তারাই তোমার বন্ধুর কাজ করে দিয়ে গেল। তবে আন্তরিক Struggle (চেষ্টা যত্ন) করা চাই। সুবিধা কি কখনও হয়? কর্তব্য বুঝে করে যাবে। তুমি তো অজর অমর আছই। তুমি কেন সুবিধা খুঁজে বেড়াবে? এ সকল তো তোমারই সৃষ্ট।

য ইচ্ছতি হরিং স্মর্তুং ব্যাপারান্ত গতৈরপি।
সমুদ্রে শান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছতি দুর্মতিঃ ॥

সমুদ্রে স্নান করতে হবে বলে বসে রইল। মতলব, তরঙ্গ থেমে গেলে স্নান

করবে। Nonsense (বাজে কথা)। সে কি কখনও হয়? ধাক্কাধাক্কি খেয়ে তুমি স্নান করে এলে; সমুদ্র যেমন তেমনই রইল। সংসারের এই তরঙ্গের মধ্যেই ভগবানকে ডেকে নিতে হবে। সুবিধা খোঁজা কোন কাজের কথা নয়। Now or never (করতে হয়ত এখন, ভবিষ্যতের জন্য ফেলে না রেখে) লেগে যাও, অসুবিধা সুবিধা হয়ে যাবে।

কী চমৎকার বলেছেন! কর্তব্য শেষ না করলে মুক্তি নেই, ছুটি নেই; না করে যেটা ফেলে দিয়েছ সেটা রইল—আবার আসবে। Face the brute (জানোয়ারটার সামনে মুখ করে দাঁড়াও) পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। সন্ন্যাস করে সুবিধা হবে, গার্হস্থ্যে অসুবিধা—এ কাজের কথা নয়। একটা অবস্থার কর্তব্য না করে আর একটা হবে না। Aspire কর—Shirk করো না। (উচ্চ অবস্থা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা কর, কিন্তু উপস্থিত কর্তব্যটা অবহেলা করো না); Don't do that (কখনই এমন কাজ করো না)। কুমার বৈরাগীদের কথা পৃথক। তারা যে সংস্কার নিয়ে এসেছে তাতে যদি ওরা সংসারেও থাকে, সেখানেও সন্ন্যাসীর মতো থাকে। সে যা আছে—তাই আছে। Avoidance (কর্তব্যে অবহেলা) ভাল নয়। Avoid করবার (পালিয়ে যাবার) জোও নাই।

নষ্ট মেয়েমানুষের গল্প এদিককার (সংসারে থেকে ভগবানে মন রাখবার) দৃষ্টান্ত। ভগবানে যাতে ভক্তিনিষ্ঠা হয় তার জন্য প্রাণে আন্তরিক প্রার্থনা চাই। নিজেকে Ready (প্রস্তুত) করবার জন্য সাধুসঙ্গ ও মধ্যে মধ্যে নির্জনবাস প্রয়োজন। আন্তরিক হলে তিনিই সব ঠিক করে দেন। এই মনটা তাঁকে দিতে হবে। মাখন তুলতে হবে। তবেই জলে থাকলেও জলে মিশবে না। যে Self-examination (আত্মপরীক্ষা) যত করেছে, যে নিজেকে ঠিক ঠিক যত জেনেছে, সেই তত বড় সাধু। Self-examination বড় কঠিন। মন যে জোচ্চুরি করে তা ধরা ভারি শক্ত। গোবিন্দ! গোবিন্দ! ভগবান! ভগবান!

৫ জুলাই ১৯২০, সোমবার, সকাল

তখন তিনি দাড়ি কামাচ্ছিলেন। সু—নমস্কার করলেন। অমূল্য মহারাজ

বললেন যে, কামাবার, জলখাবার, হাতে আগুন—এমন সময় কাউকে নমস্কার করতে নেই।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—অর্থাৎ এমন সময়ে নমস্কার করবে যাতে বিঘ্ন না ঘটে। পাশে নমস্কার করায় বললেন—সামনে নমস্কার করতে হয়, তাহলে দেখা সাক্ষাৎ হয়। তা নইলে তো মনে মনেও নমস্কার করা যায়। অনেকে বলে থাকে, অত (বাঁধা) বিধিনিষেধ থাকা ভাল নয়—স্বাধীনতা বাড়তে পায় না। ছেলেবেলায় কথাগুলো বেশ লাগত, ভাবতাম, ঠিক কথা। যত বয়স বাড়ছে, দেখছি—ওগুলো কিছু কাজের কথা নয়, নেহাত nonsense (বাজে কথা)। অনধিকারীকে দিলেই জিনিস বিকৃত হয়; স্বাধীনতা হয় না, উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়ে। তবে ব্রহ্মজ্ঞানী সমুদয় বিধিনিষেধের পারে।

ঐ দিন—বৈকাল ৫টা

আজ বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু গরম বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। মহারাজ বারান্দায় easy chairএ (আরাম কেদারায়) বসে আছেন। বলছেন, বারান্দায় রাত্রিতে ঘুমুতে ভারি কষ্ট—একটুও হাওয়া নেই। আর তুমিও যেমন! শরীরের জন্য অত করছো, কিছুতে কি কিছু হচ্ছে? শরীরং ক্ষণভঙ্গুরম্।

উপস্থিত একজন সাধু কুমিল্লার বিরাগী ছেলেটির কথা জিজ্ঞাসা করায় বললেন—বৈরাগ্যবান বলে বোধ হয়। বাংলাদেশে এক মহাপুরুষের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে প্রায় এগার বৎসর যাবৎ তাঁর উপদেশানুসারে জীবন কাটাচ্ছে। ভাল বলেই বোধ হয়। আর একদিন এসেছিল, সেই দিনই পরিচয় হয়েছে। অসি ঘাটে থাকে।

একটি বালক জাম পাড়ছিল। অনেকবার বিফল প্রযত্ন হয়ে শেষে দুই একটা জাম কুড়িয়ে পেলে।

পূর্বোক্ত সাধুটি বললেন—মহারাজ, এ ছেলেটিকে আমাদের ওখানে (অনাথালয়ে) রাখার প্রস্তাব হয়েছিল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আর একটি ছেলের কথা কা— তোমাকে বলেনি? ঐ

যে ম্যাট্রিক পাশ করে এখানে কলেজে পড়বে বলে আসতে চায়। তুমি কি বলেছ?

সাধু—ছোট ছেলেদের মধ্যে তাকে রাখা যায় কিনা, তাকে না দেখলে কি করে বলা যায়? ছেলেটির বয়স হয়েছে, তার ভালমন্দ যা হোক চরিত্র একটা গঠন হয়েছে, এ অবস্থায় তাকে বিশেষ করে না জানা পর্যন্ত আমি তো বলতে পারিনে যে, সে ছেলেদের মধ্যে থাক। এখানে আসলে তার জন্যে যা best possible তাই করে দেওয়া যাবে এখন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আমাদের ইচ্ছা, যখন একটা প্রতিষ্ঠান আছেই তখন সেটা বেড়ে উঠুক। তার বাড় বন্ধ করে রাখা তো আর ঠিক নয়।

সাধু—আমার ইচ্ছা, যারা যথার্থ অনাথ তারা যদি কেউ এসে পড়ে তাকে অবশ্য রাখতে হবে। কিছু টাকা পয়সা নিয়ে ছেলে রাখতে গেলে এখানে না রেখে অন্যত্র বন্দোবস্ত করে দেওয়াই ভাল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—সেবাশ্রমের ভাবটা দেশ নিয়ে ফেলেছে। দেখ না, কত সেবা-সমিতি হচ্ছে। এখন আর আমরা না করলেও চলে। শরৎ মহারাজের সঙ্গেও আমার এ সম্বন্ধে আলাপ হয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে এখনও আমরা কিছুই করে উঠতে পারিনি। কিন্তু এ কাজটার আরম্ভ হয়ে যাওয়া দরকার।

সাধু—মহারাজ, আমাদের সেবাশ্রমের অনাথালয়ের বারান্দায় বাইরের ছাত্রদের নিয়ে আমরা ক্লাস খুলতে পারি; কিন্তু এতে এক গোলমাল হয় এই যে, ছেলেরা নিজেদের স্বার্থ এত ভুলে বসে যে, যখন তারা বুঝতে পারে যে, বেতন দিতে হয় না, জরিমানাও দিতে হয় না, তখন থেকে তারা আর নিয়মের বাঁধাবাঁধির ভেতর থাকতে চায় না।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—তাদের প্রথমটা সাবধান করে দিয়ে, যদি তারা না শোধরায় পরে তাড়িয়ে দিলেই হলো। দু—বাবুদেরও ইচ্ছা, এ রকম ইস্কুল হয়। মহেশ ভট্টাচার্য কুমিল্লায় জায়গা দিতে চেয়েছেন—মেয়েদেরটা তো খুলেই দিয়েছেন। এখন ছেলেদের জন্য তেমন লোকই পাচ্ছেন না।

তেমন লোকই দেখছি না। এখন তো কত গ্র্যাজুয়েট আসছে। তাদের সে ভাব কই? আমি সকলের কথা বলছি না, কিন্তু অনেকেই তেমন সুবিধার নয়। তাদের মতলব যে, যখন ঘর ছেড়ে এসেছি, তখন আর খেটে মরবো কেন? যেটুকু যার কাজ সেটুকু করে খালাস। আর দিব্যি রাঁধা ভাত! কিন্তু ঘরেতে বাপ-মা-ভাইদের সঙ্গে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি যারা ঠাকুরের জনকে আপনার জন না ভাবতে পারবে, আর সকল সেবকরা ভাই-ভাই—এ ভাব না আনতে পারবে—তাদের কিছুই হবে না। এখন তবুও চলে যাচ্ছে, কিন্তু এঁরা গেলে যে কি হবে কে জানে? তখনই গোল। লোক তৈরি হচ্ছে না। আবার কেউ কেউ বলছে, এ তো স্বামীজীর মত, ঠাকুরের মত নয়। আরে স্বামীজীর মত কি ঠাকুরের মত থেকে আলাদা? গোল থাকে তো মিটিয়ে নে না। আলোচনা হওয়া তো খুবই ভাল। —কে জান? ওরও ঐ মত। মার বাড়িতে যখন থাকতাম তখন আমার ভারি অসুখ। ওর সঙ্গে ভারি তর্ক হতো। কিছুতেই বুঝতে চাইতো না। আর এদের বললেও হবে না। যা মাথায় ঢুকেছে, অন্য কিছুতেই বুঝতে চাইবে না। আর বলবে, আমরা নিজেরা আগে কিছু বুঝে টুঝে নিই, তারপর কাজ করবো।

আমি একবার খুব বলেছিলাম। স—ও সেখানে ছিল, আর আমার কথাগুলো তার খুব ভাল লেগেছিল। কাজেই ফিরে গিয়ে আমার কথার ওপর খুব চড়িয়ে আমি যা বলিনি, স—ওকে বলেছে। ও তো কেঁদেকেটে প্রকাণ্ড এক চিঠি লিখলো। শেষে আমি উত্তর দিয়ে দিলাম যে, ওর অনেক কথাই আমি বলিনি।

সবাই বলে, ধ্যানজপ করবো। কিন্তু তাও কি করে? আর ধ্যানজপ কি একমাত্র পথ? এখানে থাকবে, ও এখানের ভাব মানবে না—এ ভারি অন্যায়। দেখতে হয়, ভাবটা কি? মিশনের সব সুযোগ সুবিধাগুলিও নেবে, অথচ ভাবটা মানবে না। স্বামীজীর যে ভাব—একশবার আমি জন্মাব কেবল পরের সেবার জন্য—এই ভাবটা তো নেওয়া চাই। তা নইলে এখানে কেন? বাইরে তো ঢের ঢের সাধুসন্ন্যাসী আছেন। ভিক্ষা করে খাও, ধ্যান কর।

নূতন দলের মধ্যে যা দেখছি, স—ই বেশ ছোকরা, খুব উৎসাহ, তবে শরীরটা বিশেষ ভাল নয়। রাজা মহারাজকে বললে, "যা বলবেন, তাই করবো। আর আমি না পারি, তখন আপনাকে যেতে হবে।" সাহস করে লেগে গেল—ভেতরটাও খুলে গেল। এ রকম ভাবের সহিত কাজ করতে করতে হঠাৎ এক সময় খুলে যায়। কটা বাজল? গোবিন্দ, গোবিন্দ! এখন স্নান করতে যাই।

৬ জুলাই ১৯২০, মঙ্গলবার
স্থান—স্বামী তুরীয়ানন্দের ঘরের বারান্দা।

সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীরা চারিদিকে বসে আছেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলতে লাগলেন—

যতই খারাপ সংস্কার নিয়ে আসুক না কেন, সৎসঙ্গে লোক ভাল হয়ে যায়। যেমন আতরের দোকানে গেলে তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর, আতরের গন্ধ তোমার নাকে ঢুকবেই। সাধুসঙ্গ কি করে লোক? করতে কি পারে যে-সে? ঠাকুর কথা বলছেন, ভক্তেরা শুনছে—তাদের সঙ্গীরা কিন্তু কানে কানে বলছে, "চল না, আর কত শুনবে?" ওরাও উঠছে না দেখে শেষে বলছে, "তোমরা থাকো, আমরা ততক্ষণ নৌকায় গিয়ে বসি।" ঠাকুর এই বিষয়টা আমাদের কাছে কি চমৎকার করেই বলতেন। সৎসঙ্গের ফল তো ভাল হবেই, কারণ, একটা জীবন থেকেই আর একটা জীবনে ভাব-সংক্রমণ হতে পারে। Nothing but a round body can give a round shadow. (গোল বস্তুরই গোল ছায়া হতে পারে)। একজনের লেখা পড়ে যা ফল হয়, তার জীবনের সংস্পর্শে আসতে পারলে তার চেয়ে বেশি ফল হয়। বক্তৃতা শোনা আর বক্তৃতা পড়া কত তফাত! লেখাতেও আবার যে যত প্রাণ ঢেলে দিতে পারে, তার লেখা পড়ে তত ফল হয়। স্বামীজীর লেখা আর আমাদের অন্যান্য স্বামীদের লেখা! Personality (মানুষটাই) হচ্ছে আসল জিনিস। গোটাকতক মানুষই জগৎটা চালাচ্ছে, আর সব ভেড়া। স্বামীজী পৃথিবীটা ঘুরে এসে বললেন,

"Democracyর (গণতন্ত্রের) মাথামুণ্ড নেই—দু-চার জন লোকই কাজ চালাচ্ছে।" দেশ যখন কাজ চালাবার উপযুক্ত লোক দিতে না পারে, তখনই গোল্লায় যায়। আমাদের তো ধর্মপ্রাণ দেশ। আমাদের দেশ বরাবর Saints produce (সাধুপুরুষ প্রসব) করে আসছে। ইতিহাসে এমন একটা সময় দেখিয়ে দাও, যখন আমাদের দেশে এটি হয়নি। এক একটা জীবন কত শত বৎসর কত লোককে চালাচ্ছে। দেখ না, নানক, কবীর। দেখ, তুলসীদাস কতদিন থেকে এ দেশটা চালাচ্ছে।

আজ একটি মেয়ে এসেছিল—কালনার—সম্প্রতি বিধবা হয়েছে। ঠাকুরের কথাবার্তা হলো। তাদের বাড়ি বাবুরাম মহারাজকে নিয়ে গিছল। ওর স্বামীর ভাই বি. এ. পাশ করে গ্রামে স্কুল করছে—নিজে কিছু টাকাকড়ি নেয় না। দেশে একটা spirit (ভাব) এসে গেছে। সময় লাগবে সত্য, কিন্তু এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, একটা নাড়াচাড়া পড়েছে। জননায়করা আর এখন আগেকার মতো রেখে-ঢেকে বলছে না—একটা প্রবল জনমত থাকলে শুধু গায়ের জোরে শাসনযন্ত্র পরিচালন শক্ত ব্যাপার।

গায়ে উই পড়ায় বললেন, এ সময় সর্বত্রই জীবজন্তু-পোকা ইত্যাদি খুব বেশি জন্মায়। এই জন্যই শাস্ত্রে চাতুর্মাস্যের বিধি আছে—বর্ষার সময়টা চার মাস সাধুদের একস্থানে বাস করতে বলেছে। আমি ভ্রমণের সময় অনেকবার এইরূপ চাতুর্মাস্য করেছি। একবার পুষ্করে ছিলাম। "পুষ্করং দুষ্করং তীর্থম্" ভারি সুন্দর স্থান—বড় একান্ত। বড় আনন্দ হতো। চাতুর্মাস্যের সময় মুনিরা সকলে এক জায়গায় থেকে পাঠাদি করতেন। আবার আট মাস তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন। ও সময় বের হতেন না। জীবজন্তু মারা যাবে বলে।

৮ জুলাই ১৯২০ সাল

স্বামী তুরীয়ানন্দ—ছেলেটি খুব চালাক চতুর, তের বছর বয়স অথচ বিশ বছরের ছেলের মতো কথাবার্তা বলে। এত ছেলে দেখলুম, কিন্তু এমন বুদ্ধিমান

ছেলে দেখিনি। শরীরটা বাড়ছে। এই বাল্য ও কৈশোরের সন্ধির সময়টাই খুব সাবধানে থাকতে হয়। আমাদের দেশে তের বছরেই কৈশোর অবস্থা আরম্ভ হয়, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে আরও দেরিতে, ১৬।১৭তে আরম্ভ।

র—কুসঙ্গে পড়ে আবার অনেক সময়ে খুব কম বয়সেই এই অবস্থাটা আরম্ভ হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—তা আর বলতে? মনে তো সূক্ষ্মভাবে এসব স্বাভাবিক সংস্কার রয়েছে—সৎসঙ্গের ফলে ঐ সব সংস্কার ধীরে ধীরে মন থেকে চলে গেলে তবেই বাঁচোয়া, নইলে সুবিধা পেলে ঐ সব চিন্তা ও আলোচনা এসে পড়ে, কিন্তু এসবের আলোচনা পর্যন্ত শাস্ত্র নিষেধ করে গেছেন।

একবার সংস্কার পড়ে গেলে বাঁচা দায়। যদি বুঝতে পারে ব্রহ্মচর্য না থাকলে কি ক্ষতি হয় আর ব্রহ্মচর্য থাকলেই বা কি লাভ হয়, তবে ব্রহ্মচর্য-আশ্রম শেষ হলে পর বিবাহ করে সৎ গৃহস্থ হতে পারে।

র—যারা কুস্তি টুস্তি করে, তাদের মনটা অন্য দিকে থাকায় তারা অনেক সময় বেঁচে যায়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—হাঁ, তবে যদি যথার্থ ধর্মভাব থাকে তবেই রক্ষা, কারণ, ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার বিশেষ সম্বন্ধ। বীর্য স্থির না হলে চিত্ত স্থির হয় না। "স্বস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তি।"

(অবধূত গীতা আনা হলো এবং অষ্টম অধ্যায় ১১শ শ্লোক থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া হলো।)

চিন্তাক্রান্তং ধাতুবদ্ধং শরীরং নষ্টে চিত্তে ধাতবো যান্তি নাশম্।
তস্মাচ্চিত্তং সর্বতো রক্ষণীয়ং স্বস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তি ॥

অর্থাৎ এই শরীর ধাতুর দ্বারা গঠিত ও চিন্তা দ্বারা পরিচালিত। চিত্ত নষ্ট হলে ধাতুও নষ্ট হয়, অতএব চিত্তকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করা প্রয়োজন। চিত্ত স্বস্থ হলে সদ্বুদ্ধির আবির্ভাব হয়।

"ধাতবো" মানে কিনা বীর্য। বীর্য নষ্ট হলেই চিত্ত অস্থির হয়। তাহলে

আর ইষ্টের মূর্তি চিত্তে স্পষ্ট প্রকাশ হয় না। ঠাকুর বলতেন, "আয়নার পারা ঠিক থাকলে তবে প্রতিবিম্ব ঠিক পড়ে। পারা এধার ওধার হয়ে গেলে প্রতিবিম্ব পড়ে না।" চিত্ত জিনিসটা কি? যেখান থেকে ভাব ওঠে, সেখানেই প্রথম ছাপ পড়ে। তাহলেই বুঝতে পারছ, যেখান থেকে চিন্তা উঠবে, সেটাই যদি কাঁপে, তবে আর কেমন করে ধ্যান হবে?

আমরা শুধু পড়ে যাই—চিত্ত, মন, বুদ্ধি—কোনটা মন, কোনটা বুদ্ধি, কোনটা চিত্ত, এসব তলিয়ে বুঝতে হয়। চিত্তে একবার খারাপ সংস্কার পড়ে গেলে বাঁচা বড় শক্ত।

গীতায় ভগবান তাই বলছেন—

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ —গীতা, ৩।৪১

'জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্'—বোঝ একবার।

লক্ষ্যচ্যুতং চেদ্ যদি চিত্তমীষদ্
বহির্মুখং সৎ নিপতেৎ ততস্ততঃ।
প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ
সোপানপঙ্‌ক্তৌ পতিতো যথা তথা ॥ —বিবেকচূড়ামণি, ৩২৫

অর্থাৎ—যেমন অসাবধান হাত হতে ক্রীড়াকন্দুক (খেলার বল) কোনও সোপান-শ্রেণির ওপরের সোপানে পড়ে গেলে লাফাতে লাফাতে নিচে পড়ে যায়, তেমনি যদি চিত্ত ঈষৎ লক্ষ্যচ্যুত হয়, তবে বহির্মুখ হয়ে ক্রমশ পড়তে পড়তে শেষে চরম পতনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ঠননং—ঠননং—ঠননং ঠঃ—অর্থাৎ কিনা একেবারে পতনের শেষ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে।

প্র—বার বৎসর ব্রহ্মচর্য করলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—নিশ্চয়! ওজঃশক্তিবলে ব্রহ্মজ্ঞান খুলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান মানে কি? জ্ঞান তো রয়েছেই—সেটাকে প্রকাশ করে দেওয়া বই তো নয়!

বার বৎসর ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে পারলে চিত্ত স্বস্থ হয়, তখন জ্ঞান প্রকাশিত হয়ে পড়ে। "স্বস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তি।" কি শক্তিবলে স্বামীজী জগৎটাকে ওলট পালট করে দিলেন? কেশব সেনের সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন—"কেশব যদি ত্যাগী হতো, তবে আরও অনেক কাজ করতে পারত।" শুধু মুখের কথায় কি আর কাজ হয়? তুমি বলবে এক, করবে আর এক।

স্বামীজী আমাদের বলতেন, "তোমরা কি মনে কর, আমি শুধু লেকচার দিই? I know, I give them something solid. They know that they receive something solid." (আমি জানি আমি তাদের কিছু দিলুম, তারা জানলে তারা কিছু পেলে।) নিউইয়র্কে স্বামীজী একদিন ক্লাসে লেকচার দিচ্ছিলেন—সে কথা তোমায় আর কি বলবো? কা—বলেছিল, ধ্যানের সময় নিচের কুলকুণ্ডলিনীকে যেমন ওপর থেকে একটা শক্তি আকর্ষণ করে, স্বামীজীর লেকচার শুনতে শুনতে সেই রকমটা হচ্ছিল। এক ঘণ্টা লেকচারের পর কা— Announce (শ্রোতাদের জানিয়ে দিল) করলে, এখন প্রশ্নোত্তর হবে। স্বামীজীর লেকচারের পরই প্রায় সব লোক উঠে গিয়েছিল। স্বামীজী একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "এর পর আর প্রশ্নোত্তর কিরে? বক্তৃতা শুনে লোকের মনে যে উচ্চ ভাব জেগে উঠেছে ওতে যে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে।" বোঝ একবার ব্যাপার। গোবিন্দ! গোবিন্দ!! কি একটা শক্তি ঠাকুর তৈরি করে রেখে গেলেন! জগৎটার চিন্তার গতি একেবারে বদলে গেল। যাকে কেউ টানতে পারে না, যে সকলকে টানে, তার কতশক্তি একবার বোঝ! একজন সাধু একবার আমাকে বলেছিলেন, "মহারাজ, আঠারহ বরীষ বেদান্ত রগড়তা হুঁ"—তারপর যা বললে তার ভাবটা এই—"তবু, দূরে মলের শব্দ শুনতে পেলে মনটা সেদিকে টেনে নিয়ে যায়।" মনে সংস্কার পড়ে গিয়েছিল আর কি। একবার সংস্কার পড়ে গেলে বড় কঠিন। তবে যদি এরূপ দৃঢ়তা থাকে—একবার করেছি বলে কি হয়েছে, এখন যখন বুঝেছি, আর করবো না—তাহলে হতে পারে। কত সুন্দরী, ধনবতী, বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের ভিতর দিয়ে স্বামীজী চলে এলেন, কেউ তাঁকে আকর্ষণ করতে পারলে না; বরং তিনি সকলকে নিজের দিকে টেনে আনলেন। কি ব্যাপার বোঝ একবার। গোবিন্দ! গোবিন্দ!

আমেরিকাতে একবার একটি মেয়েকে দেখে স্বামীজীর খুব সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল—কোনরূপ খারাপ ভাবে নয়, অমনি—; আর একবার দেখতে ইচ্ছা হলো। সেবার দেখলেন—কোথায় সুন্দরী! একটা বাঁদরের মুখ! একটা Higher power (উচ্চতর শক্তি) সর্বদা রক্ষা করছে আর কি। আর একবার তিনি বলেছিলেন—তিনি স্বপ্নেও কখনও স্ত্রীলোক দেখতেন না, একদিন কিন্তু স্বপ্ন দেখেন একজন স্ত্রীলোক, তার মাথায় ঘোমটা দেওয়া। দেখে তাকে খুব সুন্দরী বলে বোধ হলো। তিনি তার ঘোমটা তুলে তাকে দেখতে গেলেন। যেই ঘোমটা তোলা, অমনি দেখেন ঠাকুর! স্বামীজী লজ্জায় মরে গেলেন! ভগবান রক্ষা না করলে কি আর রক্ষা পাবার জো আছে? তাঁর কৃপায় যাদের প্রথম থেকেই সংস্কার দাঁড়াতে না পারে—তিনি যাদের বাঁচিয়ে নেন, 'অহো ভাগ্য' তাদের, তারাই বাঁচে। নিজের চেষ্টায় এর হাত থেকে বাঁচা যায় না। তবে ঠাকুর বলতেন, "তোর যদি আন্তরিক হয়, তবে মা সব ঠিক করে দেবেন।" আন্তরিক হওয়া চাই—মনে একখানা মুখে আর একখানা হলে হবে না। পরের কাছে ভাল সাজা যায়, কিন্তু নিজের ভিতর কি আছে তা নিজের কাছ থেকে লুকোবার জো নেই। সেই ভিতর থেকে যদি চাওয়া যায় তবে তিনি শোনেনই শোনেন। কিন্তু ন্যাকার মতো হলে চলবে না। বীরের মতো জোর করে বল—আর করব না। তবে তো তিনি সাহায্য করবেন।

এক রাজার গল্প আছে। রাজা ভারি স্ত্রৈণ ছিলেন। তাঁর একজন বন্ধু একদিন সে বিষয়ে বলাতে তিনি সেদিন থেকে সামলে নিতে চেষ্টা করলেন। রাজা অন্তঃপুরে আসলেন, নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া রানীর সঙ্গে বড় একটা কথা বলেন না—রাজা ভারি গম্ভীর। রানী সব বুঝলেন। রাজা খাচ্ছেন। রানির পোষা বিড়ালটা এসে রাজার পাত থেকে খাচ্ছে। রাজা তাকে মেরে তাড়াতে চেষ্টা করছেন, সেটা কিন্তু আবার আসছে। তখন রানী এসে রাজার কান ধরে বললেন, "ওকে আগে অনেক আশকারা দিয়েছ, এখন কি আর তাড়ানো সম্ভব?" আগে আশকারা দিলে পরে আর তাড়ানো যায় না। রাশ নিজের কাছে রাখতে হয়—রাশ কিছুতেই ছেড়ে দিতে নেই। রাশ ছেড়ে দিলেই

আর উপায় নেই। স্বামীজী বলতেন, "Ready to attach and ready to detach any minute." (কোনও বিষয়ে লাগতেও যেমন, ছাড়তেও তেমন—প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকা চাই)। আমরা কাজ করতে গিয়ে তাতে জড়িয়ে যাই, আর সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনে। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। যখন খুশি বেরিয়ে যাব—সব পড়ে থাকবে—কিছুই তো আর আমার নয়। ঠাকুরের দেখ—হৃদয়কে দক্ষিণেশ্বর হতে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। দরোয়ান এসে ঠাকুরকে বলছে, "আপনাকে এখান থেকে যেতে হবে।" ঠাকুর বলছেন—"সে কিরে? আমাকে নয়, হৃদুকে।" সে বলছে—"না, বাবুর হুকুম, তাকে ও আপনাকে দুজনকেই যেতে হবে।" ব্যস, অমনি চটিটি পরে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। বাবু কুঠি থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে পায়ে হাতে ধরলেন, "ওকি? আপনি যাচ্ছেন কেন? আপনাকে তো আমি যেতে বলিনি।" ঠাকুর কিছু না বলে ফিরে এলেন। দেখলে? তাঁর ত্যাগে ঝাঁজ নেই। আর আমাদের ত্যাগে কত ঝাঁজ! আমরা হলে কত কি বলতাম। তিনি কিন্তু কিছুই বললেন না—যেতেও যেমন, আসতেও তেমন।

ঠাকুর যা কাপড় পরতেন!! একদিন একজন তো তাঁকে বাগানে দেখে মালী মনে করে বললে, "ওরে, ও গোলাপ ফুলটা তুলে দেতো!" তিনি অমনি ফুলটি তুলে দিলেন। কিছুদিন বাদে সেই লোকই জানতে পারল—ইনিই পরমহংস। তখন লজ্জিত হয়ে বলছে—"আঃ, আপনাকেই সেদিন ফুল তুলতে বলেছিলাম।" ঠাকুর বললেন—"তা কি হয়েছে? কেউ সাহায্য চাইলে তাকে তা দিতে হয়।" বোঝ একবার! গোবিন্দ! গোবিন্দ! আর স্বামীজীর কথা দেখ। স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার নিউইয়র্ক গেলেন, তখন কা—সেখানে ছিল। সে স্বামীজীকে আসতে দেখে তাঁকে বললে "আপনার জায়গা, আপনি এবার নিন।" একবার, দুবার—স্বামীজী তার কথায় কান দিলেন না। কা—আবার সে কথা বলতে তিনি বললেন—"তোকে দিয়ে দিয়েছি। আমার জন্য সারা দুনিয়া পড়ে আছে।" কি ত্যাগ স্বামীজীর! সব গুরুভাইদের দিলেন—চেলাদের নয়। প্রথম ট্রাস্টিদের ভিতর দেখবে সব গুরুভাইরা—একটিও চেলা নেই। তিনি নিজের

টাকায় খেতেন। বলতেন—"সব দিয়ে দিয়েছি।" আমায় একবার লিখেছিলেন, "সব তোমাদের দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।" কি অদ্ভুত পুরুষ! তাঁর influence (প্রভাব) যদি যেতে ওদেশে, তবে দেখতে পেতে। তিনিই বলতেন, "পাশ্চাত্য দেশে আমার কাজ বেশি হবে। ওখান থেকে ভারতে তার ধাক্কা লাগবে।" একদিন মঠ থেকে রেগে বেরিয়ে গেলেন, বললেন, "তোরা সব ছোটলোক, তোদের সঙ্গে থাকতে আছে? তোরা সব আলু পটল শাক পাতা নিয়ে ঝগড়া করবি।" কিন্তু শেষটা করলেন কি? সেই ছোটলোকদেরই সব দিয়ে গেলেন। আর একদিন ভারি চটে গেছেন, বলছেন—"একাই যাত্রা করতে হলো—বাজানো, গাওয়া সব একাই করতে হলো, কেউ কিছু করলে না।" আমাদের তো গালাগাল দিচ্ছেনই—ঠাকুরের ওপরেও ভারি অভিমান হয়েছে, তাঁকেও গাল দিচ্ছেন, "পাগলা বামুন, মুখ্যু—এর হাতে পড়ে জীবনটা বৃথা গেল।" স্বামীজীর এসব কথা শুনে আমরা ভারি দুঃখিত। তারপরই বলছেন, "তবে কি জানো? যেটা দেওয়া গিয়েছে, সেটা তো আর ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। অনন্ত জীবনের একটা না হয় পাগলা বামুনের হাতে দিয়েই নষ্ট হলো।" বোঝ একবার ভাব। আমাদের প্রাণ যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

এসব কথা জেনে রাখা ভাল। কোথায় খানা, কোথায় খাদ, কোথায় কাঁটা, সব জানা থাকলে তা থেকে বেঁচে চলা যায়। ঠাকুর কত কি জানাতেন। গিরিশবাবু একবার ঠাকুরকে বলেছিলেন, "আপনি আমার সব বিষয়ের গুরু। খারাপ বিষয়েরও।" তাতে ঠাকুর বলেছিলেন, "না গো, তা নয়। এখানে সংস্কার নেই।" করে জানা আর পড়ে বা দেখে জানার ভেতর ঢের তফাত। আর করে জানলে সংস্কার পড়ে যায়। তা থেকে বেঁচে ওঠা ভারি শক্ত। পড়ে বা দেখেশুনে জানাতে সেটা হয় না।

৯ জুলাই ১৯২০

কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বারান্দা

স্বামী তুরীয়ানন্দ একটি বালকের নিকট শুকদেবের জন্মবৃত্তান্ত বললেন।

শুকদেব চরিত্রের মাধুর্য বর্ণনা করতে করতে বললেন, "শাস্ত্রকার এই বলে শুককে প্রণাম করছেন—

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি ॥—ভাগবত ১।২।২

—ব্যাসপুত্র শুকদেব যখন সব কর্ম পরিত্যাগ করে একাকী সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন ব্যাস তাঁর বিরহে কাতর হয়ে 'পুত্র' 'পুত্র' বলে চিৎকার করে তাকে ডাকতে লাগলেন। শুকদেব তখন যোগবলে বৃক্ষসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁর কথার উত্তর দিয়েছিলেন। সেই সর্বভূতের হৃদয়স্বরূপ মুনি শুকদেবকে আমি প্রণাম করি।

ঠাকুর বলতেন, "শুকের তিন [গুরুবাক্য-শাস্ত্র-অনুভূতি] তাইতে হয়েছিল।" শুকদেব যখন জনকের কাছে গিয়েছিলেন তখন সাতদিন দণ্ডায়মান ছিলেন। জনক বলেছিলেন—"তোমার বাপ যা বলেছেন তাই, আমি যা বলেছি তাই, তুমি যা অনুভব কচ্ছ তাই।" অর্থাৎ গুরু, শাস্ত্রবাক্য আর আত্ম-অনুভূতি সাপেক্ষ হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান।"

—ধ্যানট্যান কর তো? মূর্তির ধ্যানও হতে পারে। ওঁ-ধ্যানও আছে। ধ্যান করতে করতে মন ওঁকারে লয় হয়ে যায়।

(একজন ভদ্রলোকের প্রবেশ।)

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলতে লাগলেন, "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" (যো. সূ. ১।২৮)। ওঁ জপ ও তার অর্থ ভাবনা করতে করতে চিত্ত স্থির হয়ে যায়, অর্থাৎ মন তা হতে বিরত হয় না।

"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ" (যো. সূ. ১।২৯)। ব্যাধি প্রভৃতি যে সমস্ত অন্তরায় চিত্তের বিক্ষেপ উৎপাদন করে থাকে সে সমস্তই ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা নাশ পেয়ে যায়। আর ঐ অবস্থাতেই স্বরূপদর্শন হয়ে থাকে।

আর বলেছেন—"ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।" (যো. সূ. ১।৩০)

যোগের অন্তরায় কি? এরা চিত্তের বিক্ষেপ জন্মে দেয়। প্রথমেই হচ্ছে ব্যাধি—হয় পাগল হয়ে গেল, নয় এমন পীড়া হয়ে গেল যে কিছুই করতে দিলে না। 'স্ত্যান' হচ্ছে চিত্তের কার্যকারিতাশক্তির অভাব। অকর্মণ্যতা আর কি। এ জিনিসটা এ রকম কি ও রকম, এমন করলে হবে কি হবে না, এরি নাম হচ্ছে সংশয়। যা করলে সমাধি হয়, যোগ হয়, তা না করার নাম হচ্ছে প্রমাদ। আলস্য—তমোগুণ বেশি হলে যত্ন চেষ্টার যে অভাব, তারই নাম আলস্য। বিষয়ের প্রতি যে তৃষ্ণা-বিশেষ, তাই হচ্ছে অবিরতি। আর, এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলে জানার নাম ভ্রান্তি দর্শন। উচ্চ উচ্চ সমাধিভূমির লাভ না হওয়াকে বলে 'অলব্ধভূমিকত্ব'। আর রইল 'অনবস্থিতত্ব'—সেটা হচ্ছে সমাধিভূমি পেয়ে তাতে অবস্থান করতে না পারা। এরাই চিত্তের বিক্ষেপ। এরাই যোগ হতে দিচ্ছে না। অন্তরায় সব দূর হয়ে যায় যদি এক প্রণব ভাবনা করতে পারে। মোটে ভাবনাই করতে দেবে না।

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যাপিত্তোপদুষ্টরসনস্য ন রোচকৈব।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সেবয়ৈব স্বাদ্বীপুনর্ভবতি তদগদমূলহন্ত্রী ॥

যেমন পিত্তির অসুখ হয়েছে, মিছরি খেতে তেতো লাগে, কিন্তু এই হচ্ছে ওর ওষুধ। নিয়মিত সেবন করলে অসুখ সেরে যাবে, মিছরিও মিষ্টি বোধ হবে। কৃষ্ণনামও তেমনি অবিদ্যাগ্রস্ত [মানুষ] যদি গ্রহণ করে—ওষুধ গেলার মতও "অনুদিনং সেবয়া" তাহলে 'স্বাদ্বীপুনর্ভবতি'। রোগও যাবে, কৃষ্ণনাম মাধুর্যও গ্রহণ করতে পারবে। একেবারে অবিদ্যারোগের মূল নাশ করে দেবে। সেই জন্যই জোর করেও করতে হয়। যে ছেড়ে দেবে তার তো গেল।

গীতা বলছেন, "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে" অর্থাৎ হে অর্জুন, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনস্থির হয়।

আরও বলছেন—

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ —গীতা, ৬।২৫

অর্থাৎ ধৈর্যের সহিত বিচারের দ্বারা মনকে ধীরে ধীরে বিষয়সমূহ হতে নিবৃত্ত করবে। মনকে আত্মস্থ করে আর কিছুই চিন্তা করবে না।

যোগসূত্রকার বলছেন, "দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য-সৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।" (১/১৪) দৃঢ়ভূমি লাভ করা চাই। প্রথমে বেড়া দিতে হয়, কিন্তু গাছ বেড়ে গেলে আর বেড়ার দরকার নেই। নিষ্ঠা চাই। যখনই স্থির হলো এ ঠিক, তখনই স্থির করে ফেলল—এ কাজে প্রাণ দেব। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি চাই।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ —গীতা, ২।৪১

হে অর্জুন, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ। অব্যবসায়ীদের বুদ্ধি কিন্তু বহু শাখাবিশিষ্ট ও অনন্ত।

এক বুদ্ধি নিশ্চয় করে তাতে জীবন দিতে হবে।

যোগসূত্রকার আরও বলছেন, "ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ ॥"—২।৩৮ নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে। কাজে লাগবার পূর্বে নিজেকে তার উপযুক্ত করে নিতে হবে। রামমূর্তি মটর গাড়ি টেনে রাখছে বলে যদি আমি তা ফস করে করতে যাই তাহলে সেটা আহাম্মকের কাজ হবে। তা বলে কি আর কেউ করতে পারবে না! রামমূর্তি কি করে ওটি করছে লক্ষ্য করে দেখতে হয়, তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরি করতে পারলে তা অনায়াসে করা যেতে পারে। যেমন গোবরা [বিখ্যাত পালোয়ান] করছে। অনেকেই নিজের নিজের শক্তি জানে না। হনুমানের শক্তি জাম্ববান জানিয়ে দিলেন। অঙ্গদ সকলকে জিজ্ঞাসা করছে যে, প্রভু রামের জন্য কে সমুদ্র পারে গিয়ে তাঁর কাজ সেরে আবার ফিরে আসতে পারেন? কেউ আছেন তিনি যেতে পারেন, কিন্তু আসতে পারেন না। তখন জাম্ববান বললেন যে এখানে একজন আছেন যিনি যেতেও পারেন, আসতেও পারেন। এই বলে তিনি কি করে হনুমান জন্মাবামাত্রই সূর্যকে গ্রাস করবার জন্য লাফ দিয়েছিলেন—ইত্যাদি হনুমানের

বীরত্বব্যঞ্জক কথা বলতে লাগলেন। ঐ শুনে হনুমান তো আকাশ-পথে চললেন, রাস্তায় সুরসা সাপের রূপ ধরে এসে হাজির, বলছেন আমার মুখের মধ্যে দিয়ে যাও। হনুমান প্রণাম করে বললেন, আমি এখন রামের কাজে যাচ্ছি, প্রথমে তাঁর কাজ সেরে আসি, তারপর তোমার মুখের মধ্যে দিয়ে যাব। কেমন বিনয় দেখ। Policy of least resistance. (স্বল্পতম বাধার পথে অগ্রসর হওয়ার নীতি।) সুরসা বললেন, তা হবে না, এখনই এদিক দিয়ে যেতে হবে। মহা বিপদ। হনুমান কি করেন, নিজের শরীরটাকে বাড়িয়ে ফেললেন। ওদিকে সুরসাও মুখ ততই বড় করে ফেলতে লাগলেন। মুশকিল দেখে হনুমান শরীর এতটুকু ছোট করে সুরসার কানের ভেতর দিয়ে চলে গেলেন।

সেই উত্তম ভৃত্য, যে প্রভুর মনের ভাব বুঝে কাজ করে; সে মধ্যম ভৃত্য, যে প্রভুর আদেশ শুনে তার অনুবর্তন করে; আর যে প্রভুর আদেশ শুনেও শোনে না, সেই হচ্ছে অধম। সীতা অন্বেষণ করতে হবে—সকলেই চলছেন কিন্তু হনুমান যাবার সময় নিদর্শন চাইলেন। তাতেই রাম বুঝলেন হনুমানের দ্বারাই ঠিক ঠিক কাজ হবে। কানে কানে সব কথা বলে দিলেন। হনুমান লঙ্কায় গিয়ে নিজের বীরত্বটাও দেখালেন রাবণকে খুব মর্ষণ করে।

যোগশাস্ত্র বলছেন, সব শক্তি আমাতে আছে। শম দমাদি দ্বারা মন বশ করাতে হবে, তবে তো তার শক্তির প্রকাশ হবে। আমার শক্তি সঞ্চয় করার জন্য অটুট ব্রহ্মচর্য চাই।

চেলা বনা বড় শক্ত। গল্প শোননি? একজন চেলা হতে গিছল। সে গিয়ে এক গুরুকে বলে আমাকে চেলা বানিয়ে নাও। গুরু তখন বলছেন, তুমি কি চেলা হতে পারবে? চেলা হতে হলে জল তুলতে হয়, কাঠ আনতে হয়, সেবা করতে হয়—এসব কি তুমি পারবে? আজ্ঞে গুরুর কি করতে হয়? তাঁর আর কি করতে হবে—তিনি বসে থাকেন, কখনও কখনও এক আধটু উপদেশ দেন, এই আর কি। তখন লোকটি বলছে, চেলা বনা যদি কষ্ট হয় তাহলে আমাকে গুরু করে নিন না। আসল কথা হচ্ছে সবাই কিছু না করে সব মেরে নিতে চায়। উপযুক্ত লোক একটু একটু করে দোষগুলি নষ্ট করে ফেলেন। ঝট

করে ফেললেও থাকবে, যাবে না। সেই জন্যই গীতা বলছেন, শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ ইত্যাদি।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ —কঠ., ২।২।১৫

অর্থাৎ, সেখানে সূর্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারকাও প্রকাশ পায় না, এই সকল বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নির আর কথা কি! তিনি (আত্মা) প্রকাশ পাচ্ছেন বলেই তাঁহার সবকিছু প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর প্রকাশেই সব প্রকাশ পাচ্ছে।

আমরা দৃশ্য আর দ্রষ্টা এক করে ফেলেছি। পৃথক করে ফেলা যেতে পারে। আমি দ্রষ্টা—দৃশ্য নই। বুদ্ধি পর্যন্ত দৃশ্যের মধ্যে এল।

মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলং। অর্থাৎ মূল কারণের আর কিছু মূল থাকতে পারে না বলে মূল কারণ অমূল, এ সকল প্রথম যাঁরা বের করেছেন তাঁরা কত চিন্তাই যে করেছেন—কত ভাবনা ভেবেছেন, তাঁরাই জানেন।

প্রকৃত বিচার না করলে অমনি বিচার ফাঁকা। ওতে কিছুই হয় না।

ছেলেরা বলে না—ঈশ্বরের দিব্যি। কি কথা দেখ; শুনেছে—বিচার করে তো আর দেখছে না, তাই বলছে।

বৈরাগ্যবোধোদধৌ বিমুক্তি সৌধং—ইত্যাদি

কি কাণ্ড মশাই। পাখি যেমন দুটি পাখার সাহায্যে উড়ে আকাশে যায়, তেমনি বিমুক্তি-সৌধে যেতে হলে বিবেকবৈরাগ্যরূপ দুটি পাখার সহায়তা চাই। একবার ঠিক ঠিক বিবেকবৈরাগ্য হয়ে গেলে আর ভয় নেই। মরীচিকার পেছনে জলের অন্বেষণে ততক্ষণই লোক দৌড়ায়, যতক্ষণ মরীচিকাকেই সত্য জলাশয় বলে ভ্রম হয়। একবার ভ্রম ভেঙে গেলে, কি আবারও কেউ জলের জন্য ওখানে যায়? আসল কথাই হচ্ছে, মা যাকে নিজে হাত ধরে রাখেন তারই রক্ষে। গিরিশবাবু বলতেন, "আমার ছোট ভাই বাবার হাত ধরে যেত, আমি

কিন্তু তাঁর কোলে চড়ে যেতাম। আমি কত কি ঠাকুরকে বলতাম, তিনি কিছুতেই ত্যক্ত হতেন না। যখন মদ খেয়ে টং হয়ে যেতুম—বেশ্যাও দরজা খুলে দিতে সাহস পেত না—তখন হয় তো ঠাকুরের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে যেতুম। এ অবস্থায়ও আদর করে ধরে নিয়ে যেতেন—লাটুকে বলতেন, ওরে গাড়িতে দেখ কিছু আছে কি না—এখানে খোঁয়ারি এলে তখন কোথায় পাব? তিনি জানতেন যে, গাড়িতে মদের বোতল আছে। তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে সব চোখ সাদা করে দিতেন। শেষে বলতুম—আমার আস্ত বোতলের নেশাটা মাটি করে দিলে!" সকলকে ঠাকুর গত জীবনের কথা জিজ্ঞেস করতেন—ওঁকে কিন্তু কখনও জিজ্ঞেস করতেন না। বলতেন, "আমার কাছে জিজ্ঞেস করেন না, করলে সব মহাভারত বলে দিতুম। কিছুতেই মানা করতেন না। সাধে কি ওঁকে এত মানি।"

লছমন ঝোলায় একবার কার্তিক মাসে শরৎ মহারাজ আমরা সকলে খুব ভাং খেয়েছি। ঠাকুরের কথা কইতে কইতে সারারাত চলে গেল—চোখ সাদা—সব নেশা মাটি। Counteracted (ঠাকুরের কথার নেশায় প্রতিহত হয়ে) হয়ে সব নেশা চলে গেল।

ঠাকুর বলতেন, ঢোঁড়া সাপে কামড়ালে কিছুই হয় না, কিন্তু কেউটে সাপে কামড় দিলে এক ডাক, দু-ডাক, তিন ডাক—ব্যস সব চুপ।

শশধর আসলে বলতেন—"ন তত্র সূর্যো ভাতি" ইত্যাদি। মেঘ কি আর সূর্যকে ঢাকে—সূর্য তো প্রকাশিতই থাকেন, আমাদেরই চক্ষু আবরিত হয়, তা নই তো নয়।

প্রমথবাবুর কথা উঠল। বললেন—যেটা শুনেছে সেটা ধরেছে। বিবেক হয়েছে কি না। ঠাকুর বলতেন, তেল কালি ঠিক ঠিক মতো থাকলে স্পষ্ট ছাপ পড়ে। তেল কালি ভাল না থাকলে ছাপ ভাল পড়ে না। বিবেকবৈরাগ্য থাকলে ধারণা খুব ভাল হয়। তেমন তেমন না থাকলে ধারণাও তেমন হয় না। গোবিন্দ—গোবিন্দ!

৯ জুলাই ১৯২০। বারান্দায়—৫টার সময়

ধ্যান ধারণা খুব করছ তো? কোন মূর্তির ধ্যানও হতে পারে। ওঁকারের ধ্যানও আছে। ধ্যান করতে করতে মন ওঁকারে লয় হয়ে যায়। "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্" (যো. সূ. ৩২)। অন্য বিষয় হতে গুটিয়ে এনে কোন বিষয়ে যদি চিত্ত স্থির করা যায়, তখন সেই বিষয়ে যে চিত্তবৃত্তি বারবার আকারিত হয় তাকে বলে ধ্যান। আর স্বামীজী বলতেন যে, ময়দার ডেলার মতন বস্তুবিশেষে মনটাকে আটকে ফেলার নাম হচ্ছে ধারণা।

আকাশ থেকে কিছু তো ধপ করে পড়বে না। ধারণা কেন হয় না, কারণ, পূর্ণ ব্রহ্মচর্যই হচ্ছে তার একমাত্র উপায়। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করা চাই—তবে তো ধারণা হবে। এর নাম হচ্ছে বীর্য। বীর্য যদি না থাকল তো কি করবে? মোট কথা হচ্ছে সম্পূর্ণ আত্মসংযম চাই। গীতা বলছেন—

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ —গীতা, ৬।৩৬

অর্থাৎ, অসংযতাত্মা ব্যক্তির পক্ষে যোগাবস্থালাভ দুর্লভ, ইহাই আমি মনে করি, কিন্তু সংযতাত্মা ব্যক্তি উপায় অবলম্বন করে যত্ন করতে থাকলে তা লাভ করতে পারে।

খামখেয়ালি করে যেমন যেমন মনে হচ্ছে তাই করে যাচ্ছে—কাজেই গোল। শাস্ত্র পড়ে রয়েছে তা দেখবে না, গুরুর উপদেশ নেবে না—শেষে যোগের অনুপযুক্ত হয়ে যায়।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ —গীতা, ৬।১৭

অর্থাৎ যিনি নিয়মিতভাবে আহার বিহার করেন, যাঁর কর্মচেষ্টা সমুদয় নিয়মিত, যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, যোগ তাঁরই দুঃখনাশক হয়।

কি সব চমৎকার উপদেশ রয়েছে। ব্যাধি হয়, তা চলে যাবে—কিন্তু লেগে থাকা তো চাই।

১০ জুলাই ১৯২০, অপরাহ্ণ

মহারাজ গান গাচ্ছিলেন—"সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।" কিছুক্ষণ গেয়ে বললেন, এ ভাবটা আজকাল বড্ড ভাল লাগছে। যতই দিন যাচ্ছে, এ ভাবটা ততই ভাল লাগছে। ভাল মন্দ সবই তুমি। তোমার ইচ্ছায় ভাল মন্দ সব হচ্ছে। তিনি যাকে ওঠাবেন—তাকে দিয়ে খুব ভাল কাজ করিয়ে নেন—আবার যাকে ফেলবেন তাকে দিয়ে খারাপ কাজ করিয়ে নেন।* হাতিকে পাঁকে আটকিয়ে দাও—আবার পঙ্গুকেও লঙ্ঘাও গিরি।

মন বেচারির কি দোষ আছে,

বাজিকরের মেয়ে শ্যামা, যেমন নাচাও তেমনি নাচে।

এটা ভাবতেও সুখ যে একটা শক্তি এর পেছনে আছেন—যিনি সব চালাচ্ছেন। যুক্তিবাদীরা কিন্তু ওসব কথা মানবে না। তারা বলবে, কারণ না থাকলে কি কার্য হয়। কিন্তু ওরা আবার পালটে বলবে, তিনি যে কারণেরও কারণ।

পূর্বে আমিও ওভাব স্বীকার করতুম না। খুব তর্ক করেছি। লাটু মহারাজের সঙ্গে খুব তর্ক হতো। আমি যখন বলতুম যে, যদি ভগবান যা খুশি তাই করেন, তাহলে তো তিনি খামখেয়ালি হয়ে গেলেন। তিনি কি রাশিয়ার জারের মতো যথেচ্ছাচারী নাকি? তিনি ন্যায়বান, দয়ালু, মঙ্গলময়। লাটু মহারাজ বলতেন, "ছে ভাল, তুমি তোমার ভগবানকে ছে সব দোষ থেকে রক্ষা করছ, ছে বেশ ভাল।" দেখ একবার, কি চমৎকার বলতেন। ওদিক থেকে বলছেন কি না। যুক্তির দিক দিয়ে কিন্তু অনেক তর্ক এসে পড়ে। Free will (স্বাধীন ইচ্ছা) সে উড়িয়ে দিলে। যখন কেবল বাচনিক জ্ঞান হয়েছে তখন ও রকম হলে মুশকিল। এর পরখ হচ্ছে বেতালে পা পড়বে না।

---

* কৌষীতকী উপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্যে উক্তরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে।

এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে ॥ —৩।৭

ছোটকালে পুতুলনাচ দেখতে গিয়ে যখন দেখতুম একটা পুতুল ক্যাঁ করে উঠল, তখনই মনে হতো, সত্যি সত্যি ওরা শব্দ করছে, আর আপন ইচ্ছামত নাচছে। কিন্তু শেষে দেখলাম, ওমা, ও যে আড়াল থেকে আর একজন নাচাচ্ছে!

আজকাল মহামায়ার ইচ্ছায় সব হচ্ছে, এই ভাবটা বড্ড ভাল লাগছে। কি চমৎকারই মনে হচ্ছে। মনটা মেনে নিয়েছে কিনা, তাই এখন ও রকম হচ্ছে। স্বামীজীও শেষ বয়সে মহামায়ার ওপর খুব বিশ্বাস করতেন। যন্ত্রচালিতবৎ হয়ে যাওয়া—মুখে বললেই তো হলো না। মহামায়ার অনুগত থাকলে তিনি রক্ষা করেই থাকেন। বয়স হয়ে গেলে একটা সময় আসে যখন কার্য-কারণের দিক দিয়ে না গিয়ে মহামায়ার উপর নির্ভরতা এসে যায়।

গোবিন্দ—গোবিন্দ! ভগবান! ভগবান!

১১ জুলাই ১৯২০, রবিবার

আজ লোক সমাগম অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে। মহারাজ কথায় কথায় মানবপরিবারের কথা বলতে লাগলেন—সত্যযুগ কখন হবে কি না হবে তার ঠিকানা না থাকলেও আদর্শটা মন্দ নয়। কবি বলেছেন, তখনই জগতে এ রকম সম্ভবপর হতে পারে যখন "পুরুষ হইবে নারী প্রকৃতি সমান।" সুরেন্দ্র মজুমদার খুব লিখেছেন—ভারি চমৎকার ওঁর লেখা। তোমরা তো হাসছ, আমি কিন্তু ছোটবেলায় পড়েছি, আমি তো হাসিনি।

মহারাজ—এতে মেয়েদের কোমলভাবের কথাই বলছে।

ভক্ত—নির্বীর্যতার কথা বুঝাচ্ছে না তো।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—নিশ্চয়ই—তার কি আর ভুল আছে। কবি বলছেন—"ভারবাহী পুরুষের এত অহঙ্কার!" তারা তো ভার বয়ে বয়ে মরে। স্ত্রীলোকের মতো হওয়া কি সহজ?

ভক্ত—মহারাজ, মেয়েরা নরকের দ্বার প্রভৃতি কথা তো সকলেই বলে থাকে। কিন্তু ওরা যদি লিখত তাহলে পুরুষেরা নরকের দ্বার ওরাও খুব লিখতো।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—তাতো করচেই—ঐ দেখছ না, ওসব দেশে কি ছেড়ে দিচ্ছে? শাস্ত্রও সকল স্ত্রীকে লক্ষ্য করে কিছু বলেননি। বিদ্যা স্ত্রী অবিদ্যা স্ত্রী তফাত করেছেন। ঠাকুরও ও রকম বলতেন। যে স্ত্রী সর্বদা বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই অবিদ্যা স্ত্রী। আর যে স্ত্রী ভগবানের দিকে যেতে সাহায্য করছে সে বিদ্যা স্ত্রী। অবিদ্যা স্ত্রীর ওপরই এসব কথা বলেছেন। কেবল বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া কি ভাল?

তাই শাস্ত্র বলছেন—"স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরতঃ" অবস্থান করতে। দেখ না সঙ্গদোষে কি হয়ে যায়। যখন আমরা স্কুলে পড়তুম তখন কতকগুলি ছেলে বাড়ি ফেরবার কালে মাতালের ভান করে গুলির আড্ডায় ঢুকত। মাতাল দেখলে গুলিখোরদের ভারি ভয়। ও রকম করতে করতে একজন ভারি গুলিখোর হয়ে গেল। দেখনা কি কাণ্ড!

সংস্কার একবার পড়ে গেলে সে কি যেতে চায়? সংস্কার কাকে বলে, আর তা কত ভয়ানক। কখনও কখনও নিদ্রাবস্থায় এই সংস্কারের অদ্ভুত কার্য দেখা যায়, একে ইংরেজিতে সোমনাম্বুলিজম্ (Somnambulism) বা স্বপ্ন সঞ্চরণ বলে। একবার স্বামীজী এ বিষয়ে অনেক গল্প করছিলেন। একটা বিবি কবর খুলে ঘুমের ঘোরে জিনিসপত্র এনে বিছানার তলে রাখত—ঘুম ভেঙে গেলে কিছু জানত না। একটি মেয়ে, অক্ষরজ্ঞানও নেই, সে দিব্যি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিত। আমাদের দেশে হলে বলত অপদেবতা পেয়েছে। ওদের দেশ কি না, গবেষণা আরম্ভ হলো। শেষে জানা গেল দশ বার বৎসর পূর্বে মেয়েটি এক বৈজ্ঞানিকের বাড়ির চাকরানি ছিল। সেই বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা দেওয়ার ও জোরে পাঠ করার অভ্যাস ছিল। কার্যকারণ ঠিক হয়ে গেল।

কলকাতায় খুব একটি ভালছেলে—চরিত্রবান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান ছেলে—খারাপ মেয়েদের ভাল করবে বলে কাজে লাগল। শেষে একটা মেয়ে ওর কাছে তার দুঃখের কথা বলে ওকে গলিয়ে দিলে। শেষে ও মেয়েটা ওর ঘাড়ের উপর এসে পড়ে গেল। সাহস করতেই নেই—কে জানে বাবা কখন পটকে দেবে।

আমি আর একটি ঘটনা জানি তা অতি আশ্চর্য। এ বইয়ে পড়া কথা নয়—এ একেবারে দেখা কথা। একজন বাঙালি সাধু খুব ত্যাগী—বি. এ. পাশ, স্বামীজীর সঙ্গে একত্র পড়ত। সে সম্পর্কে আমাদের সঙ্গেও ভাব ছিল। ওর খুব অহঙ্কার ছিল, আমি কামজিৎ হয়েছি এই ভাব। কারও গণোরিয়া, কুষ্ঠ ইত্যাদি হলে ভিক্ষা করেও শুশ্রূষা করত। আমাদিগকে বলত, এক স্বামীজীর মাথা আছে, তোরা সাধু হতে পারিস, তোদের কারও মাথা নেই। শাস্ত্রাদি মানত না, বলত, আমরা যদি লিখি তাও শাস্ত্র হবে। খুব তর্ক করত। লোকটা খুব সাহসী ছিল। লোকে তাকে খুব বাড়িয়ে দিলে। গুণও বহু ছিল। একবার এলাহাবাদে ওর সঙ্গে দেখা হলো। সে আমাকে তার পতনের কথা খুলে বললে। আমি বললাম—কি করলিরে শালা এই শেষ বয়েসে। দেখ কি কাণ্ড, লজ্জা সঙ্কোচ নেই—সব কথা আমাকে বলে দিলে। একটা মেয়েমানুষ জোর করে এসে এইসব কাণ্ড করলে। আমিও ভাবলুম আমার কাম হবে না; তারপর এই হয়েছে। আমি বললাম, আরে শালা, ওকে দূর করে দিতে পারলি না? অহঙ্কারেই ওর পতন হলো। এসব ব্যাপারে সাহস দেখানো একদম উচিত নয়। এর জন্যই তো বলেছে—"স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরতঃ।"

১৩ জুলাই ১৯২০

হরি মহারাজ বারান্দায় আসবার সময় বাবাজীর জুতা দেখে বললেন—এত বড় আর কার পা, এ নিশ্চয়ই বাবাজীর হবে। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের কথা তুলে বলতে লাগলেন,

—ঠাকুর বলতেন শরীরের চিহ্ন দেখলে সব টের পাওয়া যায়। তিনি আমাদের নেংটা করে অবধি দেখতেন। কাঠি দিয়ে মাপতেন। হাত ওজন করতেন। এক একটা লোক কি ধরনের, শারীরিক চিহ্ন দেখে তা ধরে ফেলতে পারতেন। তাঁর ভিন্ন ভিন্ন ঘর, থাক ছিল—কিন্তু সবার জন্য তাতে জায়গা

ছিল। আমাদের মধ্যে মাদ্রাজে শশী মহারাজও কিছু কিছু ওরকম করতেন। ঠাকুর মেনে গেছেন, তাই মঘা অশ্লেষাতে কাউকে চিঠি লিখতেন না—এমন সময়ও চিঠি যেন না পৌঁছায় যখন মঘা বা অশ্লেষা থাকবে। তবে আমি স্বামীজীর সঙ্গে বেশি মেশামিশির দরুণ ওসব বড় একটা মানতাম না।

স্বামীজী কত সব লোক সঙ্গে করে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসতেন। তা দেখে ঠাকুর বলতেন—"তুই কিসব লোক নিয়ে আসিস, কানা খোঁড়া। তুই লোক চিনিস না—যাকে তাকে নিয়ে আসিসনি।"

স্বামীজী সর্বদা দুর্বলকে সাহায্য করতেন। বলতেন—"যে যত দুর্বল তাকে তত সাহায্য কর। বামুনের ছেলের জন্য যদি একটি পণ্ডিত দরকার হয় তবে পারিয়ার ছেলের জন্য চারটি পণ্ডিত নিযুক্ত কর।" কি চমৎকার বলতেন দেখ।

একবার ঠাকুর জনৈক মহিলা ভক্তের ওপর ভারি চটে গেলেন—সবাইকে বলে দিলেন, কেউ ওর বাড়ি যাবিনি, কেউ ওর হাতে খাবিনি, তাঁকেও দক্ষিণেশ্বরে আসতে মানা করে দিলেন। ঠাকুর তাঁর ওপর বাস্তবিক চটে গিয়ে মানা করছেন, কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে যাবে? স্বামীজী কিন্তু মহাপুরুষকে ডেকে বললেন—চল বেড়িয়ে আসি। বেড়াতে বেড়াতে তাঁর বাড়ি এসে হাজির। এসেই বললেন "—মা, খাবার দাও, খাব।" তিনি তো আনন্দেই অধীর—শেষে একটা মাছ আনিয়ে রেঁধে খাওয়ালেন। ওখান থেকে খেয়ে এসে ঠাকুরকে বলছেন, "—মার বাড়ি গিয়ে খেয়ে এলুম।" ঠাকুর বললেন—"সে কিরে? আমি বারণ করলুম, আর তুই গিয়ে খেয়ে এলি?" স্বামীজী বললেন—"খাব না? তাঁকে এখানে আসতেও বলে এসেছি।"

হাজরার জন্য একবার ঠাকুরকে ধরে পড়লেন। ঠাকুর তখন কাশীপুরে, কিছুতেই ছাড়ছেন না—বলছেন—"এর একটা গতি করে দাও, একে একটু কৃপা কর।" ঠাকুর বললেন—"এখন কিছুই হবে না, যাও। এর মৃত্যুর সময় হয়ে যাবে।" ঠিক তাই হয়েছিল। স্বামীজী কৃপা-টৃপা ভেতরে ভেতরে বেশ বিশ্বাস করতেন।

লাটু মহারাজ যখন তখন ঘুমিয়ে পড়তেন বলে ঠাকুর একবার খুব রেগে যান—তাঁকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেন। শেষে স্বামীজী ধরে পড়ে সব গোল কাটিয়ে দিলেন। এর জন্যই লাটু মহারাজ বলতেন—"যদি গুরুভাই হয়, তবে বিবেকানন্দ!"

একবার মঠে একটি ছেলে থাকবার জন্য এল। সকলেরই আপত্তি। স্বামীজী বললেন—"ঠাকুর ভেতর দেখতে পারতেন, কাজেই রাখা না রাখা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ঠিক হতো। আমি তো ভেতর দেখতে পাই না, কাজেই আমি সবাইকে সুযোগ দিতে রাজি আছি। তোমরা যদি ঠাকুরের মতো ভেতর দেখতে জেনে থাকো তাহলে বরং ওকে রেখে কাজ নেই।" তারপর জনা জনার মত নেওয়া হতে লাগল। আমায় জিজ্ঞেস করা হলো। আমি বললাম—"আমি বেশ লক্ষ্য করে দেখছি ঠাকুর যাকে না রাখেন তার এখানে থাকার যো নেই, যে থাকবার সে থাকবে—যে যাবার সে যাবে।" আমার কথায় স্বামীজী বললেন—"বেশ বলেছিস, খুব সুন্দর কথা।" ছেলেটা কয়েকদিন থেকে চলে গেল। যাবার সময় কিছু চুরিও করে নিয়ে গেল।

"গিরিশবাবুর মতো লোক পর্যন্ত ঠাকুরের কাছে স্থান পেত। তিনি সবাইকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন। আমরা করি কি—যার যার নিজের মতো করে গড়তে যাই। তিনি কিন্তু যে যেখানে আছে সেখান থেকেই তার উন্নতির জন্য তাকে ধাক্কা দিতেন। কাউকে নিজের মতো করতে না পেরে তাকে নিরাশ করেননি। ঠাকুর এক একজনের সঙ্গে এক এক ভাব করতেন আর সেটা বরাবর রক্ষা করতেন। হাসি ঠাট্টার ভেতর দিয়ে খুব শিক্ষা দিয়ে দিতেন। আহা, তিনি যথার্থ আচার্যই ছিলেন। এ রকম আচার্য কোথায় মেলে! স্বামীজীও খুব রসিক লোক ছিলেন। একদিন একটা ছুরি দিয়ে কাজ করতে করতে তার আগাটা গেল ভেঙে। ভেঙে যাওয়ায় আমি মন খারাপ করে বসে আছি। স্বামীজী শুনে বললেন—"ওতো ও রকম করেই যায়, ওর তো আর ওলাউঠা বা বাতশ্লেষ্মা রোগ হবে না।" আমি কথা শুনে হেসে ফেললাম। কি চমৎকার বললেন, দেখ।

মা যা ছেলেকে শেখায়, তা ছেলে কত দৃঢ়ভাবে শেখে! মা, শিক্ষা দিচ্ছি—এ কথা বলে না। ছেলেরও মায়ের কথাবার্তার ভেতর দিয়ে সবচেয়ে ভাল শিক্ষা হয়ে যায়। একটা ভালবাসা আছে কি না। যিনি আচার্য হবেন, তাঁর মনটাকে—যিনি শিক্ষা পাচ্ছেন, তাঁর মনের সঙ্গে এক করে নিতে হবে। তবে তো সে উপকার পাবে।

একবার জব্বলপুর থেকে একজন ভদ্রলোক ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। ভদ্রলোকটি খুব পণ্ডিত ব্যক্তি—এম. এ., বেশ সরল অথচ নাস্তিক। ঠাকুরের সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্ক করলেন। এদিকে বলছেন তার মনে নানা অশান্তি, অথচ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করবেন না। বলছেন, ভগবান আছেন কি না তার তো কোন প্রমাণ নেই। ঠাকুর বললেন—"দেখ, এই বলে প্রার্থনা করতে তো তোমার আপত্তি নেই, যদি কেউ থাকো তাহলে আমার কথা শোনো। এ বলে প্রার্থনা করলে তোমার ভাল হবে।" ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপ করে ভেবে শেষে বললেন—"না, এতে আমার আপত্তি নেই।" ঠাকুর বললেন, "এ রকম করে, আবার আমার কাছে এসো।" ভদ্রলোককে তারপরে দেখেছি, সে মানুষ আর নেই। ঠাকুরের পা ধরে কেঁদে কেঁদে বললেন—"আপনি আমায় রক্ষা করেছেন।"

স্বামীজী একবার স্পর্শ করে কিডির* মনে ঈশ্বরে বিশ্বাস সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। কিডি ভারি নাস্তিক ছিল । কখনও কখনও স্বামীজীর একটা খুব শক্তি এসে যেত। তখন কাউকে স্পর্শ করে তার ভেতর যেন ধর্মভাবটা প্রবেশ করিয়ে দিতেন।

আর একবার এমন হয়েছিল কাশীপুর বাগানে শিবরাত্রিতে ধ্যানে বসেছেন। স্বামীজী ধ্যান করতে করতে একজনকে বললেন আমার উরু ছোঁ তো—যেই ছোঁয়া অমনি তার গভীর ধ্যান হয়ে গেল। ঠাকুর যেন সব বুঝতে পারতেন—

---

* সিঙ্গার ভেলু মুদালিয়ার নামক মাদ্রাজী অধ্যাপক। ইনি অনেক সময় ফলমূল খাইয়া থাকিতেন বলিয়া স্বামীজী ইহাকে রহস্য করিয়া কিডি বলিয়া ডাকিতেন। তামিল ভাষায় কিডি বলিতে পক্ষী বুঝায়।

তিনি বললেন, "নরেনকে ডেকে নিয়ে আয় তো।" স্বামীজী নিকটে এলে বললেন—"ও কি করছিলি? আগে জমা, তবে তো খরচ করবি, জমাবার আগেই যে খরচ করছিস রে!"

স্বামীজী সত্যই পরকে সাহায্য করতে পারতেন। তাঁর এমন কিছু গোপন জিনিস ছিল না যা তিনি অপরকে দিতে না পারতেন। আমাদের তো ঐখানেই মুশকিল। যদি কেউ আমাদের থেকে বড় হয়ে যায়—ঐ ভয়। তিনি কিন্তু এত ওপরে ছিলেন যে তাঁর ও ভয় ছিল না। তাঁর ঈর্ষা ছিল না। তিনি বলতেন—"যে যে জায়গায় আছে তাকে সে জায়গায় সাহায্য কর। তার যেখানে অভাব. সে জায়গাটা তার পুরিয়ে দাও। না পার জোর করে তাকে তোমার মতো করতে চেষ্টা করো না।"

ঠাকুর কেমন চমৎকার করে এক একজনকে তার অভাবের পূরণ করে উপদেশ দিতেন। বলতেন—"মা মাছ দিয়ে নানা রকম করে রেঁধেছেন, সব ছেলেকে এক জিনিস দিচ্ছেন না, যার যা পেটে সয়, তাকে তাই দিচ্ছেন।" ঠাকুর কাজের বেলায়ও এমনি করতেন। একবার যোগীন স্বামী কোথায় ঠাকুরের নিন্দা শুনেও কিছু বলেননি, চুপটি করে শুনে এসে সে কথা বলছিলেন। ঠাকুর শুনে বললেন—"আমার নিন্দা করল আর চুপটি করে শুনে এলি।" তাঁকে অনেক মন্দ বললেন। আর কয়দিন পর নিরঞ্জন স্বামী একদিন নৌকাতে দক্ষিণেশ্বরে আসছিলেন। সেই নৌকায় কতগুলি লোক ঠাকুরের নিন্দা করছিল। অমনি তিনি বের হয়ে এসে দুদিকে পা দিয়ে নৌকা দোলাতে দোলাতে বললেন—"তোরা ঠাকুরের নিন্দা করছিস, এখনই আমি এ নৌকা ডুবিয়ে দেব—দেখি, আমায় কে বাধা দেয়?" সকলের তো থরহরি কম্প। হাতে পায়ে ধরে তবে তাঁকে নিবৃত্ত করল। ঠাকুর এ কথা শুনে বললেন—"শালা, ওরা আমার নিন্দা করছিল তাতে তোর কি?" দেখ কি কাণ্ড—যার যা পেটে সয়। এমন আচার্য কই?

১৪ জুলাই ১৯২০

স্বামী তুরীয়ানন্দ আজ এই বলে কথা আরম্ভ করলেন ঃ

একবার স্বামীজী কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"তোমরা যেখানে যাবে সেখানেই একটা কেন্দ্র গড়ে উঠবে।"—তাতো দেখতেই পাচ্ছ। তখন আমার মিসেস হুইলারের চিঠির কথা মনে পড়ল। আমি লন্ডনে থাকতে মিসেস হুইলার আমাকে তাঁর ওখানে গিয়ে থাকবার জন্য আহ্বান করেছিলেন। আমি স্বামীজীকে সে কথা বলাতে স্বামীজী বললেন, "বেশ তো, ভাল কথা।" তারপর দিনকতক মিসেস হুইলারের বাড়িতে ক্লাস-টাস হলো। আমি তাদের বলতুম, "এই যে বেদান্ত পড়ছ, এ শুধু পড়লে হয় না; এর জন্য সাধন চাই, তার উপযুক্ত স্থান চাই।" বেশ নির্জন নিভৃত জায়গাও পাওয়া গেল। বোঝ না—ঠাকুর আগে থাকতেই সব গড়ে তুলছেন। একটি মেয়ে আড়াইশো একর জমি দিতে চাইল। আমি বললুম, "আমি কি করে নি?" —কে সে কথা জানালুম। সে তখন বক্তৃতা দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত। —বললে, "দাঁড়াও আমি আসছি।" এসে বললে, "আরে রাম। ও কি নিতে আছে?" আমি কিন্তু বললুম, "আমার মনে হচ্ছে এ ছাড়া উচিত নয়।" স্বামীজীকে 'তার' করা হলো। স্বামীজী তখন ক্যালিফোর্নিয়ায়। স্বামীজী ওখানে 'তারে' জবাব করলেন—"জমি নিয়ে নাও।" জানই তো, স্বামীজী কোন সুযোগ ছাড়তেন না। জমি বন্দোবস্ত হলো। স্বামীজী আমাকে লিখে পাঠালেন, "তুমি এখানে এসো।" কিন্তু—আগে থাকতেই, "আমি ক্লাস করব" বলে, সাধারণকে জানিয়ে রেখেছিল, কাজেই আমার তখন যাওয়া হলো না। স্বামীজী এলেন। তারপর স্বামীজীর সঙ্গে আমরা গেলাম। স্বামীজী মাঝ রাস্তায় চিকাগোর কাছে নেবে গেলেন—সেই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। যাওয়ার সময় "নমো নমঃ" করলেন—সে কথা আজও আমার কানে বাজছে।

* * *

সব Hypnotism (হিপনোটিজম)—মায়ার খেলা। তুমি হিপনোটিজম করা দেখেছ? ডাঙায় সাঁতার কাটতে বললে সাঁতার কাটে। মহামায়া আমাদের সব

মায়ামুগ্ধ করে রেখেছেন। বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া—দুটোই হিপনোটিজম, একটা দিয়ে অপরটা নাশ করতে হয়। বিদ্যা, অবিদ্যার বিরোধী কিনা। স্বামীজীর গল্প জান তো? এক মুসলমানের খাবার শেয়ালে খেয়েছিল। ওরা শেয়ালকে বড় অশুচি বলে মানে। মুসলমান মোল্লার কাছে গিয়ে ব্যবস্থা চাইলে। মোল্লা বললেন, "কুকুর হচ্ছে শেয়ালের শত্রু। কুকুর দিয়ে যদি খাবারটা আবার খাইয়ে নিতে পার, তবে সেটা শুদ্ধ হয়ে গেল।" (হাস্য) বিদ্যা দিয়ে অবিদ্যাকে নাশ করতে হয়।

ভক্ত—বিদ্যাকে নাশ করবার জন্য অপর কিছুর দরকার হয় কি?

স্বামী তুরীয়ানন্দ— না। বিদ্যা, বস্তুতে পৌঁছে দিয়ে আপনিই নিরস্ত হন। ঠাকুরের সেই তিন চোরের গল্প মনে আছে তো?*

---

* একটি লোক বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় তাকে তিনজন ডাকাত এসে ধরলে। তারা তার সর্বস্ব কেড়ে নিলে। একজন চোর বললে—আর এ লোকটাকে রেখে কি হবে? এই কথা বলে খাঁড়া দিয়ে কাটতে এলো। তখন আর একজন চোর বললে—না হে কেটে কি হবে, একে হাত পা বেঁধে এখানে ফেলে যাও। তখন তাকে হাত পা বেঁধে ঐখানে রেখে চোরেরা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বললে—আহা তোমার কি লেগেছে? এসো আমি তোমার বন্ধন খুলে দি। তার বন্ধন খুলে দিয়ে চোরটি বললে—আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি। অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে বললে—এই রাস্তা ধরে যাও—ঐ তোমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। তখন লোকটি চোরকে বললে—মশায় আমার অনেক উপকার করলেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ি পর্যন্ত যাবেন। চোর বলল—না, আমার ওখানে যাবার যো নেই, পুলিসে টের পাবে। সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ ডাকাত। জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে নেয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যায়, রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে, কিন্তু সত্ত্বগুণ রজঃ তমঃ থেকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম ক্রোধ এইসব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণ আবার জীবের সংসার বন্ধন মোচন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর—তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না, কিন্তু সেই পরমধামে যাবার পথে তুলে দেয়, দিয়ে বলে ঐ দেখ—ঐ তোমার বাড়ি দেখা যায়। যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান, সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড, পৃঃ ২৪৩

১৫ জুলাই ১৯২০। সময়—অপরাহ্ণ ৩টা

আজ কথাপ্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন ঃ

উত্তরায়ণের কথা মহাভারতে আছে। ভীষ্ম উত্তরায়ণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এদ্দারা নির্দিষ্ট কালের কথা বোঝাচ্ছে না—ভীষ্মের যে ইচ্ছামৃত্যুর শক্তি ছিল, তাই দেখাচ্ছেন। শাস্ত্র উত্তরায়ণের কথা বলে কালের কথা বুঝাচ্ছেন না—তৎকালাভিমানিনী দেবতা বোঝাচ্ছেন। এতো বেশ বোঝা যায়। বড়লোকদের অভ্যর্থনা করবার জন্য লোকজন যায়, সেই রকম ভিন্ন ভিন্ন দেবতারা ব্রহ্মলোকগামী জীবাত্মাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

—বাবুর বাপের অসুখ। খবর পেয়ে বাপের কাছে পৌঁছাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকেই তিনি দেখতে পেলেন—এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। তিনি আমাকে চিঠি দিলেন—তাঁর বাপ তাঁকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করতেও পারেন। কিন্তু খপ করে মনে পড়ে গেল—কোন অভিমানিনী দেবতা হতে পারেন। পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। —বাবু তো মিথ্যা কিছু বলবেন না—তেমন লোকই নন। আর গীতাতেও বলেছেন—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥" —গীতা ১৫।১০

অর্থাৎ—দেহত্যাগ করে পরলোকগমন কালে, দেহে অবস্থিতির সময় অথবা গুণসমন্বিত হয়ে ভোগ করবার সময়, মোহগ্রস্ত লোকেরা কোন সময়েই জীবাত্মাকে দেখতে পান না, শুধু জ্ঞানচক্ষু ব্যক্তিগণ দেখতে পান। এসব কথা বুঝতে পারি। স্বামীজী বলতেন, যে একটা ভূতযোনিও দেখেছে সেও বই-পড়া-পণ্ডিত থেকে অনেক বড়। ওর যে পরকালের সম্বন্ধে একটা ধারণা হবার সুবিধা হয়েছে।

১৬ জুলাই ১৯২০। শুক্রবার। সময়—অপরাহ্ণ

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলছিলেন ঃ

আজ যখনই খাই, তখনই বুঝলুম রুটি খাওয়া ভাল হবে না, কিন্তু খেতে

খেতে খেয়ে ফেললুম। বোঝ একবার কাণ্ড—আমরা জানছি এ করা অন্যায় কিন্তু তাই করে ফেলছি! মহামায়ার এমনি মায়া! আবার খেতে খেতে ভালও লেগে যায়। একটা গল্প শোননি? ঐ যে "খেতে খেতে বেশ লাগছে"। চাকুরে ছেলে খেতে বসেছে—বুড়ো মা ভয়ে ভয়ে রেঁধে দিয়েছে। ছেলে বলছে—"ওমা, কী রেঁধেছ? অ্যাঃ ছিঃ ছিঃ—এ যে মুখে দেওয়া যায় না।" গিন্নী অমনি বের হয়ে বলছে —"তুমি কি বলছ? এ যে আমি রেঁধেছি।" "অ্যাঁ—তুমি রেঁধেছ?" কতক্ষণ পরে বলছে—"খেতে খেতে বেশ লাগছে।" (হাস্য)

কিছুতেই কিছু হয় না—তুমিও যেমন, কেবল আশায় আশায় লোক ঘুরে ঘুরে পাগল আর কি? শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥ —ভাগবত, ১১।৮।৪৪

অর্থাৎ—আশাই পরম দুঃখ ও আশা ত্যাগই পরম সুখ, পিঙ্গলা নামক বেশ্যা কান্ত-আশা ত্যাগ করে পরম সুখে ঘুমিয়েছিল।

জনকের রাজত্বে এক বেশ্যা থাকত। সে একদিন রাতের বেলা তার লোকের অপেক্ষায় ঘর বার করছে। রাত যখন দুটো বেজে গেল তখনও কেউ এলো না দেখে সে আশা ছেড়ে দিলে। বলতে লাগল—"আমার মতো হতভাগিনী সমস্ত রাজ্যের মধ্যেও কেউ নেই। হায়, আশায় আশায় কি কষ্টই না পেলাম। যাক, আর না, এখন গিয়ে ঘুমোই।" এই বলে শুয়ে পড়ল। নিকটেই অবধূত ছিলেন। তিনি এসে বললেন—"তুমি সমস্ত আশা ত্যাগ করে সুখে নিদ্রিত হয়েছ—আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমার গুরুস্থানীয়া।" এই বলে চলে গেলেন। মধুসূদন দত্ত 'আশা'র সম্বন্ধে লিখেছেন, বেশ চমৎকার—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায়
ফিরাবো কেমনে ॥

দিন দিন আয়ু হীন, ক্ষীণ বল দিন দিন
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না একি দায় ॥
রে প্রমত্ত মন মম কবে পোহাইবে রাতি
জাগিবিরে কবে।
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি
কত কাল রবে ॥"

কাগজে দেখলুম মেস্টন সাহেব বড় গোলে পড়ে গেছে। সে বলছে, হিন্দু-সমাজের ওপর দিয়ে এত বড় ঝঞ্ঝা গেল, তার মধ্যেও কি করে সব নিজের ভেতর মিশিয়ে নিয়ে নিজত্ব বজায় রাখলে। এত জীবনীশক্তি কোত্থেকে এল? মুসলমানরা তরবারির বলে প্রচার করেছে, তবুও কিছু করতে পারলে না।

আমাদের ব্রহ্মকে নিয়ে সম্বন্ধ। আমাদের জীবনীশক্তি থাকবে না? বলছে—হিন্দুরা গণতন্ত্র শাসনও নিজেদের অঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নেবে। ওরা ভেবেছিল, ওতে বুঝি হিন্দুসমাজ অনেকটা শিথিল হয়ে যাবে। তা কি হবার জো আছে?

ভক্ত—ওরা বলছে—যদিও আমরা খাতাপত্রে খ্রিস্টান করতে পারছি না, কিন্তু ওদের ভিতরে খ্রিস্টানভাব ঢুকিয়ে দিয়েছি।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—ওদের জাতীয় ভাবটা এত প্রবল হয়ে যাচ্ছে যে, কবে এশিয়াবাসী বলে যিশুখ্রিস্টকেও বাতিল করে দেবে! ওদের এখন দার্শনিক ধারণা দাঁড়িয়েছে—কিসে কাইজারের মতো Superman (অতিমানুষ) উৎপন্ন হতে পারে। এই Supermanএর চোটে কি হলো দেখলে তো!

—বাবুর পত্র পেয়েছি। আমার কাছে পত্র দেন তাঁর ছেলে মারা যাবার পর। গীতায় যে অর্জুন শ্রীভগবানকে বলেছিলেন, "যচ্ছোকমুচ্ছোষণ-মিন্দ্রিয়াণাম্" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের শোষণকারী শোক—এটা তাঁর পত্র পড়ে বেশ মনে হচ্ছিল। আজকাল তন্ত্র পড়ছেন। উপনিষদ যা তত্ত্বাকারে বলেছে তন্ত্রে সেটা ব্যবহারিক জীবনে পরিণত করবার চেষ্টা হয়েছে। তন্ত্র অনেক অনেক অংশে উপনিষদেরও ওপরে চলে যায়। তন্ত্রে ঐ উপাসনা। ভারি চমৎকার।

শক্তি মানেনি এমন কি কেউ আছে? ঠাকুর বলতেন—অবতারাদি পর্যন্ত শক্তির উপাসনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন, তারপরে ধর্মপ্রচার করেন।

শঙ্করও খুব শক্তি মানতেন। শক্তির কত স্তবস্তুতি লিখে গেছেন। এক গল্প আছে—জান না? একবার শঙ্কর গঙ্গায় স্নান করে আসছিলেন। তিনি তখন বড় একটা শক্তি মানতেন না। শক্তি তো এক বুড়ির বেশে তাঁর পথের ওপর পড়ে রইলেন। শঙ্কর আসতে নিজের দুঃখ জানালেন। শঙ্কর তাঁকে স্পর্শ করা মাত্র তাঁর সব শক্তি চলে গেল। তিনি তখন বুঝতে পারলেন যে ঐ শক্তি। তখন স্তব করতে লাগলেন। ঐ হচ্ছে 'আনন্দলহরীর' উৎপত্তি। স্তবে শক্তিকে সন্তুষ্ট করে শক্তি ফিরে পেলেন।

মহিম্ন-স্তোত্র সকল স্তোত্রের শ্রেষ্ঠ। আমি কনখল থাকতে নিত্য পড়তুম। আনন্দগিরির টীকাও তখন পড়েছিলুম। পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব ছিল। শিব-নির্মাল্য মাড়িয়ে সে যখন বন্দি হয়ে পড়ল তখন মহিম্ন-স্তোত্র পাঠ করে খেচরত্ব আবার ফিরে পেল। ভারি চমৎকার স্তব।

১৯ জুলাই ১৯২০

একজন এসে বললেন—চামেলী পুরী দেহরক্ষা করেছেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—কখন?

ভক্ত—কাল বিকেলে।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আর কোন খবর কেউ জান না? বয়সও কম হয়নি, ১০৮ বৎসর হয়েছিল। ঐ বাগানেই ষাট বৎসর বাস করেছিলেন। কি তেজই তাঁর ছিল! লেঙ্গটবদ্ধ ছিলেন কিনা। আমি একবার দেখা করতে গিয়েছিলুম। শুনলুম বলছেন—"শিউ কেদার" "শিউ কেদার"। কি জোরের ডাক! ওঁদের মৃত্যু যেমন পাকা ফল গাছ থেকে সহজে ধপ করে পড়ে যায়, সেই রকম। কষ্ট হয় না। আমার যে আটান্ন বৎসর বয়স হলো, জগৎটাকে কত যেন পুরনো পুরনো ঠেকছে—মনে হয় যেন কত পুরনো। আর ওঁর দেখ ১০৮—প্রায় ডবল বয়স—জগৎটা কত পুরাতনই না তাঁর মনে হতো! কাশীর কত পুরাতন

তত্ত্বই না জানতেন। অমরবাবু প্রায় ৩।৪ বৎসর যাবৎ তাঁর সেবা করছিলেন। আমাকে অমরবাবু বলেছিলেন, যখন তিনি তাঁর সঙ্গে প্রথমে দেখা করতে যান—তখন তিনি বললেন, "আজ সারে দিন ভুখা হূঁ—মা নে তুমহারে সাথ ক্যা ভেজা হৈ দো খাউঙ্গা।" তারপর থেকেই তিনি ওঁর আহার জুটিয়ে আসছেন। অমরবাবুর সহকারী বৈজনাথ পণ্ডিতও ওঁর ওখানে যেতেন। পণ্ডিতের নাকটা খুব লম্বা। লম্বা নাক কিসের লক্ষণ বলতে পার? নেপোলিয়নের জীবনচরিতে পড়নি? নেপোলিয়ন বলছেন, "যদি লম্বা নাকওয়ালা গোটাকতক মানুষ পেতুম তাহলে আমি সব করতে পারতুম।" লম্বা নাক খুব অনুগত বিশ্বাসী লোকের চিহ্ন।

এখানে অসিঘাটের কাছে মগ্নীবাবা বলে আর একজন সাধু আছেন। তাঁর বয়সও খুব হয়েছে। অনেক কাল কাশী আছেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। বেশ পণ্ডিত লোক, তবে কি-না পুরনো ধাঁচের। তাঁর বিদ্বৎসন্ন্যাস হয়েছে—রক্তের তেজ খুব। খুব শক্ত শক্ত ব্যামো হয়, কিন্তু সেরে ওঠেন। একবার খুব অসুখ করায় ব্রহ্মচারীর সব ক্রিয়াকলাপ করার অসুবিধা হয়ে পড়ে। তখন গঙ্গা-তীরে গিয়ে শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিজে নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আমি কয়েকবার ওঁকে দেখেছি। সর্বদাই ভাবে মগ্ন থাকতেন। সম্ভবত তারই জন্য ওঁর নাম হয়েছে মগ্নীবাবা। পুরনো ধাঁজের গুণও আছে, দোষও অনেক। আগে দুর্গাচরণবাবু ওঁকে গুরুবুদ্ধি করেন, গুরুপূর্ণিমায় পুজো করতে গিছলেন। দীক্ষা প্রভৃতি ওঁকে কিছু দেন নি।

আজ হীরানন্দের জীবনী পড়ছিলুম—চমৎকার লাগল। সেও ঠাকুরের শিষ্য ছিল কি-না, ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। ঠাকুরের অসুখের সময় সিন্ধু দেশ থেকে হীরানন্দ এসেছিল—মেঠাই আর ঠাকুরের জন্য ঢিলে পাজামা নিয়ে এসেছিল। ঠাকুর একদিন পরেছিলেন। একবার স্বামীজীর সঙ্গে ওকে তর্কে লাগিয়েছিলেন। স্বামীজী জ্ঞানের দিক দিয়ে বললেন—হীরানন্দও বেশ বলল ভক্তির দিক দিয়ে। তর্ক করলে না। হীরানন্দ কেশববাবুরও শিষ্য ছিল।

সামনের মাঠে পাখিরা খাবারের খোঁজে বেড়াচ্ছিল দেখে, মহারাজ

বললেন—এখন বাচ্চা হয়েছে কি-না তাই খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। কি কাণ্ড দেখ না! নিজে না খেয়ে বাচ্চার জন্য নিয়ে যাবে। আবার বাচ্চা একটু বড় হলে অমনি তাকে ঠুকরে বের করে দেবে। মহামায়ার কাজ করে যাচ্ছে। দেখ, কি করে তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।

"তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"

ওদের হচ্ছে ভোগের শরীর। ওদের ক্রিয়মান কিছু নেই। এ শরীর শেষ হয়ে গেলে আবার সঞ্চিত থেকে কিছু নিয়ে এসে ভোগ-শরীর ধারণ করবে। ওদের ভালমন্দ বোধ নেই কি-না, তাই পাপপুণ্য ওদের নেই। বুদ্ধিবৃত্তি পর্যন্ত ওদের বেশ আছে। মানুষেরই কেবল ক্রিয়মান আছে, তার একটা ভালমন্দ বোধ আছে কি-না। তারই বন্ধনের বোধটা আছে, অন্য জীবের তা নেই। বন্ধনের বোধ হলেই তার ঠিক ঠিক মুক্তির চেষ্টা হতে পারে। দেখ না, জেলে পুরে রাখলে একটা লোক মুক্তি পাবার জন্য কত চেষ্টা করে। জগৎটা একটা বন্ধনের কারণ, এই বোধ হলেই তো মুক্তির জন্য চেষ্টা করবে। এ বুঝতে না পেরেই চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে থাকে।

ঠাকুর হোমা পাখির গল্প বলতেন—জান তো? যেই চোখ ফুটে জ্ঞান হলো, দেখলে মাটিতে পড়ছে, অমনি চোঁচা ওপরের দিকে দৌড়। এ হলেই রক্ষে। অনেক লোকও পাওয়া যায় যারা চৈতন্য হওয়া মাত্রই ওপরের দিকে চলল।

ঠাকুর বলতেন, "বুড়ি খেলতে ভালবাসে।" আমি বলেছিলাম, "খেলতে ভালবাসেন, তাতে কি? আমি কেন খেলি?" অমনি ধমক দিয়ে বললেন, "সে কিরে—কি বলছিস তুই? ভারি স্বার্থপর কথা বলছিস যে। খেলেই তো সুখ। যে কেবল বুড়ির কাছে ঘোরে, তাকে বুড়ি ভালবাসে না। যে অনেক দান খেলে তাকে ছুঁতে আসে, তার জন্য যে সে হাত বাড়িয়ে দেয়। পাশা খেলায় দেখিসনি, পাকা খেলোয়াড় পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে খেলে, আবার যেই চায় অমনি দান ফেলছে—'কচে বার'—আবার উঠে গেল।"

আমি বলেছিলাম, "এমন কি হয় মশাই?" তিনি বললেন, "হবে না কেন? হয় রে, অমন হয়। লোকে ঈশ্বর মানবে না! যে মানুষ গলায় কাঁটা ফুটলে

বেড়ালের পা ধরে, খেজুরগাছকে প্রণাম করে—সে ঈশ্বর বিশ্বাস করবে না! বলিস কিরে? 'জ্ঞান' 'জ্ঞান' যে করিস এমন ঘুমটি দিয়ে রেখেছেন যে, সে সময়ে কুকুরে মুখে মুতে দিলেও অজ্ঞান যায় না।"

কি চমৎকার বলতেন। গোবিন্দ! গোবিন্দ!

২০ জুলাই ১৯২০

এইমাত্র খবর এসেছে শ্রীশ্রীমার অবস্থা ক্রমেই অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাচ্ছে। চিঠিখানা তুরীয়ানন্দ মহারাজকে পাঠ করে শুনানো হলো। মহারাজ কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে থেকে বললেন—এই সংসারে সকল জিনিসেরই অবয়বের বিশ্লেষণ হয়। কোন জিনিস দেখতে পাবে না, যার বিশ্লেষণ হয় না। মরাটা কি? ঐ বিশ্লেষণ বই তো নয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—যারই উৎপত্তি আছে, তারই নাশ আছে। "জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি"—এই তো যাস্কমুনির মত। যে কোন জিনিস জন্মাবে—সকল জীবজন্তু বৃক্ষলতাদি পর্যন্ত—তাই এই ষড়বিধ পরিণামের অধীন। দেখ না, জগৎটাতে এর কি কোথাও ব্যতিক্রম হচ্ছে? আমাদের শাস্ত্রকারেরা এ সকল বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে গেছেন। পুনর্জন্মবাদটা ভারি চমৎকার! খ্রিস্টানদের ও রকম কিছু নেই। ওদের হচ্ছে মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা বহুদিন পর্যন্ত ঐ কবরে থাকে—তারপর জগতের প্রলয় হয়ে গেলে যিশুখ্রিস্ট ভগবানের ডানদিকে বসে সকলের বিচারকার্য করবেন—দূতেরা সব আত্মা কবর থেকে নিয়ে গেলে যিশু যার কথা বলবেন যে, একে আমি জানি—তাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবেন, আর যার সম্বন্ধে বলবেন যে, একে আমি চিনি না, তার কিন্তু অনন্ত নরক হয়ে যাবে। কি ভীষণ কাণ্ড দেখ! ওসব দেশে সরল বিশ্বাসী অনেক বিবি Baptism (খ্রিস্টীয় দীক্ষানুষ্ঠান) না হয়ে সন্তান মরে গেলে কেঁদে খুন হয়ে যায়। কারণ প্রটেস্টান্টরা মনে করে, যার ব্যাপটিজম হয়নি, তার অনন্ত নরক। রোমান ক্যাথলিকদের কি একটা Purgatory (মৃত্যুর পর পাপের

প্রায়শ্চিত্ত স্থান) আছে—তারা বলে যে, পারগেটরির ভেতর দিয়ে গিয়ে ওরাও স্বর্গে যেতে পারে। বেদান্ত ওদের যে কি রক্ষা করলে তা ওরাই জানে।

পুনর্জন্মবাদের তত্ত্ব শুনে ওরা বলছে যে, এটা খুব যুক্তিসঙ্গত, কারণ এই মতে সবারই জন্য ভাল হবার অবকাশ দেওয়া হয়। এবার হলো না, আবার শুধরে নেবে। স্বামীজী কি কাণ্ডই করেছেন—এখানে বসে তো তার কিছুই বুঝতে পাচ্ছ না। একেবারে সব চিন্তাধারাটা ওদের বদলে দিয়ে গেলেন। তারপরই New Thought Movement[১] খুব চলল। ওদের দর্শন কি আর হিন্দুর দর্শনের সঙ্গে তুলনা হয়! ওরে বাবা, মুনিঋষিরা যত রকম যা কিছু হতে পারে, তার চূড়ান্ত মীমাংসা করে রেখে গেছেন।

আলমোড়ায় থাকতে সেখানকার বড় পাদরীরা ফ্রাঙ্ককে[২] বলত, আমরা যে কিছু করতে পারি না তার কারণ হিন্দুদের দর্শন—এমন দর্শন আর হয় না। ফ্রাঙ্ক বেচারা ভারি frank (সরল) ছিল। স্বামীজীর জীবন প্রথম তিনখণ্ড ওই লিখলে। একবার এলাহাবাদে বক্তৃতা দিয়েছিল। আমিও তখন এলাহাবাদে ছিলুম। বেচারা ভারি অল্প বয়সে মরে গেল।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা একত্বে পৌঁছে গেলেন—এর ওপরে আর কি যাওয়া চলে? স্বামীজী বলেছেন, রসায়নশাস্ত্র যদি এমন একটা জিনিস বের করতে পারে যেটা আদি মৌলিক বস্তু—তাহলে রসায়নশাস্ত্রের চরম উন্নতি হয়ে গেল। এর ওপরে ও আর যেতে পারে না। হার্ভার্ড বক্তৃতার ভূমিকা যে সাহেবটি লিখেছেন, তিনি বলছেন যে, স্বামীজীর উপদেশে যদিও আমরা একেবারে সম্পূর্ণ অন্যমতাবলম্বী হয়ে যাইনি, তাহলেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি তাঁর এই একত্বের ভাব আমাদের কাছে নূতন ও আমাদের ভারি ভাল লেগেছে।

---

১ বেদান্তের ছায়া অবলম্বনে আমেরিকায় নব-প্রতিষ্ঠিত প্রবল সম্প্রদায়। এঁরা বলেন, যখন আত্মাই একমাত্র সত্য তখন রোগ শোকাদি কিছুই নাই, এইরূপ চিন্তার বলে রোগ শোকাদি হতে মুক্ত হওয়া যেতে পারে।

২ Frank J. Alexander, an American Devotee. (ফ্রাঙ্ক আলেকজাণ্ডার, একজন আমেরিকান ভক্ত)।

চিন্তাশীলতা যত এসে যাচ্ছে ততই লোক আর বাইবেল মানছে না। এমারসন থেকে ওদের Unitarian (একেশ্বরবাদী) একদল হয়ে গেল। ওদেরও অনেক ভাল ধর্মগ্রন্থ আছে। কারলাইল অনেকটা ওদের বাইবেলকে রাখতে চেষ্টা করেছেন। বীর-পূজক কিনা—তাই। নইলে ওদের দর্শন বাইবেলকে স্বীকার করে না। দেখলে না, সেদিন বেঙ্গল কাউন্সিলে—দত্তকে, বাইবেলের "এক গালে চড় দিলে আর এক গাল পেতে দিবে"—এ কথার ওপর পাশ্চাত্যদের কার কত শ্রদ্ধা তা জানিয়ে দিলে! ও একজনের নয়, প্রায় সবারই এই মত। Unitarianরা বলে, যদি যিশু ঈশ্বর-পুত্র হন তবে আমরাও তাই। ওদের দেশে ওরা কি পথে চলেছে তাও এই যুদ্ধেই দেখতে পাওয়া গেল। কেবল ভোগের পথে—কেবল জড়বাদের পথে কি শ্রেয়ঃ আছে?

তুলসী দাস, দেখ না, কেমন চমৎকার বলছেন—

> **জঁহা রাম তঁহা কাম নহিঁ,**
> **জঁহা কাম নহি রাম ॥**
> **তুলসী কবহুঁ হোত নহিঁ,**
> **রবি রজনী এক ঠাম ॥**

অর্থাৎ, যেখানে কামনা সেখানে ভগবান নেই, যেখানে ভগবান সেখানে কামনা নেই। সূর্য ও রাত্রি কখনও একসঙ্গে থাকতে পারে না।

এই দেখ না, বাংলাদেশে এখন একদল যোগভোগ একত্র করবার জন্যে লেগে গেছেন।

একজন তখন বললেন—'প্রবর্ত্তকে' একটা প্রবন্ধ পড়েছি, তাতে জঁহা কাম ইত্যাদি তুলসীদাসের বাক্য খণ্ডন করে এবং শঙ্করকে খোঁচা দিয়ে লিখেছে। অনন্তানন্দ ব্রহ্মচারীর পত্র 'নারায়ণে' বেরিয়েছে, ওটাতেও যোগভোগের একীকরণ চেষ্টা আছে। প্রবন্ধটা বেশি বড় নয়, পড়ব?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—পড় না।

বৈশাখের 'নারায়ণ' থেকে উক্ত প্রবন্ধ পড়া হলো।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—শেষের দিকটা বেশ ভাল লাগল। কিন্তু 'মায়া' সম্বন্ধে ওর কোন জ্ঞান নেই। দার্শনিক চরম তত্ত্ব হচ্ছে মায়াবাদ—ও বেচারা শঙ্করের গ্রন্থ পড়বে না, শুনবে না, অথচ তাঁকে খোঁচা দেবে। জ্ঞানগুরু তিনি—বিনা কারণে গালাগাল দিয়ে কি ওদের ভাল হবে? গীতা থেকে দুটো শ্লোক উদ্ধৃত করেছে, কিন্তু যে অর্থে শ্লোক দুটি প্রয়োগ করেছে, তা ঠিক হয়নি; কিছু ভাল কথার সঙ্গে যে গলদ চালাচ্ছে, এও তো সাধারণ লোকে খুব নিচ্ছে। 'প্রবর্ত্তকে'র তো আমি কিছু বুঝিই না—সত্যি সত্যি বলছি, ওরা যে কি বলতে চায় তা তো কিছু বুঝতেই পারি না। নিজেরা কিছু বুঝবে না, শুনবে না, আর শঙ্করকে গালাগালি দেবে!

তোমরা তো শাস্ত্র পড়েছ—তোমরা কাগজে লেখ না কেন? ঝগড়ার এত ভয় কেন? সত্য কথা বলতে ভয় পাবে কেন? এখানে বসেও তো ঝগড়া হচ্ছে—ঐ কাগজে লিখলেই তো হলো। তোমরা শঙ্করের কাছ থেকে কত সাহায্য পাচ্ছ—আর এসব অযথা গালাগালি বসে বসে শুনছ?

দেখেছ, ওরা কি বলে! শঙ্কর তো কোথাও বলেননি যে, বনে গিয়ে বসে থাকো। তিনি নিজে কত কাজ করে গেছেন। তাঁর জীবনটা ভাল করে আলোচনা কর না। আমরা যে জগৎটায় এসে পড়েছি—জগৎ ছেড়ে যাবে কোথায়? জগৎটার ভাল করাই চরম উদ্দেশ্য নয়। জগৎ যেমন তেমনিই থাকবে। স্বামীজী বলতেন—ও তো কুকুরের লেজ। তবে জগতের ভাল করে তুমি ভাল হয়ে যাও। তুমি মুক্ত হয়ে যাও।

শঙ্কর যখন বিচার করেছেন তখন সব বিপক্ষের মত কচ কচ করে কেটে দিয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাসে শক্তির উপাসনা করতেন। তাঁর স্তবস্তুতিগুলিই তার প্রমাণ। শঙ্করবিজয়েও লেখা আছে, তিনিই পঞ্চোপাসনা প্রবর্তিত করেন। ঠাকুর বলতেন—শক্তিপূজা না করলে কেউ প্রচারক হয় না। শঙ্করকে বুঝতে হলে খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন। তা না হলে—না বুঝে গালাগাল।

২১ জুলাই ১৯২০, বেলা ৫টা

আজ সকালবেলা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শরীর রক্ষার সংবাদ এসেছে। মায়ের অনেক শিষ্যই এখানে উপস্থিত। সকলেই বিমর্ষ, সকলেই নীরব। আশ্রমের কর্ম-কোলাহল এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল। তুরীয়ানন্দ মহারাজ ধীর স্থির। আজ তেমন বাক্য স্ফূর্তি নেই—শরীরও অসুস্থ। এ পর্যন্ত কিছুই খাননি। আবাল্যের কত স্মৃতি তাঁর মানস-নয়নে উপস্থিত হচ্ছে কে বলবে? ঘরে যথাস্থানে সকলেই উপবিষ্ট, কারও মুখে কথা নেই।

নীরবতার আবরণ ভেদ করিয়া মহারাজ গাইলেন—

> **"শুনরে মম মানস**
> **স্বীয় কলুষ অশেষ**
> **কর্মদোষে আছে বাঁধা স্কন্ধেতে তোমার।"**

বিষাদ, বিষাদ। মনে হচ্ছে আর বাজে বকে কি করব—মৌন হয়ে থাকব। মনমুখ এক করে কথা বলতে না পারলে কি হবে? গোবিন্দ, গোবিন্দ, হরে!

জনৈক ভক্ত—আপনার তো মনমুখ একই আছে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা সব বলবেন?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—সে কি বলছ? আর তোমার সঙ্গে কথা কইব না। যার গলা ধরে কাঁদি তারি নাই চোখে জল।

> **আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং**
> **প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসা কালো জগদ্‌ভক্ষকঃ।**
> **লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং**
> **তস্মাম্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥**[১]

অর্থাৎ, প্রতিদিন আমাদের চক্ষের সমক্ষেই আমাদের আয়ু নষ্ট হইতেছে এবং যৌবন ক্ষয় হইতেছে, যে দিবস চলিয়া যায় তাহা আর ফেরে না, কাল

---

১ শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্র, ১৩

সমস্ত জগৎকে ভক্ষণ করিতেছে, লক্ষ্মী জলতরঙ্গের ক্রীড়ার ন্যায় চঞ্চল এবং জীবন বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী—হে প্রভু, তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপ, শরণাগত! আমাকে এক্ষণে রক্ষা কর, রক্ষা কর!

মথুরাতে এক শেঠ ছিল। নতুন সাধু এলেই তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে বাজার থেকে খাবার কিনে এনে খাওয়াত। আমি যখন মথুরায় গেলুম সেখানকার সাধুরা আমায় বললেন তার ওখানে যেতে—সেখানে গেলে পাকা খাওয়া মিলবে। আমি স্বীকার পেলুম। আরও সব সাধুরা ছিলেন—খাওয়া দাওয়ার পরে শেঠজী সাধুসঙ্গ করবার জন্যে আমাদের সামনে এসে বসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "মহারাজ, বৈরাগ্য হয় কিসে?" আমি চট করে বলে ফেললুম—"আমার বৈরাগ্য যদি থাকত, তবে তোমাকে বলতে পারতুম কিসে বৈরাগ্য হয়। বৈরাগ্য থাকলে কি তোমার এখানে খেতে আসি?" সাধুরা শুনে ভারি খুশি। তাঁরা বললেন, "খুব উত্তর দিয়েছেন।" সেও আর কিছু বললে না।

খালি স্বার্থ—খালি স্বার্থ। এই আমারই কথা বলছি। বলি, ভাবি ও বুঝি আমার স্বার্থ নেই। কিন্তু ঐ স্বার্থ। গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ, হরে!

২৩ জুলাই ১৯২০

আজ প্রাতে বেশ বৃষ্টি হয়ে গিছল, তাতে গরম অনেকটা কেটে গেছে। সাধুরা গীতা পাঠান্তে অনেকেই স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে এসে বসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ কি পড়া হলো?" একজন উত্তর দিলেন, "আমরা গত কয়েকদিন থেকে শ্রীধর স্বামীর টীকাসহ গীতা পাঠ করছি।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ—গীতা বড় অদ্ভুত গ্রন্থ, যদিও তা প্রকৃতপক্ষে স্মৃতির অন্তর্গত, তথাপি তাকে উপনিষদ্ বলে গণনা করা হয়েছে—উপনিষদের সার সত্যগুলি এতে রয়েছে কিনা? দেখনি, প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে "শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাসূপনিষৎসু" লেখা আছে। এই জন্যই ঋষিরা বলে গেছেন, "সকৃদ্ গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।" অর্থাৎ একবার গীতারূপ জলে স্নান

করলে জন্মজন্মান্তরে আমাদের মনে যে মলিনতা সঞ্চিত হয়েছে তা নষ্ট করে দেয়। শত শত অতীত জন্মের মলিনতায় আমাদের শরীর-মনকে মলিন করেছে। গীতারূপ জলে একবার স্নান করলে এই মলিনতা সব ধুয়ে যায়। গীতাগ্রন্থ ওপর ওপর পড়ে গেলে কিছু হবে না, ওতে একেবারে ডুবে যেতে হবে। আগে যদি উপনিষদ্‌গুলো পড় তবে গীতা আরও ভাল বুঝবে।

গীতার কথা বলতে বলতে ক্রমে সমাধি অবস্থা প্রভৃতি অনেক উচ্চাঙ্গের কথা হতে লাগল। স্বামী ভাবে বিভোর হয়ে অনেক উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব বলতে লাগলেন। হঠাৎ সকলের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, "এসব কথা কাকেই না বলব, কেই বা বুঝবে। কবি তাই বলে গেছেন—'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ' অর্থাৎ—অরসিকের কাছে রসের কথা বলা, হে বিধাতা, যেন আমার কপালে লিখো না।" উপস্থিত সকলে ভাবতে লাগলেন, তাই তো জীবনে কি উপলব্ধি করলুম। লজ্জায় আত্মগ্লানিতে সকলে চুপচাপ বসে রইলেন। স্বামী এইবার প্রসঙ্গ বদলে বলতে লাগলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—বাঃ! বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে! কটাদিন কি গরমই গেল! তবে এই শীতোষ্ণ দুইই অনিত্য। তারা আসে আবার চলে যায়। গীতায় পড়নি—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ —২।১৪

অর্থাৎ—হে অর্জুন, বিষয়ের সহিত সংস্পর্শেই শীত, উষ্ণ এবং সুখ, দুঃখ অনুভূতির উৎপত্তি হয়। ঐগুলি আসে আবার চলে যায়; সুতরাং অনিত্য। ঐগুলি সহ্য করতে হবে। ঐগুলি যখন আমাদেরই মনের অনুভূতি মাত্র, সেইজন্য শ্রীভগবান ঐগুলি সহ্য করতে উপদেশ দিচ্ছেন। ঠাকুরের কথা মনে আছে তো? তিনি বলতেন, "শ, ষ, স, যে সয় সে রয়; যে না সয়, সে নাশ হয়।"

আঃ! কি গরমই কদিন গেল। এখন আবার বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। সমুদ্র একবার পার হয়ে এলে তাকে গোষ্পদ সমান মনে হয়। এখন আর আমাদের গরমের কষ্টটা বিশেষ মনে পড়ছে না। সমুদ্র পার হবার সময়টাই কষ্ট।

একটি গান গেয়ে গেয়ে স্বামী এই ভাবটি প্রকাশ করলেন—যে বিপদ পার হওয়া গেছে তার আর কেউ চিন্তা করে না।

কথা বলা বড় কঠিন, কারণ এক কথাই নানা জনে নানাভাবে গ্রহণ করে। অনেক সময় তার জন্য লোকে ভুগেও থাকে। প্রকৃত সাধুরা কিন্তু কখনও এমন কিছু কথা বলেন না যাতে অপরের কষ্ট হতে পারে। সেইজন্য তাঁরা এমনভাবে সর্বসাধারণের উপযোগী সত্য প্রচার করে যান, যাতে মানবজাতির উপকারই হতে পারে। কিন্তু তাই নিয়ে আবার লোকে বিভিন্ন অর্থ করে কত বিবাদ-বিসংবাদ করে, তা তো জান? আবার রহস্য রসিকতা সকলে বুঝতে পারে না। সেইজন্য খুব সাবধানে কথা কইতে হয়। আমাদের ঠাকুরের দেখেছি, তিনি যেন রসের খনি ছিলেন, তাঁর আর তুলনা হয় না। একদিন কেশববাবুর দক্ষিণেশ্বরে আসবার কথা ছিল। যে সময় তাঁর আসবার কথা ছিল তার অনেক পূর্বেই ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি পরে একখানি ভাল চাদর গায়ে দিয়ে পান চিবিয়ে ঠোঁটটি লাল করে কেশবের প্রতীক্ষায় তাঁর ঘরের বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। কেশব এসে তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে বললেন, "আপনার যে আজ খুব সাজগোজ দেখছি, ব্যাপারটা কি?" ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, "আজ যে আমায় কেশবের মন ভুলাতে হবে, তাইতে এত সাজগোজ।" কেশব শুনে হাসতে লাগলেন।

স্বামীজীও খুব রসিক ছিলেন। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর রসিকতার তুলনা হয় না। তাঁর কথা শুনে সময় সময় হেসে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যেত। তিনি বলতেন, "আমি মাঝে মাঝে আঁশজল ছিটে দিয়ে এদের ধাত ঠিক রাখি।" একবার কেশববাবু ও প্রতাপ মজুমদার এয়েছেন। তাঁদের সামনেই জনৈক ব্রাহ্মভক্ত বললেন, "এঁরা যেন গৌর নিতাই।" ঠাকুর কাছেই ছিলেন। কেশব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি তবে কি?" তিনি অমনি বললেন, "আমি তোমাদের চরণরেণু।" উত্তর শুনে কেশব বললেন, "এঁকে ধরবার জো নেই।" ঠাকুরই ব্রাহ্মদের প্রণাম করতে শেখান, তাঁর কাছ থেকেই ব্রাহ্মসমাজে ভগবানের মাতৃভাব ঢুকলো। ঠাকুরের কথার এক অদ্ভুত শক্তি

ছিল। তিনি যেন লোকের হৃদয় কেড়ে নিতেন। আমেরিকানরা বক্তৃতার চেয়ে খোলাখুলি কথা খুব ভালবাসে। তাতে তাদের বেশি কাজ হয়।

কথায় কথায় ভগবানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারলে তিনি স্বয়ং ভক্তকে রক্ষা করেন, কিন্তু এতটুকু কর্তৃত্ব বা অহংভাব থাকলে ভগবান সরে থাকেন, এই প্রসঙ্গ উঠলো। এই প্রসঙ্গে স্বামী একটি গল্প বললেন ঃ "একবার একটি ভক্ত এক জায়গায় যাচ্ছিল। পথে একটি ডাকাতের হাতে পড়ে। শিব তার ইষ্টদেবতা ছিলেন। তাই এই বিপদে পড়ে একান্ত মনে শিবকে ডাকতে লাগলো। খানিকক্ষণ বাদে কিন্তু তার সে ভাব চলে গেল এবং সে আত্মরক্ষার জন্যে একখানা ইট তুললে। এদিকে কৈলাসে হর পার্বতী পাশা খেলছিলেন। শিব খুব পাশা খেলায় নিমগ্ন, হঠাৎ পাশা খেলা ছেড়ে উঠে গেলেন। পার্বতী কিছু বুঝতে না পেরে ভাবছেন। ইতোমধ্যে শিব অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে আবার পাশা খেলতে বসলেন। পার্বতী আশ্চর্য হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু আপনি হঠাৎ উঠে গেলেন, আবার তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন; এর রহস্যটা আমি বুঝতে পারছি না। আমার ভারি কৌতূহল হয়েছে। তা নিবৃত্ত না হলে, কিছুতেই পাশা খেলায় মন দিতে পারছি না।' তখন শিব হেসে পার্বতীকে বললেন, 'হে দেবি, যে ভক্ত একান্ত মনে আমার শরণ নেয়, আমি তাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকি। কিন্তু যে এতটুকু অহংভাব রাখে, সে যখন নিজের ভার নিজেই নিতে প্রস্তুত, তখন আমি তার জন্যে কোন ভাবনা করিনে। এই মাত্র একটি ভক্ত ডাকাতের হাতে পড়ে একান্ত মনে আমার শরণ নেওয়াতে আমার টনক নড়েছিল এবং আমি তাকে রক্ষা করতে ছুটে ছিলুম। গিয়ে কিন্তু দেখি, সে আত্মরক্ষার জন্যে ইট হাতে করেছে; তাই আর আমার সেখানে থাকবার দরকার হলো না।' " বুঝলে তো, এতটুকু অহংভাব থাকলে চলবে না।

ভক্তেরা বলেন, "ভগবান দীননাথ, দীনবন্ধু, দুর্বলের সহায়।" কিন্তু দীন হওয়া বড় কঠিন। ঠাকুর এক মেথরানির গল্প বলতেন। এক মেথরানির কিছু গহনা হয়েছিল। সে সেই গহনা পরে লোকের সামনে দিয়ে যখন যেত, তখন

বলে যেত—"সরে যা, সরে যা—আমায় ছুঁসনি।" ভক্তের দীনতা আলাদা জিনিস। সাংসারিক হিসাবে সে খুব উচ্চ পদগৌরবের অধিকারী হলেও, নিজেকে তৃণের চেয়েও নীচ বলে মনে করে। ভক্তেরা আর এক কথা বলেন যে, তিনি আমাদের হাত ধরে চালান। কথাটা তোমরা কবির কল্পনা বলে মনে করো না। যাঁরা উপলব্ধি করেছেন তাঁরা জানেন কথাগুলি আমার অক্ষরে অক্ষরে সত্য। গোবিন্দ, গোবিন্দ!

২৫ জুলাই ১৯২০

একটি বাঙালি বৈশ্য যুবক সংসারে বিরক্ত হয়ে সম্প্রতি কাশীধামে এসেছেন। যুবক স্বেচ্ছায় গৈরিকধারী—সংসারে মা আছেন। মায়ের অনুমতি চাইলে মা তাকে বলেছেন যে, যাতে সে সুখী থাকে তাই তাঁর ইচ্ছা। মহারাজের সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করতে এসেছে। ছেলেটির আনুপূর্বিক সব বৃত্তান্ত শুনে মহারাজ বললেন—বৈরাগ্য তো অতি উত্তম কথা। তোমার মা তো দেখছি তোমার পথের অন্তরায় নন। বিয়ে কর নাই, সংসারে তোমার তেমন বন্ধন নাই। বয়সও অল্প, স্বাস্থ্যও ভালো, চেহারায়ও সংযমের চিহ্ন আছে। যারা কামজ ভোগ না করেছে, তাদেরই কামের হাত এড়াতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কেটে যায়। আর যাদের ও রকম হয়েছে, তাদের জন্ম জন্ম কেটে যায়। তুমি গেরুয়া নিয়েছ, চাতুর্বর্ণ্যই তোমাকে প্রণাম করবে, এতে তোমার অকল্যাণ হবে। গেরুয়া ছেড়ে ফেলো, দীক্ষা খুব ভাল লোকের কাছে নিতে হয়—নইলে ফল খারাপ হয়। আর দীক্ষা কি? ভগবানের যে নাম ভাল লাগে—তাই একান্ত মনে গ্রহণ করো। সরল প্রাণে তাঁর নিকট প্রার্থনা করো। সব ঠিক করে দেবেন। তোমাকে ভালবাসছি বলেই এত করে বলছি, আরও তো লোক আছে, সবাইকে তো বলি না।

দেখ, তোমার মা যেমন তোমার কিসে সুখ হয় তার চিন্তা করছেন, তুমিও তেমনি মায়ের কিসে সুখ হয় সে কথা ভাবো। বাড়ি যাও, বাড়ি গিয়ে মাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করো। আমাদেরও যে হাঁটি হাঁটি পা পা করতে হয়েছিল,

তা যেন আমরা সকলে ভুলে গেছি। এই মায়ের পেটে যে কত অসহায় অবস্থায় থাকতে হয়েছে—তা যেন আমাদের মনেই হয় না। ঐ দেখ ছাগলের বাচ্চা জন্মেই নিজের মায়ের দুধ খুঁজে নিয়ে তারপর আপনি লাফালাফি করে, কত তাড়াতাড়ি আপনি খুঁটে খেতে শিখে গেল। মানুষই দেখ কত অসহায়, মা একটু ঢাকা না দিলেই তো গেল শেষ হয়ে।

আদর্শ খুব উঁচু থাকা চাই, কিন্তু নিজের শক্তি সম্বন্ধে অসম্ভব ধারণা করাও অন্যায়। যত উপযুক্ত হওয়া যায়, ততই শক্তি বেড়ে যেতে থাকে।

সন্ন্যাস কি সোজা কথা? ঠাকুর বলতেন, তালগাছ থেকে হাত পা ছেড়ে যে পড়তে পারে সেই সন্ন্যাসের উপযুক্ত। সে কি সোজা কথা? আমরা তো নানা বন্ধনে জড়িয়ে আছি। বাড়ি গিয়ে মায়ের সেবা কর, তোমার কল্যাণ হবে।

২৬ জুলাই ১৯২০

আচ্ছা বল দেখি, 'স বেদবিৎ' কেমন করে হলো?

> **ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।**
> **ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥** —গীতা ১৫।১

অর্থাৎ "সেই ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ বেদরূপপত্রবিশিষ্ট সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষকে যিনি জানেন তিনি বেদবিৎ।" কই ব্রহ্মকে জানলে বেদবিৎ হয় তা তো বলছেন না। তাহলে কি জগৎটাকে জানলেই বেদবিৎ হয়ে গেল? তাই তো এখানে বলছেন অর্থাৎ জগৎটাকে জানা মানে, জগতের অনিত্যতা যে পাকাপাকি জেনেছে সে বেদবিৎ। জগৎটা কি রকম? না—

'ঊর্ধ্বমূলং'—মূলটা যার ঊর্ধ্বে—পরমাত্মা থেকে যা প্রসৃত হয়েছে—আর 'অশ্বত্থং' অর্থাৎ কালকেই যা থাকবে না—এই শ্লোকের এই তাৎপর্য নয় কি?

> **অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।...**
> **অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥** —গীতা ১৫।২-৩

অর্থাৎ গাছের শাখাগুলি অধঃ এবং ঊর্ধ্বে বিস্তৃত, তা গুণের দ্বারা বর্ধিত

এবং বিষয় যার পল্লব (ক্ষুদ্র শাখা), এই দৃঢ় মূল অশ্বত্থবৃক্ষকে অসঙ্গরূপ দৃঢ় শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করে অসঙ্গ—অনাসক্তি বা বৈরাগ্য দিয়ে এই সংসারটাকে ছিন্ন করে ফেলতে হবে।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।

—গীতা ১৫।৪

অর্থাৎ, তার পর সেই পদ অন্বেষণ করতে হবে যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না।

এই যে আবার গোল বেধে গেল। "যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।" একটা তো কথা আছে যে, তোমরা তা থেকেই এসেছ। তবে আবার 'ন নিবর্তন্তি' কেমন করে হলো? একবার যখন আসা গেছে, তখন আবার গেলে তো আসা যাবে। কেমন—না? আধিকারিক পুরুষদের কথা ভিন্ন, তাঁরা জন্মাবার সময়ই পূর্ণজ্ঞান নিয়ে আসেন। তাঁরা কিন্তু নেবে আসতে পারেন—কিছু একটা বাসনা রেখে দেন।

'পদমব্যয়ং তৎ?'—আঃ কি বলছেন—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ —গীতা, ১৫।৬

অর্থাৎ, সূর্য চন্দ্র বা অগ্নি তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। যেখানে গিয়ে আর ফিরতে হয় না, তাই আমার পরমধাম।

সকলেরই জীবনে বিষয়ভোগ করতে করতে একটা বৈরাগ্য এসে যায়। তখন যদি সাধুসঙ্গ পেয়ে যায়, তবেই কল্যাণ হয়। বিষয়ের দোষদর্শনেই প্রথম আরম্ভ হয়। দোষদর্শন না হলে উপদেশ প্রভৃতি কিছুই কার্যকরী হয় না।

২৭ জুলাই ১৯২০

সমাধিতে মন নাশ হয়।

মনের নাশ হওয়া মানে হচ্ছে বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ। মন যে একেবারে নষ্ট

হয় তা নয়। ব্যবহারিক জগতে শুদ্ধ মনে এক আত্মাতে নিশ্চয়বান হয়ে, সকলের মধ্যে এক আত্মাকে লক্ষ্য রেখে ব্যবহার করার নামই—মনোনাশ। এই অবস্থাকেই লক্ষ্য করে গীতাদি শাস্ত্রে ধীর, আত্মবান, প্রশান্তধীঃ ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলতেন, "শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা সব এক জিনিস।"

২৮ জুলাই ১৯২০

মৃত্যুর সময় বাহিরের একটা শক্তির সঙ্গে ভিতরের শক্তিটার দ্বন্দ্ব হতে থাকে। শক্তি দুটো অবশ্য ভিন্ন নয়। যেন একটা বড় বৃত্তের ভিতর ছোট বৃত্ত, বড়টা ছোটটাকে ভেঙে ফেলতে চাইছে। পুরীতে একবার আমি যখন মর-মর তখন এটা আমি বেশ স্পষ্ট অনুভব করেছিলুম। আমার মনে হয়েছিল যেন এক পা দরজার বাইরে বাড়িয়েছি, আর এক পা ভিতরে রয়েছে। আমি দুটোদিকই দেখতে পাচ্ছিলাম। আসক্তি না থাকলে মৃত্যুকে ভয়াবহ বলে বোধ হয় না। এই আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। বিশেষ বিশেষ বিষয়েই আসক্তি বা ভালবাসা হলেই যত গোল।

গঙ্গার জলে ডুব দিলে মাথায় বহু মণ জল থাকলেও ভার বোধ হয় না, কিন্তু একঘড়া জল মাথায় নিলে ভার বোধ হয়। সেইরূপ জগৎশুদ্ধ সকলকে ভালবাসলে তাতে বন্ধন হয় না, কিন্তু কোনও বিশেষ বিষয়ে ভালবাসা পড়লেই বন্ধ। এইসব ভার ফেলে দিতে পারলে তবেই শান্তি ও মুক্তির আশা করা যেতে পারে। সর্বদা বিচার করলে বুদ্ধি খোলে। যে ব্যক্তি সত্যলাভের জন্য সর্বদা বিচার করে, সত্য তাকেই ধরা দিয়ে থাকেন। বিচারের খড়্গ সর্বদাই হাতের কাছে রেখে দিতে হবে। গীতায়ও শ্রীভগবান বলেছেন, "অসঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা সংসারবন্ধন কেটে ফেলে সেই পদলাভ করতে হবে যেখান থেকে লোক আর ফেরে না।" মোহের প্রসঙ্গে ভাগবতের ১১শ স্কন্দ থেকে কপোত-কপোতীর আখ্যায়িকা বলে বললেন—কপোত যখন দেখলে সকলেই জালে পড়েছে তখন "আমিও পড়ি" বলে সেই জালে গিয়ে পড়ল। এইরূপেই লোক মোহে পড়ে নষ্ট হয়।

এমনি মহামায়ার মায়া (মা) রেখেছেন কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা জানতে পারে ॥

মহামায়া এমন কি জ্ঞানীদের পর্যন্ত গুলিয়ে দেন। চণ্ডীতে আছে ঃ

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ —চণ্ডী ১।৫৫

অর্থাৎ, সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীদের চিন্তাকেও বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহে ফেলে দেন।

আবার—

ত্বয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতৎ চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ —চণ্ডী ১।৫৬

অর্থাৎ, তিনিই এই চরাচর সমস্ত জগৎ সৃজন করছেন, আবার তিনিই প্রসন্না হয়ে বরদান করলে জীবের মুক্তি হয়। যা হোক, মন যদি শুদ্ধ করতে পারো সব ঠিক হয়ে যাবে। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির বহির্জগতের যা কিছু আগে থেকে যেন জোগাড় হয়ে থাকে, তাঁরা সব জিনিস তাঁদের জন্য তৈরি দেখতে পান। যখন স্বামীজী প্রথমবার আমেরিকা যান তখন আমি তাঁর সঙ্গে বোম্বাইয়ের পথে কতদূর গিয়েছিলুম। ট্রেনে যেতে যেতে তিনি আমাকে গম্ভীরভাবে বললেন, "এই যে আমেরিকায় এইসব জোগাড়যন্ত্র হচ্ছে শুনছো, তা সব এইটের (নিজের শরীর দেখিয়ে) জন্য। আমার মন আমায় এ কথা বলছে। শীঘ্রই দেখতে পাবে।" এই শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই ধরনা কেন? দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি তাঁর জন্যই তৈরি ছিল। ঐসব বন্দোবস্ত পূর্ব থেকেই হয়েছিল। গোবিন্দ! গোবিন্দ!

৭ ডিসেম্বর ১৯২০

জনৈক শিক্ষিত যুবক কিছুদিন পূর্বে রামকৃষ্ণ মঠের কোন কেন্দ্রে গিয়ে কিছুদিন ছিল, তার ইচ্ছা ছিল সে একেবারে সংসারত্যাগ করে ভগবান এবং দেশের কার্যে জীবন উৎসর্গ করবে। কিন্তু অল্পদিন থেকেই শারীরিক অসুস্থতা, সাংসারিক অভাব প্রভৃতি নানা কারণে তাকে চলে যেতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে তার

কথা উঠল। যে আশ্রমে সে যোগ দিয়েছিল তার অধ্যক্ষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে সম্বোধন করে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন—"ছেলেটা চলে গেল! তোমরা তাকে রাখতে পারলে না! একটু স্নেহ দিতে হয়। নূতন ছেলেদের সঙ্গে খুব ভালবাসা ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করতে হয়, তাহলে সে কখনও চলে যেতে পারে না।"

৮ ডিসেম্বর ১৯২০, প্রাতঃকাল

মঠের কয়েকজন সাধু এসে স্বামী তুরীয়ানন্দকে ঘিরে বসেছেন। কথায় কথায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ উঠল। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলতে লাগলেন—"স্বামীজী বলতেন, ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভারতের সেই ভাব এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ভারতে চিরকাল ধরে ধর্মবীর সাধুপুরুষ জন্মে আসছেন। ভারতকে সমগ্র জগতে এই ধর্ম বিস্তার করতে হবে। স্বামীজীর কথা ফলবেই, দেশ আবার উঠবে। স্বামীজী একবার বলেছিলেন, এবার আর কিছু বলতে বাকি রেখে গেলাম না। তিনি সব বলে গেছেন। এখন তাঁর সেই সব ভাবই নানাবিধ প্রণালীর মধ্য দিয়ে কার্যে পরিণত হচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী তারই একটি প্রণালী মাত্র। স্বামীজীর সেবাধর্মের প্রবর্তন এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমার বিশ্বাস ভারতের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। আমাদের জীবদ্দশায় দেখে যেতে না পারি, পরে নিশ্চিত হবে। ইতোমধ্যেই যথেষ্ট আরম্ভ হয়েছে। এই অভ্যুত্থান ব্যতীত ঠাকুর স্বামীজীর মতো ব্যক্তির আগমনের কোন মানেই থাকে না। স্বামীজী কতবার উজ্জ্বল ভাষায় ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরব চিত্র অঙ্কিত করে গেছেন। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী কখনও মিথ্যা হতে পারে না।"

অপরাহ্নে প্রাত্যহিক নিয়ম অনুযায়ী ভাগবত পাঠান্তে কথা প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন—"পাপ ত্রিবিধ—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। এদের ফল যথাক্রমে স্থাবরত্ব, পশুপক্ষ্যাদি যোনিলাভ এবং অন্ত্যজ জন্ম। এই প্রসঙ্গে মনুর বচন উদ্ধৃত করলেন।"*

---

* শারীরজৈঃ কর্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্ ॥ —মনু ১২।৯

"মনুষ্যজন্মে মুক্তির দ্বার খোলে, সুতরাং খুব সাবধানে চলা উচিত। ভোগাদি তো অন্য শরীরেও হয়। দেহের মমতা শেষ ও প্রধান বন্ধন।" তিনি বলতে লাগলেন, "বানরদের অপত্যস্নেহ খুব প্রবল, কিন্তু তাদের নিজেদের জীবন বিপন্ন হলে অন্যান্য জানোয়ারের মতো তারাও নিজেদের শাবকদের কথা ভুলে আপন প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হয়।" প্রাচীনকালের নবাবদের কথা উল্লেখ করে বলতে লাগলেন, তারা কখনও কখনও বানররা যে জঙ্গলে থাকে, তাতে আগুন লাগিয়ে তাদের অপত্যস্নেহ পরীক্ষা করতেন। তিনিও নিজে বৃন্দাবনে বাসকালে বানরের ছানা ধরে তাদের পরীক্ষা করতেন।

২০ ডিসেম্বর ১৯২০, প্রাতঃকাল

স্বামী তুরীয়ানন্দ—"একান্ত বা অব্যাকৃত ভজনের দ্বারা মনের এমন একটা গতি উৎপাদন করতে হয় যাতে সব সময়ই অজ্ঞাতসারে মনের মধ্যে একটা ক্রিয়া চলতে থাকে। অধিক অভ্যাস করলে শুধু যে জাগ্রত অবস্থায় খেতে শুতে বেড়াতে সব সময়—এই ভাবপ্রবাহ চলতে থাকে তা নয়, নিদ্রাবস্থাতেও এর বিরাম হয় না। এরূপ লোক যে অন্য কোন স্বপ্ন দেখে না, তা নয়, কিন্তু ঐ ভাবটাও সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে। এই সাধনকালে বেশি লোকের সঙ্গে মেশা বা কথাবার্তা কওয়া উচিত নয়।

"স্বামীজী প্রেমানন্দ স্বামীর সঙ্গে নানা প্রকার রহস্য করতেন। একবার কথায় কথায় বলেছিলেন, 'তোদের কি আবার মন, ওতো ছটাক। তোদের কি আবার হৃদয়, ওতো ধুকধুকি।'

২১ ডিসেম্বর ১৯২০

মায়ার প্রসঙ্গ হচ্ছিল—স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন, "মায়া জিনিসটা অনির্বচনীয়—আছেও বলা যায় না, আবার নেই বললেও ভুল হয়।

"ঠাকুর বলতেন, 'যতবার সহবাস হবে ততবার জন্ম নিতে হবে।' আবার প্রত্যেক জন্মে ঐ সংস্পর্শের সম্ভাবনা, উপায় তাঁর শরণাগত হয়ে, 'আর করব

না' বলে ছেড়ে দেওয়া, তাহলেই সমস্ত পূর্বকৃত অপরাধের মার্জনা হয়ে যায়। কিন্তু 'ন্যাকা' হলে চলবে না, তাহলে সুদ শুদ্ধ সমস্ত পাপ ঘাড়ে চড়বে। ঠিক ঠিক ভক্তের কখনও স্থায়ী পতন হয় না। ঈশ্বরের কৃপায় তাদের আবার উন্নতি হয়। একবার পড়লেই কি অনন্তকালের জন্য পতন হলো? বাজে কথা। তা কখনও হতে পারে না। আবার ভক্তের পতন দ্বারাও অনেক সময়ে জগতের কাজ হয়ে যায়।"

মায়া ও দয়ার কথা উঠল—বললেন, "দয়া আর মায়া অনেক তফাত। সাধুরা দয়া রাখবে, কিন্তু মায়া, অর্থাৎ আমি আমার ভাব, রাখবে না। তাইতেই বন্ধন।" এই বিষয়টি তিনি, ঠাকুরের স্বামীজীর এবং অন্যান্য কোন কোন শিষ্যের ওপর টানের দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করলেন—বললেন, "ঠাকুর স্বামীজী প্রভৃতির মধ্যে বিশেষভাবে নারায়ণের প্রকাশ দেখতেন বলেই অপর অপর ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁদের ওপর অত টান ছিল। এই নারায়ণবুদ্ধিই তাঁর সর্বদা জাগ্রত থাকত বলে তাঁর বন্ধনের আশঙ্কা কোথায়?

"তবে মহাপুরুষদেরও বন্ধনের আশঙ্কা আছে—যেমন জড়ভরতের বিষয় পুরাণে পড়া যায়। সুতরাং এই বন্ধন কাটাবার জন্য পুরুষকার বা উদ্যমের সদা সর্বদা প্রয়োজন। উদ্যম দ্বারা শীঘ্র ফল লাভ হয়। উদ্যম চাই, নতুবা কবে হবে তার স্থিরতা নেই। মহাপুরুষেরা যে সময় সময় বলে থাকেন যে, অমুকের শেষ জন্ম তার মানে এই জন্মেই তার ঈশ্বর লাভ হবে। অজ্ঞান অনাদি, কারণ তার আদি খুঁজে পাওয়া যায় না। ঈশ্বরলাভ হলে কিন্তু এ অজ্ঞানের একেবারে নাশ হয়, তার আর পুনরুদ্ভব হয় না।"

এইখানে অজ্ঞানের অনাদিত্ব সম্বন্ধে গৌড়পাদীয় কারিকা থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করলেন।

কথায় কথায় ঠাকুরের সাধনের কথা উঠল। স্বামী বলতে লাগলেন, "গিরিশবাবু একবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার অত সব সাধন কেন?' ঠাকুর তাতে বলেছিলেন, 'হরগৌরীর মিলন তো নিত্যই রয়েছে, তবে আবার গৌরী শিবকে লাভ করবার জন্যে অত সাধন অত তপস্যা করেছিলেন

কেন? এসব নজিরের জন্য। আমি ষোল টাং করলে তবে অপরে যদি এক টাং করে।'"

তারপর মনের একাগ্রতা ও প্রত্যক্ষানুভূতির কথা উঠল। স্বামী বললেন, "মন স্থির হলে প্রাণ আপনিই স্থির হয়। নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে বয়। যে ভিতরে নারায়ণ দর্শন করে সে বাহিরেও তাঁকে দেখতে পায়।"

২২ ডিসেম্বর ১৯২০

আজ কথাপ্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর কথা উঠল। স্বামী তাঁর অজস্র প্রশংসা করতে লাগলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলতে লাগলেন, "গান্ধী ঋষিত্ব লাভ করেছে, এ কথা অপর কেহ বিশ্বাস না করলেও আমি করব। তাঁর কোথাও ভুল হচ্ছে না। রাজা পর্যন্ত তাঁর কথা মেনে নিচ্ছেন। একি কম শক্তির কথা! গান্ধীর মধ্য দিয়ে সত্য প্রকাশিত হচ্ছে। স্বামীজীর মুখেও পূর্বে এইসব সত্য শুনেছি। সত্য কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়। স্বামীজী নিজেই এই কথা বলতেন।"

তারপর পরাবিদ্যার কথা উঠল। স্বামী বলতে লাগলেন, "মায়ার পারের কথা স্থূলদৃষ্টিতে অতি অসম্বদ্ধ বলে মনে হয়। যেমন জড়ভরতের রহুগণ রাজার প্রতি উপদেশ। বিচার করতে করতে এদের সাধারণ জ্ঞান উড়ে যায়। যেমন ধর এ বাড়িটা। বিচার করতে করতে এটি কতকগুলি পরমাণুসমষ্টি বলে মনে হয়। শরীরটাও তাই। আরও বিচার করতে করতে এই পরমাণুগুলিও ব্রহ্ম সত্তা মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'তালগাছটাই সত্য তার বালতো বা তাল সত্য নয়, কারণ বালতো ও তাল পড়ে যায় কিন্তু তালগাছটা ঠিক দাঁড়িয়ে থাকে।' সেইরূপ ব্রহ্মই সত্য, আর জগৎটা যখন পরিবর্তনশীল, তখন অনিত্য। জগৎটাকে সমষ্টি ভাবে ধরলে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বলে বোঝা যায়। আবার বিদ্যা ততক্ষণ, যতক্ষণ অবিদ্যা। অবিদ্যা চলে গেলে বিদ্যাও আর থাকে না। বিদ্যার দ্বারা সেই ব্রহ্মকে জানা যায়, বিদ্যা কিন্তু ব্রহ্ম নয়। ব্রহ্মই একমাত্র আছেন। যখন আমরা ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলি, তখন তাতে এ বুঝায় না যে তিনি সত্য সত্যই সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তার দ্বারা ব্রহ্ম

সম্বন্ধে বুঝাবার চেষ্টা করা হয় মাত্র। তিনি অসত্য নন, তিনি অজ্ঞান নন, তিনি দুঃখ নন, এইটি বুঝাতেই তিনি সচ্চিদানন্দ। এ কথা বলা হয়, বাস্তবিক, তিনি বাক্য মনের অগোচর।"

"এই দেহের মধ্যেই এমন জায়গা আছে যেখানে মনকে তুলে রাখতে পারলে আর কোন গোলমাল থাকে না। দৃষ্টি বদলাতে হবে। তাহলেই সব হয়ে গেল, নইলে পালিয়ে কোথায় যাবে।"

২৩ ডিসেম্বর ১৯২০

আজ মঠের কতকগুলি সাধুর সামনে বসে কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন, "মনের অসুখ কিরূপে সারে বলতে পার? আমি নিজে তার রাস্তাও জানি, অপরকেও রাস্তা বাতলে দিতে পারি। কিন্তু এখন রোগ হয়েছে নিজের, কাজেই মুশকিল। একটা গল্প শোনো—একজন লোক সভাশুদ্ধ লোককে হাসাতে পারত, এখন নিজের তার এমন রোগ হলো যে হাসিখুশি সব কোথায় চলে গেল, দিনরাত বিমর্ষভাব। ঐ তার প্রধান রোগ হয়ে দাঁড়াল। তখন সে নানাবিধ ডাক্তার কবিরাজ দেখায়; কিন্তু কিছুতেই তার রোগ সারে না। শেষে একজন ডাক্তার তারই নাম করে তাকে বললে, তুমি অমুকের কাছে যেতে পার, তাহলে এখনি তোমার সব রোগ সেরে যায়। ডাক্তার জানত না যে, সে তার রোগীকে যার কাছে যেতে বলছে এবং তার রোগী উভয়েই এক ব্যক্তি। যাই হোক, রোগী ডাক্তারের কথা শুনে জবাব দিলে 'হ্যাঁ, তা তো পারি, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে আমি স্বয়ংই সেই লোক।' তখন ডাক্তার অপ্রস্তুত হলো। সুতরাং তার ব্যবস্থায় কোন ফল হলো না। আমারও এখন হয়েছে সেই অবস্থা।"

২৫ ডিসেম্বর ১৯২০

আজ আমেরিকার শান্তি আশ্রমের একান্ত সাধনা সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠলো। মার্কিন ভক্তরা এই সাধনাকে নিজের সঙ্গে কথোপকথন বলতো। সকলেরই এতে বিশেষ আধ্যাত্মিক উপকার হতো, আর তারা তা স্বীকারও করত। তবে

স্বামী তুরীয়ানন্দ একটা নিয়ম করেছিলেন যে, তিন দিনের বেশি কেউ ঐভাবে থাকতে পারবে না। স্বামী বললেন, "একবার জনৈক মহিলা আমাকে না জানিয়েই ঐ ব্রত নিয়েছিল, আমি নিজেও সে সময় ঐ ব্রত আচরণ করেছিলাম, মৌনী থাকতাম। আশ্রমে গুরুদাসই একমাত্র পুরুষ ছিল। সেই আমাকে একটু চা ও টোস্ট দিয়ে আসত। আমি অবশ্য সাত দিনের ব্রত নিয়েছিলুম। আমাকে ঐ অবস্থায় যখন খবর দিলে যে, মিস বেল আমাকে না জানিয়ে ব্রত নিয়েছে তখন আমার ভেতর থেকে কে যেন বলে দিলে, এতে ওর বিশেষ অনিষ্ট হবে। তখন আমার মনে ভয়ানক অশান্তি এলো, পঞ্চম দিনেই ব্রত ভঙ্গ করে বাইরে এলুম। উজ্জ্বলা বলে আর একটি মেয়ে তার সেবা করত, তার কাছে শুনলুম ওর অবস্থা ভয়ানক শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে—পাগল হবার জোগাড়। তখন তাকে ডাকিয়ে এনে খুব ধমকালুম। সে বললে, আমার মৃত্যু হবার জোগাড় হয়েছিল। বাইরে না আসলে নিশ্চিত মরতুম। তাকে আশ্রম থেকে সরিয়ে দেব মনে করলুম। অনেক করে ক্ষমা চাওয়াতে পরে থাকতে দিয়েছিলুম।"

স্বামী বলতে লাগলেন, এই মহিলাটি খুব বিদুষী ছিলেন। বাষট্টি বৎসর বয়স, চোদ্দ বৎসর অনেক বড় বড় সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। পরে সত্যাশ্রম (Home of Truth) নামক এক আশ্রম স্থাপন করে, তাই চালাতেন। তবে 'আমি খুব বুঝি' বলে একটা খুব অহঙ্কার ছিল। শান্তি আশ্রমের অনেকেই এইরূপ গণ্যমান্য অথচ পণ্ডিতম্মন্য ছিল। স্বামীজী বেছে বেছে এদের শিক্ষা দেবার ভার আমাকে দিয়েছিলেন। এদের প্রত্যেকেরই যদিও এক একটা প্রবল ব্যক্তিত্ব ছিল, তথাপি কারও ভাবের ঘরে চুরি ছিল না। তারা বলত—আপনি কি করে এইসব ভিন্ন প্রকৃতির একবগ্‌গা লোকগুলিকে একসঙ্গে রেখে চালান? আমরা আপনার প্রত্যেক কাজ ও কথাটির ওপর খুব নজর রাখি, আপনার তো একটুও বৈষম্য দেখতে পাইনি। আশ্চর্য! স্বামী বলতে লাগলেন, "ঠিক মায়ের মতো হলে তবে সঙ্ঘ চালানো যেতে পারে।"

স্বামী আবার সেই যুবকটির কথা তুললেন যে ভারতের এক আশ্রমে যোগ

দিয়েছিল, সুবিধা না হওয়ায় পরে বাড়ি চলে যায়। বলতে লাগলেন—"খ—চলে যাওয়াতে ভারি দুঃখ হয়েছিল।

"শান্তি আশ্রমেও এই রকম ব্যাপার হতো। সময় সময় আমায় খুব ধমকাতে হতো। তবে তাদের খুব আন্তরিকতা ছিল বলে আমার কথা মানত ও থেকে যেত। খ—অসুখের সময় ঠিক বাড়ির মতো যত্ন চাইত। পায়নি—তাই চলে গেল। প্রথম প্রথম এসেই ছোকরাদের অসুখ করে এবং সেই সময় তারা বাড়ির কথাই ভাবে। পুরানো হলে আর সেরূপটা হয় না। সঙ্ঘ চালাতে গেলে এই আন্তরিক ভালবাসার দরকার। ভালবাসা পশুতেও বোঝে, আর মানুষ বোঝে না? দেখনি, মানুষ যদি কোন জানোয়ারকে ভালবাসে, জানোয়ারটা তার কিরূপ অনুগত হয়ে পড়ে?"

২৮ ডিসেম্বর ১৯২০

আজ স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকটে অনেকগুলি সাধু বসে আছেন, কাঁদি থেকে জনৈক উকিলও তাঁকে দর্শন করতে এসেছেন। তিনি তার ভায়রা ভাই-এর নানাবিধ দর্শনাদির প্রসঙ্গ করছিলেন। তার স্বপ্ন বা ধ্যানাবস্থায় ইষ্ট দর্শন হতো। এই অবস্থায় তিনি নিজ স্ত্রীকে মাতৃবোধে পূজা করতে উপদিষ্ট হয়েছেন, কিন্তু স্ত্রী নারাজ। স্বামী বললেন, "তাঁকে ইষ্টের নিকট প্রার্থনা করতে বলবেন যেন তিনি তাঁর স্ত্রীর মন ফিরিয়ে দেন।" তারপর উক্ত উকিলকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, "তাঁর কাজ ঠিক চলছে। আমরা তাঁর লীলার কতটুকু সংবাদই বা পেয়ে থাকি—কত ভাবে তিনি ভক্তকে অগ্রসর করে দিচ্ছেন! প্রথম প্রথম অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে তিনি ভক্তের বিশ্বাস দৃঢ় করে দেন; যাই তিনি করান না কেন—তাতে কল্যাণই।"

জীবসেবা সম্বন্ধে কথা উঠল। সু—কে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "ঈশ্বর-বুদ্ধিতে জীবসেবা করা খুব ভাল। শুধু ঐ নিয়ে আলোচনা করলে হবে না, কাজেও করতে হবে, তবেই ক্রমে সর্বভূতে ঈশ্বর উপলব্ধি হবে। ঠাকুরের ছেলে যারা, তাদের যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম সব চাই, নতুবা সমন্বয়

কি হলো! একটা একটা ভাবের পুষ্টি করা—এত পূর্বেও ছিল। সর্বাঙ্গসম্পন্ন ও উদারচরিত্র হওয়া চাই।"

তারপর ঈশ্বরে নির্ভরের কথা উঠল—"সকল অবস্থায় তাঁকে ভার দিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। তিনি যা করবার করবেন। তাঁকে আমার মত অনুসারে চালাবার চেষ্টা আহাম্মকি—ভার দিয়েছ যে। তিনি ওরূপ অবস্থায় আমাদের অন্যায় প্রার্থনা না শুনে ঠিক যা কল্যাণ, তারই দিকে নিয়ে যান।"

কা—র কথা উঠল। বলতে লাগলেন, "বেশ ছেলে।" আশ্রমের কয়েকজন ছেলে অধ্যক্ষের সঙ্গে বিবাদ করে খাওয়া বন্ধ করেছিল। অধ্যক্ষ তাতে কিন্তু বিচলিত হননি। অধ্যক্ষের এই দৃঢ়তার প্রশংসা করে বললেন, "আমি খুব খুশি হলুম! লোককে চালানোর ক্ষমতা আগে ওর কম ছিল। বড়ই নরম প্রকৃতির ছিল। এখন অনেক উন্নতি করেছে। ছোঁড়ারা দল বেঁধে আমার কাছে এল, তখন বেলা প্রায় দেড়টা, বলে খাওয়া হয়নি। আমি বললাম এখানে খিচুড়ি রেঁধে খাও, আমি খরচ দেব কিন্তু তার সঙ্গে মিটমাট করে নাও। দেখলুম, একটা ছোঁড়াই যত অনিষ্টের গোড়া। বাকিগুলোকে খুঁচিয়ে দেখলুম কারও বিশেষ কোন অভিযোগ নেই। ভাত বন্ধ করে দেওয়াতে তারা মহামুশকিলে পড়েছিল।" নি—বললে "যারাই গোঁয়ারগোবিন্দ তারাই আবার কাপুরুষ হয়।" স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন—"স্বামীজী আমাদের একজনকে লক্ষ্য করে এই কথা কতবার বলতেন। কত শিক্ষাই না স্বামীজী আমাদের দিয়ে গেছেন।"

নি—"একটু কঠোর প্রকৃতি হতে হয়।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ—কঠোর কেন? ভেতরে খুব ভালবাসা থাকবে কিন্তু কাজটা চালাবার জন্য বাইরে শাসন থাকবে, নইলে অধ্যক্ষ কিসের?

নি—কর্তৃপক্ষ যদি সাধারণভাবে একটা শিক্ষার বন্দোবস্ত করতেন, তবে নতুন অধ্যক্ষদের একটা সুবিধা হতো।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—"হাঁ, শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত যে মোটেই নেই। তবে ক্রমে

সব হয়ে যাবে। ধাক্কা খেতে খেতে বাঁক চোরগুলো সিধে হয়ে যাবে। কথায় বলে, 'কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না' যদি কেউ পড়ে থাকতে পারে, তবে তিনিই সব ঠিক করে নেন।"

প্রসঙ্গক্রমে ল—র কথা উঠলো, বললেন ল—টা ছটকে গেল। বলছে আমেরিকায় যাবে, হোমিওপ্যাথি শিখতে। তা আমেরিকায় যেতে পারবে, কিন্তু চরিত্র নাই; উন্নতি করতে পারবে না। সাধুজীবন ও স্বার্থপরতা এ দুটো একেবারে পরস্পরবিরোধী।

রা—স্বদেশী ও কংগ্রেসের কথা তুললে। স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন—"নেতা কোথায়? এক গান্ধী ছাড়া উপযুক্ত নেতা তো কাউকেও দেখছি না। 'শিরদার তো সর্দার।' স্বার্থ নিয়ে থাকলে সর্দার হয় না। একবার আমি কংগ্রেস সম্বন্ধে স্বামীজীর হৃদ্গত ভাব জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন, 'কি কচ্ছে ওরা, দেহি দেহি করলে কি পাওয়া যায়—যোগ্য হলেই পাওয়া যায়।' "

তাঁর নিজের অসুখের কথা উঠলো—স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন "যদি ধ্যান করতে পারতাম তবে সব অসুখ সেরে যেত। আমি অনেকবার দেখেছি। কিন্তু শরীরের অবস্থা যেরূপ ধ্যান হবে কি?"

আজ শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি। অনেক ভক্ত স্বামীর নিকট উপস্থিত। সম্প্রতি তিনি পায়ের একটা বুড়ো আঙুলের যন্ত্রণায় বিশেষ ভুগছিলেন। সরষের তেল মালিশ করে প্রায় সেরে গেছে। ঐ প্রসঙ্গ তুলে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলতে লাগলেন, "কেন একটা জিনিস হয় বা কেন কমে বাড়ে তার কিছুই ঠিকানা নেই। লোকে যা তা একটা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে। সবই মহামায়ার হাত। এইটে বোঝা গিয়াছে যে, জগতের সব জিনিসের পেছনে এক মহাশক্তি কাজ কচ্ছেন। তিনি পরম মঙ্গলময়। অতি তীব্র দুঃখকষ্ট পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। মানুষের তাতে মঙ্গলই হয়। কত কত সংস্কার কেটে যায়। মানুষের —অনেক জন্মের কর্ম রয়েছে, তার ফল ভোগ করা তো চাই। (প্রণাম করে) এই জীবনে তো কিছু অনর্থ হয়নি, তবে অতীত কত জন্মের পাপ রয়েছে, এসব ভোগ তারই ফল।"

এই প্রসঙ্গে একজন Vicarious atonement-এর (একজনের পাপ অপরে ভোগ করে তার প্রায়শ্চিত্ত করা) কথা তুললেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন—"হাঁ। কেউ কেউ ঐরূপ অনুমানও করেন। আগে একজন অপরের পাপের ফল ভোগ করে, এ কথায় তত বিশ্বাস হতো না; কিন্তু এখন খুব বিশ্বাস করি। একজন অপরের সুখদুঃখ বাড়াতে কমাতে খুব পারে। যার যত শক্তি, সে তত বেশি পারে।

এই প্রসঙ্গে জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাতাঠাকুরানীর অপরের পাপের ফল গ্রহণ করবার কথা উল্লেখ করাতে বললেন, "হাঁ। তাইতেই তো আরও বিশ্বাস হচ্ছে।"

গত নাগপুর কংগ্রেসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মিটমাটের কথা কাগজ থেকে পড়া হলো। স্বামী পাঠান্তে বললেন, "এই প্রসঙ্গে আমার স্বামীজীর একটা কথা মনে পড়ছে। স্বামীজী প্রায়ই বলতেন, 'We agree to differ' অর্থাৎ আমাদের শত শত মতভেদ, পরস্পরের মতভেদ থাকলে, তা স্বীকার করে নিয়েও একযোগে আমরা কাজ করবো।"

১ জানুয়ারি ১৯২১

কংগ্রেসের বক্তৃতা ও নির্ধারণগুলি তাঁর কাছে পড়া হলো। মহাত্মা গান্ধী সমগ্র কংগ্রেসকে নিজের মতাবলম্বী করেছেন শুনে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন, "উপর থেকে প্রেরণা এলে এইরূপই হয়ে থাকে। গান্ধীর মধ্য দিয়ে তিনি কাজ কচ্ছেন, সুতরাং তাঁর কথা রোকে কার সাধ্য। ঈশ্বরের শক্তিতে এই সকল আশ্চর্য সংঘটন হচ্ছে।"

ঠাকুরের সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের ভাব লক্ষ্য করে জনৈক সাধু কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "কালে আমাদের ধর্মই ভারতের রাজশক্তি পৃষ্ঠপোষিত ধর্ম (State religion) হবে।" তাতে স্বামী বললেন, "তোমরা ভাল হও তবে তো। তোমরা ঐ ধর্মের প্রতিনিধি। তোমরাই তো সব করবে। আমরা তো চললুম।"

আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা উঠলো—বললেন "সৌকৎ আলি একেবারে গান্ধীর ভাবে অনুপ্রাণিত। শুধু ভারতই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। মহম্মদ আলির কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি একটা খুব টান আছে।"

একজন বললেন "আপনারা আরও কিছুকাল থাকুন, তাহলে দেশের অনেক উন্নতি দেখে যেতে পারবেন।"

স্বামী—"দেখবার সাধ হয় বটে। আমাদের মন যে ওতে পড়ে রয়েছে। এ যে ঠাকুর-স্বামীজীরই কাজ, যাঁরা এই জন্য প্রাণ দিয়েছেন। আজকের খবর শুনে মনটা খুশি হলো।"

৩ জানুয়ারি ১৯২১

(অপরাহ্ণে বেড়াতে বেড়াতে) মঠের জনৈক সাধু মঠাধ্যক্ষের অনুমতি না নিয়ে হঠাৎ কাশী চলে আসে, তৎপ্রসঙ্গে মঠের একজন পুরাতন সাধু বলেছিলেন, আমি হলে তাকে বার করে দিতাম। সেই প্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ বলতে লাগলেন—"অতিরিক্ত কঠোর হলে চলে না, ক্ষমা করতে হয়। সু— যখন আমাকে ঐ কথা বললে, তখন আমি তাকে বলেছিলাম ঃ তোমার ভাই যে স্বামীজীর অসুখের সময় তাঁর কথা ঠেলে চলে গিছল। স্বামীজী তখন কি করেছিলেন? সু— এর কোনও জবাব দিতে পারেনি। স্বাধীনতা না দিলে উন্নতি হতে পারে না। নিজেরা এমনভাবে চলতে হবে যাতে অপরে ঝগড়া করবার ছুতো না পায়। দুষ্ট লোকে অপরের দুর্বলতার সুবিধা নেবার চেষ্টা করে।"

মঠের শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা হলো, "রাজা মহারাজের ভাবটা হচ্ছে এই, আপনা আপনি যে রকম হয়ে দাঁড়ায়, হতে দেওয়া। এতে অনেক স্থলে ভালও যে হয় না, তা নয়। তাঁর অনেক শিষ্য তাঁর সঙ্গে খোলাখুলিভাবে মিশতে পারে না, তারা আমাকে চিঠি লেখে। কত চিঠির এইরূপ জবাব দিয়েছি। আমি তাদের রাজা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করতে বলি। তারা লেখে—তারা তাঁর নিকট সব বিষয়ের জবাব বা মীমাংসা পায় না।

"গো— স— এর অনেক আগে মঠে যোগ দিয়েছে, সুতরাং স—র

অধীনে কাজ করতে মাঝে মাঝে একটু আধটু গোলমাল হয়। আমি গো—কে কখনও কখনও একটু বেশি ভালবাসা দেখাই বা গো—র কথাটাই বহাল রাখি। স—কে বলে দিয়েছি যেন ঐ হুকুম করার ভাবটা কথায় বা আচরণে প্রকাশ না পায়। কিন্তু সকল সময়ে ঠিক রাখতে পারে না।"

"সু—ভাল মানুষ—কিন্তু তার বুদ্ধিটা কিছু কম। স—পূর্বরাত্রে তাড়া খেয়ে কাল ভোরে কোথা চলে গিয়েছিল, যাবার সময় সু—কে আভাসে একটু বলে গিয়েছিল। তার উচিত ছিল তখনই আমায় বলা। ডাকতে পাঠিয়ে দিলাম। সে তাকে গঙ্গার ঘাটে দেখলে, কিন্তু কথা বলেনি; বলে, অ—বললে আমি আছি তুমি যাও। আমি তাকে পাঠালুম ঐ কাজের জন্যে অথচ কথা কয়ে এল না! নিজের বুদ্ধি না খাটালে চলে? স—র সঙ্গে প্রথমটা তারও, 'মঠে সে পরে যোগ দিয়েছে'—এই ভাব নিয়ে একটু গোল হয়েছিল; পরে আমার সেবা করতে স—ভাল জানে, এই ভেবে একেবারে তার বাধ্য হয়ে পড়েছিল। ভাবটা খুব ঠিক, কিন্তু নিজের বুদ্ধিটাও তো একটু খাটাতে হয়।"

অন্য প্রসঙ্গ উঠলো। বললেন, "ঠাকুর স্বামীজীর প্রবল শক্তি রয়েছে, তাই মিশনের কাজ চলে যাচ্ছে এবং নূতন নূতন লোক আসছে। আমি আজকাল সকলকে যে কাজে আছে সেই কাজই করতে বলি। এক জায়গায় তো থাকতেই হবে, সুতরাং যখন এক জায়গায় অনেক দিন থাকলে অভিজ্ঞতা বেড়ে কাজের সুবিধা হয়, তখন সেই জায়গায় অনেক দিন থাকাই ভাল।

"শরৎ মহারাজের 'লীলাপ্রসঙ্গ' পড়ে অনেকে আমায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। আমি বলি, গ্রন্থকর্তা নিজে রয়েছেন তাঁকে জিজ্ঞাসা কর। না—তা বলে—আপনি এ সম্বন্ধে কি বলেন।"

৪ জানুয়ারি ১৯২১, প্রাতঃকাল

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বিচিত্র জগৎ' পড়ালেন। রামেন্দ্রবাবুর খুব প্রশংসা করলেন, সেই প্রসঙ্গে বললেন, "ধারণা থাকলেই বুঝানো যায়। ধ্যান আরও ভাল। আমি শ্রীনগরে উপনিষদের ধ্যান করতাম। চমৎকার লাগত। ঐরূপে

বড় বড় দুখানা ছাড়া আটখানা উপনিষদ্ মুখস্থও হয়ে গেল। ধ্যান মানে আর কি? খুব নিবিষ্ট হয়ে যাওয়া—কোনও বিষয়ে মন নিবিষ্ট হলে আপনিই ভিতরকার খবর বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে মনটাকে তৈরি করে নিতে হয়। তারপর যাতে লাগাও তাই বোঝা যাবে। মনঃসংযোগের উপায়—তার পিছনে কিছুকাল লেগে থাকা। ভালবাসা ও শাসন, দুই উপায়েই মনকে সংযত করা যেতে পারে—যখন যেমন দরকার, মন তোমার বশে থাকা চাই। তোমাকে মনের বশ হলে চলবে না। তাহলে 'উল্টা সমঝলি রাম' গোছের হবে। কোনও বিষয়ে একটু আসক্তি থাকলেই মন জো পেয়ে বসে, অমনি তোমাকে যেদিকে ইচ্ছা ফেরাবে। আসক্তিশূন্য হলে আর কিছু করতে পারে না। কাম—আসক্তি এসব একই জিনিস, কেবল মাত্রার তফাত।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

তস্মাৎ ত্বম্ ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ —গীতা, ৩।৪১

অর্থাৎ, হে অর্জুন, অতএব তুমি প্রথমেই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশকারী পাপ-স্বভাব এই কামকে নষ্ট করে ফেল।

মঠের অনেক সন্ন্যাসীর খুব প্রশংসা করলেন, বললেন, "সে অনেক রকম জানে।" উপস্থিত একজন বললেন, "আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ তার প্রতি প্রসন্ন হন।" তিনি বললেন, "এখন আর এর প্রতি মহারাজের রাগ নেই। আমি তাঁকে খুব করে লিখেছিলাম। 'ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ'—দেবতার ক্রোধও বরের ন্যায়। তার উত্তরে তিনি আমায় লিখেছিলেন, 'আপনি ওকে আশীর্বাদ করবেন।' ও এখন অনেক বদলে গেছে, আর এক মানুষ, নরম হয়েছে ইত্যাদি।"

"পূর্বে—রাজামহারাজের সহিত ওর অনেক কথা কাটাকাটি হতো। একদিন আমি আলাদা ডেকে বললাম এরূপ কোরো না। মহারাজকে যেমন দেখ, এঁদেরও সেইরূপ দেখবে, নতুবা মহা অকল্যাণ। তখন বুঝলে। আমার সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি।

"কাল সু—র সঙ্গে অসহযোগ নিয়ে খুব তর্ক হয়েছিল। সে বলে নাগপুর কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে গান্ধীকে আপস করতে হয়েছে ইত্যাদি। আমি চেপে ধরলাম—বললাম কলকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাব থেকে হটে যাওয়া কোথায় হয়েছে, অন্যায়ই বা কি হয়েছে? শেষে কারণ দেখাতে পারে না। তর্ক করবার খুব জিদ আছে, সুতরাং যুক্তি দেখালেও শুনতে চায় না।"

জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চরিত্রের কথা উঠলো, ঐ প্রসঙ্গে বললেন—"চরিত্রবল না থাকলে শুধু কথায় কি কাজ হবে। ঐখানেই যত লোকের পতন। ঠাকুর বলতেন, 'সকলেই ওতে পড়ে আছে। মাত্র দু-চার জনকে যা সরিয়ে রেখেছেন।' একবার ওতে আসক্ত হলে আর রক্ষা নেই। যতক্ষণ না কেহ ওসবের পাল্লায় পড়ছে ততক্ষণ বেশ আছে। ওর নাম সম্ভোগ অর্থাৎ সবচেয়ে গভীর ভোগ।"

এই প্রসঙ্গে কামের প্রভাব মানুষকে কতদূর হীন করে, নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে লাগলেন। বললেন "স্ত্রীলোক মুগ্ধ পুরুষকে যা ইচ্ছে তাই করাতে পারে। তুলসীদাসের দোঁহায় আছে—

তুলসী ইয়ে সংসার মে,
কাঁহাসো ভক্তি ভেট।
তিন বাত্সে লট পাট হ্যায়,
দামড়ি, চামড়ি, পেট ॥

অর্থাৎ হে তুলসী, এই সংসারে ভক্তি কিরূপে মিলবে? লোকে কামিনী-কাঞ্চন ও উদর এই তিন বিষয় নিয়েই মোহিত হয়ে রয়েছে।

"দামড়ি, চামড়ি, পেট—আরও সংক্ষেপে একে কামিনী-কাঞ্চন বা জিহ্বোপস্থ বলে থাকে। জিহ্বোপস্থের ভোগ বাদ দিলে জগৎই বাদ পড়ে যায়। যারা পারে, তারা সমগ্র জগৎকে উপেক্ষা করে।"

৬ জানুয়ারি ১৯২১

স্বামী আজ প্রসঙ্গক্রমে বলতে লাগলেন, "সংসার ভয়ানক ব্যাপার—

অসত্যেরই কারবার। সাধুর সত্যই সব। সত্য ছাড়লে আর উন্নতি হতে পারে না। ছোট অসত্যও তো অসত্য!"

৮ জানুয়ারি ১৯২১

য—র সম্বন্ধে বললেন, "ওর সত্যে আঁট কম। সত্যই ভগবান, অসত্যই মায়া। সত্যকে ধরে থাকলে সব হয়। ঠাকুর শিবনাথকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'তোমরা এত ঠিক মাথাওলা, তবে মিথ্যা কও কিরূপে? আমায় বেহেড বল, কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কখনও মিথ্যা বেরোয় না।

"একবার কথা দিয়েছিলেন যে, যদু মল্লিকের বাগানে গিয়ে দুপুরবেলা তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু লোকেদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তা ভুলে যান। রাত্রে ১১টায় শুতে যাবার সময় হঠাৎ মনে পড়ল, তখনি লণ্ঠন জ্বেলে রাজামহারাজকে সঙ্গে নিয়ে সেই বাগানে গেলেন এবং দরজা বন্ধ দেখে এক পা দরজার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'এই আমি এসেছি।'

"আহার সম্বন্ধে ঐরূপ সত্যে নিষ্ঠা রাখতেন। সব ছেড়ে ছিলেন, কিন্তু সত্য ছাড়তে পারেননি।

"সত্যরক্ষা করা মহাব্যাপার। অনেক ত্যাগ চাই। বলব না বলে কোনও কথা গোপন রাখাও এক প্রকার অসত্য। একেবারে খোলাখুলি ব্যবহারই সত্যপরায়ণতা। একজন বিখ্যাত বাঙালি ঔপন্যাসিককে আমি একবার এই কথা বলেছিলাম। তিনি একবার কথায় কথায় বলেন, 'আমি সত্য খুব মেনে চলি'; তাতে আমি বলি, 'মশায় কথাটা একটু ভেবে বলবেন।'"

স্বামী বলতে লাগলেন, "মায়ার রাজ্য কি ভয়ানক! কি ঢেউ তার! এর মধ্যে থেকে নিজেকে সরিয়ে ফেললে তবেই তা স্থিরভাবে দেখা যায়। অনাসক্তি, নতুবা মহা বিপদ; কিন্তু সরিয়ে ফেলাও ভারি শক্ত ব্যাপার।"

আজ তাঁর নিকট চণ্ডীপাঠ হবে। চণ্ডীর দু-একটি শ্লোক আবৃত্তি করে বললেন, "যুদ্ধাদির বর্ণনা দ্রুত ও স্তবাদি ধীরে ধীরে পড়তে হয়।" "দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ।" ইত্যাদি মধুর ভাবে আবৃত্তি করে বললেন "কি চমৎকার!"

বললেন "শুধু গত পূজার সময় চণ্ডীপাঠ ফাঁক গিয়েছে—হাতে ঘা ছিল, তাতে পাঠ নিষিদ্ধ। একবার মনে করেছিলাম এত রাগানুরাগ ভক্তির ব্যাপার, পড়িই না কেন—কিন্তু শরীরের দুর্বলতার দরুন হয়নি। ইতঃপূর্বে আর কখনও নবরাত্রিতে চণ্ডীপাঠ ফাঁক গেছে বলে মনে পড়ে না।"

পাতঞ্জল যোগসূত্র আনিয়ে 'কর্ম-অশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনঃ ত্রিবিধম্ ইতরেষাম্' (৪/৭) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পড়লেন—যোগীর কর্ম পুণ্য বা পাপাত্মক নয়, অপরের পক্ষে পুণ্য, পাপ এবং পুণ্য-পাপ মিশ্রিত এই ত্রিবিধ কর্ম হয়ে থাকে। বললেন—"যোগী নিষ্কাম বলে যোগীকে পাপপুণ্য স্পর্শ করতে পারে না।"

৯ জানুয়ারি ১৯২১

স্বামী তুরীয়ানন্দ একজনকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "মনকে চঞ্চল করতে নাই। এই তো সেদিন কলকাতা থেকে এলে। এতে অসৎ দৃষ্টান্ত দেখানো হবে। মনকে নিজের বশে রাখ। মনের বশে যেও না। একজনের কাছে মাথা দিয়ে দাও। দেহ মন বুদ্ধি সব ভগবানে অর্পণ কর।"

এই বলে রামপ্রসাদের একটি গান গাইলেন—

মনরে আমার এই মিনতি
তুমি পড়া পাখি হও করি স্তুতি ॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে গাছের ফলে কদিন চলে, কর রে চার ফলে স্থিতি ॥
প্রসাদ বলে ফলাগাছে ফল পাবি মন শোন যুকতি।
ওরে বসে মূলে কালী বলে গাছ নাড়া দাও নিতি নিতি ॥

"অর্থাৎ ওরে মনপাখি, তুমি উড়ে উড়ে আর গাছের ফল খেও না, যাতে চতুর্বর্গ ফল মেলে এমন গাছ আশ্রয় কর, অর্থাৎ ভগবান।"

তারপর মন্ত্রশক্তির কথা উঠলো; বললেন "মন্ত্রশক্তিতেও রোগ ভাল হয়, কিন্তু ঐ শক্তির পেছনেও ঐশ্বরিক শক্তি। এখন সেইটেতেই বেশি বিশ্বাস হয়ে গেছে।"

একজন বললে, "এমন করে দিন, যাতে স্ত্রীলোক দেখলে মনে পর্যন্ত ভেদবুদ্ধি না উঠে।" তিনি বললেন "দেহের দিকে না দেখে আত্মার দিকে লক্ষ্য করবার চেষ্টা কর। অভ্যাসদ্বারা মনকে আত্মসংস্থ করবার চেষ্টা কর।" গীতা উদ্ধৃত করে বললেন, "গীতায় বলেছেন, বিষয়ের চিন্তা করতে করতে বিষয়ে আসক্তি আসে, আর এই আসক্তি থেকে কাম এবং কাম থেকে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধ হচ্ছে কামের ঘনীভূত অবস্থা। দিকবিদিক জ্ঞান থাকে না, কামেতে তবু একটু হুঁশ থাকে। অসৎ জিনিসের চিন্তা করতে নেই, তাহলে আর আসক্তি আসবে না।

"আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পুরুষরা ভূতের মতো খাটে, কাজেই কাজের অবসরে যখন এলিয়ে পড়ে তখন ভোগপ্রবৃত্তি প্রবল হয়। অন্য রকমে ভোগের তো ধারণা নেই। কাজেই তাদের ঐ প্রবৃত্তি বেশি। মেয়েরা কম খাটে। লেখাপড়ার চর্চা নিয়ে বেশি থাকে, তাইতে তাদের এটা কম বলে বোধ হয়।

"প্রচারকদের ভগবান আলাদা শক্তি দেন। গুরুপরম্পরায় ঐ শক্তি সঞ্চারিত হয়। নইলে সাধারণের মতো হলে লোকে আসবে কেন। তাঁর কাজের জন্য তিনি ঐ সকল প্রচারকদের শক্তিসম্পন্ন করেন। কিন্তু স্বার্থের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে পর চলে যাবে। বক্তৃতা শক্তি আদি অন্যান্য ক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু উদ্ধার করবার শক্তি থাকে না।"

জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "কার্য শেষ হলেও ঐ শক্তি থাকে, কমে যায় মাত্র। কিন্তু অপব্যবহার করলে একেবারে নষ্ট হয়। কি অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি তখন হয়েছিল! তাঁর আশ্চর্য লীলা!"

মনঃসংযমের কথা উঠলো, গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে শ্লোক আবৃত্তি করে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন—

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্, (৬/২৬) ইত্যাদি—

"বারবার চেষ্টা করে মনকে টেনে এনে আত্মাতে বসাতে হবে। মন তো বাহিরে ছুটে যাবেই, কিন্তু দুষ্ট ছেলের মতো তাকে কানে ধরে নিয়ে এসে বসাতে

হবে। বুদ্ধির ওপারে নিয়ে যেতে হবে। একেবারে আত্মাতে, আবার বসালে—আবার বসালে, এই রকম করতে করতে বশ হয়ে যাবে। তা ছাড়িয়ে [ক্রমশঃ] রজঃতে উঠতে হবে। সেটা ছাড়িয়ে সত্ত্বে, তারপর তারও বাহিরে যেতে হবে, তখনই 'সর্বভূতস্থং আত্মানম্' (৬/২৯)—আত্মাকে সর্বভূতে উপলব্ধি করবে। 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র'—(৬/৩০) দেখবে তিনিই কেবল আছেন। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। এইটিই ত্রিগুণাতীত অবস্থা।

"'ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ' (৩/৪০)—ঐ সব জায়গা জয় করে কাম জয় করতে হবে। কাম, ক্রোধ, লোভ এসব একই জিনিসের বিভিন্ন রূপ মাত্র, 'জ্ঞানিনো নিত্য বৈরিণা' 'জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ (৩/৩৯,৪১)'—এই কাম ক্রোধাদি জ্ঞানীর নিত্য বৈরী এবং জ্ঞান বিজ্ঞান নষ্ট করে দেয়।

"সব ইন্দ্রিয়কে তাঁতে যোগ করে দিতে হবে—চক্ষুতে তাঁর মূর্তি দর্শন করতে হবে, খেতে হয় তো তাঁর প্রসাদ ইত্যাদি, এইরূপে ইন্দ্রিয়গুলি ক্রমশ জব্দ হয়ে যাবে।

"ঔষধে আমার বড় কাজ হচ্ছে না। ভোগ হয়ে যাচ্ছে, প্রারব্ধ ক্ষয় হলে শরীরটাও পড়ে যাবে।"

জনৈক ভক্ত ঠাকুরের মাতাল ও বেশ্যাসক্তদিগকে একেবারে বদলে দেবার কথা তুললে ইনি বললেন, "হাঁ, এসব সত্য কথা। কাকেও কাকেও আবার কিছু সময় দিতেন, যেমন গিরিশবাবু। তাঁকে বলেছিলেন, 'দিন কতক খেয়ে নে, ভোগ করে নে, যদি জাত সাপে কামড়ে থাকে তবে বেশি ডাক ডাকতে হবে না।

"মনুতে আছে 'বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি'—বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ জ্ঞানীকেও ভোগের দিকে টেনে নিয়ে যায়। পুরাণে একটা গল্প আছে—জৈমিনি ঋষি কোনও মতে মানতে চাইতেন না যে জ্ঞানীকে আবার প্রলোভনে অভিভূত করতে পারে। একবার তিনি পথে যেতে যেতে রাত্রে খুব জল ঝড়ে পড়ে একটা মন্দিরে আশ্রয় নিলেন। খানিকক্ষণ পরে এক পরমাসুন্দরী যুবতীও বিপদে পড়ে সেখানে এসে আশ্রয় চাইলে। তখন জল

ঝড় অনেকটা থেমে গেছে। সেখানে তাঁরা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। তিনি সেই স্ত্রীলোকটিকে মন্দির-গৃহটি ছেড়ে দিয়ে নিজে মন্দিরের বারান্দায় রাত্রি যাপন করবেন স্থির করলেন। মেয়েটিকে বললেন, 'এখানে একটা ভূত থাকে। তুমি দরজা বন্ধ করে থেকো। রাত্রে যদি কেউ ডাকাডাকি করে, কোনও মতে দরজা খুলো না। এমনকি আমার গলার স্বর শুনলেও দরজা খুলো না।' রাত্রে জৈমিনি কামাতুর হয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে ক্রমাগত স্ত্রীলোকটিকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন ও দরজা খুলে দিতে বললেন, কিন্তু দরজা খুললো না, সমস্ত রাত ছটফট করে জেগে দোরের সামনে কাটালেন। সকালে দরজা খোলা হতে দেখলেন স্ত্রীলোক কেউ কোথাও নেই, স্বয়ং ব্যাসদেব রয়েছেন, তখন জৈমিনি লজ্জিত হয়ে সব বুঝলেন ও মানলেন যে জ্ঞানীর পক্ষেও ইন্দ্রিয় জয় বড়ই কঠিন ব্যাপার।

"'ব্রহ্ম-সংস্পর্শ' অর্থাৎ সেই আত্মাকে যথার্থ উপলব্ধি করতে পারলে মানুষ সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে পারে।"

১০ জানুয়ারি ১৯২১

আজ অ—মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দ কথিত এই গল্পটি বললেন, "লালাবাবু তাঁর গুরুকে একশত টাকার একখানি নোট দিয়ে প্রণাম করলেন। গুরু হঠাৎ অত টাকা পেয়ে তা দিয়ে কি করবেন এই ভেবে ভেবে সারা রাত ঘুমুতে পারলেন না। বিরক্ত হয়ে শেষে পরদিন সকালে লালাবাবুর কাছে গিয়ে নোটখানি ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন 'বাপু, এই একখানি নোটের কি করব তাই ভেবে আমার সারারাত ঘুম হয়নি। আর তুমি অত ঐশ্বর্য নিয়ে সুখে নিদ্রা যাও। তুমিই আমার গুরু'।"

১১ জানুয়ারি ১৯২১

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলছিলেন, "কাল বৈকালে আমার জ্বর একটু বেশি বেড়েছিল। এরা পাছে আমার মন খারাপ হয় সেই জন্য আমার কাছে সত্য গোপন করে ৯৯.২ বলেছিল। যখন সত্য বেরিয়ে পড়ল তখন বললে, ১০০.২

জায়গায় ভুলে ৯৯.২ বলা হয়েছিল।" ইংরেজিতে একটা কথা আছে বটে 'Where ignorance is bliss, it is folly to be wise' অর্থাৎ 'অজ্ঞানেই যেখানে সুখ সেখানে জ্ঞানটা বেকুবি মাত্র'। আমি কিন্তু বলি অজ্ঞান কোন অবস্থাতেই ভাল নয়। জ্ঞানই আসল জিনিস। গৌড়পাদ বলে গেছেন, 'জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে' অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হলে আর দ্বৈত বুদ্ধি থাকে না। দ্বৈতই তো যত অনর্থের মূল। দ্বৈত চলে গেলে তো সব ভয় চলে গেল। উপনিষদে আছে, 'দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি' অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তুর বোধ থাকলেই ভয় আসে। 'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি' অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজাকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়ে বলেছেন 'হে জনক, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তুমি এখন অভয় প্রাপ্ত হয়েছ।'

"শাস্ত্র পাঠের পিছনে যদি জীবন না থাকে তো কি হলো? নইলে শাস্ত্র তো অনাদি কাল থেকে আছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও আমি যখন কাঙ্গাড়ি উপত্যকায় বেড়াচ্ছিলাম (তখন আমার বয়স ২৫ কি ২৬ হবে) তখন সেখানে একটি চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স্ক সাধুর সঙ্গে দেখা। লোকটি বেশ সরল। তিনি বললেন, 'ষোল বৎসর ধরে বেদান্ত রগড়াচ্চি, কিন্তু তেঁতুল মনে করলেই জিবে জল আসে।' ঠিক কথা। শাস্ত্রে আর কি আছে?

"চণ্ডাশোক এক ব্যক্তির ওপর খুব রেগে ছিলেন, রেগে স্বয়ং তরবারি হস্তে তাকে বধ করতে ছুটেছেন। বেচারা ভয়ে শেষে এক মঠে আশ্রয় নিলে। মঠাধ্যক্ষ রাজরোষে পতিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেবার দায়িত্ব বুঝেও তাকে আশ্রয় দিলেন। অশোক যখন ঐ মঠে গিয়ে মঠাধ্যক্ষের নিকট সেই ব্যক্তির সন্ধান করলেন, তখন তিনি স্বীকার করলেন যে সে ব্যক্তি মঠে আছে—তিনি তো আর মিথ্যা বলবেন না। অশোক সে ব্যক্তিকে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে আদেশ করলেন, কিন্তু তিনি তাঁর হুকুম মানতে অস্বীকার করলেন। ক্রুদ্ধ সম্রাট তৎক্ষণাৎ অসি নিষ্কোষিত করে ঐ মঠাধ্যক্ষকে বধ করতে উদ্যত হলেন। প্রায় মারেন আর কি, তথাপি সাধুর দেহের একটি মাংসপেশীও কুঞ্চিত হলো না অথবা এতটুকু ভীতিব্যঞ্জক বাণীও তাঁর মুখ থেকে বেরুলো না। রাজা এই ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত

হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি মৃত্যু সম্মুখে দেখেও এতটুকু ভয় পেলেন না?' সাধু তখন বললেন, 'ভয় কেন পাব? মৃত্যু কার হবে?' ইত্যাদি। তখন দুজনে খুব বিচার আরম্ভ হলো। সম্রাট মহাবুদ্ধিমান ছিলেন। সাধুর যুক্তির সারবত্তা বুঝলেন। ফলে 'চণ্ডাশোক' 'ধর্মাশোকে' পরিণত হলেন।

"লক্ষ্মীনারায়ণ মারওয়াড়ি ঠাকুরের সেবার জন্য টাকা দিতে চেয়েছিল। তিনি যখন নিতে অস্বীকার করলেন, তখন সে বললে, 'আপনার নামে না নেন আপনার কোনও আত্মীয়ের নামে টাকা রাখুন।' তিনি তাতেও স্বীকার হলেন না। বললেন, 'তাতেও আমার মনে দাগ লাগবে।' তখন লক্ষ্মীনারায়ণ বললেন, 'আপনি জ্ঞানী, আপনার আবার ত্যাজ্য গ্রাহ্য কি?' তিনি বললেন, 'আমার বাপু অত জ্ঞান এখনও হয়নি। আমার এখনও ত্যাজ্য গ্রাহ্য ভেদ আছে।' পঞ্চবটীতে এক সাধু এসেছিল, তার একবার চরিত্র স্খলন হয়েছিল। ঠাকুরের সঙ্গে সে সাধুটির যখন কথাবার্তা হলো, তখন সে বললে 'জগৎটাই যখন মায়া তখন আমার চরিত্র দোষটাই কি কেবল সত্য?' ঠাকুর বললেন, 'তোর অমন জ্ঞানে মুতে দি।' অসত্যের প্রশ্রয় কোনও মতে দেওয়া উচিত নয়।

"সাধারণ লোকে এমন সব কাজে জড়াতে চায় যাতে আসক্তিটা চিরস্থায়ী হয়ে থাকতে পারে। সংসারটাই এই, অবশ্য সাধুদের কথা আলাদা। তাঁরা বিচার করে সংসার ছেড়ে এসেছেন, ঐ বিচার আরও পাকলেই জ্ঞান।

"কাল এক প্রচারক এসেছিল, তার গুরু এক নূতন মত চালিয়েছে; বলে, 'আর কেউ এ তত্ত্ব বোঝেনি।' আমি তাকে বললাম যদি আর কেহই বোঝেন নি তো আপনার গুরুই একা বুঝলেন কি করে? প্রকৃতপক্ষে সব পুরনো কথা নিয়েই সেইটেকে নূতন বলে প্রচার কচ্ছে। বলে নাকি, এ মতে এক লাখ চেলা হয়েছে।

"জগতে কোনও মতই ফেলা যায় না। সব মতেরই একটা সার্থকতা আছে। তাই সেটা টিকে থাকে। তাতে কত লোকের উপকার হয়। হয়ত অন্য কোনও মতে তাদের তত হতো না।"

১২ জানুয়ারি ১৯২১

আজ মনকে সংযম করা যে অতি কঠিন এই বিষয়ে প্রসঙ্গ উঠল। স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন—

"মনটাকে সংসার থেকে তুলে রাখা কি কঠিন ব্যাপার! আবার নেবে পড়ে। বাসনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া বড় শক্ত। যার কিছু নেই, ঠাকুর বলতেন, সেও একটা বেড়াল পুষে সংসার পাতায়।

"উপলব্ধি—আহা কি অদ্ভুত জিনিস! তার কথা চিন্তা করেও কত আনন্দ পাওয়া যায়। উপলব্ধি হলে কি আনন্দ হয় কে জানে!"

উপলব্ধি সম্বন্ধে বিবেকচূড়ামণির শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন—

কিং হেয়ং কিমুপাদেয়ং কিমন্যৎ কিং বিলক্ষণম্।
অখণ্ডানন্দ-পীযূষপূর্ণে ব্রহ্মমহার্ণবে ॥ ৪৮৪ ॥

ন কিঞ্চিদত্র পশ্যামি ন শৃণোমি ন বেদ্ম্যহম্।
স্বাত্মনৈব সদানন্দরূপেণাস্মি বিলক্ষণঃ ॥ ৪৮৫ ॥

অর্থাৎ "অখণ্ডানন্দরূপ অমৃতপূর্ণ ব্রহ্মরূপ। মহাসমুদ্রে ত্যাজ্য গ্রাহ্য আর কি থাকিতে পারে? তথায় আর অন্য বা পৃথক বস্তু কি আছে? আমি আর অন্য কিছু দেখিতেছি না, শুনিতেছি না বা জানিতে পারিতেছি না। আমি সর্বদা সদানন্দস্বরূপ নিজ আত্মস্বরূপে জগৎ হইতে পৃথকরূপে অবস্থিত রহিয়াছি।"

শা—স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলো। বললেন—"তার মুখে একটা সাহসের ভাব এসেছে—পূর্বে সেটা ছিল না; খাওয়া-দাওয়া তো কমে গেছে। খুব বেশি ধ্যান ধারণা করলে এটা হয়ে থাকে।"

১৩ জানুয়ারি ১৯২১

এদিনও শা—স্বামীর কথা উঠলো। বললেন, "সে এখনও কিছু উপলব্ধি করতে পারলে না বা ভগবানের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা এল না বলে দুঃখ করছিল। আমি তাকে বললাম, সব তাঁর ওপর ফেলে দিয়েছ, আবার এ দিলেন

না ও দিলেন না বলে দুঃখ করছ কেন? তাঁর যখন ইচ্ছা হবে তখন এত ব্যাকুলতা দেবেন যে অস্থির হয়ে পড়বে, তোমার কাজ তুমি করে যাও না।

"বলে—তাঁর সান্নিধ্য খুব উপলব্ধি করছি। এই তো ধ্যানের ফল। তার খাবার-দাবার যা দরকার হবে আমি দেব বলেছি।"

১৪ জানুয়ারি ১৯২১

কালকে ভাগবতে প্রহ্লাদচরিত্র পড়া হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গ তুলে বলতে লাগলেন, "প্রহ্লাদের ছেলেদের প্রতি উপদেশ কি চমৎকার! বলে, বালককাল থেকেই হরি ভজনা করবে। মনুষ্য শরীর অতি হেয়, কিন্তু এ থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। সুতরাং এটি অর্থদ। বাপকে [হিরণ্যকশিপুকে] সাফ বলে দিলে—'এ কথা কেউ শেখায়নি, শিক্ষকরাও নয়, আপনিও নয়, আমি নিজেও নই, এঁরা কেউই শেখাতে পারেন না—মুকুন্দ-পদারবিন্দসেবী সাধুদের কৃপাই এই অনুরাগ দিতে পারে।' বাপ বললে, 'এটা কে রে! এই বেটাই আমাকে মারবে দেখছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু আমার ভয়ে কাঁপে, আর এটা নির্ভীক হয়ে আমার সঙ্গে জবাব করছে! আর এ কে।' কিন্তু প্রহ্লাদকে মারবার চেষ্টা সব বিফল হলো।

"বলতে পার এসব গল্প কিন্তু সব সত্যি। প্রহ্লাদ মরেননি, এখনও বেঁচে আছেন। প্রত্যেক ভক্তহৃদয়ে তিনি আছেন। তোমার মধ্যে আমার মধ্যে। এত কাণ্ড করেও যাঁকে মারতে পারেননি, তিনি আবার মরবেন কি করে? তিনি যে নিজের আত্মাকে সর্বভূতে দেখেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ পড়ে দেখ, অদ্বৈত অনুভূতির ফলে পাহাড় ভেসে উঠল। ষণ্ডামর্ক বলেছিল, আর অন্য শাসন করে কাজ নেই, একে বরুণপাশে বেঁধে বাবা আসা পর্যন্ত রেখে দেওয়া যাক। তারপর বুদ্ধি ভাল হয়ে যেতে পারে। ওঁদের মতে 'ভাল' হবে আর কি! হিরণ্যকশিপু ত্রিবর্গ শিক্ষা দিতে বললে। প্রহ্লাদ পিতৃআজ্ঞায় শিখতে লাগলেন, কিন্তু ভাল লাগত না, মন বসত না, কেন না এঁরা ছিলেন 'দ্বন্দ্বারাম'।"

চণ্ডীর কথায় বললেন, "চমৎকার বই! ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এটিই চণ্ডীর শিক্ষা। 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তি' ইত্যাদি শ্লোকের পর শ্লোক বলে যেতে

লাগলেন। মহামায়াই সবাইকে ভুলিয়ে রেখেছেন—'সংসারস্থিতিকারিণা' তাঁর সৃষ্টি চলবে বলে। তিনি ভোগ মোক্ষ দুই দেন—এই হচ্ছে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য তিন বৎসর ধরে মহামায়ার পূজা করে নিজ নিজ অভীষ্ট পেলেন। মানুষ যে জেনেও করতে পারে না, সে কেবল মহামায়ার খেলা। তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' তাঁর কৃপা না হলে সংসার থেকে বের হবার অন্য উপায় নেই, সাধারণ মানুষ এক উপাসনার দ্বারাই চরম অবস্থা অর্থাৎ সর্বভূতে আত্মদর্শন লাভ করতে পারে। অন্য কোনও রকমে হবার জো নাই।

"নিজের সঙ্গে যেমন কথা কওয়া যায়, তেমনি অপরের সঙ্গেও কথা কইতে হবে, অর্থাৎ অপর সকলের ভিতর আত্মদৃষ্টি করতে হবে। নিজের ওপর কেউ রাগ করে কি? সেই রকম সকলের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। নিজের আত্মাকে অপরের মধ্যে দেখলেই তবে এইটি হয়। স্বামীজী ঐভাবে দরিদ্রনারায়ণ সেবার প্রবর্তন করে গেছেন। গান্ধী এইভাবে সকলের সঙ্গে কথা কয়, তাই তার কথা সবাই শোনে। একটা ভূমি আছে যেখান থেকে সবার প্রতি আত্মবৎ দৃষ্টি করা যায়, সে অবস্থাটা লাভ করতে পারলে আর কথায় গোল থাকতে পারে না।"

ঠাকুরের ভক্ত ঈশান মুখুজ্যের দানধ্যানের কথা উঠলো, বললেন—"ঠাকুর তাঁকে ওসব ছেড়েছুড়ে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ মন দিতে বলেছিলেন। ওসবের মধ্যেও স্বার্থের ভাব থাকে। তাঁর লোকমান্যের প্রতি নজর ভিতরে ভিতরে ছিল, তাই সালিশি, মোড়লি করতে পারতেন। নিষ্কামভাবে করা ভারি শক্ত।"

একজন জিজ্ঞাসা করলে, "আমরা যে নিষ্কাম কর্ম করি, তাও কি ঐ প্রকার নাকি? কেউ কেউ বলে, যা নিজের ভাল লাগে তাই কর।"

স্বামী তু—হ্যাঁ নিজের ভাল লাগে বলে করা বটে, তবে স্বার্থের জন্য করলে যে ফল হতো এতে তার উল্টো হবে—অবশ্য ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করতে হবে।

প্রশ্ন—কেউ কেউ বলে এসব কাজ ঠাকুরের কি না সন্দেহ।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—তবে তারা করে কেন? এগুলো স্বামীজীর কাজ, ঠাকুরের নয়, এ যাঁরা বলে তারা গায়ের জোরে এই তফাত করে। স্বামীজী এতটুকু নূতন কিছু নিজের মাথা থেকে ঢোকাননি। ঠাকুর আর স্বামীজী আলাদা, এ কে বলতে পারে? ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যদের ভিতর কারো কারো পূর্বে এ ধারণা ছিল। তাঁদের সঙ্গে আমার খুব তর্ক হতো।

"অনেকে ধ্যানের চেয়ে এইসব কর্মকে নিচু বলে জানে, তারা এর মানে বোঝে না, নিজের খেয়ালে ঐ রকম বলে। ধ্যান মানে কি? সেটা উঁচু কিসে—না ঈশ্বরের সঙ্গে তার যোগ আছে বলে, আর যিনি এই সকল কর্মের প্রবর্তন করেছেন, তিনি কি করতে বলে গেছেন? গু-মুত ফেলতে—না নারায়ণসেবা করতে? তা যদি হয় তবে ধ্যান আর এই নারায়ণসেবায় কি তফাত? তুমি পার না করতে, তাই বল, কিন্তু এটা নিচু কিসে? সর্বভূতে আত্মদর্শন করে স্বামীজী এটা প্রবর্তন করেছেন, লোকে তা বুঝতে পারে না। সেই পুরানো কলা চটকানো—ধ্যানজপ নিয়ে থাকতে চায়। তিন দিন ঠিক ঠিক এই নারায়ণ- সেবা করলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়ে যাবে। যারা করেছে তারা প্রাণে প্রাণে বুঝেছে। অ—বলত, 'তখন কাজ করতে করতে মনটা একেবারে তর হয়ে থাকত।' ঠিক ঠিক ভাবে সেবা করতে পারে না। রোগী বলে মনে করে, নারায়ণবুদ্ধি নেই তাই হয় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি সকলে নারায়ণ নয়—'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি'—তুমি দেখতে পাও না, সে তো তোমার দোষ।

"আমি নির্বাণ চাই শুনে ঠাকুর আমাকে হীনবুদ্ধি বলে ধমকে ছিলেন, বলেছিলেন, 'জীবের ঝোঁক নির্বাণের দিকে, কষ্টেসৃষ্টে চিক খোঁজে। জোড়ে থাকতে চায়। কিন্তু পাকা খেলোয়াড় পাকা ঘুঁটিও কাঁচায়। তারা খেলায় এত সিদ্ধহস্ত যে, যা বলে ফেলে তাই পড়ে। কচে বার বলল তো তাই পড়ল। এইরূপ এমন লোক আছে যারা সংসারে থেকেও মজা লোটে।' আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'মশায় তা হয় কি?' ঠাকুর বললেন, 'হাঁ হয় বই কি। মার কৃপায় হয়, তিনি দয়া করে পাশা ঐ রকম ফেলিয়ে দেন।'"

১৪ জানুয়ারি ১৯২১

একজন বললে "আপনি একদিন বলেছিলেন, অবতারের সঙ্গে একদিনে যে আনন্দ হয় তা সারা জীবন দুঃখ কষ্ট পেলেও বেশি লোভনীয়; সুতরাং ঐ একদিনের আনন্দেই এত দুঃখভোগ সব পুষিয়ে যায়।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ—হাঁ এক ঘণ্টা সঙ্কীর্তনে যে আনন্দ হতো, তখন মনটা কোন্ রাজ্যে চলে যেত তা আর কি বলব। এখন ধ্যান করেও ছাই হয়, তার একটু আভাস মাত্র যদি এখন মনে আনা যায়! তখনকার সে আনন্দ পাঁচ সাত দিন পর্যন্ত থাকত। কি করে যে এত আনন্দ আসত তা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু একটা যেন নেশার মতো হয়ে থাকত, এইটুকু বুঝতে পারতাম। এইসব এখন কে বিশ্বাস করবে? যদি কেউ না বিশ্বাস করে, তাকে বুঝাতে পারি নে, তবু না বলে থাকতে পারি না। জীবেরা দুঃখ পেয়েছে বলে নির্বাণ চায় অর্থাৎ দুঃখকষ্টের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি। তারা ভুলে যায়, ঈশ্বর চিন্তায় এত আনন্দ আছে যে তা পেলে আর দুঃখকষ্ট বোধই থাকে না।

"একদিন দুপুরবেলা ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখি তিনি খেতে বসেছেন, অনেকগুলি বাটিতে নানা রকম তরকারি সাজানো রয়েছে। রজঃ গুণের ব্যাপার দেখে হয়ত আমাদের কারও মনে উঠেছিল, কেন উনি এসব আড়ম্বর করেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন, 'দেখ, এখানকার মনের রোক অনন্তের দিকে। তাই এইসব রজোগুণের দ্বারা জোর করে মনকে নাবিয়ে রাখি, নইলে তোদের সঙ্গে কথা কইতে পারতুম না।' আমার মনে হলো লোকে হবিষ্যি করে, রজঃ থেকে সত্ত্বে উঠবার চেষ্টা করে, আর এঁর মনকে জোর করে সত্ত্ব থেকে রজেঃ নাবিয়ে রাখতে হয়।

"ঠাকুর একবার কৃপা করে আমায় অনুভূতি করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রত্যেক কাজটি এমনকি পা ফেলাটি পর্যন্ত অপরের কল্যাণের জন্য। তিনি বলতেন—'এরা বলে এদের উপকার হয়, তাই না বলে থাকতে পারিনি।'

"লোকে নিষ্কাম কর্মের ঠিক ধারণা করতে পারে না, তাই করে না। ভাসা ভাসা বোঝে মাত্র। ঠিক ঠিক বুঝলে না করে থাকতে পারে না। আবার না

বুঝে, যে বলে বুঝেছি, সে আবার নিজেকে নিজে ঠকাচ্ছে—সত্যাশ্রয়ী না হলে হবে না।

"বাসনা আছে বলে উপলব্ধি হচ্ছে না। তাঁর উপর সব ছেড়ে দিতে পারলেই হয়। কিন্তু লোকে কতক তাঁকে ভার দেয়, কতক নিজে ব্যবস্থা করে, পাছে তিনি সবটা না পারেন।"

(রা—কে সম্বোধন করে) কিছু বল ঈশ্বরীয় কথা। রা—আমরা কলির ভাগবত বলতে পারি (অর্থাৎ খবরের কাগজের কথা)।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—কলির ভাগবত কেন? সত্য ভাগবত। ভক্তের কাছে কি কলি থাকে। রা—বেশ একটি একটি কথা বলে। সেদিন একটা স্বপ্ন কথা বলেছিল। আমার ভারি ভাল লেগেছে। যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মতো। আর একবার এদের কাছে সেটি বল তো। রা—স্বপ্ন বৃত্তান্ত এই ভাবে বলতে লাগল "দেখলাম ঠাকুরের অসুখ। ভক্তেরা বিষণ্ণ। তিনি আর শরীর রাখবেন না এইরূপ আভাস দিয়েছেন। মা ঠাকরুন ঘরের ভিতর বসে কাঁদছেন। এইসব দেখে আমার মনে হলো জীব আর ঈশ্বরে যখন সামান্য মাত্র শক্তির তফাত, তখন ভক্তেরা বোধ হয় তাঁদের ভালবাসার জোরে ঠাকুরকে আরও কিছু দিন এই শরীরে রাখতে পারেন। যেমন এইরূপ ভাবা, ঠাকুর আমায় বলছেন, 'দেখ ঈশ্বর ও জীবে অনেক প্রভেদ। জীব কি রকম জানো? একটা যেন অনন্ত সমুদ্র পড়ে আছে, জীব অতি কষ্টে তার একটুখানি পর্যন্ত, বড়জোর সামনের ঢেউগুলো পর্যন্ত গিয়ে ফিরতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর নিমেষে ঐ অনন্ত সমুদ্রের ওপারে গিয়ে ফিরে আসতে পারে।' ঠাকুরের কথার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম যেন কতকগুলি লোক সমুদ্রে সাঁতার কাটছে, তার মধ্যে দু-একটি ঢেউগুলোর শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়েছে, বাকি লোকেরা ঢেউয়ের পিছে পড়ে আছে আর তিনি স্বয়ং এক নিমেষে সমুদ্র পার হয়ে ফিরে এলেন। ঠাকুর বলতে লাগলেন, অবতারের মনের ঝোঁক অন্তরের দিকে, তার একবিন্দু মাত্র সমস্ত জগতে পড়ে আছে। এই কটি ভক্ত সেই জগতের কতটুকু! তাতে আমার মনকে ধরে রাখবে কি করে?

"মাও ঐরূপ বলতেন। আমার মন রাতদিন উঁচুতে উঠে থাকতে চায়। আমি সেই মনটাকে নানারকম করে নিচে নাবিয়ে রাখি। বলে কিনা আমার মায়া! আমি তো এখনি কেটে বেরিয়ে যেতে পারি।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ—একটি কথা শুনেছি, মার উক্তি—সেটিও চমৎকার। ঠাকুরের অদর্শনের পর মা অধীর হয়ে কাঁদছিলেন, এমন সময় দেখলেন ঠাকুর এসে বলছেন—"ও কিগো! গেছি কোথায়! এই তো আমি রয়েছি। কেবল এ ঘর আর ও ঘর। শুধু না হয় দেখতেই পাচ্ছ না, কিন্তু আমি আছি তার তো কত পরিচয় পাচ্ছ।"

এই কথায় ইহলোক পরলোকের সমস্ত সমস্যা মিটে গেল।

আজকের কথা এই পর্যন্ত হয়ে শেষ হলো, কেবল রা—কে সম্বোধন করে বললেন "কেমন তোমায় ভাগবত বলিয়েছি তো?"

১৫ জানুয়ারি ১৯২১

স্বামী তুরীয়ানন্দ আজ অ—র সঙ্গে ঠাট্টা করতে করতে ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করছিলেন, বললেন, "চৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসিক ভকত খায় প্রেমাম্রমুকুলে ॥

তাৎপর্য এই—নিমফল তিক্ত আর পাকা ফল বলে তার আর বাড় নেই। শীঘ্র পচে ঝরে যাবে, কিন্তু আম্রমুকুল থেকে ক্রমে পাকা ফল পাওয়া যাবে—উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সূচনা করছে।

"জ্ঞান পাকলে ভক্তি, জ্ঞানচর্চায় ক্রমে মনকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়—দ্বৈতের পারে। কিন্তু পাকা ভক্তিতে কোথাও যেতে হয় না—ভক্ত যেখানেই থাকে 'অমৃতী ভবতি'—আনন্দে ভরপুর।

"প্রথমটা জ্ঞানের দরকার—ইন্দ্রিয় বা রিপুগুলোকে জব্দ করার জন্যে, তারপর প্রেমানন্দ ভোগ।

"স্বামীজী একবার বৃন্দাবনের কাছে বেড়াতে বেড়াতে পোড়ো একটা ধর্মশালা গোছের তিনদিক-ফাঁক ঘরে বৃষ্টিতে আশ্রয় নেন—সেখানে দেখেন দেয়ালে কয়লায় লেখা রয়েছে—

চাহি চামারি তুহী তু সব নীচ উন্‌কো নীচ।
ইয়ে তু পূরণ ব্রহ্ম থা যব তু নহী হোতী বীচ ॥

অর্থাৎ, হে বাসনা, তুমি নিচ জাতীয়া বা চামারনি স্ত্রীলোকের মতো, তুমি মনের মাঝে না থাকলে আমি নিজেকে পরব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করতাম।

"ঈশানুসরণ (Imitation of Christ)-প্রণেতা টমাস আ কেম্পিস কেমন সুন্দর বলেছেন 'হে আচার্যগণ! হে মহাপুরুষগণ! তোমরা সকলে নীরব হও। হে প্রভু! তোমার দাস—তোমার কথা শুনতে সদা প্রস্তুত। তুমি আমাকে যা বলবার বল। আমার অন্তরাত্মায় তোমার দিব্যবাণী যেন সর্বদা শুনতে পাই।' এখনও প্রভু কথা কচ্ছেন, কিন্তু বাহিরের নানা গোলমালে তা শুনতে দিচ্ছে না। কেম্পিস সেইসব গোলমাল থেকে নিজেকে সরিয়ে প্রভুর বাণী শোনবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

"ঐ গানটিতে কেমন বলেছে—

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
ও মন তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেহ নাহি দেখে ॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি...

"কামাদিকে ফাঁকি দিতে বলছেন, কিন্তু ওদের ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত। ওরাই তো মানুষকে পশু করে রেখেছে।

"ঠাকুর একদিন এক ভারি পণ্ডিতকে শাস্ত্র থেকে কিছু বলতে বলেন। পণ্ডিত এক ঘণ্টার ওপর জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতারূপ ত্রিপুটি ভেদ সম্বন্ধে বললেন। সব শুনে ঠাকুর বললেন 'বেশ বলেছ। আমার কিন্তু ভাব—মা আছেন আর আমি আছি।'"

১৬ জানুয়ারি ১৯২১

গভর্ণমেন্টের সঙ্গে অসহযোগ করে ছেলেরা দলে দলে গভর্ণমেন্ট সংশ্লিষ্ট স্কুল কলেজ ছাড়ছে—আজ এই সম্বন্ধে আলোচনা হতে লাগল। কথাপ্রসঙ্গে বললেন "সবাই জাগুক যেন দেখে মরতে পারি।"

১৮ জানুয়ারি ১৯২১

হিন্দিই ভারতের সাধারণ ভাষা হওয়া উচিত, আজ এই সম্বন্ধে কথাবার্তা হচ্ছিল। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "আমি যখন আমেরিকা থেকে ফিরি, তখন সেই জাহাজে এক জাপানি কর্নেল আসছিল। তিনি কেবল তাঁর মাতৃভাষা ও জার্মান ভাষা জানতেন। অন্য কোনও ভাষা জানতেন না।

"স্বামীজীর মত ছিল—রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা প্রচলনের সমর্থন করে ভারতের উন্নতি ষাট বৎসর পেছিয়ে দিয়েছিলেন। যদি বেশি লোকের মধ্যে কোন্ ভাষা প্রচলিত দেখে, ভারতের সাধারণ ভাষা ঠিক করতে হয়, তবে অবশ্য হিন্দিকেই সেই ভাষা বলতে হবে। গুরুমুখী আয়ত্ত করতে আমার পাঁচ সাতদিন লেগেছিল, তারপর আমি 'গ্রন্থসাহেব' বেশ পড়তে পারতুম।"

১৯ জানুয়ারি ১৯২১

আজ স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকার ভোগবিলাস, বৈজ্ঞানিক উন্নতি, ভাস্কর্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা কইতে লাগলেন। বললেন, "আমেরিকার ভাস্কর্য যেন সূক্ষ্ম পাতলা পাতলা, ইংলণ্ডের তার বিপরীত। আমেরিকানরা লক্ষ্মীবন্ত বলে তাদের নানাবিধ গুণের বিকাশ হয়েছে। তারা ভারি আতিথেয়, ঈর্ষাপরায়ণ নয়। তারা স্বামীজীকে কেমন যত্ন করেছিল। ডাক্তার রাইট চিকাগো মহাসভার কর্তৃপক্ষদের কাছে কেমন সুন্দর পরিচয় পত্র দিয়েছিল।

"'Horace, hurry up' (হোরেস, চটপট করে নাও) এই বলে তারা লোককে ঘুম ভাঙায়। জাতটা যেন ছুটছে। বলে—ইউরোপের সঙ্গে

প্রতিযোগিতা করতে হয় কিনা, তাই। তার ফলে কিন্তু অনেকের আবার স্নায়বিক অবসাদ ব্যাধি এসে থাকে।

"একবার স্যানফ্রান্সিসকো থেকে জাহাজে চড়ে একটা দ্বীপে যাবার সময় স্বামীজীর সঙ্গী আমেরিকানরা ছুটতে লাগলো, তিনি কিন্তু গদাইলস্করি চালে চলছেন। তারা বলতে লাগলো, 'স্বামীজী স্টিমার ছুটে যাবে।' তিনি জবাব দিলেন 'আবার আসবে', তখন তারা বললে 'ভারতবাসী! আপনাদের সময়ের মূল্যজ্ঞান নেই।' স্বামীজী বেপরোয়া। চট করে জবাব দিলেন, 'তোমরা কালের অধীন হয়ে কালে বাস করছ, আমরা কালাতীতকে ধরে মহাকালে বাস করছি বলে কালের কোনও ধার ধারিনি।'

"স্বামীজীর মধ্যে তারা প্রাণ দেখেছিল বলেই তাঁকে অত প্রাণঢালা ভক্তি করত। যারা তার সঙ্গে বিশেষভাবে মিশেছে, তারা এখনও গোলাম হয়ে আছে। কেবল জ্ঞানবিচারে হয় না।

"আমি বরাবরই তাদের আতিথ্যই পেয়েছি, কেবল এদিক ওদিক যাতায়াত উপলক্ষে দু-তিন দিন মাত্র হোটেলে খেতে হয়েছিল।"

২১ জানুয়ারি ১৯২১

শ—জিজ্ঞাসা করলে, মহারাজ ও দেশে নির্বিকল্প সমাধি হয়, এমন লোক দেখেছেন কি?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আমি তো যত লোককে দেখেছি বা যত লোকের কথা শুনেছি, কারও নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে বোধ হয় না, তবে ভাবসমাধি কারও কারও হতো শোনা যায়। কবি টেনিসনের নিজের নাম জপ করতে করতে কখনও কখনও ঐরূপ অবস্থা হতো, আর কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতির ধ্যান করতে করতে ঐরূপ হতো। এমার্সনেরও কখনও কখনও এইরূপ উপলব্ধি হতো বলে মনে হয়। কিন্তু নির্বিকল্প সমাধি কারও হয়েছে বলে শোনা যায় না। এইটি ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে হয়।

শ—যিশুখ্রিস্টের নির্বিকল্প সমাধি হয়নি?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—হাঁ। তাঁর হয়েছে। তাঁর 'I and my Father are one' (আমি ও আমার পিতা এক) এইসব কথায় বোঝা যায়। আর ঠাকুরও তাঁকে অবতার বলেছেন। তবে ছেলেবেলায় যখন বাইবেল পড়ি, তখন একবার সন্দেহ উঠেছিল 'Father! Hast Thou forsaken me?' (পিতা! তুমি কি আমায় ত্যাগ করলে?) ইত্যাদি ভাবের কতকগুলি কথায়। ভাবলুম, বলে কি? অবতারের কি এ রকম হয়? তাঁরা কি আত্মবিস্মৃত হন! তখন আমার বয়স বার কি তের বৎসর।

বি—মাত্র বার তের বৎসর!

স্বামী তুরীয়ানন্দ—হাঁ। ঐ সময় মনে হয়েছিল, যাঁর একবার আত্মানুভূতি হয়েছে তাঁর কি আর ভুল হয়।

বি—কখনও কখনও দ্বৈতবুদ্ধি, পৃথক জ্ঞান কি হয় না?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—কার সঙ্গে হবে? অবতার স্বয়ং যে তিনি, তোমাকে তোমা থেকে পৃথক কি করে ভাববে?

এ বিষয়ে আর বেশি কথা হলো না, অন্যপ্রসঙ্গ উঠে কথা চাপা পড়ল। প্রাচীন সভ্যতার কথা উঠলো।

২১ জানুয়ারি ১৯২১

শ—মহারাজ বললেন—চীন, ইজিপ্ট, পারস্য ও ভারতবর্ষ—এই চারটে দেশের সভ্যতাই খুব প্রাচীন সভ্যতা।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—ওরা বলে amoeba (জীবাণু) থেকে ক্রমবিকাশ হতে হতে মানুষে দাঁড়িয়েছে এবং বর্তমান সভ্যতাও এই ক্রমবিকাশের ফল। আমি তাদের বলতুম, আমরা ক্রমবিকাশবাদ কতকটা মানি বটে, তবে এটাও মানি যে আদিম যুগ থেকেই সভ্য মানুষ ছিল। তোমরা এমন জাতি দেখাও যারা অপর কোন সভ্য জাতির সংস্পর্শে না এসে আপনা আপনি সভ্য হয়েছে, দৃষ্টান্ত দেখাও।

শ—হাঁ মহারাজ, হটেন্ট এখনও সেই হটেন্টই রয়েছে।

রা—তা এমন তো হতে পারে, কোনও অসভ্য জাতের মধ্যে হঠাৎ কোনও মহাপুরুষ জন্মালেন, তাঁর সংস্পর্শে এসে জাতটা সভ্য হলো?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—অসভ্য জাতের মধ্যে হঠাৎ কোনও মহাপুরুষ জন্মেছেন, এ রকম তো কই শোনা যায় না। দেখা যায়, অসভ্য জাত অন্য সভ্য জাতের সংস্পর্শে এসেই তবে সভ্য হয়েছে। অবশ্য আমাদের সভ্যতার সর্বোচ্চ আদর্শ হচ্ছে—সর্বভূতে একাত্মানুভূতি। গীতার শ্লোক মনে আছে তো—

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ —৬/৩২

অর্থাৎ, হে অর্জুন! যিনি নিজের তুলনায় অপরের সুখদুঃখের বিচার করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। এটা কিন্তু কেবল নির্বিকল্প সমাধি থেকে হতে পারে।

বি—সবিকল্প সমাধিতে যেমন ঈশ্বরদর্শন হয়, তাতেও তো এইরূপ একাত্মানুভূতি হয়?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—হাঁ, হয় বৈ কি। সবিকল্প, নির্বিকল্প, উপলব্ধির বিভিন্ন সোপান। স্বামীজী বলতেন, ভারতবর্ষে জীবন্মুক্ত পুরুষের কখনও অভাব হয়নি। আমিই পনের ষোল জনকে দেখেছি। দেশের নেহাত দুর্দশার সময়ও ভারতে ধর্মবীর সব জন্মেছেন।

রা—যে দেশে সাড়ে একত্রিশ কোটি লোক (পূর্বে আরও বেশি ছিল) ধর্মের জন্য চেষ্টা করে আসছে, সেখানে কি ঐরূপ লোকের কখনও অভাব হয়? ভারতবর্ষ যেন পৃথিবীর ঠাকুরঘর, এখানে ভগবানের চিন্তাই হলো মুখ্য।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামীজী বলতেন কেবল মস্তিষ্ক কিন্তু হৃদয়বত্তার সম্পূর্ণ অভাব, তার চেয়ে বরং মস্তিষ্ক একদম না থেকে যদি কেবল হৃদয়বত্তা থাকে—সেও ভাল। তিনি বলতেন, হৃদয় দ্বারাই সব কাজ হতে পারে।

শ—আমি কিন্তু ও কথা বিশ্বাস করি না।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আদর্শ জীবন ছাড়া কি কখনও জীবন তৈরি হয়? এই

ভাগবতেই দেখো না, কেবল সাধুসঙ্গের কথা রয়েছে। শঙ্করাচার্যও বেদান্তে জ্ঞানের দিকটায় খুব জোর দিয়েছেন বটে, কিন্তু ঐ বেদান্তেই আবার গুরুবাদও রয়েছে। একটা জীবনের সংস্পর্শেই আর একটা জীবন গড়তে পারে।

শ—মহারাজ, আমরা ঠাকুরের, স্বামীজীর এবং আপনাদের জীবন চোখের সামনে দেখছি বলেই নিজেদের জীবনের আদর্শ এবং শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে পারছি।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—মহাপুরুষদের জীবনই তো হচ্ছে শাস্ত্র গ্রন্থের নজির।

২২ জানুয়ারি ১৯২১

আজ স্বামী অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে তাঁর মতামত বলতে লাগলেন ঃ "আমরা অসহযোগ-টোগ বুঝি না। যে শিক্ষায় মানুষ তৈরি হয়, তাকে আমরা আদর করে গ্রহণ করব। এই অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে যতটুকু স্বামীজীর ভাবের সঙ্গে মেলে, ততটুকু আমাদের গ্রাহ্য। আমরা ভারতের স্বাধীনতা চাই বটে, কিন্তু আমাদের উপায় আলাদা। আমরা আমাদের জাতের চরিত্রগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করে স্বাধীনতা আনতে চাই। শাসনযন্ত্র ভাল হলেই যে একমাত্র তাইতেই জাতীয় উন্নতি হবে, তা আমরা স্বীকার করি না। কারণ দেখছি ঠাকুর-স্বামীজীর মতো লোক বর্তমান যুগেও জন্মেছেন। আমাদের দেশের লোকের যাতে উত্তম শিক্ষা হয়, যাতে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, যাতে তারা অন্নবস্ত্রের অভাবে কষ্ট না পায়—এই সবের দিকে নজর দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।

"তবে অন্যায়-অবিচার দেখলে তার প্রতিবাদ করা উচিত, নতুবা তাতে এক রকম সায় দেওয়াই হলো। সাধুর স্বাধীনচেতা হওয়া দরকার। সে আবার কার বা কিসের ভয় করবে? সত্যের, ন্যায়ের প্রতি তার ঐকান্তিক নিষ্ঠা চাই। স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার ইত্যাদি শুনলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে না? গান্ধী ঠিকই বলেছিল যে, পাঞ্জাবে যখন ছেলেদের বুকে হেঁটে যেতে বাধ্য করলে, তখন কি একটা ছেলেও সাহস করে বলতে পারলে না, যে আমরা এরূপ

অন্যায় আদেশ মানব না? আধুনিক শিক্ষার ফলেই ছেলেদের মধ্যে এইরূপ কাপুরুষতা এসেছে।

"কোন একটা স্টেশনে যখন স্টেশনমাস্টার কয়েকজন সাহেবের জায়গা করে দেবার জন্যে স্বামীজীকে দ্বিতীয় শ্রেণির গাড়ি থেকে নামাবার চেষ্টা করেছিল, তখন তিনি তাতে অসম্মত হয়ে স্টেশনমাস্টারকে এমন ধমক দিলেন যে সে সরে পড়তে বাধ্য হলো। স্বামীজী তাকে বলেছিলেন, 'আমাকে নাবিয়ে দিতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না—আমি বিবেকানন্দ। ওদের নাবিয়ে দাও না।'

"আমার ক্ষমতা থাকলে আমি অত্যাচারের সমূলে উচ্ছেদ করতাম।

"গান্ধীকে আমি মহামায়ার শক্তিতে অনুপ্রাণিত মনে করি। খুব ভাল করে বিবেচনা করেই আমি এ কথা বলছি। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা ও নিজে তাই করা এ দুটো মাত্রার তফাত মাত্র।"

২৪ জানুয়ারি ১৯২১

স্বামী তুরীয়ানন্দের পায়ের নখটি আজ আপনি উঠে গেছে। সেই প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, "শরীরটাও এইরূপ পড়ে থাকে, প্রাণ চলে যায়। অবশ্য প্রাণ যাবার সময় টের পাওয়া যাবেই। মনই টের পাবে—অহংটা। পুরীতে অসুখের সময় স্পষ্ট দেখলাম প্রাণের সঙ্গে আর একটা শক্তির লড়াই চলছে, তখন আপনা আপনি প্রাণায়াম হতে লাগলো। শেষটা প্রাণই জয়ী হলো। শেষে বললাম, এবার শরীর যাবে না। যখন ঐ রকম প্রাণের সঙ্গে লড়াই চলছিল, তখন বাহ্যজ্ঞান একেবারে ছিল না, মনটা ঐ লড়ায়েই ডুবে ছিল। তারপর দেখলাম, স্বামীজী এসে বলেছেন 'ও কি! ওঠো। এ রকম পড়ে থাকলে হয়।' তাতেও বুঝলাম এবার বাঁচবো।

> **মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।**
> **ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ —গীতা ১৩।৬**
>
> **ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।**
> **এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্‌ ॥ —গীতা ১৩।৭**

অর্থাৎ, পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, একাদশ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চ বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনা, ধৃতি ও এইগুলির সমষ্টি সংক্ষেপে এই বিকারের সহিত ক্ষেত্র বলা হইল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবই এর মধ্যে সত্য। সেই সত্যের ছায়ায় মন দেহ প্রভৃতিকেও সত্য বলে মনে হয়।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ —গীতা ১৫।১০

অর্থাৎ, জীবাত্মা যখন শরীরে অবস্থিত থাকেন অথবা গুণযুক্ত বিষয় হয়ে ভোগ করেন অথবা দেহত্যাগ করে পরলোকে গমন করেন, কোন অবস্থাতেই অজ্ঞানিরা তাঁকে দেখতে পায় না।

"শেষ জন্মে মানুষ সচেতন হয়। তাঁকে জানতে পারে। তখন আর তাঁর ভ্রান্তিজনিত অভিমান থাকে না।

"রাগদ্বেষই অনর্থের মূল। রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ করতে বলেছে। ঐ দুটো বাদ দিয়ে যা কিছু কর, দোষ নেই।

"মহাপুরুষের কৃপায় জ্ঞান লাভ হয়। নারদ-ভক্তিসূত্রে আছে 'মহৎ কৃপয়া ভগবৎ কৃপালেশাৎ বা' সেই সময় মনেরও মুমুক্ষত্ব আসে। সব যোগাযোগ একটা বিরাট ইচ্ছার বশে হয়ে থাকে। ঠাকুরের সেই দৃষ্টান্ত মনে কর। ভগবানের ইচ্ছায় কেমন মড়ার মাথার খুলিতে নির্দিষ্ট ক্ষণে সাপের বিষ পড়ল এবং সেই ঔষধ ব্যবহার করে রোগী বেঁচে গেল।

"জীব বদ্ধ। অবশ্য তার কতকটা স্বাধীনতা আছে। সবটা নয়, যেমন দড়িতে বাঁধা গরু। কিন্তু তাকে যতটা স্বাধীনতা দেওয়া আছে, তার সবটা ব্যবহার করলেই মুক্তি। কিন্তু আমরা তো তা করি না। নানাদিকে সে শক্তির অপব্যবহার করি।

"প্রত্যেক লোকেরই এক একটা আলাদা জগৎ রয়েছে। সেই এক বস্তুকে লোকে নানাভাবে দেখছে। সর্বভূতে আত্মদর্শন করতে পারলেই আর গোল থাকে না।"

২৬ জানুয়ারি ১৯২১

জনৈক ভক্তের মাথা খারাপ হবার মতো হয়েছে। তার সম্বন্ধে বললেন, "পাগলের সঙ্গে থাকতে হলে নিজে পাগল হতে হয়। যদি আমি আমার সব শক্তিটা ওর পেছনে দিতে পারি, তাহলে ঠিক সেরে যায়; কিন্তু আমার শরীর এত খারাপ যে তা হবার নয়, দুদিনে নষ্ট হয়ে যাবে। এই দুদিন দেখতে পাচ্ছি আমি একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ি। আমার শান্ত ভাবটা কমে গেছে।

"অ—কে খুব বকলাম। বললাম, কেবল তমঃতে ডুবছে। ধ্যান-ধারণার নামে কেবল কুঁড়েমি। কাজ না করাই ওরা আদর্শ মনে করছে। তাহলে দেয়ালগুলোকেও তো সমাধিস্থ বলতে হয়। সব অবস্থায় মনের সাম্যভাব রাখা, অবিচলিত থাকা—এই হচ্ছে আদর্শ। সুখ দুঃখ প্রভৃতি সব দ্বন্দ্বের পারে যেতে হবে।

"নারায়ণসেবা—কি চমৎকার কথা! এযুগের অপূর্ব নূতন জিনিস।

"ধ্যান ধারণাও ঠিক করে করতে পারলেও ভাল। কাজও ঠিক করে করতে পারলেও ভাল। দুটোই সমান ভাল। স্বামীজী দার্জিলিং-এ আমায় বলেছিলেন, 'এবার নূতন ধরনের ব্রহ্মচর্য (সেবাধর্ম) প্রচলিত করব।' 'মাধুকরী' কথাটাকে বিকৃত করে বললেন, আর 'ধুকড়ি' চলবে না।' আমি বললাম, 'ওর সবটাতো খারাপ দেখছি না।' তখনি তিনি কথা ঘুরিয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছ। মাধুকরীও রাখতে হবে। তপস্যা না থাকলে, আমি টাকা রেখে যাব, আর সকলে বিলাসী হয়ে উঠবে।'

"—যে সময় এসেছিল, তখন স্বামীজী ঠাকুরের থেকে একটা নূতন মত চালিয়েছেন, এই ভাবটা খুব ছিল। ঐ ভাবটা ওর ভিতর খুব ঢুকেছে। এখন সে ভাবটা একটু কমেছে বটে, তবে একেবারে যায়নি, কারণ স্বভাব বদলান শক্ত। চিতাবাঘের গায়ের দাগগুলো কি কখনও একেবারে ওঠে?

"ডাক্তারিতে পয়সা নেওয়াই খারাপ। শুদ্ধ মনে নিষ্কামকর্ম করলে তাতে

যে মুক্তি হবে। ওরা মনে করে কর্মে বন্ধন হয়। আরে কর্মে যদি বদ্ধ করে, তবে মুক্তও করবে।

"সকালে আধ ঘণ্টা, বিকালে আধ ঘণ্টা বসে ও কি ধ্যান! একটা নিরন্তর ভাব লেগে থাকবে না? একটুখানি চোখ বুজে তারপর সমস্ত দিন চকড়বায় যোগ দেওয়া। যদি ঠিক ঠিক অহরহ ধ্যান করতে পারে, তবেই না উপলব্ধি হবে। যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি—যা চাও সেইটা এখনি কর। একেবারে পুরোপুরি না হোক, তবু যতটুকু পার কর। এখনই সাধনে লেগে যাও। এরপর আর সুযোগ মিলবে না।"

২৭ জানুয়ারি ১৯২১

"মনেতেই সব। 'মনঃ পূতং সমাচরেৎ' —মন যা বলে তাই করা উচিত। একটা শ্লোক আছে—

ব্রহ্মচর্যে তৃণং নারী শূরস্য মরণং তৃণম্।
ব্রহ্মজ্ঞানে তৃণং শাস্ত্রং নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্মচারীর পক্ষে নারী তৃণ সদৃশ, বীরের পক্ষে মরণ তৃণতুল্য, ব্রহ্মজ্ঞান হলে শাস্ত্র তৃণতুল্য এবং নিস্পৃহ ব্যক্তির পক্ষে জগৎ তৃণতুল্য।

"তৃণ কিনা তুচ্ছ। ব্রহ্মচারী নারীকে তৃণজ্ঞান করবে। তবে নারীতে মাতৃজ্ঞান আরও ভাল। 'ব্রহ্মজ্ঞানে তৃণং শাস্ত্রং' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর শাস্ত্রের বিধিনিষেধে আবদ্ধ থাকতে হয় না। জ্ঞানী নিরঙ্কুশ।

"স্বামীজী বলতেন 'যদি খারাপ কাজও করতে হয় তো মরদের মতো কর' অর্থাৎ তাহলে সে কাজের মন্দত্বটুকু চলে যাবে। যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্নর গল্প জানত? একজন লোক বাহান্নটা পাপ নিজের স্বার্থের জন্য করেছিল। শেষে নরহত্যারূপ আর একটা পাপ অপরের জন্য করে আগেকার বাহান্নটা পাপ থেকেও মুক্ত হলো। স্বার্থ ও নিঃস্বার্থতার মধ্যে এত তফাত।"

একজন ছাত্র অসহযোগ করতে চায়। তাঁর কাছে এসে পরামর্শ চাইলে।

তাকে বললেন "একটাতে দৃঢ় হও, দোনামোনা কর না, দু নৌকায় পা দিও না।"

২৮ জানুয়ারি ১৯২১

অনেকগুলি ব্রহ্মচারীর সন্ন্যাস হবার কথা হচ্ছে, কাজেই সন্ন্যাসের আদর্শ সম্বন্ধে কথা উঠলো, বললেন, "সন্ন্যাস বজায় রাখবার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেবার দৃঢ় সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করা চাই, তবেই সন্ন্যাসের অধিকারী হবে। ঠাকুর বলতেন, 'যে তালগাছ থেকে হাত পা ছেড়ে পড়তে পারে, সেই যথার্থ সন্ন্যাসের অধিকারী।'

"কি করে সন্ন্যাস রক্ষা করতে হয়, সে সম্বন্ধে একটা সত্য ঘটনা শোন। একজন মহাতেজস্বী সাধু এক নূতন জায়গায় এসেছেন। জনৈক শেঠ তাঁকে মহা যত্ন করে ভিক্ষা করাবার জন্যে নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে, একটা ঘরে নিজের যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে পুরে দোর বন্ধ করে দিলে। শেঠটি অপুত্রক ছিল। তার ইচ্ছা সাধুটির দ্বারা তার একটি পুত্র হয়। এইরূপ প্রথা পশ্চিমে কোন কোন জায়গায় আছে। সাধুটি শেষে নিরুপায় হয়ে মনে মনে ভগবানের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করলে, 'হে পরমাত্মন্! এতকাল ধরে কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য পালন করে আসছি। আজ কেন আমায় এই বিপদে ফেললে?' অন্তর্যামী তাঁর প্রার্থনা শুনলেন। হঠাৎ তাঁর শৌচের চেষ্টা হলো। যুবতীটি তাকে পাশের ঘরে যেতে বললে। কোনওরূপে বাইরে যেতে না পেরে তথায়ই শৌচে গেলেন। সেখানে তাঁর মনে হঠাৎ একটা ভাবের উদয় হলো। তিনি নিজের বিষ্ঠা মূত্র সর্বাঙ্গে মেখে উলঙ্গ অবস্থায় সেই নারীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। রমণীটি ভয়ে দ্বার খুলে দেবার জন্য চিৎকার করতে লাগলো। দ্বার উদ্ঘাটিত হলো। তখন সাধুটি বেরিয়ে গিয়ে স্নানাদি করলে। আন্তরিক হলে ভগবান এইরূপেই ভক্তকে বাঁচিয়ে থাকেন।

"আমি কিন্তু অনেকদিন ধরে পাঞ্জাবের নানা জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু একদিনও এসব উৎপাত ভোগ করিনি। স্বামীজীকে লিমডীতে বীজমার্গীরা

আটকে রেখেছিল। দৈবযোগে এক বালক তথায় উপস্থিত হয়। স্বামীজী সেই বালকের দ্বারা একখানা খোলামকুচিতে কয়লার দ্বারা লিখে তথাকার রাজাকে তাঁর বিপদের কথা জানান। শেষে রাজার লোকজন এসে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।"

পূর্বকথিত ভক্তটি উন্মাদ হয়ে গেছে। ইনি তার জন্য বিশেষ চিন্তিত। বললেন, "ঠাকুরের কাছে তার জন্য খানিকটা প্রার্থনা করলাম। বললাম ঠাকুর! তোমার শরণ নিয়েছে, যদি তোমার ইচ্ছা হয়ত একে ভাল করে দাও। তা কি শুনবেন!"

১ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

মা—কঠোপনিষদের শেষ চারটি অধ্যায় পাঠ করলে। শেষ অধ্যায়ের ১৩র শ্লোক পড়া হলো—

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ —কঠ ২।৩।১৩

অর্থাৎ, তিনি আছেন এইভাবে তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে—এবং তাঁর স্বরূপতত্ত্বও উপলব্ধি করতে হবে। তিনি আছেন এইভাবে তাঁকে উপলব্ধি করলে, পরে তাঁর স্বরূপ তত্ত্বত হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন ঠাকুরের নিম্নোক্ত গল্পটি বললেন—

"একজন ঠাকুরকে সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করেছিল। উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, 'ও দেশে হালদার পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। তাতে লোকে মাছ ধরে। একজন লোক ছিপ হাতে করে বসে আছে। খানিক পরে মাছে ঘাই দিলে (ঠাকুর যেমন যেমন বর্ণনা করছেন তখনি তখনি হালদার পুকুর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করছেন)। তখন তার বিশ্বাস হলো পুকুরে মাছ 'অস্তি'। তারপর ধৈর্য সহকারে এবং উৎসাহের সহিত সে আরও বসে রইল এবং মাঝেমধ্যে চার ফেলতে লাগল। শেষে ছিপে যখন মাছ পড়ল তখন সেটাকে ডাঙায় তুললে।'

ঈশ্বর উপলব্ধি বিষয়েও এইরূপ। অনেক সাধ্য সাধনার পর তিনি ঠিক আছেন এই উপলব্ধি হয়। পরে আরও ধৈর্যসহকারে সাধনা করতে পারলে, তিনি যে কি বস্তু, ক্রমে তাও স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

"উপনিষদে 'ধীর' কথাটার ওপর খুব জোর দেওয়া আছে। ওতে অনেকবার ঐ কথাটার প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।"

গতকাল সন্ন্যাসের পর কঠোপনিষদের প্রথম দুই অধ্যায় এবং বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ ও যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাসের অংশ পড়া হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বললেন, "স্বামীজীও তাঁদের সন্ন্যাসের পরদিন বরানগর মঠে একটি লতাপাতায় ঘেরা কুঞ্জবনের মতো জায়গায় গিয়ে ঐ আরণ্যক পড়েছিলেন।"

স্বামী শিবমানসপূজা স্তোত্র থেকে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরো
যদ্‌যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্ ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ, হে মহাদেব! আমার আত্মা তুমি, আমার বুদ্ধি পার্বতী, আমার প্রাণবায়ু তোমার সঙ্গিগণ, আমার এই শরীর তোমার মন্দির, বিষয়ভোগ তোমার পূজা, আমার নিদ্রা তোমাতে সমাধিস্থ হয়ে অবস্থান। আমার পদসঞ্চার তোমার প্রদক্ষিণ, আমার সকল বাক্য তোমার স্তোত্র। হে শম্ভো! আমি যে যে কর্ম করি, তা সে তোমারই আরাধনা।

এই স্তোত্র আবৃত্তির পর শ্রীরামপ্রসাদের এই গানটিও আবৃত্তি করলেন ঃ

মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে।
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে ॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মারে ॥
যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।

(আনন্দে) শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজেন সর্বঘটে,
(তুমি) নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥

অর্থাৎ, তিনি এই ভাবটি বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন যে, সবের ভিতরই তিনি।

২ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

আজ মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমার্ধ পড়া হলো। পাঠান্তে বললেন—"একটা বৈ দুটো নাই। আমরাই কেবল এটা মানুষ, ওটা পাখি, সেটা উদ্ভিদ, অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ইত্যাদি বলে গোল করি। কোথাও ভেদ নেই। বিচার করলে বেশ বুঝতে পারা যায়। একটা 'আমি' কল্পনা করে তার জন্য কত ভোগের ব্যবস্থা। অথচ শুধু কতকগুলো অনুভূতি বৈ আর কিছুই নেই। ইন্দ্রিয়গুলোর দ্বারা ঐ অনুভূতি হচ্ছে। প্রত্যেক লোকেরই এক একটা জগৎ রয়েছে। তাই নিয়েই সে পরলোকে যায়। সংসারের রসবোধই আমাদের জ্ঞান হতে দিচ্ছে না। রসলিপ্সা না থাকলে এখনই জ্ঞান হয়। জ্ঞান-স্বরূপ তুমি। কিন্তু আমরা সুখলিপ্সা ছাড়তে চাই না।

"নিজে না বুঝলে অপরে অনন্ত কাল ধরে বোঝালেও বোঝাতে পারবে না। সেই রাজার গল্প শোনোনি? এক রাজা বলত, যে আমাকে মুড়ি কি করে ভাজতে হয় শিখিয়ে দিতে পারবে, তাকে আমি অর্ধেক রাজ্য দেব। অনেকে রাজত্বের লোভে মুড়িভাজা শেখাতে এল, কিন্তু শেখাবার পর রাজা বলেন—বুঝলাম না। বুঝলেই যে অর্ধেক রাজ্য দিতে হবে। সেইরূপ কে না বোঝে যে সংসারটা অনিত্য? কিন্তু লোকে বুঝেও বোঝে না, কারণ তাহলে যে ভোগসুখ ছাড়তে হবে।"

মা—দুঃখকে বরণ করাও তো একটা পাগলামি?

স্বামী তু—হাঁ। কিন্তু সাধন হিসাবে তার খুব সার্থকতা আছে। ওতে মন শুদ্ধ হয়।

'যাঁর একটুও অজ্ঞান আছে, তিনি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শুধু মুখে বললেই চলবে

না, উপাসনা তাঁর চাইই। উপাসনার দ্বারা মহামায়া প্রসন্ন হয়ে ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ দান করেন। তাই তো মার্কণ্ডেয় ঋষি দেবীমাহাত্ম্য সব বলে, শেষে সুরথ রাজাকে সম্বোধন করে বলছেন—

তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥ —১৩/৪

অর্থাৎ হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীর শরণ নাও। তাঁকে আরাধনা করলেই তিনি লোকের কামনা অনুরূপ ইহলোকে ভোগ, পরলোকে স্বর্গ বা মুক্তি দিতে পারেন। তাই তো হলো সুরথ আর বৈশ্যের।

হরো যদ্যুপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোঽপিবা।
তথাপি তব ন স্বাস্থ্যং সর্ববিস্মরণাদৃতে ॥

অর্থাৎ যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বরও তোমাকে উপদেশ করেন, তথাপি যতদিন না তুমি সমস্ত জগৎ বিস্মৃত হচ্ছ, ততদিন তোমার শান্তি লাভ হবে না।

বিবেকচূড়ামণিতে বলেছে ঃ

সদ্ব্রহ্মকার্যং সকলং সদেবং
তন্মাত্রমেতন্ন ততোঽন্যদস্তি।
অস্তীতি যো বক্তি ন তস্য মোহো
বিনির্গতো নিদ্রিতবৎপ্রজল্পঃ ॥—বিবেকচূড়ামণি, ২৩০

অর্থাৎ, সৎস্বরূপ ব্রহ্মের সমুদয় কার্যই সৎস্বরূপ, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে জগৎ ব্রহ্ম মাত্র। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তু নেই। যিনি বলেন, জগৎ আছে তাঁর এখনও মোহ দূর হয়নি। তাঁর বাক্য নিদ্রিত ব্যক্তির অসম্বদ্ধ বাক্যের তুল্য।

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

আজ মুণ্ডকোপনিষদ পাঠ শেষ হলো। পাঠের মধ্যে মধ্যে ও শেষে স্বামী তুরীয়ানন্দ অনেক কথা বললেন।

"জাগ্রত থেকে মনকে স্বপ্নাবস্থায় নিয়ে যেতে হয়, তারপর সুষুপ্তিতে, পরে তা থেকেও উঠিয়ে তুরীয়ে নিয়ে যেতে হয়, সবশেষে তুরীয়াতীত। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ—তারপরই শুদ্ধ আত্মা। শেষ দুটো খুব কাছাকাছি। যোগীরা এসব প্রত্যক্ষ করেন।

" 'তপসোবাপ্যলিঙ্গাৎ' এই অংশের ব্যাখ্যায় লিঙ্গ মানে সাধারণ লোকে গৈরিকাদি ধরে বটে, কিন্তু তাতে মন ওঠে না। বেদান্তে এ সম্বন্ধে বিচার আছে। জনকের তাহলে জ্ঞান হলো কি করে? ব্যাসদেব একবার তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের নিয়ে জনকরাজার কাছে গিয়েছিলেন। জনকরাজা যে একজন জীবন্মুক্ত পুরুষ, ব্যাসের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা তা বিশ্বাস করত না। এজন্য তারা জনককে যথোচিত সম্মান দেখায়নি। জনকের মহত্ত্ব প্রমাণ করবার জন্যে, ব্যাস যোগবলে মায়া অগ্নি সৃষ্টি করেছিলেন। বিদেহ নগরে অগ্নি জ্বলে উঠেছে। ক্রমশ প্রাসাদের দিকে এগুচ্ছে। সন্ন্যাসীরা তাঁদের কৌপীন রোদে শুকোতে দিয়েছিলেন। আগুনে পুড়ে যাবার ভয়ে তাঁরা সব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কৌপীন তুলতে ছুটলেন। জনক কিন্তু হাসতে লাগলেন এবং অবিচলিতভাবে বললেন—

'মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন'

অর্থাৎ, মিথিলা দগ্ধ হয়ে গেলেও আমার কিছু দগ্ধ হচ্ছে না। এর নামই যথার্থ ত্যাগ এবং রাজা জনক গৃহী হলেও তাঁর এই ত্যাগ এবং ত্যাগের ফলে আত্মজ্ঞানও হয়েছিল; সুতরাং লিঙ্গ মানে গৈরিকাদি ত্যাগের বাহ্য চিহ্ন নয়, এর অর্থ ভেতরের ত্যাগ। এই ত্যাগ না হলে আত্মজ্ঞান হয় না।"

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

আজ রাত্রে আহারের সময় সেবাধর্ম ও কর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে লাগলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—কর্মরূপ সেবাও ধ্যান জপের মতো লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাবার পূর্বে স্বামীজী বলেছিলেন, 'এই মঠের জমিতে আলু প্রভৃতির চাষ করবি, পরে দরকার হলে ঐ আলু প্রভৃতি মাথায় করে নিয়ে বাজারে বেচে আসবি। আবার ধ্যানে যখন বসবি—একেবারে সমাধি। সু—তুমিও ছিলে, শোননি?

সু—হাঁ।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—এসব কথা যে গেঁথে গেছে। আমাদের প্রাণের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এসব ভুলবো কি করে? মরলেও ভুলতে পারবো না। স্বামীজী আমায় দার্জিলিং-এ নূতন ধরনের ব্রহ্মচর্য প্রবর্তন করবেন বলেছিলেন—সেদিন বলেছিলাম, মনে আছে তো? এসব কথা কি এখন ছেড়ে দিতে হবে!

"গীতারও তাই মত। ভাল করে পড়লে বুঝতে পারা যায়—গীতায় কর্ম করতেই বলেছে। জ্ঞানীর পক্ষে যে কর্ম নেই বলেছে, তারও এক মানে আছে বলে মনে হয়, অর্থাৎ জ্ঞানীর কর্ম বলে বোধ নাই। তাঁর কোন কর্মই তো 'আমি কর্ম করছি' বলে জ্ঞান নাই।

"'সন্ন্যাসী শুধু ভিক্ষাদি কর্ম রাখবে' এসব পুরাণ কথা এত কাল চলেছে; কিন্তু তাতে কি তৃপ্তি হয়? বিশেষ এখন ঠাকুর স্বামীজীর আলোক পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা নূতন আলোক দিয়ে গেছেন। অথবা পুরাতন ভাবকেই নূতন ভাবে প্রকাশ করে গেছেন।"

মিশনের কোনও কার্যে লোক পাওয়া যাচ্ছে না শুনে বললেন, "যত পার নিজেরাই খাটো, শেষে খেটে খেটে মরে যাও। তাতেই তো পরম কল্যাণ হবে।

"সাধুদের ভেতর লোক পাওয়া যাচ্ছে না বলে, মাইনে দিয়ে লোক রাখতে হবে, এ কথার আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারিনি। তার চেয়ে কাজ উঠিয়ে দিলেই হয়। স্বামীজীর সমস্ত কাজ তাহলে কিছুই নয়?

"ঠাকুরের কাজে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে কাজ করে যাও—দেখবে সময়ে তিনি যতটুকু দরকার, সাহায্য নিশ্চিত দেবেন, কিছু ভেব না।

"কাজকে উপাসনা থেকে আলাদা করে দেখা আমার আদৌ ভাল লাগে

না। কাজই তো তাঁর উপাসনা। সব তাঁর সেবা। বরং দেখেছি একলা তপস্যা করতে গিয়ে অনেকে মহা স্বার্থপর হয়ে পড়ে। কাজের মধ্যে দশজনের সঙ্গে থাকতে গিয়ে অনেকটা সহ্যগুণ, প্রীতি ইত্যাদির অভ্যাস করতে হয়। উপাসনাও তো কর্ম। উপাসনার ফলও ভগবানে সমর্পণ করতে হয়।"

৭ ফেব্রুয়ারি

কাল স্বামীজীর উৎসব হয়ে গেছে। স্বামীজীর কথা প্রসঙ্গে তাঁর আমেরিকার স্মৃতি জেগে উঠলো। মন্ট ক্লেয়ারবাসিনী মিসেস হুইলারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বললেন, "মিসেস ছিলেন প্রৌঢ়া, বদ্ধ কালা অথচ বুদ্ধিমতী, মাঝে মাঝে তাঁর ভিতর কিছু কিছু অলৌকিক শক্তিরও স্ফুরণ দেখা যেত। তিনি নিজে সংসারের সব খুঁটিনাটি দেখতেন। অপরের ঠোঁট নড়া দেখে, কি বলছে, সব বুঝতে পারতেন। আমি তাঁর ওখানে ছ-মাস ছিলাম। শরৎ মহারাজের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ। আমি যখন স্বামীজীর সঙ্গে ভারত থেকে প্রথম ইংলন্ডে গেলাম, তখন তিনি অযাচিতভাবে আমায় এক চিঠি লেখেন, 'স্বামী সারদানন্দ আমার ভাই। আপনিও তাঁর ভাই, সুতরাং আমার গৃহে যখন ইচ্ছা আপনার মতো থাকবেন।' পরে স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকায় গিয়ে রিজলি ম্যানরে মিঃ লেগেটের বাড়িতে কয়েকদিন থাকি। হঠাৎ একদিন স্বামীজী বললেন, 'আমার নিকটে টাকা পয়সা বেশি নেই। আমি এখন স্যানফ্রান্সিসকো যাব—বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমায় থাকতে হবে। তুমি এখন নিজের পথ দেখ।' আমি তখন বুঝতে পারিনি যে স্বামীজী এইভাবে তাঁর সঙ্গ ছাড়িয়ে আমাকে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবার অবসর দিচ্ছেন। সুতরাং মনে মনে খুব চটে গেছি, কিন্তু সেভাব কিছু প্রকাশ না করে বললাম— 'বেশ কথা।' কথা বলার সময় ভাবিনি কোথায় যাব; কিন্তু স্বামীজী যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাবে' তখন সেই মিসেস হুইলারের চিঠিখানার কথা মনে পড়ে গেল, বললাম, 'তাঁর কাছে যাব।' স্বামীজী বললেন 'খুব ভাল। সেখানে একটা সেন্টার টেন্টার কর।' আমি তখন রাগে গরগর করছি, বললাম, সেন্টার টেন্টার করতে পারব না। শুধু থাকব।' স্বামীজী বললেন, 'ওরই নাম

সেন্টার করা। তোমরা যেখানে থাকবে, সেইখানেই সেন্টার হবে।' যাই হোক মিসেস হুইলারকে চিঠি লেখা হলো। তিনি লিখলেন, 'আপনার যদি অসুবিধা না হয় তবে সাতদিন পরে একলা আসবেন।' প্রথমে গিয়েই তাঁর মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো। যখন মিসেস হুইলারের সঙ্গে দেখা হলো তখন তিনি আমার হাত দুখানি চেপে ধরে বললেন, 'আমি আপনার ভগিনী। আমার এ বাড়ি আপনার বাড়ি বলেই জানবেন। কেমন ভগিনী বলে দেখতে পারবেন তো।' আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।' তারপর আমাকে থাকবার জন্য একখানা ঘর দিলেন। বাড়িতে মস্ত বড় লাইব্রেরি। তিনি সব জায়গায় নিমন্ত্রণ জোগাড় করে আমাকে নিয়ে যেতেন এবং পরিচয় করিয়ে দিতেন। ডাক্তার লুইস জি জেমস, ব্রুকলিন নৈতিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। আমাকে বলে কয়ে ঐ সভায় বক্তৃতা করতে রাজি করলেন। আমি সব নিমন্ত্রণ থেকে ফিরে এসে এঁকে জিজ্ঞাসা করতুম, সেখানে লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারে আমার শিষ্টাচারের কিছু ত্রুটি হয়েছে কি? তিনি উত্তর দিতেন, 'কিছুমাত্র ত্রুটি হয়নি। আপনারা এদের সবার চেয়ে বেশি সভ্য।' বলতেন, 'খুব সহজভাবে থাকবেন।' আমি নিশ্চিত জানি আপনার ভ্রমেও কোন বেচাল হবে না। কলার পরতে তখন আমার খুব অসুবিধা হতো। সেই কথা তাঁকে বলায় তিনি বললেন, 'কিছু দরকার নেই। বেশ স্বচ্ছন্দে থাকুন।'

"একদিন ভারত থেকে শরৎ মহারাজের এক পত্র পেলুম। তাতে ভারতের ভীষণ দুর্ভিক্ষের খবর ছিল। চিঠিখানা পড়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু কাকেও কিছু বললাম না। খানিক পরে মিসেস হুইলার আমার কাছে এসে উপস্থিত। বললেন, 'স্বামী আপনার হয়েছে কি?' আমি বললাম, 'কই কিছুই না।' মিসেস কিন্তু নাছোড়বান্দা, বললেন, 'নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। কোনও চিঠি পেয়েছ কি? কই দেখি।' আমি তাঁর কাছে কিছু লুকোতাম না। তিনিও আমার কাছে কিছু লুকোতেন না! আমি তাঁকে সেই চিঠিখানি দিলাম। তিনি পড়েই ঠাকুরঘরে চলে গেলেন। মিনিট পনের পরে এসে বললেন, 'তোমাদের কাছে কেবল ধর্মই আছে, কিন্তু টাকাকড়ি কিছু নাই, যাই হোক তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।' এই কথা বলে

কয়েকখানা চিঠি লিখলেন এবং এই অল্প দিনের মধ্যেই হাজার ডলার সংগ্রহ করে আমায় দিলেন। পরে আরও কিছু দিয়েছিলেন। নিজের মার কাছ থেকে কিছু, স্বামীর কাছ থেকে কিছু, মিসেস বুল ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে কিছু সংগ্রহ করেছিলেন এবং নিজেও কিছু দিয়েছিলেন।

"তাঁর স্বামী রয়েল ইঞ্জিনিয়ার ছিল। একদিন সে নিজের ক্ষমতার খুব বড়াই করছিল। তাতে ইনি বললেন, 'অত হাঁকাই কর না, জন। তুমি কি করতে পার? জেনো, ঈশ্বরের কৃপাতেই দুপয়সা পাচ্ছ।' স্বামীও বুঝে চুপ হয়ে গেল। টেবিলের বিপরীত দিকে বসে স্বামী-স্ত্রীতে যে ইশারায় কথাবার্তা হতো, তা দেখলে অবাক হতে হতো। স্বামী শুধু ঠোঁট নাড়লে, ইনিও ঠিক তা বুঝে নিয়ে জবাব দিলেন।

"স্বামীজীও এঁর নেমন্তন্ন পেয়ে এঁদের এখানে এসেছিলেন কিছুদিন। আমাদের অনেকেই এঁর এখানে এসেছিলেন, এখন বেঁচে আছেন কি না জানি না। কি আদর যত্নই করতেন। নিজের মা বোন ওরকম পারে না। রান্নাঘরে পর্যন্ত নিয়ে যেতেন। তাইতেই তো অত সব ঘরের খবর জানি।

"লুইস জি জেমস যখন আমাকে তাঁদের সভায় নিমন্ত্রণ করলেন তখন ইনি আমাকে বলেছিলেন—প্রভু তোমায় সাধারণের কাছে পরিচিত হবার সুযোগ এনে দিয়েছেন। তোমার এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। কথাটা আমারও প্রাণে লাগলো। আমি সেই সভায় শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে পড়েছিলাম। প্রথমটা সাধারণের কাছে বক্তৃতা করতে আমি একটু ভয় খেয়েছিলাম। কিন্তু ইনি আমায় খুব উৎসাহ দিতেন। ইনিই তো আমায় ওদেশের উপযুক্ত হতে তৈরি করে দিলেন।

"শরৎ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার বিশ বৎসর পূর্বে ইনি স্বপ্নে এক সাধুকে দেখেন, তিনি বলছেন, 'আমার ছেলেরা সব আসবে, তুমি তাদের যত্ন কোরো।' শরৎ মহারাজের সঙ্গে আলাপ হবার পর একদিন তাঁর গীতার ভিতর ঠাকুরের ছবি দেখে বলে উঠলেন, 'এঁকে তো আমি বহু পূর্বে দেখেছি।' তখন স্বপ্নের কথা সব প্রকাশ করে বললেন।"

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

গতকাল স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উৎসব হয়ে গেছে, আজ কথায় কথায় জনৈক ভদ্রলোকের প্রসঙ্গ উঠলো। বললেন—'ইনি কিছুকাল পূর্বে দেখা করতে এসেছিলেন। ভারি পুরুষকারবাদী। আমি দৈবের দিকটা জোর দিয়ে বলতে লাগলাম, আমরা দুটো দিকই দেখেছি কিনা, তাই ঈশ্বরের ইচ্ছাটাই প্রবল বলে মনে করি। আপনি বোধ হয় জীবনে কখনও কোন বিষয়ে বিফলকাম হননি। তাই পুরুষকারের কথা অত করে বলছেন। তবু তিনি বালকের ন্যায় বেশ সরলভাবে পুরুষকারই সমর্থন করতে লাগলেন। আমরা এই যে সেবাদি কর্ম করছি তার জন্য তিনি আমাদের অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। আমি বললাম, এসব তাঁরই ইচ্ছায় হয়েছে। তিনি কিন্তু বলতে লাগলেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, আপনাদেরই চেষ্টায় হয়েছে।' তিনি এও বললেন, সাধুরাই তো বৈরাগ্য প্রচার করে দেশের সর্বনাশ করেছেন। যাই হোক, লোকটি বেশ ভাল বোধ হলো। আমার তো তাঁকে বেশ ভালই লাগল।"

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

আজ কথাপ্রসঙ্গে না—র ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে য—র কথাও উঠলো, বললেন, "য—কিছু টাকা জমিয়ে সংসার ছেড়ে দিতে চায়। ভিক্ষা করতে ভয় পায়। কিন্তু তাহলে তো সাধু হওয়া হলো না। 'ভৈক্ষচর্যং চরন্তঃ'—ভিক্ষা কত পবিত্র, কত নির্ভর হয় এতে! ভিক্ষার ওপর নির্ভর করলে ক্রমে বিশ্বাস হয় সব জায়গা ভগবানের, তিনি দিলেই তবে পাওয়া যায়, নতুবা ভয় যায় না, লোকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়।"

দু—বাবুর কথা উঠলো। বললেন "একজন পুলিশের গোয়েন্দা কিছুদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে উত্ত্যক্ত করত। তিনি যদিও বিরক্ত হতেন, কিন্তু কিছু বলতে সাহস করতেন না। একদিন আমার সামনে তিনি এবং ঐ গোয়েন্দা দুজনেই বসে আছেন। আমি বলে ফেললুম তাদের বাড়িতে ঢুকতে দেন কেন? মেরে তাড়িয়ে দেবেন। ঐ দিন থেকে তাঁর একটু সাহস হয়েছে।

"পাছে ভাগ দিতে হয় বলে কেউ কেউ ভয় পায়। এক সাধু বনে বাস করত। এক রাজা বৈরাগ্য করতে রাজ্য ছেড়ে ক্রমে তাঁর কাছে এল। সাধু ভাবলেন এ আবার আমার রুটিতে ভাগ বসাবে, এই ভয়ে রাজাকে বললেন, 'দেখ যথার্থ বৈরাগ্য করতে গেলে, সব সঙ্গ ত্যাগ করতে হয়। তুমি আরও গভীর জঙ্গলে গিয়ে একলা বাস কর।' রাজারও সে কথা মনে লাগল। তিনি দূর জঙ্গলে গিয়ে একাকী বাস করতে লাগলেন। একটি লোক সাধুটিকে প্রত্যহ ভিক্ষাস্বরূপ কয়েকখানা শুকনো রুটি দিয়ে যেত। পূর্বোক্ত ঘটনার পর যখন সে লোকটি এসে সাধুকে তাঁর রুটি দিলে, সাধু দেখলে তার হাতে একখানা সোনার থালে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন রয়েছে। সাধু জিজ্ঞাসা করলেন এটি কার জন্য? লোকটা বললে, 'আমাকে একজন পাঠিয়ে দিয়েছেন, যে রাজা এখানে সাধু হয়ে এসেছেন, তাঁর জন্য।' সাধু চটে গিয়ে বললেন, 'কি? আমি এত দিনের সাধু, আমার জন্য এই শুকনো রুটি? আর ও এই সবে সংসার ত্যাগ করে এসেছে, ওর এত খাতির!' লোকটা বললে, 'তা তো আমি জানি নে, যিনি আমায় পাঠিয়েছেন তিনি বলে দিয়েছেন, সাধুর যদি এ শুকনো রুটি পছন্দ না হয়, তো তাঁর জন্য ঐ খুরপি রয়েছে।' সাধুটি সংসার ত্যাগের পূর্বে ঘেসেড়া ছিলেন। খুরপি দিয়ে ঘাস কাটতেন। তাঁর যদি শুকনো রুটিতে না পোষায় তবে তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর পূর্ব জীবনের ঘেসেড়ার কাজ করতে পারেন। আর রাজার যদি সাধুগিরি ভাল না লাগে তিনি তো ফিরে গিয়ে আবার রাজত্ব পেতে পারেন। সুতরাং তাঁকে একটু বেশি যত্ন করতে হবে না? চমৎকার গল্প। অনেক ভাব আছে এর মধ্যে।

"এ জগৎ একটা বিরাট ইচ্ছার বশে চলেছে—যার যা পাবার সে তা পাচ্ছে। চেষ্টা করে কেউ কিছু করতে পারে না অথবা কোনও জিনিস যে হঠাৎ আপনা আপনি হয়ে গেল তাও নয়; আমি তাই শেষটা দেখে মন স্থির করলাম। কোন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হতাম না। ভাবতাম—আমি ভগবানের চিন্তা নিয়ে থাকি, যা হবার তা হবে। যদি না হবার হয় তো চেষ্টা করেও হবে না। ঠিক এই ভাব আসতে কিন্তু অনেক সময় লাগে। অনেক ঠেকতে হয়। অনেক

ধাক্কা খেতে হয়। অহংটা একেবারে মুছে না গেলে এরূপ নির্ভর ভাব আসে না।

"ক্যালিফোর্নিয়ার শান্তি আশ্রমে যখন প্রথম গেলুম, দেখলুম সকলের চেয়ে নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন পঞ্চাশ মাইল দূর। নিকটে জনমানব নাই। আশ্রমের পাঁচ মাইল দূরে পোস্টমাস্টার থাকেন। তিন মাইল দূর থেকে পিপে করে জল আনতে হয়। আমার সঙ্গে সেখানে চৌদ্দ পনেরো জন সাহেব মেম এসেছে। এইসব অসুবিধা দেখে আমার প্রথম মনে হয়েছিল, মা এ কোথায় আনলে! এতগুলি লোক এই অসুবিধার মধ্যে থাকবে কেমন করে? সকালে এইরূপ ভাবনা হলো। রাত্রে দেখলুম, চণ্ডীতে (১/৫১) যেমন আছে—

...পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥

"পক্ষিনী তার শাবকের ঠোঁটে খাবার দিচ্ছে যেন দেখতে পেলুম। মা যেন দেখালেন আমি সব আগে থাকতে ঠিক করে রাখি। তার পর দিনই আশ্রমে একটি লোক এল, সে আমাদেরই দলের একজনের বহু কালের বন্ধু। সে মাটি দেখে কোথায় খুঁড়লে সহজে জল পাওয়া যাবে, সেই বিদ্যা জানে। ইতোমধ্যে আমাদের দলের জনৈক মহিলা আমাকে অনুযোগ করে বলেছিল, 'তোমার ঐ বেবির চেয়েও কম বুদ্ধি! তোমার মায়ের ওপর বিশ্বাস নেই!' স্বামীজী একটি মেয়েকে বেবি বলে ডাকতেন, তাই থেকে সকলে ওকে ঐ নামে ডাকত। মহিলার কথাটা আমার খুব প্রাণে লাগল, মা-ই ওর মুখ দিয়ে বলালেন। যাই হোক, সেই জল-বিদ্যাবিৎ লোকটি ঘণ্টা দুই আশ্রমের চারদিকে ঘুরে এসে বললে, 'এর মধ্যে তিন জায়গায় খুড়লে জল পাওয়া যেতে পারে, কোন্ জায়গা তোমাদের চাই?' আমরা কাছের জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম। সেইখানটা কিছু খুঁড়ে তোফা জল পাওয়া গেল। সে পাথর ও কাঠ এনে সেই জায়গাটা বাঁধিয়ে দিলে, তারপর শান্তি আশ্রমে ক্রমে সব যোগাযোগ হয়ে বেশ সুবিধা হয়ে গেল।

"তিনিই সব করছেন। একটা বই দুটো নাই।

সর্বভূতস্থম্ আত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।—গীতা, ৬/২৯

অর্থাৎ, আত্মা সর্বভূতে রয়েছেন এবং সর্বভূত আত্মাতে রয়েছে অথবা—

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র, সমবস্থিতমীশ্বরম্।—গীতা, ১৩/২৯

অর্থাৎ, ঈশ্বর সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত রয়েছেন—এটা ঠিক ঠিক দেখা শক্ত ব্যাপার। আমরা মুখে বলি, অপরকে বোঝাই, কিন্তু কাজে হওয়া বড়ই শক্ত। সবই ভিতরের ব্যাপার, বাইরে সুখ দুঃখ কিছু নেই। আমরাই নিজের ভিতরের সুখ দুঃখের ভাবটা বাইরের জিনিসে আরোপ করে তাকে সুখকর বা দুঃখকর মনে করি। রমণীর শরীরে কি আছে? ও তো শুধু মাংসপিণ্ড মাত্র! কিন্তু আগে থেকে আমরা ওতে প্রিয়বুদ্ধি করে রেখেছি বলে ওতে আসক্ত হই। জ্ঞানীর কাছে ওটা কিছুই নয়।"

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

স্বামী তুরীয়ানন্দ বলতে লাগলেন—"জ্ঞানী যখন 'আমি' বলে তখন সে আত্মার সঙ্গে নিজেকে এক করে বলে। আমরা নিজেকে দেহের সঙ্গে এক করে বসে আছি। 'বোধে বোধ করা' মানে এই 'আমি'কে আত্মাতে লয় করা। কঠোপনিষদে আছে—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ —২।১।১৫

অর্থাৎ, যেমন নির্মল জলে নির্মল জল ফেললে দুটিই এক হয়ে যায়, সেইরকম জ্ঞানীর আত্মাও পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়।

"দাঁতে জিব কামড়ে ফেললে কেউ দাঁতের ওপর রাগ করে না। যাঁর অদ্বৈত জ্ঞান হয়েছে তিনিও জগতের সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করেন। তাঁর আর রাগ ও দ্বেষবুদ্ধি হয় না। স্বামীজী মরীচিকা সম্বন্ধে যেমন বলতেন, 'যতদিন না আমরা মরীচিকাকে মরীচিকা বলে জানতে পারি, ততদিনই আমাদের তাতে জলভ্রম হয়, কিন্তু একবার জানতে পারলে বারবার মরীচিকা দেখলেও আমরা

আর জলের জন্য ছুটে ওর কাছে যাই না।' জ্ঞানীও জগৎকে দেখে বটে, কিন্তু জগতের সুখদুঃখে আর মুগ্ধ হয় না।

"সবিকল্প ও নির্বিকল্প উভয় প্রকার সমাধিতেই আত্মা সেই পরমাত্মার আনন্দেই বিভোর থাকে। আনন্দ উভয়েতেই আছে, কেবল মাত্রার তফাত—প্রকারগত কোনও ভেদ নেই। নির্বিকল্প সমাধিতেও সেই আত্মাতেই আনন্দ। ঐ অবস্থায় কোন বোধ থাকে না, কেবল শূন্যমাত্র থাকে বললে, দেয়ালটাকেও তো নির্বিকল্প সমাধিস্থ বলা চলে।

"ঠাকুর নির্বাণকেও উচ্চতম স্থান দিতেন না। আমি একবার তাঁকে বলেছিলাম, আমি নির্বাণ চাই তাতে তিনি বললেন, 'তুই তো ভারি হীন বুদ্ধি। জীবই নির্বাণ চায়। পাশাখেলায় যে ওস্তাদ নয়, সে খুব সাবধানে ঘুঁটি ফেলে, পাছে কেড়ে নেয় সেই জন্য, যুগ বেঁধে রাখে এবং শীঘ্র শীঘ্র চিকে উঠতে চায়। কিন্তু খেলায় সিদ্ধ হস্ত যে, সে চিকের কাছাকাছি গেলেও ইচ্ছা করে ঘুঁটি কাঁচিয়ে ফেলে, যাতে খেলা অনেকক্ষণ ধরে চলে। আর তাদের হাত এমন দোরস্ত যে, যা মনে করে ফেলে, তাই পড়ে। সেইরূপ সিদ্ধ যে—সে সংসারেই থাকে; কিন্তু তাতে লিপ্ত না হয়ে মজাটা লোটে। মুক্তির পরে অহৈতুকী ভক্তি হয়। তাতে ঐশ্বর্যের দিকে আদৌ নজর থাকে না—যেমন গোপীদের যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ছিল।

"আধিকারিক পুরুষদের—অবতারদের প্রারব্ধ থাকে না, ঈশ্বর ইচ্ছায় তাঁরা জগতের কল্যাণার্থে শরীর ধারণ করেন! ইন্দ্র প্রভৃতি ভোগভূমির অধিপতি। কিন্তু জীবন্মুক্তরা সর্বশক্তিমান। বেদান্তে 'জগদ্‌ব্যাপার বর্জং' (ব্রহ্মসূত্র) সূত্রে বলেছে বটে যে, তাঁরা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করতে পারেন না; কিন্তু তার তাৎপর্য হচ্ছে, তাঁদের শক্তি থাকলেও, তাঁরা সৃষ্টি প্রভৃতি করতে চান না। সব শক্তি না থাকলে মুক্তির অবস্থা অবিচল হতে পারে না।

"শিব, শুক, নারদ। ঠাকুর বলতেন, 'শিব ব্রহ্মসাগরের তিন গণ্ডূষ জল খেয়েছিলেন, শুকদেব স্পর্শ করেছিলেন এবং নারদ দর্শন করেছিলেন।'

"একজন এখানে শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের আগমনে নিত্য উৎসব হচ্ছে এটা তত পছন্দ করেন না লিখেছেন। তা হবে না, ভাগবতে আছে—

নিত্যোৎসবো ভবেত্তেষাং নিত্যশ্রীনিত্য মঙ্গলম্।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনো হরিঃ ॥

অর্থাৎ, যাঁদের হৃদয়ে সকল মঙ্গলের আশ্রয়স্বরূপ হরি রয়েছেন, তাঁদের পক্ষে নিত্য উৎসব, নিত্য শ্রী ও নিত্য মঙ্গল হয়ে থাকে।

আমেরিকার শান্তি আশ্রম প্রসঙ্গে আরও বললেন, "স্বামীজী তাদের কাছে আমাকে এমন বাড়িয়ে বলে রেখেছিলেন যে, তারা আমার কথায় প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিল। স্বামীজী বলেছিলেন, 'এরা মরবে তবু চাকরি করবে না।'

সুরদাস যেখানে থাকতেন সেখানে রামানুজ এসেছিলেন। তিনি প্রত্যহ দেখেন সুরদাস ভগবানকে নিজের দুঃখ জানাচ্ছেন। তাতে তিনি বলেন, 'সুরদাস, এ রকম করে রোজ ভগবানকে দুঃখ জানিয়ে কি হবে? তুমি ভগবানের যশোগান কর।' তাইতেই সুরদাস ভগবানের গুণবর্ণনা করে লক্ষ পদ রচনা করেন। তিনি অন্ধ ছিলেন, শেষে তিনি চক্ষুও পেয়েছিলেন।

"ভগবানই সব করে থাকেন। তুলসীদাস তাঁর একটি দোঁহায় বলেছেন, 'ভগবানই লাভ, ক্ষতি, মরণ, জীবন, যশ, অপযশ প্রভৃতি সব দিয়ে থাকেন।' ঈশ্বরই সব কচ্ছেন। তবে এই জগতে শুধু যে মোক্ষের চেষ্টা আছে তাই নয়, ভোগের চেষ্টাও রয়েছে। সুখদুঃখ ভোগ করে তারপর লোকের চৈতন্য হয়। পাপ ও পুণ্য দুইই তিনি করান, তবে যাইই করান না কেন, সকলেরই পিছনে তাঁর মঙ্গলময় ইচ্ছা রয়েছে। প্রত্যেক কাজের মধ্য দিয়ে শেষে জীবের মঙ্গল হবে।

"দক্ষিণেশ্বরে আমি একবার লাটুর সঙ্গে ঈশ্বরের বৈষম্য নৈঘৃণ্য দোষ প্রভৃতি খণ্ডন করবার জন্য খুব যুক্তিতর্ক দেখাচ্ছিলুম। ওরা ঠাকুরের হাতে তৈরি কি না, শেষে বললে, 'তোমার ভাবটি তো বেশ! ঈশ্বর যেন একটি শিশু আর তোমরা তাঁকে আগলে আগলে রাখবার চেষ্টা কচ্ছ, মায়ের মতো।' আমার খুব লাগল কথাটা।"

৭ মার্চ (শিবরাত্রির দিন) ১৯২১

স্বামী তুরীয়ানন্দ—"এই যে প্রণাম করা-টরা, তার আসল ভাব হচ্ছে, যাকে প্রণাম করেছ নত মস্তকে, তার আজ্ঞা পালন করবে। কিন্তু এখন ভেতরের ভাবটা উড়ে গেছে, বাইরের আকারটাই আছে। এই যে এত লোক এতবার করে প্রণাম করছে, এদের কিছু করতে বললে করবে? এর বিপরীতটাই তো অনেক জায়গায় দেখছি।"

ঐ অপরাহ্ন—

জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শঙ্করের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করেছেন শুনে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন, "শঙ্করের বিরুদ্ধে কাউকে বলতে শুনলে মুখে গাল এসে পড়বে। জিজ্ঞাসা করি, যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁরা কিসের জোরে করেন? শুধু বুদ্ধির জোরে? আর শঙ্কর যে তপোমূর্তি। যদি তোমার পূর্বতন আচার্য সবকিছুই না হয়, তবে তোমার ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কাছে তুমিও তো কিছুই নও! বরং তাঁরা যদি সত্য হন তুমিও সত্য হতে পারবে।"

১০ মার্চ ১৯২১

প্রশ্ন হলো—ভারতবাসীর এত অবনতি কেন হলো?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—লোকের অবনতি কেন হয় এইটি বিচার করলেই ভারতবাসীর কেন অবনতি হয়েছে তা বুঝতে পারা যেতে পারে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ভারতবাসীর এ দুরবস্থা হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা বললেন—আপনি চাবকে আমাদের জাগিয়ে তুলুন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আবার কি করে চাবকাব? রাতদিনই তো তাই করছি। নতুবা এত বকে মরি কেন? নিজের ধ্যান-জপ নিয়ে থাকলেই তো হয়। সত্যসত্যই কি আর চাবুক নিয়ে মারতে হবে? নিজের ভিতর থেকে জাগবার ইচ্ছা না থাকলে হয় না। খিদে পেলে আর মাকে ডেকে তুলে খাওয়াতে হয় না, খিদের চোটই তোমায় ওঠাবে।

"সব যোগাযোগ তিনিই করেন! সব কাজের পিছনে একজন সূত্রধার আছেনই। যেমন পুতুল নাচ। ছোট ছেলেরা বুঝতে পারে না যে একজন ভেতর থেকে পুতুলদের নাচাচ্ছে তাই তারা নাচছে। আমরাও জ্ঞানীর কাছে ছোট ছেলের মতো। যার হবার, ভগবান তার প্রতি তোমার প্রবল সহানুভূতি ও অসীম ধৈর্য এনে দেবেন। আবার সেই সব লোককেও তিনি তোমার কাছে নিয়ে আসবেন, তবেই তো হবে।

"একজন লোক এক সাধুর কাছে চেলা হতে গিছলো। গুরু শিষ্যের জীবনের কঠোরতা বর্ণনা করে বললেন, চেলা হতে গেলে ইঁদারা থেকে ঘড়া ঘড়া জল তুলতে হবে, কাঠ কাটতে হবে, বাসন মাজতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। গুরুকে কি করতে হয় জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, 'গুরু শিষ্যের সেবা নেবেন। আর মাঝে মাঝে উপদেশ করবেন।' সব শুনে, লোকটা হাত জোড় করে বললে, 'মহারাজ তব মুঝকো গুরু বনায় লেও।' আর খাটতে হবে না!

কথাপ্রসঙ্গে যোগীদের অদ্ভুত শক্তির কথা উঠলো। বললেন, "যোগীরা অসাধ্যসাধন করতেন। যেমন গর্ভে, পুরুষকে স্ত্রী করা, স্ত্রীকে পুরুষ করা ইত্যাদি। এসব শাস্ত্রে ভূরি ভূরি পড়া যায়। না হবার কোনও কারণ নেই। ওর রহস্যটা তাঁরা আয়ত্ত করেছিলেন।"

সেবাধর্মের কথা উঠলো। বললেন, "রোগী নারায়ণদের সেবা করতে করতে তাদের বিষ্ঠা মূত্র সাফ করতে করতে অ—যা আনন্দ পেত, জপধ্যান করেও তা পায়নি। শিবজ্ঞানে জীবসেবা স্বামীজীর অপূর্ব শিক্ষা।

"কোনও ছোকরাকে সেবাশ্রমের সেবকরূপে গ্রহণ করবার পূর্বে শু—তাকে স্বীকার করিয়ে নিত যে, রোগীর বিষ্ঠা মূত্র সব থেকে যে কোনও কাজ পড়বে, সে তাই করতে প্রস্তুত। তার ফলে বিশ বৎসর ধরে সুন্দররূপে কাজটা চলেছে। একটা আদর্শ ধরে কাজ না করলে হয়?

"কল্যাণানন্দ যখন স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাস চাইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার এখন টাকার দরকার; আমি যদি তোকে টাকা নিয়ে চা বাগানে কুলি

করে বিক্রি করি, তাতে তুই রাজি আছিস।' সে জবাব দিলে, 'হাঁ।' সত্যই তাই করেছে। দেখ না, নিজেকে স্বামীজীর কাজে বিক্রি করে দিয়েছে।

"অনেকে মনে করে স্বামীজীর কাজ করতে গিয়ে তাদের ধ্যানজপের ব্যাঘাত হবে। আধ্যাত্মিক উন্নতির বাধা পড়বে। আমি তাদের বলি, স্বামীজীর কাজের জন্য নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি পর্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করে অকপট ভাবে কাজে লেগে যাও দিকি, তাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল কখনও হবে না।"

১১ মার্চ ১৯২১ (ঠাকুরের তিথিপূজার দিন) স্বামী তুরীয়ানন্দ সমবেত ব্যক্তিদের উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন—

"স্বামীজী আমেরিকার এক বক্তৃতায় তর্কের ছলে ঈশ্বর-টিশ্বর সব উড়িয়ে দিয়েছেন এমন সময় একজন শ্রোতা মহা রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'মহাশয় তবে কি আপনি গড নাই বলেন?' স্বামীজী তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন 'গডের অভাব কি? আমাদের দেশে ত্রিশ কোটি গড আছে। যত চাই তত তোমায় দেব।'

"স্বামীজী জেনেছিলেন যে আমাদের দেশে ধর্মের অভাব নেই। একটু খাইয়ে দাইয়ে লোকগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই সেই ধর্মভাব আবার ফুটে বেরুবে। অন্যান্য দেশের চেয়ে আমাদের দেশ বেশি সভ্য—পাশ্চাত্যেরা সভ্যতা হিসেবে আমাদের চাইতে অনেক ছোট।

"স্বামীজী বলতেন, তাঁর বক্তৃতায় যে এত লোক মেতে গিয়েছিল তার অর্ধেকটা তাঁর সুস্বরের জন্য বলা যেতে পারে।

"এখন দেখছি দীর্ঘজীবন ভাল। অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে বৈরাগ্য এনে দেয়—যেমন যযাতির হয়েছিল। ভোগ না হয়ে গেলে ত্যাগ হয় না। কিছুই নেই, তা আর ত্যাগ করবে কি।

"প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি—যেমন নূতন কারবার ফাঁদা আর পুরনো কারবার গুটানো। একজন বিস্তার করতে চায়, আর একজন আদৌ সে দিকে নজর না দিয়ে, যেমন করে হোক খালাস পেলে বাঁচে।

"পাশ্চাত্য দেশেও উদারতা, ত্যাগ প্রভৃতি আছে—ওরা দেশের জন্য সব

করতে পারে। আমাদের এখানে সাধারণ দেশ-টেশ তত বোঝে না, তবে ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে সদাই প্রস্তুত।

“নিউইয়র্কে আমায় প্রতি রবিবারে একটা করে বক্তৃতা দিতে হতো। তার পূর্বে এক ঘণ্টা, আধ ঘণ্টা ধ্যানের মতো করে বিষয়টা ভেবে নিতাম। তাতেই হয়ে যেত। ক্রমে নিজের ওপর একটা বিশ্বাস এসে গেল। বক্তৃতায় লোকে ভাষা তত দেখে না, ভাবটা দেখে। বক্তা কি বলছে সেইটা বোঝবার চেষ্টা করে।”

১০ মার্চ ১৯২১

আজ সকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ অনেক রকমের উচ্চ কথা বললেন। অতি তেজের সঙ্গে সন্ন্যাস জীবনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। বললেন, “এ জগৎটা বিচিত্রতায় পূর্ণ। কত রকমের হাঙ্গামা এতে রয়েছে। এসব ত্রিগুণের খেলা। আবার এর ওপরের অবস্থা—ত্রিগুণাতীত অবস্থা, পরমহংসদের ভিতরে রয়েছে। মায়ের ইচ্ছায় এই অপূর্ব ব্যবস্থা। ‘ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং’ ইত্যাদি। যিনি এই সবের মধ্যে একত্ব দেখতে পেয়েছেন, তিনিই শান্তিতে থাকেন। কারণ তখন আর লাভ, লোকসান, ভাল, মন্দ কিছুই থাকে না। কার ভাল, কার মন্দ? এই কদিন যে যজুর্বেদ সংহিতার রুদ্র অধ্যায় পড়া হচ্ছে, তাতে কেবল সকাম প্রার্থনা রয়েছে। আমার গরুগুলিকে মেরো না, আমাদের দিকে তোমার করুণাময় মূর্তি ফিরিয়ে রেখ, ধনুর্বাণ ফেলে দিয়ে এস, অন্যের যা হয় হোক আমার ভাল কর, আমার শত্রুদের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ কর—এসব ভাব স্বার্থ থেকে আসে। দেহবুদ্ধি চলে গেলে আর এ রকম ভাব আসে না। ‘সবই তিনি’ এই চিন্তা সব চাইতে উত্তম। তা না পারলে, ‘তিনিই সব করাচ্ছেন’—এই চিন্তা করা ভাল।

“ঠাকুর বলতেন ‘পূর্বজন্মে যে রাজারাজড়া ছিল, ভোগবাসনা সম্পূর্ণ মিটিয়ে নিয়েছে, সেই এ জন্মে সন্ন্যাসের অধিকারী হয়।’ তখন জন্ম থেকেই প্রবল বৈরাগ্য থাকে। ভোগবাসনা যার মেটেনি, তার বৈরাগ্য আসবে কি করে। সন্ন্যাস কি নিলেই হলো? আমাদের ধারণা ছিল যে সন্ন্যাসী ক্বচিৎ হয়। প্রপঞ্চ

যাকে ছেড়ে দিয়েছে, সে কি সাধারণ লোক? হৃষিকেশে তিন হাজার সাধু দেখে বুঝলাম যে আসল সাধুতে, আর সচরাচর যা দেখতে পাওয়া যায়, তাতে কত তফাত! গেরুয়া নিলেই কি সন্ন্যাসী হলো?

"অনেকেই কাজ ফাঁকি দিতে চায় বলে তাদের তাড়াতাড়ি সন্ন্যাস নেবার এত আগ্রহ। ঠাকুর সন্ন্যাসের কথা তো অত বলতেন না—'ভগবান লাভ করবার চেষ্টা কর'—এই দিকেই বেশি জোর দিতেন। তবে অবশ্য এ কথাও বলতেন যে ত্যাগ ব্যতীত ভগবান লাভ হতে পারে না। তাঁর কথা ছিল, 'একবার বাইরে থেকে আগুন আনতে হয়।' "

একজন বললেন, স্বামীজী কিন্তু সন্ন্যাসের ওপর খুব জোর দিতেন শুনেছি।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—"হাঁ। কিন্তু তিনি আবার সেবাধর্ম প্রবর্তন করেছেন। স্বামীজীর কথা নিতে হয় তো সবটা নাও। তা তো নয়। অনেকে কোন কাজ করতে চায় না। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'মাখন তুলে মুখে ধর।' করে দাও! সন্ন্যাস নিয়ে প্রায়ই এ রকম লোকের বড় উন্নতি হয় না। ঐখানেই রয়ে যায়। পরের জন্য নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ না করলে কারও এতটুকু উপকার করা যায় না। অসীম সহানুভূতি ও ধৈর্য চাই। শরীর ভাল না থাকলে আবার এসব করা যায় না। ভিতরে ভিতরে রাগ হয়।

"স্বামীজী কি সত্ত্বগুণী ছিলেন না? তাঁর মতো সত্ত্বগুণী কে ছিল! সঙ্গে থেকে তো দেখেছি। এ তো শোনা কথা নয়। রাত ৯টায় ধ্যানে বসে ভোর ৫টায় উঠে স্নান করতে গেলেন। মশায় ছেয়ে ফেলেছে, যেন গায়ে একখানা কালো কম্বল বিছিয়ে দিয়েছে। তবু হুঁশ নেই। যেন শিব ধ্যানে বসেছেন। এই সত্ত্বগুণের লক্ষণ—ইন্দ্রিয় মনের সম্পূর্ণ সংযম—সম্পূর্ণ সাম্য ভাব। তিনি দেখেছিলেন যে রজঃর মধ্য দিয়ে না গেলে ভারতের কল্যাণ নেই। সেই জন্যই নিষ্কাম কর্মের ব্যবস্থা করেছেন। এ সত্ত্বের রজঃ।

"কত খাটলে তবে লোকের একটু কল্যাণ করতে পারা যায়। অপরের অবস্থায় নিজেকে এনে ফেলে তবে তাকে ধীরে ধীরে হাতে ধরে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

"মিরাটে আমরা যখন ছিলুম, তখন স্বামীজী একজনকে খুব ধমকে ছিলেন। সে অপরের খুব খুঁত কাটত। বলেছিলেন, 'কেন পিছে লাগ? কিছু দিতে পার?' স্বামীজীর চিকাগোয় রওনা হবার ঠিক পূর্বে যখন বম্বেতে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো, তখন স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন 'দেখ হরি ভাই, ধর্ম কর্ম আর কিছু বুঝতে পারি না পারি, কিন্তু দেখছি হৃদয়টা বড্ড বেড়ে গিয়েছে। পরের জন্য দিনরাত প্রাণ কাঁদছে।' এইখানেই স্বামীজী জনৈক প্রচারকের প্রচারপ্রণালী উপলক্ষ করে বলেছিলেন, 'ওকি হচ্ছে। ও রকম করে কি প্রচার হয়? আসল প্রচার হয় নিজের চরিত্রের দ্বারা।' লোকে তোমার চরিত্র দেখে বুঝুক যে ইনি যখন এত উন্নতচরিত্র, তখন এঁর গুরু না জানি আরও কত বড় ছিল। তিনি নিশ্চিতই অবতার হবেন।' স্বামীজী আমেরিকায় ঠিক সেইভাবে প্রচার করেছিলেন। তিনি একটি দিনও তথায় ঠাকুরকে অবতার বলে প্রচার করেননি। এমনকি ঠাকুরের কথাও বিশেষ বলেননি। কেবল নিউইয়র্ক ছেড়ে ইংলন্ডে যাবার পূর্বদিন, My Master (মদীয় আচার্যদেব) বক্তৃতায় তাঁর কথা কিছু আলোচনা করেছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে যখন আমেরিকায় ছিলাম, যে কটা বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলাম শ্রোতাদের কাউকে কাউকে জিজ্ঞাসা করতাম, 'কেমন লাগল?' তাঁরা বলতেন, 'খুব ভাল।' স্বামীজীকে সেই কথা বলাতে তিনি বলতেন, 'আমি কি শুধু লেকচার দি। আমি ঐ উপলক্ষে শ্রোতৃবৃন্দকে কিছু বস্তু দিয়ে থাকি। আমি নিজে বুঝতে পারি আমি তাদের কিছু দিচ্ছি, তারাও বুঝতে পারে তারা কিছু পাচ্ছে।' শুধু লেকচারে কি হয়? লেকচার মানে সব লোকদের মনগুলোকে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে একটা ভাব ঢুকিয়ে দেওয়া। সব লোক সে সময় তোমার ভাবে ভাবিত হবে।

"নিজের জন্য এতটুকু রাখলে তাতে আর অমৃতত্ব ফল হয় না। অতি অল্প ফল হয়। বৃহদারণ্যকে যেমন যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, 'সমস্ত ধনরত্নযুক্ত পৃথিবী লাভ করলেও অমৃতত্ব লাভ হবে না। সাধারণ বিভবশালী লোকদের মতো তোমার জীবন হবে। মানুষের সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য পেয়েও তৃপ্তি হয় না। আবার যজ্ঞাদি করে স্বর্গে যেতে চায়। স্বর্গ আর তো কিছু নয়।

এখানকার চেয়েও অধিক ভোগ ঐশ্বর্য। স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র আবার তাতে বাধা দেয়, বলে—এত কষ্ট করে পেয়েছি, তুমি আবার তাতে ভাগ বসাতে চাও? কিন্তু সাধুরা, পরমহংসেরা, ইহজীবনেই প্রায় ঈশ্বরতুল্য ক্ষমতার অধিকারী হন। বৈকুণ্ঠের পার্ষদরা শ্রীভগবানের সমানরূপতা পান, কেবল পার্থক্যের ভিতরে তাঁদের কৌস্তুভটি থাকে না।"

শ্রোতাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, এসব যা বলছেন একি রূপক না সত্য?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—"সত্য কেন হবে না? চিন্তাজগতের একটা স্থূল রূপ তো থাকতে পারে। 'যেমন ভাব, তেমনি লাভ।' যেমন আরশোলা কাঁচপোকা হয়ে যায়। ঠাকুর বলতেন, 'পারার হ্রদে সীসা ফেলে দিলে পারাই হয়ে যায়, আর সীসা থাকে না।' তাই ভাবতে ভাবতে তাই হয়ে যায়। চিন্তা স্থূলভাব প্রাপ্ত হয়।

"আত্মাতে তো কোন পরিবর্তন হয়নি—প্রকৃতিটাতেই যা কিছু গোল হয়েছে। সেই প্রকৃতি ক্রমশ শুদ্ধ হয়। আর এই জন্যেই সেটা করা যায়।

"ভারতবর্ষে মনস্তত্ত্বের খুব উন্নতি হয়েছে। কারণ ঐটে নিয়েই এখানে বিশেষভাবে আলোচনা হয়েছিল। পাশ্চাত্য জাতি আবার জড় জগৎ বিশ্লেষণের ফলে কত কি অদ্ভুত ব্যাপার করছে। প্রাণী জগতে, উদ্ভিদ জগতে কত বৈচিত্র্য সম্পাদন করছে। দেখ না বুরব্যাঙ্কের কি অসাধারণ ক্ষমতা! জমি পরীক্ষা করে কোথায় কি ফসল হতে পারে তার চেষ্টা করছে, তার ফলে বীজহীন কমলালেবু প্রভৃতি কত নূতন নূতন জিনিস হচ্ছে। এই রকমে পাশ্চাত্য জাতিরা বহির্জগতের খুব আলোচনা করে তাতে নানা উন্নতি করেছে। হিন্দুরা কিন্তু জড় কখনো চৈতন্য দিতে পারে না, এই ভেবে জড় জগতের দিকে কখনও বেশি ঝোঁক দেয়নি। তারা অন্তর্জগতের দিকেই নজর দিয়েছিল, তাতেই আত্মার তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে।

"স্বর্গ ও নরক, ভগবান ও বিষয়, দুটোই পাশাপাশি রয়েছে। একটা থেকে

মনকে সরিয়ে নিলেই মন আর একটাতে চলে যায়। একটু বিষয় থেকে তফাত হও, ভগবানের দিকে যাবে, আবার ভগবান থেকে তফাত হও, বিষয়ের দিকে চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে একটা বই তো দুটো বস্তু নেই। তা বলে অবশ্য বুঝ না পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্মে কোনও প্রভেদ নেই। ঠাকুর বলতেন, ধর্ম ও অধর্মের লক্ষণ হচ্ছে যা ভগবানের দিকে নিয়ে যায় তাই ধর্ম, আর যা ভগবান থেকে বিমুখ করে তাই অধর্ম।

"সত্ত্বতে সংযম, রজঃতে কর্মশীলতা নিয়ে আসে। তমঃতে আরও নিচে নিয়ে যায়, অধোগতি করায়। তমঃকে জোর করে তাড়িয়ে রজঃতে নিয়ে যেতে হবে। তমঃ কি রকম জানো? লোকে বরফের ভিতর যখন পড়ে, তখন খুব ঘুমুবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু সেটা মারাত্মক। আফিম খেয়ে যখন ঝিমিয়ে পড়ে তখন তাকে চুল ছিঁড়ে জাগিয়ে রাখতে হয়, নইলে মৃত্যু। ভারতবাসীরও 'সত্ত্বের ধুয়া ধরে' তমঃতে অনিষ্ট হচ্ছে। এদের চাবকে কাজে নামাবার জন্য স্বামীজী কত চেষ্টা করেছেন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন শ্রীরামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রম, কাশী

(উৎস : উদ্বোধন ২৭ বর্ষ ২, ৪, ৭ সংখ্যা;
২৯ বর্ষ ১১ সংখ্যা;
৩০ বর্ষ ২, ৩, ৫, ৬, ১০, ১১, ১২ সংখ্যা;
৩১ বর্ষ ২, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ সংখ্যা;
৩২ বর্ষ ১, ৩, ৫, ৮ সংখ্যা;
৩৩ বর্ষ ৪, ৫ সংখ্যা)

স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের স্মৃতি

স্বামী শান্তানন্দ

হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—"তাঁর ভাব কি সামান্য ছিল? কোন কোন সময় এমন কি বহির্জগৎও তাঁর ভাব অনুযায়ী বদলে যেত। একবার মথুরবাবু দক্ষিণেশ্বর থেকে ওঁর জুড়িগাড়ি করে ঠাকুরকে ওঁদের জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। গাড়ি যখন চিৎপুর রোডে এসে পড়েছে, তখন হঠাৎ ওঁর এরূপ ভাব হলো যে, উনি যেন সীতা হয়েছেন আর রাবণ ওঁকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে—উনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। এমন সময় হঠাৎ গাড়ির ঘোড়া রাশ ছিঁড়ে একেবারে ছিটকে গিয়ে পড়ল। মথুরবাবু ভাবলেন এমন কেন হলো? ঠাকুরের সমাধিভঙ্গের পরে ওঁকে জিজ্ঞেস করায় তিনি সমস্ত বিবরণ বললেন। তিনি বললেন, ঐরূপ ভাবাবস্থায় তিনি দেখলেন যেন রাবণ তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় জটায়ু রাবণের রথ আক্রমণ করেছে এবং সব ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে। মথুরবাবু শুনে বললেন, 'বাবা, এমন হলে তো তোমার সঙ্গে রাস্তা চলা মুশকিল!' "

আর একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—"একবার দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুর বলরাম-মন্দিরে এসে হলঘরে বসেছেন। ভক্তরাও অনেকে উপস্থিত আছেন। বলরামবাবু ঠাকুরকে পরখ করবার জন্য একথালা সন্দেশ ঠাকুরের সামনে এনে ধরলেন। সন্দেশগুলি তিনি পৃথকভাবে মনে মনে ভাগ করে রেখেছিলেন—এইটি ঠাকুরের, এইটি নরেনের, এইটি বাবুরামের, এইটি রাখালের ইত্যাদি করে। ঠাকুর কিন্তু যেটি তাঁর নাম করে রাখা হয়েছিল, সেটি গ্রহণ করলেন। তখন বলরামবাবুর সংশয় কাটলো।"

আমি তখন কাশীতে কাশিগিরির বাগানে মৌন হয়ে তপস্যা করছিলাম।

একদিন স্বামী সুবোধানন্দ আমাকে দেখতে আসেন। দেখা হলো, কিন্তু মৌন থাকায় কোন কথাবার্তা হলো না। ঠাকুরের সন্তানকে যথোচিত সম্মান দেওয়া হলো না বলে মনে লাগল। মৌনভঙ্গের পর হরি মহারাজকে এই কথা বলায় তিনি বললেন, "ঠিক করেছ। তপস্যাকালে খালি নিজের দিকে দেখবে। পরের দিকে দেখলে ভুল করবে।"

তপস্যা থেকে ফিরে আমি তখন কাশীর আশ্রমে আছি। ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত যোগীন-মা আমাকে একদিন কাশীর মন্দিরাদি দর্শন করাবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কাজের চাপ ও সময়ের অভাব হেতু পারলুম না। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হলো। হরি মহারাজকে ঐ কথা বলায় তিনি বললেন, "আর কারুর মন জোগাবে না, একমাত্র তাঁরই (ভগবানের) মন জুগিয়ে চলবে। ঠিক হয়েছে।"

* * *

আমি তখন কাশিগিরির বাগানে তপস্যা করছিলাম। কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে হরি মহারাজ নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, "আমরা একটা ছেলে তৈরি করছি, তোমরা কেন তার ক্ষতি করবে?"

একদিন সকালে হরি মহারাজের সেবক তাঁর ঔষধের অনুপান একটা গাছড়া খুঁজতে খুঁজতে আমার বাগানে এসেছিল। আমি ঐ সেবকের সঙ্গে ঘুরে বাগান থেকে গাছড়া সংগ্রহ করি। সেই রাতে আমার খুব গভীর ধ্যান হয় এবং একটা অনুভূতিও হয়। পরদিন মহারাজের সেবক ফণীর (স্বামী ভবেশানন্দ) সঙ্গে দেখা হলে সে বলল ঃ "হরি মহারাজ গাছড়া সংগ্রহের ব্যাপার শুনে বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তাই তো খগেন (স্বামী শান্তানন্দ) তপস্যা করছে। এ অবস্থায় আমার জন্য গাছড়া খুঁজে বেড়াচ্ছে।' তারপর বেশ কাতর হয়ে আপনার জন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করলেন।"

ফণীর এ কথা শুনে আমার নিশ্চিত ধারণা হলো, গত রাতে আমার যে গভীর ধ্যান ও অনুভূতি হয়েছিল, তা হরি মহারাজের ইচ্ছা ও আশীর্বাদে।

* * *

একদিন হরি মহারাজ বললেন ঃ "পরের দোষত্রুটি দেখলে খপ করে স্পষ্ট কথায় তা বলে দেবার অভ্যাস আমার খুব ছিল। কিন্তু ভাগবতের একটা শ্লোক ভাষ্যসহ পড়ে ঐ অভ্যাস ত্যাগ করবার খুব ইচ্ছা হয়েছিল এবং তা করেছিলাম।

শ্লোকটি এই—

পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥—১১/২৮/১

এর ভাষ্যে আছে ঃ যদি হঠাৎ দাঁত জিহ্বার ওপর জোরে পড়ে জিহ্বাকে কেটে ফেলে, তাহলে কি লোকে পাথরের নোড়া দিয়ে দাঁত ভেঙে ফেলে? যার দাঁত, তারই জিহ্বা। এ সংসারে প্রকৃতি ও পুরুষ এক বই দুই নয়—এটি বুঝে আদৌ রাগান্বিত বা প্রতিশোধপরায়ণ হবে না। কারণ তুমি ও তোমার শক্তিই সব হয়েছে এবং সব কাজ করছে।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৪৯ বর্ষ, পৃষ্ঠা ৫৩০; জনৈক সাধুর ডায়েরি)

তুরীয়ানন্দ প্রসঙ্গ

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ

স্থান ঃ কাশী রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রম

ডি মেলোর পাগল হওয়ার প্রসঙ্গে হরি মহারাজ বলেছিলেন, "স্বামীজী বলতেন, "সব অবস্থার ভিতর দিয়ে গেলে শেষে পরমহংস অবস্থা আসে। পাগলামির ভিতর দিয়েও যেতে হয়।" হরিশদা দিনকতক পাগল হয়েছিলেন, নিরঞ্জন মহারাজ তাঁকে একদিন 'গোবেড়ন' করায় স্বামীজী বলেছিলেন 'শালাকে পুলিশে দিতে হবে দেখছি।"—এই বলে নিরঞ্জন স্বামীকে ভয় দেখিয়েছিলেন।"

"ঠাকুর বলতেন, 'হৃদয় ডঙ্কা মারা স্থান—ধ্যানের জন্য প্রশস্ত। হালদার পুকুরে মাছ ধরতে এসেছে, ছিপ ফেলে বসে আছে। তারপর ঘাই মারলো,' অর্থাৎ অস্তিত্ব বোধ হলো।" "অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ" —কঠ উ. ২।৩।১৩।

"ব্যাসদেব উপদেশ করছেন জনককে লক্ষ্য করে। তখন তাঁর সন্ন্যাসী চেলারাও রয়েছে। তারা ভাবলে, জনক রাজা কিনা, তাই তাঁকে লক্ষ্য করে বিশেষভাবে উপদেশ দিচ্ছেন গুরুদেব। ব্যাস তাদের অন্তরের অভিপ্রায় বুঝে মায়াগ্নি সৃজন করলেন। সেই আগুন সমস্ত মিথিলাকে পুড়িয়ে জনকের সভার কাছাকাছি এসেছে। লোক এসে জনককে খবর দিলে তিনি তাদের প্রতিকারের উপায় বলে দিয়ে ব্যাসদেবকে বললেন, 'আমি অবহিত আছি, আপনি উপদেশ করুন।' আর বললেন 'মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহ্যতে কিঞ্চন।' কিন্তু আগুনটা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে দেখে সন্ন্যাসী চেলারা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাদের কৌপীন শুকোচ্ছিল, পাছে পুড়ে যায় এই ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠে কৌপীন রক্ষা করতে গেল। ব্যাসদেব তা দেখে একটু হাসলেন। তাই

কথা হচ্ছে 'ন লিঙ্গং ধর্মকারণম্' অর্থাৎ বাহ্য লিঙ্গ (বেশ) ধর্মের কারণ নয়। মুণ্ডকেও (৩।২।৪) আছে, 'ন...তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ' অর্থাৎ বৈরাগ্যহীন তপস্যার দ্বারাও আত্মা লভ্য নন। ত্যাগই আসল লিঙ্গ, কাষায়াদি নয়।

"ঠাকুর বলতেন, 'জেনেশুনে সংসার কর। আমি কারুকে একেবারে ত্যাগ করতে বলি না। নক্স খেলায় বেশি কাটিয়ে জ্বলে যায়, আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি।'"

"'যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ' —ঈশ উ. ৮।—যার যেমন ভাব তার তেমনি লাভ। যাকে যেমনিটা দেওয়া দরকার ঠিক তাই বিধান করছেন—চিরকাল ধরে।

"'ততো ন বিজুগুপ্সতে'—ঈশ উ. ৬। নিজেকে রক্ষা করতে চান না, কারণ জানেন নিজের মরণ নেই—অমর। গুপ্ রক্ষণে।

"ভক্তিতে পুংস্ত্ব নেই, স্ত্রীত্ব নেই, জাতি নেই, বয়স নেই অর্থাৎ স্ত্রী হলে হবে না, শূদ্র হলে হবে না বা যৌবনে হবে না কি বাল্যে হবে না, ইত্যাদি কিছু নিয়ম নেই। এটা অধ্যাত্মে (অধ্যাত্মরামায়ণে) আছে। ঠাকুর বলতেন, 'সে কিগো, এ কথা যে অধ্যাত্মে আছে। তবে কি অধ্যাত্ম মিছে?"

"'অহং ব্রহ্মাস্মি' শুধু মুখে বললে হবে না, উপাসনা করা চাই। উপাসনা না করলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, তত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। চিত্তশুদ্ধিই দরকার, না হলে তিনি তো সকল হৃদয়ে আছেনই।

"'সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা' (মুণ্ডক উ. ৩।১।৫) এইসব উপায়। গুরুসেবা দরকার। রাধেশ্যাম সম্প্রদায়ের প্রবর্তক গুরুসেবা করে শক্তি পেয়েছিলেন। তাঁর গুরুর জন্য অনেকদূর থেকে যমুনার জল কলসি করে নিজে নিয়ে আসতেন। তাঁর টাকা ছিল, ইচ্ছা করলে চাকর রাখতে পারতেন, কিন্তু তা করেননি। গুরু যে তাঁর বিশেষ শক্তিমান ছিলেন, তা নয়। কিন্তু নিজের শ্রদ্ধাতেই হয়েছিল। গুরু বিশেষ শক্তিমান হলে তো কথাই নেই। একলব্য মাটির দ্রোণ গড়ে সিদ্ধ হয়েছিল।"

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২১

হরি মহারাজ বললেন, "ভাগবত ভক্ত ভগবান, গুরু আর নাম এক বপু"—ভাগবতের সেবা করলেই সবার সেবা করা হলো।

প্রশ্ন ঃ মহারাজ "যত মত তত পথ" ঠাকুরের এই কথার অর্থ কি?

উত্তর ঃ সকল মতগুলোই পথ এবং লোকে এক জায়গায়ই পৌঁছায়।

প্রশ্ন ঃ দ্বৈত অদ্বৈত কি এক স্থানেই নিয়ে যায়?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সেই এক ভগবানকেই লাভ হয়।

দৃষ্টান্ত দিলেন ঠাকুরের কথায় ঃ গরুর লেজে হাত দিলে বা শিং-এ হাত দিলে সেই গরুতেই হাত দেওয়া হয়! গোমুখীতে স্নান, কাশীতে স্নান আর কলকাতায় গঙ্গাস্নান করলে সেই এক গঙ্গাতেই স্নান করা হয়।

প্রশ্ন ঃ শাস্ত্রে বলে ব্রহ্মলোক হতেও মানুষ ফেরে। দ্বৈতবাদীর শিবলোক, বিষ্ণুলোক ইত্যাদি তো তারি মধ্যে। তাহলে তাদের মুক্তি হয় কি করে?

হরি মহারাজ প্রশ্ন করলেন ঃ মুক্তি কাকে বলে?

উত্তর দিলাম ঃ বারবার সংসারে গতায়াত-নিবৃত্তিই মুক্তি।

হরি মহারাজ ঃ কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি না থাকলেই সংসার থেকে নিবৃত্তি। ঐ সকল 'লোকে' কাম ক্রোধ নাই। কেবল উপভোগ, আনন্দ—ভক্তদের কাছে।

প্রশ্ন ঃ শাস্ত্রের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য কোথায়?

বিরক্ত হয়ে বললেন, "একটা ভাব নিয়ে থাকতে হয়, তাতে নিষ্ঠা চাই। হাজার 'লোক' থাকুক—তাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি না হয়—তাহলে তুমি নির্বাণকামী। বেশ, তাই হও। গীতাও বলছেন, 'শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা। সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥' (২।৫৩) নিশ্চলা বুদ্ধি হলে তবে যোগ ঠিক ঠিক হয়। সাধন ভজন খুব করলে একটা terra firma [দৃঢ় ভূমি] অবস্থায় পৌঁছানো যায়। 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' চাই। কেবল খোসা, বাহ্য ব্যাপারে রত থাকলে কি হবে?"

জয় বিজয় বৈকুণ্ঠ থেকে শাপগ্রস্ত হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন বলায় পূজনীয় মহারাজ বললেন, "ওসব ভগবানের লীলা।"

প্রশ্ন ঃ ঔপনিষদ্ পুরুষের (বৃ. উ. ৩।৯।২৬) জ্ঞান মুক্তির প্রযোজক। ভক্তের ঐ জ্ঞান কিভাবে হয়?

উত্তর ঃ কি মাথামুণ্ডু বলছ, ভগবানের সঙ্গে ঔপনিষদ্ পুরুষের তফাত কোথায়? ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা হলে ঔপনিষদ্ পুরুষকেই প্রত্যক্ষ করা হলো।

প্রশ্ন ঃ কৃপা কি?

উত্তর ঃ ভক্তের কাছে কৃপা, জ্ঞানীর পুরুষকার—ভাবের বিভিন্নতা। কৃপা বাতাস তো বইছেই, চিত্ত শুদ্ধ হলে কৃপা বোধ হয়। জগাই মাধাই প্রেমের স্পর্শ পেয়েছিল—তাতে তাদের চোখ খুলে গেল—চিত্তশুদ্ধি হতে লাগল, তখন কৃপা বুঝল। জ্ঞানীর ভাব, আমি মায়ের সন্তান। কৃপা আবার কি? As a matter of right মাকে পাব। মথুরের ছেলে ত্রৈলোক্য যেমন মায়ের জমিদারির টাকা দাবি করত। নিজেকে আর ভগবানকে তফাত বোধ না করা জ্ঞানীর স্বভাব। ভক্ত ভগবানের ওপর নির্ভর করে, জ্ঞানী নিজের (আত্মার) ওপর নির্ভর করে। জ্ঞানীর আত্মা ও ভক্তের ভগবান একই—ভাবটাই কেবল তফাত।

ভান করেও সময় সময় বালকের মতো বাহ্য আচরণ কেউ কেউ অনুকরণ করে। একটা গল্প আছে। এক রানী পরমহংস-পূজার জন্য বেরিয়েছিলেন। তারপর একজন সাধু তাঁর কোলে গিয়ে বসে, রানী তাকে খাওয়ান। পরে সাধু তাঁর কোলে বাহ্যে করে দেয়। শেষে রানী test (পরীক্ষা) করার জন্য সেই গু নিয়ে একটু তার মুখে যেই দিতে গেলেন, অমনি তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন।

ঠাকুরের চোখের পলক (ছয় মাস) পড়েনি। আয়না ধরে চোখে আঙুল দিয়ে দেখতেন, তবুও পড়ত না। বলতেন, "ওগো, আমার কি রোগ হলো গো।" মহাবায়ু উঠে দৈহিক সব নিয়ম উলট পালট হয়ে গেছিল।

হরি মহারাজের নিকট গেলাম। শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করায় বললেন—“শরীর—‘শীর্যতে ইতি শরীরম্’—যা ক্ষয় হয় তাই শরীর, ওর আর থাকাথাকি কি? কিন্তু স্বামীজী বলতেন, ‘এর মধ্যে মজা এই যে, এরি ভিতরে সেই আদত মাল রয়েছে।’ কিন্তু তিনি শরীরটার ভিতরেই যে আছেন তা নয়, বাহিরেও রয়েছেন—নিত্যই আছেন। ‘সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য অহম্ ইদম্ মম ইদম্ ইতি নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যবহারঃ।’ (অধ্যাসভাষ্যম্) ব্যবহার যা কিছু সব প্রকৃতির। মূল প্রকৃতিটার অনেকটা বিকৃত হয়ে এই সংসার হয়েছে, কিন্তু সবটা বিকৃত হয়নি। খানিকটা দুধ দই হয়েছে। বাকি দুধ দুধই আছে। ‘প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।’ (গীতা, ১৩।২০) অবিদ্যানাশ হলেই সংসার নাশ হলো, কিন্তু নির্বাণেতে মূল প্রকৃতিই নাশ হয়ে যায়। যে সমাধিতে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন লয় হয়, তাতেও মূল প্রকৃতি পর্যন্ত চলে যায়। জ্ঞানলাভের পর দেহ নাশ হওয়াই নির্বাণ। মুক্তি তো রয়েইছে, আত্মার তো কখনো বন্ধন হয়নি, তবে সেইটা জানা। কি যেন একটা ‘পেঁচ’ হয়েছে তাতেই সংসারদশা এসেছে। কিন্তু সেই ‘পেঁচ’টা জানতে পারলেই মজা। তখন ধোঁকার টাটি সংসার কেটে যায়।”

প্রশ্ন ঃ আমি দ্রষ্টা, আর এইসব দৃশ্য, এরূপ তো একটা ধ্যান হতে পারে।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এরূপ একটা সাধন আছে, মনই সব দেখে—মনই দ্রষ্টা—দেখছে আমার মনযন্ত্রই। কিন্তু ঐখানেই সব শেষ হলো না। “যত্র যেনানুভূয়তে তত্রৈব সাক্ষিত্বং” কিন্তু “যত্র যেন নানুভূয়তে তত্র সাক্ষিত্বং নোপযুজ্যতে” অর্থাৎ সাক্ষিত্বের ওপরে যেতে হবে। এসব কথা তো রোজ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না—“ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা” (মু. উ. ৩।১।৮) বুদ্ধিরও গোচর নন, কিছুরই গোচর নন। “শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ” (কঠ উ. ১।২।৭) ইত্যাদি। “আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ” (কঠ উ. ১।২।৭)।

শর্বানন্দ স্বামীর প্রশ্ন ঃ কুলকুণ্ডলিনী জাগলে কি কোন sensation হয়? উত্তরে হরি মহারাজ বললেন, “হ্যাঁ হয়। ঠাকুর বলতেন, ‘সাপের গতির মতো এঁকে বেঁকে ওঠে। উঠে পরমশিবের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। সাধারণ জীবের

লিঙ্গ গুহ্য নাভিতে স্থিতি হয়, তাতে আহার নিদ্রা রমণ ইত্যাদি হয়। তারপর হৃদয়ে ওঠে, সেখানে জ্যোতি দর্শন হয় কিন্তু সেখান থেকেও নামে। তারপর কণ্ঠে যায় সেখান থেকেও নামে—সে অবস্থায় ভগবৎ-কথা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। কিন্তু কণ্ঠ পার হয়ে গেলে আর নামে না। সে অবস্থায় খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে আসে—জ্যোতিতে জ্যোতি মিশে যায়। শরীর একুশ দিন মাত্র থাকে। তখন নানারকম দর্শন হয়। হৃদয়ে উঠলেই খাওয়া দাওয়া কমে আসে।" "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।"—মুখ দেখিয়ে বললেন, "এইটা প্রাদেশ পরিমাণ স্থান, এখানেই consciousness-এর (চৈতন্যের) বেশি প্রকাশ। স্বামীজীর সমস্ত দেহের জ্ঞানটা ঐ জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল—সে সময় শরীরটা অসাড় বোধ হয়েছিল, কিন্তু মুখটার মাত্র জ্ঞান ছিল। এই জন্য জ্ঞানীদের শরীর হাজার খারাপ হলেও মুখের উজ্জ্বলতা ঠিকই থাকে। ঠাকুরকে দেখেছি চলতে পারছেন না, পা এখানে ওখানে পড়ছে, শরীর জীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু মুখের কোন বিকৃতি নেই, মুখটা তম্‌তম্ কচ্ছে (জ্বল জ্বল করছে)।"

সরস্বতীপূজার প্রসাদ (বাসি) খেতে খেতে মহারাজ বললেন, "আহুতি দেই শ্যামা মাকে।"

হরি মহারাজ ঃ দেখ একই কর্মে কেউ বদ্ধ হচ্ছে, সাধক তাতেই মুক্ত হচ্ছে। সিদ্ধ পুরুষ "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" দেখছে। ভাবের তফাতে সব তফাত হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা তবে খারাপ কাজ (হীন কর্ম) বলে কি কিছু নেই?

উত্তরে বললেন ঃ না খারাপ বলে কিছু বলা যায় না। সাধক সব জিনিসকেই spiritualise (আধ্যাত্মিকভাবে রূপান্তরিত) করে ফেলে।

প্রশ্ন ঃ তন্ত্রের সব ব্যাপার নানা রকমের আছে যাকে এ দৃষ্টিতে হীন বলা হয়, সেগুলিও কি খারাপ নয়?

উত্তরে বললেন ঃ না সেগুলিও খারাপ নয়। যা ভগবানের দিকে নিয়ে যায়, তাই ভাল, আর যা সংসারের দিকে নিয়ে যায়, তাই খারাপ। গিরিশবাবু

একবার কর্তাভজাদের কথা নিয়ে ঠাকুরকে বলেছিলেন, "ওদের ওসবগুলো বড় খারাপ, ওর বিষয় নাটক লিখতে হয়। আপনি কি বলেন, ওসবগুলো খারাপ নয় কি?" ঠাকুর থাকতে না পেরে বললেন, "ও কথা কি করে বলি, দেখছি ওদের মধ্যেও সিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং খারাপ কি করে বলি! দ্যাখ, বাড়ি ঢুকতে পায়খানার দরজা দিয়েও তো ঢোকা যায়—মেথর তো সেই পথ দিয়েই ঢোকে। তবে তোমাদের ও পথ দিয়ে যেতে বলছি না।"

হরি মহারাজ conclude (সিদ্ধান্ত) করলেন ঃ "অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে বলি না, তবে লোক খারাপ বললেই যে, সে পথ দিয়ে ভগবানের দিকে যাওয়া যায় না, এ কথা কিছু বলা যায় না। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে কিছুই খারাপ নেই।"

ডি মেলোর পাগলামির কথা উঠল। হরি মহারাজ বললেন, "পাগলামিটা পবিত্রতালাভের একটা পূর্বাবস্থা যে নয়, এ কথা কে বলতে পারে? হরিশদা ও লাটু মহারাজের জীবনে ঐ রকম দিনকতকের জন্য হয়েছিল। নিরঞ্জন স্বামী হরিশদাকে বেজায় পাখা পেটা করেছিলেন, তাতে স্বামীজী বলেছিলেন, 'তুই গুণ্ডা, তোকে পুলিশে দেব।' এই বলে কাগজ নিয়ে কলম নিয়ে বসেছিলেন—দরখাস্ত লেখার জন্যে। 'আমাদের মধ্যে গুণ্ডার স্থান নেই, আয় শালা, আমার সঙ্গে আয় দিকি'—এই বলে ঘুষি পাকিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, 'সিদ্ধ হবার আগে ঐ রকম পাগলামি অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়।' কে জানে সিদ্ধ হবার আগে ঐ রকম একটা অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয় কিনা!"

মহারাজ বললেন, "যশোদার মুখ কৃষ্ণ চেপে দিলেন, ব্রহ্ম শব্দ মুখ দিয়ে বেরুল না (ভা. ১০।৮।৩৬-৪৩)। নারদকে উপদেশ দিতে এলেন, failure (বিফল) (ভা. ১।৬।১৬-২৮), কিন্তু দেবকী ও বসুদেবের উপদেশ পেয়ে মুক্তি হলো (ভা. ১০।৩।২৪-৪৫। দেবকীর স্তব)। ঠাকুর বলতে বলতে ডুকরে উঠলেন, ঘরশুদ্ধ লোক (১৫০।২০০) স্তব্ধ হয়ে গেল।"

"গোপালের মার কথা শুনে স্বামীজী কেঁদে ফেললেন, আর সব সত্য বলে বিশ্বাস করলেন। ঠাকুর স্বামীজীকে রহস্য করে বললেন, 'সে কি, তুই এসব কথা বিশ্বাস করলি?'

"প্রত্যেক রোমকূপে রমণজনিত যে রকম সুখ বোধ হয়, সে রকম সুখ হয়।"

যশোদাকে বিশ্বরূপ-দর্শন ও গোপালের বাল্য-লীলা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে ভরপুর হয়ে গেলেন। বললেন, "নবম স্বর্গ পর্যন্ত তুচ্ছ।"

রামলালার কথা উঠলো। হরি মহারাজ বললেন, "খই-এ ধান রয়েছে দেখে ঠাকুর বলতেন, 'মা যশোদা যে মুখে ক্ষীর সর দিতেন, আমি সেই মুখে খই দিচ্ছি, তাতে আবার ধান!' বলেই ভাবান্তর হলো। তিনি চড় মারতেন, বলতেন 'ঝাঁপাই ঝুড়িসনি।"

মধুরভাবের কথা উঠল। মহারাজ বললেন, "বড় শক্ত। শুনলে কাম চলে যায়। 'কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্' (ভা. ১০।৩১।০৭)। কামের কি সুখ? হাড় চিবিয়ে, দাঁতের রক্ত চেটে কুকুর যে সুখ পায়, সেখানেও বাস্তবিক আত্মসুখ।"

৩ এপ্রিল ১৯২১

আজ ভাগবত পাঠের পর এক ঘণ্টা ধরে হরি মহারাজ কথাবার্তা বলতে লাগলেন। বিষয়—প্রেমতত্ত্ব। প্রথমত বৃন্দাবনে থাকাকালীন প্রসিদ্ধ বাবাজীদের দর্শন সর্বদা করতেন। বাবাজীরা প্রায়ই গোঁড়া, কিন্তু কেউ কেউ উদার। গোঁড়ারা সময় সময় সন্ন্যাসী নাম শুনেই তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এক-আধজন উদারও পাওয়া গেছে। জনৈক উড়িয়া বাবাজীর নিকট একবার হরিবাসরে (একাদশী) হাজরার জন্য জল চাইতে গিছলেন। বাবাজী কিছুতেই জল দিতে চাইলেন না; বললেন, "জলাভাবে যদি হরিবাসরে মৃত্যু হয় সেও শ্রেয়ঃ তবু জল দেব না।" হরি মহারাজের তখন কম বয়স। খুব গালি দিয়েছিলেন, বাবাজী তবু চটেননি। বরং পরে যখন দেখা হয়েছিল, তখন খুব যত্ন করেছিলেন। কালনার ভগবানদাসের শিষ্য, জনৈক বাবাজীর বয়স ১২০ হয়েছিল, তালগোল পাকিয়ে গিছলেন, কিন্তু সংকীর্তন শুনলে ফুলে উঠতেন—স্বচক্ষে দেখেছিলেন। অনেক ভজনানন্দীও বাবাজীদের ভেতর দেখা যায়। ভগবানদাস নামব্রহ্ম মানতেন। সাকারে ঝোঁক ছিল না কিন্তু সগুণ মানতেন।

ক্রমে ভক্তি ও প্রেমতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ হলো। পূজনীয় হরি মহারাজ বললেন, "বৃন্দাবনে জীব গোস্বামী প্রথমে বড় শুষ্ক জ্ঞানী ছিলেন—তাঁর জ্যাঠা ও খুড়ো সনাতন ও রূপগোস্বামী কৌশল করে তাঁর যখন কুড়ি-একুশ বছর বয়স তখন একটা পনের-ষোল বছরের গোয়ালিনীর সঙ্গে তাঁর ভাব করিয়ে দেন। ক্রমে ভাব যখন জমে এলো তখন গোয়ালিনীটাকে সরিয়ে দিয়ে সেই প্রেম ঈশ্বরের অভিমুখী করবার জন্য উপদেশ করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর রসতত্ত্বের বোধ হলো; ভাব-ভক্তি পেলেন। উত্তম শিক্ষক হলে এমনি হয়। চণ্ডীদাস পড়ে কতদিন কেঁদেছি। চণ্ডীদাসেরও রজকিনীর ওপর প্রেম হয়েছিল, ক্রমে তিনি রজকিনীর মধ্যে ইষ্ট দেখেন, রজকিনীও তাঁর ভিতর ইষ্ট দেখেছিলেন। কারোর ওপর ভালবাসা থাকা দরকার। ঠাকুর প্রায়ই সবাইকে জিজ্ঞাসা করতেন, "কার ওপর তোর ভালবাসা আছে?" শরৎ মহারাজকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "কাউকে নয়", তাতে তিনি চটে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন "যা শালা, তুই ভারি শুষ্ক।" কারো ওপর ভালবাসা থাকলে সেটা ঈশ্বরের দিকে direct (নিয়ন্ত্রিত) করা যায়। যদি ভালবাসতে গিয়ে একটু কাম এসে পড়ে, তাতেও ক্ষতি নেই। যৌবনেই ভালবাসাদি ফোটে, বুড়ো বয়সে ওসব হয় না। তবে আর এক রকম আছে, কাম থেকেই ভালবাসা, সেটা হীন থাকের। কাম চরিতার্থ করা তার মুখ্য উদ্দেশ্য। বালককালেও সহপাঠিদের মধ্যে কারো কারো ওপর বিশেষ ভালবাসা হয়।

"আত্মার ওপর যে ভালবাসা—সর্বভূতে তিনি আছেন এই ভেবে যে ভালবাসা, সেটা খুব উঁচু থাকের বটে, তবে সেটা rare (দুর্লভ) জিনিস। সে হলে তো কথাই নেই। তা না হলেও কারোর ওপর ভালবাসা থাকাও খুব ভাল।"

৩ এপ্রিল ১৯২১

পূজনীয় হরি মহারাজ বললেন—"স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন—'হরি ভাই, এবার নূতন ব্রহ্মচর্য সৃষ্টি করব। শিবজ্ঞানে জীবসেবায় সে ব্রহ্মচর্য থাকবে। ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবা করে ধন্য হবে।' কিন্তু স্বামীজী বলে গেলে

কি হবে? আমাদের এমন অদৃষ্ট যে তা নেব না। ফুসমন্ত্রে যদি কিছু হয় আমরা তাই চাই। (রাধিকামন্ত্র নিয়ে আসবার জন্য জনৈক ব্যক্তি মঠে গিয়েছিল—সে প্রসঙ্গে সব কথা হতে লাগল।) তিনি বললেন, কিন্তু তা কি হয়? হরগৌরী একবার যাচ্ছেন। পথে শিবের একজন খুব ভক্তের সঙ্গে দেখা হলো। গৌরী বললেন, 'তুমি তো বড় নিষ্ঠুর, এ লোকটা তোমায় এত করে ডাকে, এর একটা কিনারা কর না।' শিব বললেন, 'আমি কি করব? ওর অদৃষ্টে নেই।' গৌরী বললেন, 'ও কি কথা? তুমি মনে করলেই দিতে পার। দিয়ে দেখ দিকি।' তখন শিব বললেন, 'আচ্ছা আমি দিচ্ছি, কিন্তু ওর বরাতে নেই, দিলেও হবে না।' এই বলে শিব একটা টাকার তোড়া বেঁধে সেই লোকটা যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, সেই পথের মাঝে ফেলে দিলেন। লোকটা এমনি বেশ যাচ্ছিল; কিন্তু যেখানে সেই তোড়াটা পড়ল তার একটু দূর থেকেই বললে, 'আচ্ছা অন্ধ লোকে কেমন করে যায় একবার দেখি।'—এই বলে চোখ বুজে সেই জায়গা দিয়ে যেতে লাগল। তারপর সেই স্থানটা পেরিয়ে যেমন চলছিল তেমন চলল। তাই দেখে শিব গৌরীকে বললেন, 'দেখলে অদৃষ্টের ফের।'"

৫ এপ্রিল ১৯২১

হরি মহারাজ বললেন—"স্বামীজী একবার আমেরিকায় লেকচার দিচ্ছিলেন। তাঁর শ্রোতার মধ্যে একজন রমণীকে খুব সুন্দরী বোধ হওয়ায় যেমনি তাকে দেখবার জন্য তার দিকে দ্বিতীয়বার চাইলেন অমনি একটা বাঁদরীর মতো (কুৎসিত) মুখ দেখতে পেলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, 'Higher power (উচ্চতর শক্তি) ওরূপ করে রক্ষা করেন।'"

পূজনীয় হরি মহারাজ বললেন—"আর একবার ওদেশে যাবার আগে স্বামীজী স্বপ্নে এক পরমাসুন্দরী নারীমূর্তি দেখেন, ঘোমটা দেওয়া। তাঁর কৌতূহল হলো মুখটা দেখার জন্য। স্বপ্নেই যেমন ঘোমটা তুলেছেন, অমনি দেখেন ঠাকুরের মুখ!

"স্বামীজীর রূপে ও সুমিষ্ট গলায় অনেক সাফল্য হয়েছিল। ওসব ঐশ্বরিক ব্যাপার। অমন সুমিষ্ট গলা আমরা শুনিনি। আর কি রূপ ছিল! চোখ ফেরানো যায় না। আর পবিত্রতা! তিনজন যুবতী সর্বদা তাঁর সঙ্গে মিশত দেখে মিশনারীরা এসে তাদের বাপের কাছে বলল, 'তোমার সমাজে নিন্দা হবে, এ লোকটা rogue etc. (ভণ্ড ইত্যাদি)।' কিন্তু তাদের বাপ বলল, 'এ লোকটা যদি ভণ্ড হয়, তবে তোমার ধর্ম মানি না, ঈশ্বর মানি না।'"

৮ এপ্রিল ১৯২১

হরি মহারাজ বললেন—"গতকাল রাত্রে যখন কানের যন্ত্রণায় খুব কষ্ট হচ্ছিল তখন উঠে বসলুম—প্রাণবায়ু সম করে মনকে সমভাবে ধারণ করলুম। Rhythmical breath (শ্বাস-প্রশ্বাস ছন্দোময়) হলো। দেহ থেকে মন উঠল। তখন মনে হতে লাগল কোথায় যেন যন্ত্রণা হচ্ছে। 'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম।' সম হচ্ছে ব্রহ্ম। একটুতেই অধৈর্য হলে চলবে না, সেটা জ্ঞানীর লক্ষণ নয়, আবার ভক্তেরও লক্ষণ নয়। ভোগীর লক্ষণ। ঠাকুরের যখন খুব যন্ত্রণা তখন একদিন ইশারা করে দেখিয়ে বললেন 'ভারি কষ্ট'। আমায় কিন্তু দয়া করে দেখাচ্ছেন সচ্চিদানন্দ মূর্তি। সুতরাং আমি বললাম sincerely (অকপটভাবে) 'না আপনার আবার কষ্ট কই।' প্রথমটা বললেন, 'ওই তোমাদের এক কথা।' খানিক চুপ করে থেকে খুব খুশি হয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছ।' বললেন, 'দুঃখ জানে আর দেহ জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো।' সেই সব দেখেছি কিনা। সেই জন্য এখন কাতর হই না। তোমরা একটুতে এলিয়ে পড়, ওটা ভাল নয়। ভাববে আমি আত্মা, জোর করে সব তাড়িয়ে দেবে তাহলে সব পালাবে, না হলে সব চেপে ধরবে। আর যদি নিজেকে ভক্ত ভাবো, তাহলেও এলিয়ে পড়া উচিত নয়। 'তারকাশ্চর্বয়ামঃ, রামকৃষ্ণতনয়া বয়ম্।'—এই ভাব হবে। এলিয়ে পড়াটা না জ্ঞানীর ভাব, না ভক্তের ভাব—ওটা ভোগীর ভাব।"

রাত্রে অনেক কথা হলো। পূজনীয় হরি মহারাজ বললেন—"বিয়ে করব না এটা ছোটবেলা থেকে ধারণা। আমার খুব অল্প বয়স তখন গঙ্গাধরকে

বলেছিলুম 'দেখ, সকল স্ত্রীকে মা বলতে পারি।' সে বললে, 'আমি একজনকে বাদে সবাইকে পারি।' যখন বার তের বছর বয়স তখন ঠাকুরের দর্শন হয় বটে, কিন্তু যখন পনের ষোল বছর তখন বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মেশা হয়। সেই ক-বছরের মধ্যে একদিন কেবল তাঁকে গেরুয়া পরে জপ করতে দেখেছিলাম। ভক্তদের ইচ্ছা হয় নিমাই-সন্ন্যাস কেমন হয়েছিল একবার দেখবেন। তাই তিনি একদম নেড়া হয়ে দাড়ি গোঁপ ফেলে গেরুয়া পরে রুদ্রাক্ষ মালা জপ করছিলেন। আমিও দেখি এবং মহাপুরুষও বলেন যে তিনিও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি কয়েকজনকে গেরুয়া দিয়েছিলেন। গোপালদা তাঁর কাছে থাকাকালীন অনেক সময় গেরুয়া পরতেন। ভজন করতে খুব বলতেন। কানে মন্ত্র দিতেন কিনা ঠিক জানি না। তবে জেনে নিতেন, বলতেন 'তোর কোন্ মূর্তি ভাল লাগে?' তারপর একটা suggest (প্রস্তাব) করতেন। আমি বাড়িতেই মন্ত্র নিয়েছিলুম। তিনি একদিন সে কথা জিজ্ঞাসা করলেন, আর যে মূর্তি ধ্যান করি এবং যে মন্ত্র জপ করি, সব তাঁকে বললুম। তিনি দু-একটা কথা suggest (প্রস্তাব) করলেন। তবে নির্জনে নিয়ে গিয়ে বুক ছুঁয়ে দিতেন। তাতে দর্শনাদি হতো এসব জানি। তাঁকে পৈতা পরতে কখনো দেখিনি। তবে তাঁর মুখে শুনেছি ভট্টাচার্যদের ভয়ে সময়ে সময়ে একটা পৈতা পরতেন। কিন্তু সেটা আপনিই খসে যেত। ঘর ঝাড়ু দেবার সময় হয়ত খুঁজে পাওয়া যেত।"

১১ এপ্রিল ১৯২১

হরি মহারাজ বললেন—"রূপদর্শন হলেই হয়ে গেল বা রূপদর্শন না হলে spiritual advancement (আধ্যাত্মিক উন্নতি) হচ্ছে না, এসব কথা ঠিক নয়। যদি কোন ভক্ত দেখতে চায়, তিনি দেখিয়ে দেন। কিন্তু এমন লোক দেখেছি যিনি রূপাদি দেখেননি অথচ খুব উন্নত। তখন পবিত্র আনন্দ অনুভব হবে। অনুভব আর কি, সেটা তো আছে, খুলে যাবে। আত্মরূপে তাঁর উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। রূপটুপও মিথ্যা নয়। তাঁর জগতে কি হতে পারে আর কি পারে না, কিছু বলা যায় না। তবে সমাজস্থিতির জন্য এসব মত প্রচার করা ঠিক নয়— ব্যভিচার হতে পারে। কিন্তু Truth is truth–deny (সত্য যা, তা সত্য—

অস্বীকার) করা যায় না। ন্যায় অন্যায় কিছুই বাস্তবিক নেই। সবই ব্যবহারিক দিক থেকে সত্য।

"গান্ধী স্বামীজীকে ঠিক বুঝেছেন—তাঁর line-এ (প্রদর্শিত পথে) work (কাজ) করছেন।

"ভক্তের মধ্যে ভগবানের ঐশ্বর্য এসে পড়ে। খুব সাত্ত্বিকভাব বৃদ্ধি হলে সেইগুলি ফোটে। ভক্ত ভগবানের চেয়ে বড়। নারদ একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'প্রভু আপনার চেয়ে কেউ বড় আছে কি?' ভগবান বললেন, 'এই তোমরাই আমার চেয়ে বড়। আমি অনন্ত, কিন্তু সেই আমাকে তোমরা হৃদয়ের এক কোণে পুরে রেখেছ।'

"সারূপ্যাদি মুক্তিতে ভগবানের অলঙ্কার বা অস্ত্রাদি হয়ে থাকা।"

১৪ এপ্রিল ১৯২১

পূজনীয় হরি মহারাজ বললেন, "বন্ধন মানে বাঁধা, মুক্তি হচ্ছে সেইটি খুলে দেওয়া। সকলেরই এক একটি গ্রন্থি আছে, শাস্ত্রে যাকে হৃদ্‌গ্রন্থি বলে, মা সেইটি খুলে দেন। এখন মুক্তি ও বন্ধন সম্বন্ধে যা জানছো সেইটি বন্ধন। বন্ধনের ভিতর থেকে মুক্তি জানা যায় না। মুক্ত হলে বন্ধন দেখতে পাওয়া যায় না।

"ভগবান মুচকুন্দকে বললেন, 'রাজন, তুমি অনেক হিংসাদি কার্য করেছ; সেই প্রারব্ধ কর্মক্ষয়ের জন্য মুক্ত হয়ে পর্যটন কর। আগামী জন্মে ব্রাহ্মণ শরীর লাভ করবে। —(ভা. ১০।৫১।৬৩)

"সেই শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় যাওয়া চাই।

"তোমরা একটু করলেই হয়ে যায়। প্রবাহপতিত—যে স্রোতে পড়েছ, একটুতেই হয়ে যাবে। এ সুযোগ সকলের ঘটে না। এ সুযোগ নষ্ট করতে নেই।

"বন্ধনদশায় থেকে জীব মোক্ষের ধারণা পর্যন্ত করতে পারে না। মুখে

বললে হবে কি মোক্ষটা বুঝেছি। জগদম্বার কৃপায় যার বন্ধন ছুটে যায়, সেই বুঝতে পারে। সকল জীবহৃদয়ে একটা ফাঁস, বন্ধনের পাশ আছে। তাকে হৃদ্‌গ্রন্থি বলে। ওসব কবির কল্পনা নয়—যথার্থই ফাঁস। যার সেই বন্ধনপাশ কেটে যায়, সে তখন ভাবে বন্ধনটা হলই বা কেমন করে, আর গেলই বা কেমন করে! এসব তর্কের ব্যাপার নয়। ধীরভাবে বুঝতে হবে। শাস্ত্রজনিত শুভ সংস্কার মনে জমাতে হবে। সকল আসক্তি ছাড়তে হবে। আসক্তিটাই তো বন্ধন। জীবকে কোন না কোন বিষয়ে এই আসক্তিই বেঁধে রেখেছে। যখন আসক্তি চলে যাবে, তখন স্পষ্ট বোধ হবে একটা মস্ত বন্ধন খুলে গেল। এসব বিষয় খুব আলোচনাও ভাল, শুনে রাখলে ঠাকুর বলতেন, পরে কাজে লাগবে। সেগুলো মিলিয়ে নিতে পারবে। সত্ত্বগুণ মোক্ষের দিকে খুব এগিয়ে দেয়। সত্ত্বগুণ বাড়ানো চাই, এই জন্যই মুচকুন্দকে ভগবান বললেন, 'তুমি ক্ষত্রিয়জন্মে মৃগয়াদিতে অনেক পশুবধ করেছ। তপস্যা কর। পরজন্মে ব্রাহ্মণকুলে জন্মাবে।' ভগবৎ-সাক্ষাৎকার মাত্রেই মুচকুন্দ মুক্ত হয়ে গেল সত্য। তথাপি যে—দেহধারণ, সে দেহধারণ বন্ধনজনিত নয়, জীবন্মুক্তি অনুভবের জন্য। 'তাঁর' হয়ে গিয়ে যদি কেউ দেহধারণ করে তবে তার দেহাভিমান থাকে না—সে মুক্ত হয়ে সংসারে থাকে। তোমাদের ধারণা মুক্তি হলেই লয় হওয়া চাই। তা নয়। অভিমান যাওয়ার নামই মুক্তি—তাছাড়া মুক্তি আর কার নাম?"

২০ এপ্রিল ১৯২১

স্বামীজী হরি মহারাজকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চাইলে হরি মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন, "কি করতে হবে বল?" তিনি প্রথমে বলেছিলেন—"আমি কি বলব, মা বলে দেবেন যা করতে হবে। কাজ আমার না তোমার!" তারপর দু-চারটি কথা বলেন। প্রথম বলেন—"Forget India" (ভারতকে ভোল), দ্বিতীয় বলেন—"আশ্রম কর", তৃতীয় বলেন—"Live the life of renunciation" (ত্যাগীর জীবন যাপন কর)।

হরি মহারাজ বললেন—"আমি প্রথমটায় আমেরিকায় যেতে চাইনি। দেহটা

ও দেশে যায় এ আমার ইচ্ছা নয়। পরেও একশবার ডেকেছে কিন্তু তবু গেলাম না।"

"স্বামীজী বলেছিলেন, 'তোমরা আমার ভাব নিতে পারলে না—কিন্তু কেউ না কেউ নেবে।'"

২৫ এপ্রিল ১৯২১

কেমন গরম ইত্যাদি প্রসঙ্গে হরি মহারাজ বললেন—

সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্বকম্।
চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥" —বিবেকচূড়ামণি ২৪

তিতিক্ষা আবশ্যক। শ-ষ-স, যে সয় সেই রয়—যে না সয় সে নাশ হয়। আমি বললুম, "ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিত হলে তো সব আপনিই সহ্য হয়।" তাতে বললেন, "প্রথম থেকেই তো আর ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। অভ্যাস করতে হয়।" আমি বললুম, "অনেক লোক এমন আছে যে সব সইতে পারে অথচ ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি, সে রকম সইলে লাভ কি?" মহারাজ বললেন, "তা নয়, উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ ইত্যাদি। তবে গোড়ায় গোড়ায় সহ্য অভ্যাস করা আবশ্যক, তা না হলে কষ্টের সীমা থাকবে না। Face the brute (নিজের পশুভাবের সম্মুখীন হও), স্বামীজী বলেছিলেন এই কথাটা তাঁর জীবনে অদ্ভুত আলো দিয়েছিল। আমি একবার উজ্জয়িনীতে ছিলাম তখন খুব গরম। দ্বিপ্রহর রৌদ্রে যখন কেউ বেরোয় না, আমার হঠাৎ সেই সময়ে বেড়াবার ইচ্ছা হলো। আমি বেরোলাম। কিছু দূর গিয়ে পায়ে ফোসকা হলো। তবুও চলেছি। হঠাৎ একটা দোকানদার, ভারি ভক্ত, সে ছুটে এসে পায়ে ধরলে—তার দোকানে নিয়ে গেল। সরবত খাওয়ালে—যেন কষ্টটা তারই হচ্ছিল এমন অনুভব করে আমায় নিয়ে গেল। বাহিরে বেরোলে যখন কেউ সাহায্য করার থাকে না তখন তিনিই দেখেন। ঠিক ঠিক নিষ্কিঞ্চনভাব এলে তিনি রক্ষা করেন—তাঁর হাত অনুভব হয়।"

২৬ এপ্রিল ১৯২১

হরি মহারাজ বললেন—"স্বামীজী বলতেন, 'ভীষ্ম হচ্ছে মহাভারতের hero (নায়ক)।' ভীষ্মকে বেশি পছন্দ করতেন। আমরা যুধিষ্ঠিরকে বড় মনে ভাবতাম। তিনি বলতেন, 'ওটা প্যানপ্যানে। শিব হচ্ছেন মহাভারতের দেবতা।'"

১০ মে ১৯২১

হরি মহারাজ বললেন—"ঠাকুরের সামনে শশী মহারাজ একখানা নূতন কাপড় জোরে ছিঁড়েছিলেন। ঠাকুর চমকে উঠে বলেছিলেন, 'করলি কি? খবরদার করিসনি। এর ভিতর যিনি আছেন তিনি ফোঁস করে উঠে ছুবলে দিবেন। সাবধান।'"

১৫ মে ১৯২১

হরি মহারাজ বললেন—"ঠাকুর একবার একঘর লোকের সামনে শশধর তর্কচূড়ামণিকে দেখে বলেছিলেন, 'দেখগো শশধর ভূয়ো পণ্ডিত নয়। যেন একটা বীরাচারী সাধক।' তখন শশধর তর্কচূড়ামণি সজলনয়নে বলেছিলেন, 'মহাশয়, আমি দর্শন পড়ে শুষ্ক হয়ে গেছি। আমায় একটু ভক্তি বিশ্বাস দিন।' ঠাকুর বলেছিলেন, 'হবে হবে।'"

"শশধর আরও বলেছিলেন, 'মহাশয়, আপনাদের মতো লোকের মুখ দিয়েই বেদ-বেদান্ত বাহির হয়েছিল।'"

হরি মহারাজ বললেন—"ভগবান, ভগবান করে মরে যাওয়াও ভাল, তবু ছাড়া উচিত নয়। চাতক, সাতসমুদ্র ভরপুর, তবুও 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' বলে চেঁচায়। স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্য অপেক্ষা করছে—অন্য জল খাবে না। বলে—অন্য জলে সব ধুলো। ভক্তও ভগবান ছাড়া বিষয়ে মজবে না। আগে তিনি, পরে বিষয়।"

(উৎস ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর প্রসঙ্গ)

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতিকথা

স্বামী নির্বাণানন্দ

মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) ব্যক্তিত্বের একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) বলতেন ঃ "মহারাজ যেখানে থাকেন সেখানে উনি একটা atmosphere create করে বসেন এবং সেখানে যদি কেউ যায়, তার মনে যে ভাবই থাক না কেন, তা ভুলে গিয়ে সে মহারাজের ভাবে ভাবিত হবেই। এটা মহারাজের একটা বিশেষ ক্ষমতা।" দেখেছি অনেকে মনে অনেক অশান্তি নিয়ে মহারাজের কাছে গেছে। অনেকে হয়তো মনে করেছে—একটু ভগবানকে ডাকি, কিন্তু মনকে ঠিক করতে পারছে না, মন চঞ্চল; তাঁকে জিজ্ঞেস করতে গেছে, কিন্তু গিয়ে কোন প্রশ্ন করতে আর সাহস পাচ্ছে না। এমনভাবে চুপ করে তিনি বসে আছেন যে, প্রশ্ন করবার সাহস হচ্ছে না, অথচ তাঁর কাছেই বসে রয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছে—মহারাজও চুপ করে বসে আছেন। হয়তো একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা, দুঘণ্টা বসবার পর তারা প্রণাম করে চলে গেল। যাবার সময় তারা অনুভব করছে, যে ভাব বা মানসিক অশান্তি নিয়ে তারা এসেছিল, তা ধীরে ধীরে চলে গিয়েছে। তাদের মন শান্ত হয়ে গিয়েছে। যাদের মন চঞ্চল হচ্ছিল, ভগবানকে ডাকতে পারছিল না—তাদের মন স্থির হয়ে এল। এই রকমই তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল। এ ধরনের ঘটনা আমরা অজস্রবার দেখেছি।

১৯২১ সাল। কাশীতে অদ্বৈত আশ্রমে রয়েছেন মহারাজ। ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব (১১ মার্চ)। মহারাজ ঠাকুরের পুরনো ফটো পালটে নতুন ফটো স্থাপন করলেন। ষোড়শোপচারে পূজা শেষ হলে আরতি হলো। আরতির পর স্তবপাঠ হলো। তারপর মহারাজ একটি ভজন গাইতে বললেন। সবাই মিলে ভজন গাওয়া হচ্ছে। হঠাৎ মহারাজ উঠে পড়লেন। উঠে গাইতে গাইতে

ভাবে নৃত্য করতে লাগলেন। সেখানে তখন হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ও খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) ছিলেন। সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। আমি একপাশে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলাম। তখন সেখানে প্রায় ৬০-৭০ জন সাধু ছিলেন এবং ২০০-৩০০ জন ভক্ত। ভক্তদের মধ্যে ছোট-বড়, বালক-বালিকা, মেয়ে-পুরুষ সব রকম ছিল। ঐভাবে নৃত্য করতে করতে মহারাজ এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করলেন যে, সাময়িকভাবে প্রত্যেকে অন্য একটা জগতে চলে গেল, এই জগৎটার কথা সবাই ভুলে গেল। এমনকি ৭-৮ বছরের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত যেন জগৎ ভুলে গেল। এমন একটা at-mosphere হয়েছে যেন সকলের কাছেই এই জগৎটা নেই। তারপর একটা ঘটনা ঘটল। একজন ভক্ত হঠাৎ মহারাজের সামনে এসে হরি মহারাজকে বলল ঃ "মহারাজ, দেরি হয়ে গেলে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" তাতে হরি মহারাজ এবং ভক্তরা তাকে খুব ধমক দিলেন। হরি মহারাজ পরে বলেছিলেন ঃ "মহারাজ তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতি চেপে রাখেন। আজকের মতো এ রকম বড় একটা হয় না। অল্প সময়েই মহারাজকে এইভাবে পাওয়া যায়—আজ একটা আনন্দের হাট বসিয়েছিলেন, আমাদের সকলের মনকে কত উঁচুতে তুলে দিয়েছিলেন!"[১]

মহারাজ দক্ষিণ দেশে রামনাম-সঙ্কীর্তন শুনেছিলেন। সে সুর অন্য ছিল। উনি এখনকার (মঠে) প্রচলিত সুন্দর সুর-সংযোজন করেছেন। প্রথমে অন্য রকম করেছিলেন। ১০৮ রামনামের আগে পরে যে স্তবকগুলি সংযোজিত হয়েছে তা মহারাজের নির্দেশে হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) করেছিলেন। বিষ্ণুদিগম্বর যখন 'কনকাম্বর' গাইতেন তখন সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত। আহা সে কী ভাব! সুরটি ইমনকল্যাণ।

মহারাজকে পিছন থেকে ঠিক ঠাকুরের মতো লাগত, ঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদরা বলতেন। একদিন হরি মহারাজ দেখেন, ঠিক যেন ঠাকুর বেড়াচ্ছেন।

---

১ স্বামী নির্বাণানন্দ প্রদত্ত এই ঘটনাটির বিস্তৃততর বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ব্রহ্মানন্দচরিত—স্বামী প্রভানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় সং, ১৯৯৫, পৃঃ ২১৪।—সম্পাদক

কাছে গিয়ে দেখেন মহারাজ। রাজা মহারাজ বেশ লম্বা-চওড়া ছিলেন। সেই রাজা মহারাজকে ঠাকুর অনায়াসে কাঁধে তুলে নিতেন।

হরি মহারাজ একদিন বলেছিলেন ঃ "মহারাজের তপস্যা আপনা থেকেই হয়ে যেত। চরম অন্তর্মুখী মন। সন্ধ্যা সাতটায় জপ করতে বসলেন, সকাল আটটায় উঠলেন।"

ঠাকুরসেবা, গুরুসেবা, সাধুসেবা খুব কঠিন। মনে অহঙ্কার থাকলে সত্যিকারের সেবা হয় না। যত অহংশূন্য হওয়া যাবে ততই সেবা সার্থক হবে। অহঙ্কার নিয়ে সেবা মহা অনর্থকর। ঠাকুরকে আমরা দেখিনি, কিন্তু ঠাকুরের সন্তানদের আমরা দেখেছি। তাঁদের কাছে শুনেছি ঠাকুরের সেবা করতে করতে তাঁদের যেন একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তৈরি হয়েছিল। মুখ ফুটে বলার আগেই ঠাকুরের কি প্রয়োজন তা তাঁরা বুঝে ফেলতেন। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) বলতেন ঃ "যে সেবক, তাকে যদি সবসময় বলতেই হয়—কী দরকার, তাহলে সেই সেবক অধম সেবক। বলার আগেই যে বুঝে ফেলে, সে উত্তম সেবক।" মহারাজ বলতেন ঃ "যে সেবককে প্রয়োজনের কথা বলতে হয়, সে অধম সেবক; যে সেবক নিজে থেকেই সেব্যের প্রয়োজনমত সবকিছু করে, সে মধ্যম সেবক; আর যে সেবক রুটিন সেবার বাইরে সেব্যের ইচ্ছা ও প্রয়োজন বুঝে নিয়ে সেবা করে সে উত্তম সেবক।"

একবার কাশীতে হরি মহারাজের সাথে নির্বাক ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। তখনও talkie হয়নি। ছবিটির নাম Les Miserables। দেখলাম এক অপরাধী, জনৈক বিশপের দামি দীপদানি চুরি করে নিয়ে গেল, পুলিশ ধরলো, দেখে চিনতে পারলো, এটি মহামান্য বিশপের চুরি যাওয়া জিনিস। তাকে ধরে নিয়ে এল। বিশপ তাকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি সস্নেহে বললেন ঃ "বন্ধু, তুমি আমার দেওয়া উপহারের মধ্যে একটা ফেলে গিয়েছো।" তাঁর কাছে আর একটা দীপদানি ছিল, সেটাও তাকে দিয়ে দিলেন। কেমন সপ্রেম দৃষ্টিভঙ্গি। আর সেই অপরাধীর মনও তাতে পরিবর্তিত হলো। সে বুঝল মহান বিশপের দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভব করলো তাঁর গভীর ভালবাসা। তার জীবন পালটে

গেল। পওহারীবাবা ভগবানকে ডেকে কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আশ্রমে চোর এসেছে। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ার ভয়ে জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। আর পওহারীবাবাও তার পিছনে পিছনে ছুটছেন, জিনিসগুলি দেবার জন্য। শেষে সেই চোর সাধু-সংস্পর্শে এসে সাধু হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা উঁচু sphere-এ থাকেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এই রকমই থাকে। সাধককে অভ্যাস করে তা অর্জন করতে হয়। সাধন মানেই হচ্ছে সিদ্ধির লক্ষণটিকে অনুশীলন করা।

কাশীতে তখন হরি মহারাজ থাকতেন। পিঠে ভীষণ কার্বাঙ্কল। কলকাতা থেকে নামকরা সার্জন ডাঃ ভট্টাচার্য গেছেন অপারেশন করতে। গিয়ে দেখেন সদানন্দ পুরুষ হাসিমুখে বসে আছেন। আনন্দ যেন তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরে পড়ছে। হরি মহারাজ অনেকক্ষণ ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করলেন। গল্প শুনতে শুনতে ডাক্তার ভুলে গেলেন তিনি রোগী দেখতে এসেছেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পরে বললেন ঃ "আমি এসেছি আপনার শরীরে অপারেশন করতে।" তখন হরি মহারাজ আস্তে আস্তে তাঁর গায়ের চাদর উঠিয়ে ফোড়াটি দেখালেন। ডাক্তার দেখে চমকে উঠলেন। বললেন ঃ "মহারাজ আপনি কি করে এত বড় ফোড়া নিয়ে বসে গল্প করছেন!" তিনি বুঝতে পারলেন না যে কি করে শরীরে এত কষ্ট সত্ত্বেও মন এত আনন্দে মগ্ন।

(উৎস ঃ দেবলোকের কথা ও ব্রহ্মানন্দ-সেবক নির্বাণানন্দ)

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি

স্বামী শর্বানন্দ

১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে মায়াবতী থেকে চার বছর পর বেলুড় মঠে ফিরে এলাম। রাজা মহারাজের শ্রীচরণে উপস্থিত হয়ে আনন্দে মন ভরে গেল। মহারাজ তখন মোটামুটি ভালই ছিলেন। চার বছর পর আমাকে দেখে ও কাছে পেয়ে তার যেন আনন্দের সীমা ছিল না। কাছে বসিয়ে স্নেহভরে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। সাধন-ভজনের কথা শুনে খুব খুশি হয়ে বললেন—"তোমার তেজপুঞ্জ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক। মহাবীর্য অবলম্বন করে ঠাকুর স্বামীজীর কাজে জীবন সার্থক হোক। আবার বলতে লাগলেন—সামনেই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম উৎসব, ঐ পবিত্র দিনে তোমায় সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা দেব।"

সন্ন্যাসের আগের দিন সকালে মস্তক মুণ্ডন করে, শিখা সূত্র ত্যাগ করে, উত্তরীয় ধারণ করে নিজের শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সমাপন করে, আনন্দে অধীর আগ্রহে সন্ন্যাস দীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। মহারাজ আমাদের কাছে ডাকলেন। আমি, গোকুলানন্দজী ও আর একজন ব্রহ্মচারী তাঁর কাছে গিয়ে কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে রইলাম।

তিনি আমাদের বললেন—"সংসারে আজ থেকে তোমাদের মৃত্যু হলো। কাল থেকে নতুন জীবন আরম্ভ হবে। ব্রহ্মবীর্যে প্রদীপ্ত হয়ে তোমরা বহ্নিশিখার মতো স্বামীজীর আদর্শে জগতের হিতসাধনে ব্যাপৃত হবে। 'ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ত্বমানশু।' কাল তোমরা মনুষ্য জীবনের সার্থক ব্রত গ্রহণ করবে, ধন্য তোমার বংশ, ধন্য তোমাদের জননী—'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।'"

পরদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি, ব্রাহ্মমুহূর্তেই আমরা তিনজন গঙ্গায় স্নানাদি সেরে মহারাজের শ্রীচরণ বন্দনা করে, তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে প্রণামাদি সেরে মঠের উঠোনে যে পুরনো চালাঘর ছিল; সেখানে উপস্থিত হলাম। ঐ ঘরেই আমাদের সন্ন্যাস হয়।

সন্ন্যাসদীক্ষার অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) নিজে ঋত্বিক হয়েছিলেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ, শ্রীমহারাজ ও অন্যান্য বড়রা সকলে যজ্ঞকুণ্ডের চারপাশে বসেছিলেন। বিরজা হোমের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানদের মধ্যে যাঁরা সে সময় বেলুড়ে ছিলেন, সকলেই হোমের স্থানে গৈরিকের জ্যোতিতে ঘরটি যেন উদ্ভাসিত করেছিলেন। সন্ন্যাসী ছাড়া এ হোমে কারও আসবার বা দেখবার অধিকার নেই। মহারাজরা সব চারিদিকে গোল হয়ে বসেছিলেন—আর হরি মহারাজ আমাদের মন্ত্র পাঠ করাচ্ছিলেন। শেষ রাত্রে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছিল, আগের দিনই সব ঠিক করা ছিল। আমরা সকলে সমস্বরে হরি মহারাজের সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলাম। সে এক অদ্ভুত পরিবেশ, বাহ্য জগতের জ্ঞান তখন থাকে না। কী এক চরম ও পরমপ্রাপ্তি ঘটে তা ভাষায় বলবার নয়। ঘরের সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ, এ মন্ত্রের আওয়াজ যাতে বাইরে না যায়। সন্ন্যাসের মন্ত্র সন্ন্যাসী ছাড়া কারও শোনা নিষিদ্ধ। কী এক প্রেমের ও আনন্দের রাজ্যে আমরা উপস্থিত হলাম তা অবর্ণনীয়।

মে মাসে ঠিক হলো মহারাজ পুরী যাবেন। মহারাজ জানালেন তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। শরৎ মহারাজ আমায় পুরী যাবার অনুমতি দিয়ে বললেন—"ওরে মহারাজ যে ঠাকুরের মানসপুত্র, আমরা মহারাজকে ঠাকুর বলেই ভক্তি করি। তোর মহাভাগ্য যে তুই সাক্ষাৎ ঠাকুরের সেবার সুযোগ পাবি। আধ্যাত্মিক জগতের চাবিকাঠি কিন্তু মহারাজের হাতেই আছে জানবি।" এভাবে শরৎ মহারাজ আমাকে নানা কথা বললেন, তারপর আমায় নিয়ে মঠে গেলেন।

অবশেষে পুরী রওনা হবার দিন উপস্থিত হলো। মহারাজের সঙ্গে আমরা

অনেকেই যাব স্থির হলো। কেদার-বাবা (স্বামী অচলানন্দ), নীরদ মহারাজ ও নলিনীকে নিয়ে আমরা পাঁচজন রওনা হলাম। মহারাজ পুরী গেলে শশীনিকেতনে থাকতেন। এই শশীনিকেতন ছিল শ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপাধন্য শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়দের আত্মীয়ের বাড়ি। বলরামবাবুর বাড়ি তো ভক্তদের কাছে আজও বলরাম মন্দির বলেই খ্যাত। ঠাকুরের সন্তান বা মঠের যে কেউ পুরী গেলে শশীনিকেতনেই থাকতেন। শ্রীমহারাজকে বলরামবাবু ও তাঁর পরিবারস্থ সকলেই অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন।

মহারাজের সঙ্গে সেবার পুরীতে একটানা সাত মাস অর্থাৎ নভেম্বর মাস পর্যন্ত থাকা হয়। এই সময়টা আমার সবচেয়ে আনন্দে কেটেছে। গভীরভাবে সাধন-ভজনের সুযোগ পেয়ে শ্রীগুরুর কৃপায় ওখানেই সাক্ষাৎ ঠাকুরের আবির্ভাব হয়েছিল। নিত্য জপধ্যান, দেবদর্শন ও মহারাজের সেবা ছাড়া কোন কাজ ছিল না।

৩ জুন হরি মহারাজ পুরীধামে গিয়ে শশী নিকেতনে মহারাজের সঙ্গে ছ-মাস থাকেন। সেই সময় অমূল্য মহারাজও পুরীতে যান।

জুন মাসে পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হয়। আমরা সকাল থেকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পহুণ্ডি ও স্নানবেদিতে বাইরে এনে স্নান দেখবার জন্য বারবার মন্দিরে যাওয়া আসা করছিলাম।

স্নানযাত্রার দিন শ্রীমহারাজ একটু অসুস্থ ছিলেন। অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ) ও আমি মহারাজের সেবার কাজ করছিলাম।

সকাল থেকে অমূল্য মহারাজ তিনবার মন্দিরে গিয়েছিলেন। তিনি হরি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কবার মন্দিরে গেছেন? হরি মহারাজ আঙুল দিয়ে দেখালেন, পাঁচবার। আমিও বললাম পাঁচবার গিয়েছি। হরি মহারাজ ইশারা করলেন আবার বেরিয়ে পড়তে। অমূল্য মহারাজকে রেখে আমি হরি মহারাজের সঙ্গে গেলাম। ফিরতে আমাদের সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। আমি তো ভয়ে ভয়ে ঢুকছি এই ভেবে যে, বেলা তিনটায় মহারাজকে একটি ওষুধ খাওয়াবার কথা ছিল। কিন্তু অমূল্য মহারাজকে তো বলে যাইনি, নিজেও

আসিনি। বাড়ি ফিরে শুনলাম মহারাজ বলছেন, "আমি কী আর ওদের পরোয়া করি?"

আমি তো ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকে মহারাজের এটা ওটা কাজ করছি। সন্ধ্যার ওষুধটা দিতে গেছি, মহারাজ নীরবে এড়িয়ে গেলেন। আমি তখন পিতার কাছে পুত্রের মতই আবদার করে বললাম, "মহারাজ আমি বুঝতে পারিনি, আর কখনও কোন কাজ ফেলে কোথাও যাব না।" মহারাজের দুচোখে অশ্রু, আমায় কাছে ডেকে নীরবে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। সেদিনই সন্ধেবেলা মহারাজের পা জ্বালা করছিল। আমি কাঁসার বাটি ঠাণ্ডা জলে খুব ঠাণ্ডা করে নিয়ে মহারাজের পায়ে লাগাতে লাগলাম। মহারাজের তাতে খুব আরাম হলো ও ঘুম এসে গেল। পরের দিন সবাইকে বললেন আমার সেবার কথা। হরি মহারাজ বললেন—"রাজা ভাই, তুমি রাগ করেছিলে তাই অমন ভালো করে তোমার সেবা করলো।" আমি লজ্জায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আর একটা ঘটনা মনে পড়ে। ঠাকুরের সন্তানদের সহনশীলতা, দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা ও স্পর্শ যারা পেয়েছে তাঁরা শ্রীঠাকুরেরই স্পর্শ পেয়েছে। হরি মহারাজের চোখ উঠেছিল। তাই তাঁর চোখে রোজই আমি গোলাপ জল দিয়ে মিশিয়ে একটা ওষুধ এক ফোঁটা করে দিতাম। টেবিলের ওপর গোলাপজল ও নাইট্রিক অ্যাসিড একই রকম শিশিতে রাখা হয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি একদিন নাইট্রিক অ্যাসিড-এর শিশিকে গোলাপ জল ভেবে হরি মহারাজের একটা চোখে এক ফোঁটা অ্যাসিড ঢেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরি মহারাজের চোখ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছিল; তিনি বলে উঠলেন—"এতো গোলাপ জল নয়।" আমি তখন শশব্যস্ত হয়ে শিশির লেবেল দেখে বুঝলাম এটা নাইট্রিক অ্যাসিড। আমি ভয়ে ও দুঃখে কাঁদতে লাগলাম। অবিলম্বে চক্ষুটি গোলাপজলে ভাল করে ধুয়ে দিলাম। হরি মহারাজ কিন্তু একেবারে শান্ত হয়ে রইলেন। সকলেই বুঝতে পারছিলাম তাঁর কী ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। মহারাজ ভয় পাচ্ছিলেন তাঁর চোখ না অন্ধ হয়ে যায়। এবারেও মহারাজ আমার অসাবধানতার জন্য বিরক্ত হলেন। হরি মহারাজের মুখে কথা নেই। রাত্রে চোখ ঢেকে বসে আছেন, আমি

হাওয়া করছি আর নিঃশব্দে ঠাকুরকে বলছি হরি মহারাজের চোখ যেন ভাল হয়ে যায়। আমার মন অত্যন্ত খারাপ। বুক ফেটে কান্না পাচ্ছে। হরি মহারাজ আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, ওতে কিছু হয়নি। কী আশ্চর্য ব্যাপার! চোখে অ্যাসিড দেওয়াতেও বিরক্তি নেই। এত স্নেহ, এত ক্ষমা, এত প্রেমের অধিকারী কী করে হলেন?

রাত্রে হরি মহারাজ ঘুমোতে পারলেন না। আমিও ছটফট করলাম। সকালে তিনি মহারাজকে বললেন—"মহারাজ আমার চোখের যন্ত্রণা কমে গেছে।" মহারাজের কী আনন্দ। মহারাজ হরি মহারাজকে বললেন—"হরিভাই, সাধু দিয়েছে কি না তাই কিছু হলো না। অ্যাসিড কী ভীষণ ব্যাপার! আমি তো ঠাকুরের কাছে তেজনারায়ণের অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য বারবার মার্জনা ভিক্ষা করছিলাম।" দুই গুরুভ্রাতা অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে আমায় লক্ষ্য করে নানা কথা বললেন। আমি উভয়কে প্রণাম নিবেদন করে কার্যান্তরে গেলাম। সেদিন প্রাতরাশের সময় মহারাজ ও হরি মহারাজ স্নেহভরে উভয়ের খাদ্য থেকে আমার হাতে খানিকটা তুলে দিলেন। এসব ঘটনা বলার উদ্দেশ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের কাছে কীভাবে আমাদের ট্রেনিং হয়েছিল তা তোমাদের জানানো। আমরা তাঁদের স্নেহ ভালবাসায় কীভাবে পুষ্ট হয়েছি। কখনও দোষীকে শাস্তি দিয়ে তাঁরা দূরে সরিয়ে দিতেন না।

পুরীতে এমনি আনন্দের মধ্যে সাত মাস কেটেছিল। এ সাত মাস আমার জীবনের অতি উজ্জ্বল সময়। কারণ এই সাত মাস শ্রীমহারাজ ও হরি মহারাজের একত্র সমাবেশে আমার সাধন-ভজনের খুব সুবিধা হয়েছিল।

শশী নিকেতনের দোতলার ওপর একটি চিলে কোঠা ছিল। সকাল সন্ধ্যায় আমি সেখানে ধ্যানে বসতাম। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ওপরে গিয়ে বসে পড়তাম, ৯টার খাবার দেওয়া হলে নামতাম। খাওয়া-দাওয়া করে মহারাজের কাছে বসে মহারাজ ও হরি মহারাজের কথোপকথন বা অন্যান্য আলোচনাদি শুনতাম। ১০টার পর আমরা শুতে যেতাম। ভোর ৪টায় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে আবার ওপরে গিয়ে ধ্যানে বসতাম। ৭টায় চা, জলখাবার খেয়ে মহারাজ ও

হরি মহারাজের সেবা বা অন্য কোন কাজ করতাম। শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা হতো। আবার জপ, ধ্যান, ১২টায় খাওয়া-দাওয়া।

এইভাবে মহারাজ ও হরি মহারাজের ত্যাগ, তপস্যা ও বৈরাগ্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মহানন্দে দিন কাটছিল। সেই সময় একদিন হরি মহারাজ জগন্নাথদেব দর্শনে যান। আমরাও দু-একজন তিনি অসুস্থ বলে তাঁর সঙ্গে ছিলাম। অরুণস্তম্ভের পাশে তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্য পাশ দিয়ে নামতে দেখে ছুটে গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। কিন্তু যখন পাদস্পর্শের জন্য হাত বাড়ালেন তখন ঠাকুর অদৃশ্য হলেন। তাতে হরি মহারাজের সম্বিত ফিরল। মনে হলো ঠাকুর তো সশরীরে নেই। হরি মহারাজ আমাদের বলেছিলেন—"যাঁকে দর্শন করতে মন্দিরে যাচ্ছিলাম, তিনি তো আগেই এসে আমায় দর্শন দিলেন। আমি অনুভব করলাম শ্রীজগন্নাথদেবই শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে এসেছিলেন। ঐ জন্যই বোধহয় ঠাকুর পুরী যাননি। তিনি বলতেন পুরী গেলেই শরীর থাকবে না।"

আর একটি ঘটনা মনে পড়ছে। একবার পুরীতে থাকাকালীন অবনীকে মহারাজ কোন কাজ করতে বলেন। অবনী (পরবর্তী কালে স্বামী প্রভবানন্দ) সে কাজটি সুসম্পন্ন করতে পারেনি। মহারাজ তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে কিছু তিরস্কার করেছিলেন। রাতে মহারাজ ও হরি মহারাজ একসঙ্গে খেতে বসেছিলেন। তখনও আবার যখন মহারাজ ঐ কাজের কথা তুললেন, তখন হরি মহারাজ হাসিমুখে অবনীকে বললেন—"অবনী, তুমি বুঝতে পারছ মহারাজ কেন তোমায় বকছেন?" অবনী উত্তরে বললে—"না মহারাজ আমি তো বুঝতে পারছি না, আমার কি দোষ হলো।" তখন হরি মহারাজ বললেন—"দেখ, শিষ্য তিন প্রকার। উত্তম শিষ্য, গুরুর মনে চিন্তা উদিত হবার আগেই গুরুর মন বুঝতে পেরে তা পূর্ণ করে। মধ্যম শিষ্য, গুরুর অব্যক্ত মনোভাব বুঝতে পেরে তা পূর্ণ করে। আর অধম শিষ্য গুরু আদেশ ব্যক্ত করলে তা পালন করে। মহারাজ চান যে তোমরা উত্তম শিষ্য হও।" অবনী মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। মহারাজের কৃপায় পরবর্তী কালে অবনী ঠাকুরের বাণী প্রচারে সাগর পাড়ি দিয়েছিল।

সে সময় পুরীতে হরি মহারাজের শরীর ভালো ছিল না। তাঁর বহুমূত্র রোগ ছিল তাই কার্বাঙ্কল হওয়ায় বারবার অস্ত্রোপচার হতো। কিন্তু উপশম সহজে হতো না। এইসব অস্ত্রোপচারের সময় হরি মহারাজের সহ্যশক্তির অসীম পরাকাষ্ঠা আমরা দেখেছি। ডাক্তার অস্ত্রোপচার করতে এলে হরি মহারাজ বলতেন, "আগে আমায় বলবেন, তারপর ছুরি লাগাবেন।" ছুরি চালাবার আগে তাঁকে যেই বলা হতো, অমনি সোজা হয়ে বসে তিনি মনটাকে এমনভাবে দেহ থেকে তুলে নিতেন যে, যতক্ষণ ডাক্তার অপারেশন করতেন হরি মহারাজের কোন দেহবোধই থাকত না। একদিন ডাক্তার না বলেই ছুরি লাগিয়ে দিয়েছিল। ছুরি লাগানো মাত্রই হরি মহারাজ চিৎকার করে উঠলেন। ডাক্তার লজ্জিত হলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন রোজই তো সহ্য করেন, তাই না বললেও হবে। গীতায় বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন তিনি, তাই ইচ্ছা করলেই মনটাকে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যেতে পারতেন।

(উৎস ঃ স্বামী শর্বানন্দ)

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতিকথা

স্বামী প্রভবানন্দ

অনুবাদক ঃ স্বামী চেতনানন্দ

১৯১২ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কনখলে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। আমি পূজার ছুটিতে কনখলে যাই এবং সেখানে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। কনখল থেকে ফেরবার পথে আমি মহারাজের নির্দেশে বৃন্দাবন যাই এবং স্বামী তুরীয়ানন্দের পরিচিত এক বৈষ্ণব সাধুর খোঁজ নিই। তিনি জঙ্গলে এক কুটিয়ায় থাকতেন। আমি একটা সরু পথ ধরে এগিয়ে ঐ সাধুর কুটিয়ায় যাই। সাধুটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দর্শন দেন। তাঁর শিষ্যেরা একটা মাদুর পেতে তাঁকে বসতে দেয় এবং তিনি আমাকেও বসতে ইঙ্গিত করেন। এই সাধুটির সান্নিধ্যে আমি প্রগাঢ় আধ্যাত্মিকতা অনুভব করলুম। আমি তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলুম, "হে মহারাজ, আপনি কিভাবে এই উচ্চ অবস্থা লাভ করেছেন?" তিনি এক কথায় আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন, "নামে।" অর্থাৎ ভগবানের নাম জপ করে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন।

১৯১৪ সালে আমি কাশীতে যাই এবং স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য অধ্যয়ন করি। আমি হরি মহারাজের সঙ্গে ব্রহ্ম ও মায়া নিয়ে তর্ক করতুম। আমার মাথা তখন পাশ্চাত্য দর্শনের চিন্তাধারায় পূর্ণ ছিল। তাঁর ক্লাসে আমি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের উক্তি উদ্ধৃত করে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করতুম। আমরা কিন্তু রাজা মহারাজের সঙ্গে কখনও তর্ক করতুম না। অন্যান্য তরুণ সাধুরা আমাকে দুর্বিনীত মতে করত, কিন্তু হরি মহারাজ কিছু মনে করতেন না, বরং আমাকে তর্ক করতে উৎসাহ দিতেন।

পরে আমি যখন কলকাতায় ফিরে যাই, স্বামী অচলানন্দ আমাকে হরি মহারাজের জন্য কতকগুলি ডাব পাঠাতে লেখেন। আমি ডাব পাঠালুম। তা

পেয়ে স্বামী অচলানন্দ লেখেন যে, হরি মহারাজ আমাকে জানাতে বলেছেন যে "ক্লাসগুলি এখন আর তেমন উত্তেজনাপূর্ণ হচ্ছে না, কারণ সোৎসাহে তর্ক করবার কেউ এখানে নেই।"

আর একবার কাশীতে আমি স্বামী তুরীয়ানন্দকে কিভাবে গীতা অধ্যয়ন করতে হয় শেখাবার জন্য ধরলুম। তিনি বললেন, "কালকে এস।" পরদিন তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন, "গীতার একটি শ্লোক নাও। মুখস্থ কর এবং প্রতি শব্দের অর্থ জানো। ঐ শ্লোকটির ওপর ধ্যান কর এবং এক সপ্তাহ ঐ শ্লোকটি নিজ জীবনে অভ্যাস কর। তারপর পরবর্তী শ্লোক নাও। আমি এভাবে গীতা অধ্যয়ন করেছি। This is my first and last class on the Gita for you—এই আমার তোমার প্রতি গীতার প্রথম ও শেষ ক্লাস।"

একবার কাশী অদ্বৈত আশ্রমে একজন সাধু ভাগবত ব্যাখ্যা করছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ ও অন্যান্য সাধুরা কার্পেটে বসে তা শ্রবণ করছিলেন। এমন সময় এক ভক্ত মহিলা ভাগবত শুনবার জন্য ঐ কার্পেটের এক পাশে এসে বসলেন। আত্মানন্দ সঙ্গে সঙ্গে পাঠশ্রবণ ত্যাগ করে উঠে গেলেন। পরে কোন প্রাচীন সাধু তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে আত্মানন্দ বলেন, "স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে সন্ন্যাসীর উপবেশন নিষিদ্ধ।" তাঁকে যখন বলা হলো যে প্রেমানন্দ ও তুরীয়ানন্দ স্বামী ঐ আসনে তবে বসেছিলেন কি করে, তাতে তিনি উত্তর দেন, "ওঁরা মহাপুরুষ—পরমহংস। বাবুরাম মহারাজ ও হরি মহারাজের এক এক চাঁটিতে আমার মতো হাজার শকুনের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হতে পারে। তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনা করা উচিত নয়।"

কাশীতে একবার একজন সাধুর সঙ্গে আমার তর্ক হয়। তিনি বলেন যে স্বামীজী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন, অদ্বৈতবাদী নয়। আমাদের বাদানুবাদ স্বামী অচলানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেন। তিনি আমাকে ডেকে বলেন, "দেখ, তর্ক দুভাবে হতে পারে—এক, আলোচনার দ্বারা সত্য নিরূপণ। এটাই প্রকৃত তর্ক। দুই, কেউ জোর করে নিজের মত স্থাপন করে। এটা সত্য নিরূপণের প্রকৃত পন্থা নয়। ঐ সাধুটি তার সাথে একটু মজা করে তর্ক করছিল।"

১৯১৫ সালে গুরুদাস মহারাজ, সীতাপতি মহারাজ, আমি ও আর একজন ব্রহ্মচারী বদ্রীনাথ দর্শনে যাই। গুরুদাস মহারাজ ছিলেন পাশ্চাত্যদেশবাসী। সে সময়ে কোন পাশ্চাত্যদেশবাসীকে হিন্দু দেবমন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। আমরা বিগ্রহ দর্শনের জন্য তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে বসেছিলাম। তখন এক গৌরবর্ণ যুবক পুরোহিত আমাকে ইশারা করে ডাকলেন এবং বললেন, "তোমার সঙ্গীদের নিয়ে আমার সঙ্গে এস।" তিনি আমাদের মন্দিরের এক পাশে আনলেন, মন্দিরের দরজা খুললেন ও আমাদের গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করতে দিলেন। অন্য যাত্রীরা মন্দিরে ঢুকতে চাইলে তিনি বললেন, "না, এখনও তোমাদের সময় হয়নি।" এই বলে তিনি মন্দির-দ্বার বন্ধ করলেন। তারপর আমরা দেখলাম তিনি বিগ্রহের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তখন আমাদের খেয়াল হয়নি যে পুরোহিতের বিগ্রহের পাশে দাঁড়ানো নিয়ম নয়, তিনি দাঁড়ান বিগ্রহের সামনে। কয়েক মিনিট পরে তিনি বললেন, "তোমাদের ঠিক দর্শন হয়েছে তো? এবার বাইরে যাও।" আমরা বাইরে গেলে তিনি ভিতর থেকে মন্দির বন্ধ করে দিলেন।

আমরা আবার যাত্রীদের ভিতর বসলাম। এমন সময় একজন আমাকে ডেকে প্রধান পুরোহিতের কাছে নিয়ে গেল। তিনি গুরুদাস মহারাজের বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনি শ্বেতকায় বলে তাঁকে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হবে না বললেন। তবে বাইরে থেকে বিগ্রহ দর্শন করবার ব্যবস্থা করলেন এবং নিয়মিত প্রসাদ পাঠাতেন। সম্মানিত অতিথিরূপে আমরা তিনদিন সেখানে ছিলাম। সেখানে অবস্থানকালে যে কয়জন পুরোহিত মন্দিরে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যে পুরোহিত আমাদের গর্ভমন্দিরে নিয়ে গিছলেন, তাঁর দেখা আর পেলাম না।

বদ্রীনারায়ণ থেকে মায়াবতী যাবার পথে আমরা আলমোড়া যাই। স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন সেখানে রামকৃষ্ণ কুটিরে ছিলেন। তাঁকে আমাদের কীভাবে বদ্রীনাথের গর্ভমন্দিরে বিগ্রহ দর্শন হয়েছে বলায়, তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, "হায়, হায়! তোমরা কি বোকা! ঠাকুরকে চিনতে পারলে না? তিনি ঐরূপে তোমাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে তোমাদের গর্ভমন্দিরে নিয়ে গিছলেন।"

হরি মহারাজ একদিন আমাকে বলেন, "শ্রীশ্রীমায়ের মন কখনও কণ্ঠের নিচে নামে না।"

১৯১৭ সালে শ্রীশ্রীমহারাজ সদলবলে মাদ্রাজ হতে এসে পুরীতে শশী-নিকেতনে অবস্থান করছিলেন। হরি মহারাজও মহারাজের সন্নিধানে। কলকাতা হতে জনৈক ভক্ত একটি পার্শেল পাঠিয়েছেন। পূজনীয় অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ) আমাকে একখানা রসিদ দিয়ে বললেন, "যাও রেলওয়ে স্টেশনে।" আমি যাত্রা করলুম। যেতে যেতে ভাবছি, তাইতো, জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলুম, রসিদ নিয়ে কাকে দিতে হবে বা কি করতে হবে। এই ভাবনা নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছি, এমন সময় ব্রহ্মচারী শ—র সঙ্গে দেখা। তাকে রসিদটি দেখিয়ে বললুম, "ভাই—তুমি তো এসব কাজ কর; কি করতে হবে বল তো?" শ—বলল, "রসিদটি স্টেশন মাস্টারকে দেবে। তারপর পার্শেলটি এলে স্টেশন মাস্টার পাঠিয়ে দেবেন।" ব্যস, আমিও স্টেশন মাস্টারকে রসিদটি দিয়ে ফিরলুম। যখন ফিরেছি, দেখলুম, মহারাজ, হরি মহারাজ উদ্‌গ্রীব হয়ে পার্শেলটির জন্য অপেক্ষা করছেন। মহারাজ আমাকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে দেখে বকুনি আরম্ভ করলেন। সেই জীবনে প্রথম বকুনি। এখন এর স্মৃতি খুবই মধুর লাগে। সারাদিন এইভাবে বকুনি চলল। রাত্রে মহারাজ ও হরি মহারাজ আহারে বসেছেন বাইরের বারান্দায়। আমি পাখা নিয়ে পোকা তাড়াচ্ছি। মহারাজ পুনরায় পার্শেলের কথা উল্লেখ করলেন। হরি মহারাজ হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "অবনী, তুমি বুঝতে পারছ মহারাজ কেন তোমাকে বকছেন?" আমি উত্তরে বললাম, "না, মহারাজ আমি তো কি দোষ হয়েছে বুঝতে পারছি না।" তখন হরি মহারাজ বললেন, "দেখ, শিষ্য তিন প্রকার। উত্তম শিষ্য গুরুর মনে চিন্তা উদয় হবার পূর্বেই গুরুর মন বুঝতে পেরে তা পূর্ণ করে। মধ্যম শিষ্য গুরুর অব্যক্ত মনোভাব বুঝতে পেরে তা পূর্ণ করে। আর অধম শিষ্য গুরু আদেশ ব্যক্ত করলে তা পালন করে। মহারাজ চান যে তোমরা উত্তম শিষ্য হও।" আমি চুপ করে আছি। মহারাজ তখন বললেন, "হরি ভাই, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, তাই এরা আমার কথা শোনে না। আপনি এদের একটু বুদ্ধিশুদ্ধি দিন।"

১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের পর স্বামী শিবানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট হন। আমি তাঁর কাছে আলমোড়ায় তপস্যার জন্য একমাসের অনুমতি চাই। তিনি আমাকে অনুমতি দেন; তারপর এক সপ্তাহের মধ্যে আমাকে ডেকে বলেন, "দেখ, মালয়েশিয়ার সিঙ্গাপুরে বিদেহানন্দ একজন সহকারী চায়। কেউ যেতে চাইছে না। তুমি যেতে পারবে?" আমি বললুম ঃ "হ্যাঁ, মহারাজ, আমি যেতে রাজি। বিদেহানন্দ আমার বন্ধু। আমাকে এক মাস সময় দিন। আমি কাশীতে হরি মহারাজের সঙ্গে দেখা করে পরে যাব।"

১৯২২ সালের জুন মাসে আমি কাশীতে হরি মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাই এবং তাঁকে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার কথা বলি। তিনি আমার সিঙ্গাপুর যাওয়া পছন্দ করলেন না। তিনি বললেন, "কর্তৃপক্ষ যদি তোমাকে বিদেশে পাঠাতে চায়, তাহলে তাঁরা তোমাকে আমেরিকায় পাঠাক না কেন?" কার্যত তাই হলো। কর্তৃপক্ষের প্ল্যান পরিবর্তন হলো এবং ১৯২৩ সালে আমি আমেরিকার স্যানফ্রান্সিসকোতে বদলি হই।

এর এক মাস পরে হরি মহারাজের দেহত্যাগ হয়। ঐ শেষ দর্শনকালে আমি তাঁর পা ম্যাসাজ করেছিলাম। তিনি একদিন বলেন, "জ্ঞান যত দেওয়া যায়, তা তত বাড়ে।" লোকে জানে তিনি কঠোর প্রকৃতির সাধু ছিলেন; কিন্তু আমি তাঁর কাছে অনেক স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি। আমি যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিই, তিনি তখন খুবই অসুস্থ। আমি যখন তাঁকে প্রণাম করলুম, তিনি আবেগভরে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি যতক্ষণ না দৃষ্টির বাইরে গেলুম, তিনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানদের ভালবাসা ভোলবার নয়।

[উৎস ঃ স্বামী প্রভবানন্দের কথোপকথন ঃ সংগ্রাহক—প্রব্রাজিকা আনন্দপ্রাণা।]

সন্তোদ্যানে পুষ্পচয়ন

স্বামী বাসুদেবানন্দ

হরি মহারাজকে প্রথম দর্শন করি কাশীতে ১৯১৬ সনে শীতকালে, যখন মহাপুরুষ মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে সেখানে যাই। অনেক দিন পর আলমোড়া থেকে নেমে এলেন, পায়ে বাত—ঘরের মধ্যে বেড়াবার জন্য বাবুরাম মহারাজ তাঁকে একজোড়া লাল কাপড়ের চটি দিলেন। তিনি সেটি মাথায় রেখে নৃত্য করতে লাগলেন—গুরুভাইয়ের প্রতি ভক্তি দেখে আমরা তো অবাক!

একদিন গোপনে জিজ্ঞাসা করলুম, "শান্তির উপায় কি?" বললেন, "বৈরাগ্যমেবাভয়ম্—এইটে জপ কর, এতেই শান্তি। কোন কাম্য বস্তু পাবার চেষ্টা করো না—যদি ভাল জিনিস আপনি আসে ভাল—যদি চলে যায়, বলবে, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।" মঠে ফিরে এসে কয়েক দিন গঙ্গার ধারে কদমতলায় (সে গাছটি এখন পড়ে গেছে, তার জায়গায় সূর্য মহারাজ আর একটি গাছ গঙ্গার ধারে লাগিয়েছেন) এটি আমায় জপ করতে বলেন। "কাম্যবস্তু প্রথমটা ত্যাগ করতে কষ্ট হবে অথবা কেউ দুর্বাক্য দুর্নাম করলে তার প্রতিকার না করে চুপ করে থাকাটা প্রথম প্রথম খুব কষ্টকর বলে বোধ হবে—হয়ত বা দু চার বার প্রতিকার করেও বসবে, কিন্তু অভ্যাস করতে করতে দেখবে এতে পরম শান্তি—অতীতের ব্যাপারগুলো ছেলেখেলা বলে বোধ হবে—অতীতের দুঃখ-অপমান কিছু দিন পরে বিস্মৃতির অতল গর্ভে কোথায় তলিয়ে যাবে। এই হলো পতঞ্জলির অহিংসা-অভ্যাস।"

১৯১৮ সাল (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)। হরি মহারাজ অসুস্থ হয়ে 'উদ্বোধনে' আছেন। ঐ সময় কিছু দিনের জন্য আমি 'উদ্বোধনে' পূজক হিসাবে থাকি, সর্বদাই পূর্বাশ্রমের ভয়, যদি কোন গোল বাধায়। হরি মহারাজ শরৎ মহারাজের

ঘরে থাকতেন, শরৎ মহারাজ সেই জন্য দক্ষিণ দিকের ঘরে থাকতেন। শরৎ মহারাজ তাঁকে পুরী থেকে নিয়ে আসেন। একদিন হরি মহারাজকে বললুম, "এখানে থাকতে আমার ভয় করে—পূর্বাশ্রম কাছে।" তিনি বললেন, "কিসের ভয় যদি তোমার ভিতর সম্বন্ধ-জ্ঞানটা না থাকে? সম্বন্ধ-জ্ঞানেই এই জগৎ, সম্বন্ধ না থাকলে 'ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্বচরাচর।' আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী-পুরুষ এসব সম্বন্ধ-জ্ঞানের ওপর। স্বামীজী একবার আমাকে বলেন, "আত্মায় আবার স্ত্রী-পুরুষ কী? আত্মীয়স্বজনই বা কী? লিঙ্গ ও সম্বন্ধ আত্মায় কল্পিত, ঐ দুটো জিনিস মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে দিতে হবে, তখন দেখবে তোমাকে দিয়েই জগতের কত কল্যাণ হবে।" সামনের উত্তরদিকের মাঠ (তখনও সেদিকে ঘরবাড়ি উঠেনি) দেখিয়ে বললেন, "কি দেখছ?" আমি বললুম, "কতকগুলো গরু ও মানুষ বেড়াচ্ছে।" "ওদের দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে?" বললুম, "কি আর মনে হবে, কিছু না।" "কেন জান? ওদের সম্বন্ধে তুমি disinterested বলে—interested হলে অনেক কিছুই দেখতে পেতে—স্বার্থ জিনিসটা সঙ্গে থেকে ওঠে।"

এখন বুঝতে পারছি সর্বারম্ভপরিত্যাগী কে? বললেন, কারুর উপকার করব বলে কিছু করতে নেই; কারণ তাতে উপকারকের উপকৃত হতে একটা কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। নিঃস্বার্থ সেবা হবে তীর্থসেবার মতো—সেবা করে চলে এলুম। সেবা করতে হয় সরলভাবে ও আন্তরিকতার সহিত। কিন্তু সেব্যের বেশি details-এ যেতে নেই। যখন সেবা করে চলে এলুম, তখন মাত্র সেবার আনন্দটা রয়ে গেল, কিন্তু তাতে কোন বন্ধন নেই। এইটে হলো সেবারসের স্থায়ী ভাব। সাধারণ লোকে কিন্তু এই নিঃস্বার্থ সেবাকাজের উদ্দেশ্যটা খুঁজে না পেয়ে মস্ত একটা ধাঁধায় পড়ে যায়, কারণ আজকাল স্বার্থ ছাড়া লোকে একটা পয়সা দিয়েও উপকার করতে নারাজ।

এক দিনের একটা ঘটনা মনে হচ্ছে। পূজ্যপাদ হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা ব্রহ্মলোকাদি ত্যাগ করতে পার?" একজন সাংখ্যতীর্থ বলে উঠলেন, "ও আর কি মশাই, ও কিছুই নয়।"

ললিত হেসে বললে, "আজ্ঞে হাঁ, ওতে আর কি আছে।" সভাস্থ সকল সাধুদের মুখেই ঐ কথাটির সম্মতিসূচক ভাব ফুটে উঠলো। তখন হরি মহারাজ বললেন, "তোমরা হচ্ছ আধা নাস্তিক—তোমাদের কথার তাৎপর্য হচ্ছে, ওসব তো কিছু নেই-ই, তখন আর ওসব ত্যাগ করা কি কঠিন? ধ্যান-ভজন গভীর হলে, মন সূক্ষ্মস্তরে গেলে সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্মস্পন্দন গ্রহণ-ধারণের যোগ্যতা হয়, তখন এসব দেখতে পাওয়া যায়। ব্যবহারিক সত্তায় বিভিন্ন মনের স্পন্দনে বিভিন্ন লোক রয়েছে। মন যত শুদ্ধসত্ত্ব হবে, তত শুদ্ধসত্ত্ব লোকসকল চিত্তে প্রতিভাত হবে। আর মন যত তামসিক হতে থাকে, জীব তত প্রাণের নিম্নস্তরে (lower strata of life) যেতে থাকে। ঐ যেসব পুরাণে অতল বিতল প্রভৃতি—ওসব হচ্ছে চেতনার নিম্নস্তর। বিভু আত্মার তো আর গতাগতি নেই, দ্রষ্টার সামনে চতুর্দশ ভুবন গুণভেদে দৃশ্য হয়—যেমন জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। আত্মা কি আর গাড়ি করে ঐসব জায়গায় যান? যখন একটা আছে, তখন অন্যগুলো নেই, যেন ক্যালিডোস্কোপের (kaleidoscope) সাজানোগুলো বদলে যায়।"

পূজ্যপাদ হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) অসুস্থ অবস্থায় যখন বলরাম-মন্দিরে থাকতেন, তখন একদিন মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল, অর্থাৎ সাধুর সহিত মৈত্রী, দুঃখীর প্রতি করুণা, পরের ভাল দেখে আনন্দ এবং দুষ্টের প্রতি উপেক্ষা করা উচিত। বললেন, "দুর্জনের প্রতি উপেক্ষা অনেক নিচের কথা। এক সাধু একদিন স্নান করতে গিয়ে দেখলেন একটা বিছে গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে, তিনি হাত কোষ করে তাকে ডাঙায় তুলে ফেলে দিলেন। বিছে কিন্তু তার মধ্যেই তাঁকে হুল ফুটিয়ে দিলে, সাধু উঃ করে উঠলেন। তারপর আবার স্নানাদিতে মনোযোগ দিলেন। ইতোমধ্যে বিছেটা আবার ঢেউতে জলে গিয়ে পড়ল, সাধু আবার তাড়াতাড়ি কোষ করে সেটাকে তুলে ডাঙ্গায় ফেলে দিলেন, বিছেটা তাঁকে আবার কামড়ালে। সাধুটি আবার উঃ করে চিৎকার করে উঠলেন। একজন লোক কিনারায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল, বললে, 'বাবাজী, তুমি তো আচ্ছা বোকা দেখছি, কেন ওটাকে বারবার তুলছো?' সাধু বললেন, 'ওর যা স্বভাব ও তাই দেখাচ্ছে, আর আমার যা কাজ তাই আমি করছি।'"

কাজের ছোট-বড় নিয়ে অনুযোগ উঠলে পূজ্যপাদ হরি মহারাজ আমাদের একটি গল্প বলতেন, "খুরপি লেও।" এক প্রাচীন সাধু অনেক দিন ধরে এক গ্রামের ধারে জঙ্গলে তপস্যা করতেন। একদিন জমিদার স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর গৃহবিগ্রহ গোবিন্দ বলছেন, "সাধুর বয়স হয়েছে, আর ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে খেতে পারে না, তুমি ওর খাবারটা রোজ পাঠিয়ে দিও।" তাই হতে লাগলো। একদিন সাধু দেখেন জমিদারের লোক দুটো খাবার নিয়ে এলো। সাধু জিজ্ঞেস করলেন, "ও খাবার কার।" সে বললে, "আর একজন অল্পবয়সী সাধু এসেছেন, এই জঙ্গলের ওধারে, গ্রামে ভিক্ষা করতেও আসেন না—এ খাবার তাঁর জন্য।" এই বলে সাধুর খাবার দিয়ে সে সেই দিকে হনহন করে চলে গেল। একদিন প্রাচীন সাধুটি, যে খাবার আনে তাকে বললেন, "খোলতো দেখি ওর ভেতর কি আছে।" খুলে দেখা গেল সোনারূপোর বাটিতে খুব ভাল ভাল খাবার। দেখে সাধু চাকরটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ রকম বিষম ব্যবস্থা কেন?" লোকটি বললে, "তা তো বাবা জানি না, বাবু যেমন পাঠান, আমি তেমন নিয়ে আসি।" সাধু বললেন, "জমিদারকে এর কারণটা কি জিজ্ঞেস কর।"

তার পর দিন লোকটি এসে বললে, "বাবু বললেন, গোবিন্দই এইরূপ ব্যবস্থা করেছেন, তিনি কিছুই জানেন না।" সাধু বললেন, "জমিদারবাবুকে বল, যেন এ সম্বন্ধে গোবিন্দজীকে জিজ্ঞেস করা হয়, আমার বড় কৌতূহল হয়েছে।" তার পর দিন লোকটি এসে বললে, "গোবিন্দজী আপনাকে বলতে বলেছেন, 'যদি ভাল না লাগে খুরপি লেও।'" সাধু শুনে খানিক পরে কাঁদতে লাগলেন, বললেন, "বহুত কৃপা! বহুত কৃপা! বহুত কৃপা! আমি আগে ঘাস ছুলে খেতুম, আর এখন ভগবানের নাম করি বলে বসে বসে নানাবিধ খাচ্ছি, তবুও ভগবানে পক্ষপাতিত্ব-দোষ দিচ্ছি—সাধু হয়ে পরের খাবারে লোভ করছি। তাই প্রভুজী আমায় শিক্ষা দিলেন।" সন্ধানে জানা গেল, যে যুবক সাধুটি নূতন এসেছেন, তিনি একজন রাজকুমার, সর্বস্ব ত্যাগ করে একেবারে বিবিক্তদেশসেবী হয়ে রয়েছেন। অর্থাৎ সাধু-জীবনের এই বিশুদ্ধ কর্মযোগ যদি ভাল না লাগে, তাহলে সংসারে যা করছিলে তাই ফের করগে।

একদিন গীতা-ক্লাসে "যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ" (গীতা, ৪।২২) শ্লোকটি সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। বাবুরাম মহারাজ বললেন, "ভোগ্য বস্তু নিয়ে যত আলোচনা করবে তত আত্মা দেহগামী হয়, যা পেলে খেলে, যা পেলে পরলে, যেখানে জায়গা একটু পেলে শুয়ে পড়লে।" এই ক্লাসে পূজ্যপাদ হরি মহারাজও ছিলেন। তিনি বললেন, "যারা তারিয়ে তারিয়ে খায়, রান্নার ক্রমাগত প্রশংসা করে, রাঁধুনির খবর নেয়, খাদ্যের উপাদান ও জাতি-সম্বন্ধে বিচার করে, তাদের আত্মা জিহ্বা-স্বরূপ হয়ে যান, তারা তখন চার্বাক। দেখ, ভাগবত বলছেন, 'জিতং সর্বং জিতে রসে—' (ভাগবত, ৮।২১)—অর্থাৎ ততদিন পর্যন্ত পুরুষকে জিতেন্দ্রিয় বলা যায় না যত দিন না তিনি রসনা জয় করতে পারেন, কারণ রসনা জয় হলেই সর্বেন্দ্রিয় জয় হলো।"

* * *

সাধুরা পরস্পর নিন্দা করলে হরি মহারাজ একটি গল্প করতেন, "গৌকা মাফিক, ভৈঁসা কা মাফিক"—হৃষীকেশে একজন শেঠ সাধুভোজন করাবেন বলে একজন সাধুকে জিজ্ঞেস করলে—"অমুক সাধু কেমন?" সাধু বললেন, "ও তো একঠো ভৈঁসা হৈ।" শেঠ আবার সেই সাধুটিকে প্রথম সাধুটির কথা জিজ্ঞেস করলেন, "ও মহাত্মা কৈসা হৈঁ!" সাধু বললেন, "আরে ও তো একঠো গৌ হৈ।" শেঠ দুজনকেই নিমন্ত্রণ দিলেন। সাধু দুটি যখন ভিক্ষার জন্য তার কাছে গেলেন, তখন শেঠ দুখানা থালায় করে জাব এনে দিলেন। সাধুরা চটে জিজ্ঞেস করলেন, "য়হ কৈসা জী!" শেঠ বললেন, "আপনারা উভয়ে উভয়ের যে পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী ভিক্ষার ব্যবস্থা করেছি!"

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৫৩ বর্ষ ৩, ৬, ১০ সংখ্যা;
৫৪ বর্ষ ২, ৪ সংখ্যা)

স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন

স্বামী—

প্রশ্ন—মহারাজ, শুনেছি, ঠাকুর নিজে নানারূপ সাধন করেছিলেন এবং তিনি নানারূপ সাধনপথের উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনাদের নিকট ধ্যানজপের উপদেশ ছাড়া অন্য কোন সাধনপন্থার কথা আমরা শুনতে পাই না। ধ্যানের অবস্থা লাভ করবার উপায়স্বরূপ আপনাকে শ্রীশ্রীঠাকুর যেরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন, তা বলুন।

হরি মহারাজ—ঠাকুর কাউকে কাউকে বিভিন্ন সাধনপথ নির্দেশ করেছিলেন সত্য, কিন্তু আমাকে তিনি কেবল ধ্যানজপেরই উপদেশ দিয়েছিলেন। তবে গভীর রাত্রে (মধ্যরাত্রে) উলঙ্গ হয়ে ধ্যান করতে বলেছিলেন। ঠাকুরের একটি বিশেষত্ব ছিল, তিনি উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন, শিষ্য উপদেশ অনুযায়ী চলছে কি না। ঐরূপ উপদেশ দেবার পরই একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, ন্যাংটা হয়ে ধ্যান করিস তো?' 'আজ্ঞা হাঁ।' 'কেমন বোধ হয়?'—'মহাশয় যেন সমস্ত বন্ধন চলে গেছে।' 'হাঁ, ঐরূপ করবি। খুব উপকার পাবি।' আর একদিন তিনি (ঠাকুর) আমায় বলেছিলেন, 'মন মুখ এক করাই হচ্চে সাধন।' আমি তখন খুব শঙ্করের বেদান্তচর্চা করছি। আমায় তিনি (ঠাকুর) বললেন, 'ওরে, জগৎ মিথ্যা, মুখে বললে কি হবে? ঐ নরেন ও কথা বলতে পারে। ও যদি জগৎ মিথ্যা বলে, জগৎটা অমনি মিথ্যা হয়ে যায়! ও যদি বলে, কাঁটা গাছ নাই, কাঁটা গাছ নাই হয়ে যায়, কিন্তু তোরা কাঁটায় হাত দে তো? কাঁটা অমনি প্যাঁট করে ফুটবে।'

প্রশ্ন—মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলেছিলেন, "ক্রিয়াশীল হতে হয়।" কি করতে হবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, "এখন যা বলছি (অর্থাৎ ধ্যানজপ) তাই করে যা, পরে তোকে বলে দেবো।" মহারাজ তো আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, আপনি কিছু বলে দিন।

হরি মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করে গম্ভীরভাব ধারণ করলেন। পরে বললেন,

"এক একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে হয়। এক একটা ভাবের সাধন করতে হয়। মহারাজ ঐ ভাবসাধনকেই ক্রিয়াশীল হওয়া mean (অর্থ) করেছিলেন বোধ হয়।"

প্রশ্ন—আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

হরি মহারাজ—আমি তখন তখন এক একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকতুম। "আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী," এই ভাবটি কিছুদিন খুব সাধন করেছিলুম। প্রত্যেক কার্যে, প্রত্যেক চিন্তার মধ্যে সদা জাগ্রত থাকতুম, আর লক্ষ্য রাখতুম, ঠিক ঠিক ঐ ভাবটি সর্বদা আছে কিনা। এইরূপে কিছুদিন গেল, আবার হয়ত 'আমিই ব্রহ্ম' এই ভাবটি কিছুদিন সাধন করলুম।

প্রসঙ্গক্রমে মহাত্মা গান্ধীর কথা উঠল। হরি মহারাজ বললেন, "মহাত্মার মন মুখ এক।" একটি সেবাশ্রমের ব্রহ্মচারীর কথা বললেন, "ব্রহ্মচারী গম ভাঙাবার জন্য কাশীতে একটি দরিদ্র স্ত্রীলোকের নিকট গিয়েছিল। স্ত্রীলোকটি তখন কর্মে ব্যাপৃত। ব্রহ্মচারী একটু দূরে বসেছিল এবং তার নিকটেই এক বোঝা পাতা পড়েছিল। স্ত্রীলোকটি ঐ পাতার বোঝাটি এগিয়ে দেবার অনুরোধ করায় ব্রহ্মচারী একটু ইতস্তত করছিল। কারণ তার অভিমানে একটু ঘা লেগেছিল। স্ত্রীলোকটি তা বুঝতে পেরে একটু হেসে বললে, 'মহারাজ, তোমরা মহাত্মা গান্ধীর জয় চিৎকার কর, কিন্তু তিনি যা বলেন, তা কর না। এ রকম হলে স্বরাজ হবে কি করে? আমি তোমার কাজ করব, তুমিও আমায় সাহায্য করবে। কোন কাজ বড় ছোট নয়। এই না মহাত্মার উপদেশ?'"

হরি মহারাজ—স্বামীজী তখন আমেরিকায় আত্মার অজরত্ব ও অমরত্ব উপদেশ দিতেন, "আমি আত্মা, আমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। আমার আবার ভয় কাকে?" কতকগুলি cowboys (রাখালবালক) স্বামীজীকে পরীক্ষা করবার জন্য তাদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করে। স্বামীজী যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন, সেই সময় তারা dead shots তাঁর কানের, মাথার নিকট দিয়ে চালাতে আরম্ভ করল; স্বামীজী কিন্তু নির্ভীক, অবিচলিত, তাঁর বক্তৃতারও বিরাম নাই। তখন সেই ছেলেরা আশ্চর্য হয়ে তাঁর কাছে দৌড়ে গেল, আর বলতে লাগল, 'Here is our hero.' একেই বলে মন মুখ এক।

প্রশ্ন—মহারাজ, ভগবানের আদেশ কিরূপে পাওয়া যায়?

হরি মহারাজ—একরূপ আদেশ হচ্ছে শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে। তিনি যা করতে হবে নিজেই বলে দেন। তবে এ হচ্ছে অনেক পরের কথা।

আমি বললাম—হাঁ, মহাপুরুষ মহারাজের নিকট শুনেছি, মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) যখন যা করতেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী করতেন।

হরি মহারাজ—হাঁ, আর এক রকম আদেশ আছে, তা অনেকেই পেয়ে থাকে। রাস্তা দিয়ে হয়ত চলে যাচ্ছে, একটি ছোট ছেলে হঠাৎ একটা কথা বললে, আর তোমার কানে পৌঁছে তোমার সকল সন্দেহ চলে গেল। ঐ রকম ছেলের মুখ দিয়ে, পাগলের মুখ দিয়ে, আরও নানাপ্রকারে তুমি কোন কথা শুনতে পেলে, আর সেই কথাটি তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্তরে পৌঁছে তোমার জীবনের সংশয় কেটে যায়, আর তুমি মনেপ্রাণে বুঝতে পার—এই ভগবানের অভিপ্রেত। আবার আদেশ পাবার জন্য সাধনও আছে। গীতায় ঐ যে মন্ত্রটি "কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ। যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে, শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" ॥ (গীতা, ২।৭) বারে বারে জপ করতে হয়। আর তখন শ্রীভগবান যে প্রকারেই হউক জানিয়ে দেন, কি করতে হবে। আমি তখন রাজপুতানায় ঘুরছি। একটি সাধুর সঙ্গে দেখা হয়। সাধুটি দেখলুম এক জায়গায় চুপ করে বসে, "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥" (গীতা, ১৫।১৪) এই মন্ত্রটি বারে বারে আবৃত্তি করছে, আর সঙ্গে সঙ্গে পেটে হাত বুলুচ্ছে। শুনলুম, তার হজমের গোলমাল হয়েছে, আর গীতার ঐ মন্ত্রটি হচ্ছে তার ঔষধ।

পূজনীয় হরি মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতিপূর্বক বিদায় নেব, তিনি এমন সময় বলে উঠলেন, "Give light and more light will come to you."—"যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।"

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৩৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা)

তপস্বী হরি মহারাজ

স্বামী সারদেশানন্দ

একবার কনখল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দজী (হরি মহারাজ) গঙ্গার ধারে নাঙ্গোলে তপস্যায় যাইতেছেন পদব্রজে। সঙ্গে একটি কম্বল, সামান্য কাপড়চোপড় ও একটি বইয়ের পুঁটুলি। নিজেই সব বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সঙ্গে স্বামী কল্যাণানন্দ। তিনি তাঁহাকে কিছু দূর আগাইয়া দিতে যাইতেছেন। জগদীশপুরের শেষ পর্যন্ত গিয়া বিদায়কালে কল্যাণ স্বামী কিছু পয়সাকড়ি সঙ্গে দিতে চাহিলে হরি মহারাজ তীব্র আপত্তি করিলেন। কিন্তু কল্যাণ স্বামী লুকাইয়া একটা সিকি মোহর হরি মহারাজের জামার পাশের পকেটে রাখিয়া দিলেন। তারপর বিদায় লইয়া কল্যাণ স্বামী চলিয়া আসিলেন।

হরি মহারাজ অনেকখানি পথ চলিয়া গিয়াছেন। হঠাৎ পকেটস্থ মোহরটি কিভাবে হাতে লাগিয়াছে। হরি মহারাজ পকেটের ভিতর হাত দিয়া দেখিলেন একটি সিকি মোহর। বুঝিলেন ইহা কল্যাণ স্বামীর কর্ম। তিনি আবার কয়েক মাইল রাস্তা হাঁটিয়া কনখল সেবাশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং স্বামী কল্যাণানন্দকে বলিলেন ঃ "কল্যাণ, এ তোমার কর্ম। কেন দিয়াছ? সঙ্গে পয়সাকড়ি আমি রাখিব না। শুধু ঠাকুরের ওপর নির্ভর করিয়া থাকিব।" এই বলিয়া সিকি মোহরটি ফিরাইয়া দিলেন এবং চলিয়া গেলেন। রাস্তায় নাঙ্গোলের একটা লোক জুটিল। সে তাঁহার বইয়ের পুঁটুলিটি বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। সাধুসেবার আগ্রহ। হরি মহারাজ কোনমতেই রাজি হইলেন না। কিন্তু লোকটিও নাছোড়বান্দা। শেষে হরি মহারাজের দয়া হইল। লোকটি যেন কৃতার্থ হইল। সে মহানন্দে হরি মহারাজের বইয়ের পুঁটুলিটি বহন করিয়া চলিল।

(উৎস ঃ স্বামী ধীরেশানন্দের ডায়েরি)

হরি মহারাজের স্মৃতি

স্বামী গৌরীশানন্দ

১৯২১ সালে কাশীতে একদিন গঙ্গাস্নানান্তে শরৎ মহারাজ ও আমরা রাজা মহারাজকে প্রণাম করে বসেছি। তখন রাজা মহারাজ বললেন, "দেখ শরৎ, আমার ইচ্ছা হচ্ছে হরি মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে আসি। এমন মহাপুরুষ দুর্লভ। ব্যাধির অসহ্য যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়ে তিনি কিরূপে স্বস্থ, নির্বিকার হয়ে রয়েছেন। এরূপ দেখা যায় না।"

কিছুক্ষণ পরে শরৎ মহারাজ উঠলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে চললুম। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় শরৎ মহারাজ বললেন, "এ সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না। হরি মহারাজকে প্রণাম করে আসি।" আমি তাঁর সঙ্গে চললুম। আরও দু-তিন জন সঙ্গে চললেন। গরমের দিন। হরি মহারাজের ঘরে পর্দা ছিল। তখন কেবলমাত্র তাঁর আহার শেষ হয়েছে। তিনি হাত মুখ ধুয়ে চৌকির ওপর বসেছেন। চৌকির নিকটেই কুলকুচি করা জল পড়েছিল, তা তখনও পরিষ্কার করা হয়নি। শরৎ মহারাজ পশ্চাতে, আমি অগ্রে। পর্দা একটু ওঠাতেই হরি মহারাজ বললেন, "কে?"

শরৎ মহারাজ আমাকে একটু টিপে দিলেন। সেবক সনৎ সামনে ছিল। আমি শরৎ মহারাজের ইঙ্গিতে চুপ করে রইলাম। শরৎ মহারাজ অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করে ঐ এঁটো জলময় স্থানে একেবারে সাষ্টাঙ্গ হয়ে হরি মহারাজের পা ধরে প্রণাম করতেই, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কে প্রণাম করছে?" শরৎ মহারাজ তখন বললেন, "আমি শরৎ। তুমি এখানে রয়েছ। মহারাজ বললেন যে, তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে তোমাকে প্রণাম করতে। আমিও ভাই সে প্রলোভন ছাড়তে পারলুম না।"

হরি মহারাজ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বেদনার সুরে বললেন, "শরৎদা, আমি অন্ধ হয়ে পড়েছি। [তখন হরি মহারাজের চোখে ছানি পড়েছিল।] তাই তুমি আমাকে অপ্রস্তুত করলে। আমি কি জানি না, তুমি কে? নীলকণ্ঠ পাহাড়ের* ঘটনা কি আমি ভুলে গেছি?"

অন্য একদিন ঐ নীলকণ্ঠ পাহাড়ের কথা হরি মহারাজ আমাকে এরূপে বলেছিলেন ঃ নীলকণ্ঠেশ্বর শিবদর্শনে গিয়ে একদিন উভয়ে [হরি মহারাজ ও শরৎ মহারাজ] ফেরবার সময় পথ হারিয়ে ফেলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ও শ্বাপদসঙ্কুল। গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার জন্য দুই জন দুই পথ অবলম্বন করলেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে হরি মহারাজ এক প্রৌঢ়া সন্ন্যাসিনীর কুটির দেখতে পেলেন এবং তার সঙ্গে কতক্ষণ শরৎ মহারাজকে খুঁজে বিফল হলেন। সন্ন্যাসিনী বললেন, "এখানে বাঘ ভালুকের অবাধ বিচরণ; পথহারা পথিকের মৃত্যু অনিবার্য।" যা হোক, হরি মহারাজ একটা মশাল জ্বেলে একটা পাহাড়ের উচ্চভূমির ওপর উঠে ঘুরাতে লাগলেন এবং শাঁখ বাজিয়ে শব্দ করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ঐরূপ করাতেও কাকেও আসতে বা শব্দ করতে না দেখে নিরাশ হয়ে নিজ কুটিরে ফিরলেন।

অতি প্রত্যুষে হরি মহারাজ আবার শরৎ মহারাজকে খুঁজতে বের হলেন। কতকটা দূরে এগিয়ে দেখলেন শরৎ মহারাজ একটা উঁচু স্থানে বসে আছেন। হরি মহারাজ বললেন, "মৃত ব্যক্তির শরীরে হঠাৎ জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেলে তার আত্মীয়েরা যেমন উৎফুল্ল হয়, শরৎদাকে দেখে আমার অবস্থাও সেরূপ হয়েছিল। উচ্চৈঃস্বরে আমি তাঁকে ডাকতে লাগলাম। সাড়া না পেয়ে দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম যে তিনি রোমাঞ্চিত কলেবর এবং বাহ্যস্পন্দনহীন হয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন। বারবার ডেকে যখন সাড়া পেলুম না, তখন তাঁকে জড়িয়ে ধরে 'শরৎদা, শরৎদা' বলতে লাগলাম। অত শীত,

---

* গঙ্গা পার হয়ে স্বর্গাশ্রম থেকে সাত মাইল চড়াই করে হৃষীকেশ পশ্চাতে ফেলে নীলকণ্ঠ পাহাড়স্থিত শিবের মন্দির। ১৮৯০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ নীলকণ্ঠেশ্বর শিব দর্শন করতে যান।

একখানা পাতলা চাদর গায়ে। কিন্তু দেখলাম তাঁর শরীর বেশ গরম। যা হোক, ডাকাডাকিতে বাহ্যজ্ঞানের ঈষৎ প্রকাশ পেল, কিন্তু আবার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। এইরূপ দু-তিন বার হবার পর পরিষ্কাররূপে বাহ্যজ্ঞান হলো। তখন শরৎদা বললেন, 'অন্ধকারে গতাগতি অসম্ভব এবং মানুষের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা নেই দেখে এ স্থানে বসে পড়লাম এবং ধ্যানে প্রবৃত্ত হলাম।'"

(উৎস ঃ জনৈক সাধুর ডায়েরি)

হরি মহারাজের পুণ্যস্মৃতি

স্বামী ভবেশানন্দ

কাশীতে হরি মহারাজ একদিন আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছেন। তখন তাঁর পায়ে ব্যথা ছিল। হঠাৎ বললেন, "আর পারা যায় না।"

আমি বললুম, "আপনি বেশি আর কি করছেন? ঐ একটু লোকজনের সঙ্গে কথা বলা ছাড়া আর তো কিছু করতে দেখি না।" তখন হরি মহারাজ বললেন, "আরে মূর্খ! লোককে দিতে হচ্ছে কত। ঠাকুর সবাইকে পাঠাচ্ছেন। যদি সাধ্যমত না দিই তবে তাঁর নিকট কি বলব? দেখা হতে তিনি যখন জিজ্ঞাসা করবেন, 'একে কি দিলি? ওকে কি দিলি? তখন?'"

সত্যই যে তিনি দিতেন তা একটা ঘটনাতে পরিষ্কার হলো। এক বৃদ্ধ ডাক্তারের একটি সন্তান (ডাক্তারের নাম নগেন বসু) গঙ্গায় ডুবে মারা যায়। বৃদ্ধ ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী শোকে অধীর হয়ে হরি মহারাজের কাছে আসলেন। সে কি কান্না! হরি মহারাজ অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন, কিছুই বললেন না। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম বুড়োবুড়ি মহারাজের সান্নিধ্যে বেশ শান্ত হলেন এবং খুশি মনে ফিরে গেলেন।

আর একটি ঘটনাতেও তিনি যে কিছু দিতেন তা বুঝেছিলাম। কলকাতার কোন মহিলার একমাত্র ছেলে এম. এ. পাশ। বিবাহের পর এক মাসের মধ্যে ছেলেটি মারা গেল। শোকে অধীর হয়ে মহিলা একদিন স্বপ্নে দেখলেন—একটি সাধু তাকে মন্ত্র দিয়ে বলছেন, "ইহা জপ কর, ক্রমশ শান্তি পাবে।" মহিলাটি হরি মহারাজকে বললেন, "একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি পড়ায় বুঝলাম, ইনিই সেই সাধু। সেই থেকে কতকটা শান্তি এসেছে। কিন্তু আরও সান্ত্বনা ও শান্তি পাবার জন্য আপনার কাছে এসেছি।"

হরি মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, ঐ মন্ত্র জপ করুন। বিশ্বনাথ নিশ্চয়ই শান্তি দেবেন।" মহিলাটি মহারাজের কথায় মনে আনন্দ পেলেন এবং প্রণাম করে চলে গেলেন।

(উৎস ঃ জনৈক সাধুর ডায়েরি)

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি

স্বামী দেবানন্দ

কাশী সেবাশ্রমে প্রায় দুমাস কাল পূজনীয় হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দ) পূত সঙ্গলাভের সুযোগ হয়েছিল আমার। এই শাস্ত্রদর্শী, মহাতপস্বী মহাপুরুষের ত্যাগ-তপস্যা, বিবেক-বৈরাগ্য, ধৈর্য ও সাধনার পরিচয় পেয়ে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। এইকালে নিত্য মধ্যাহ্নে একাকী ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর মধুর সঙ্গ ও অল্প স্বল্প সেবা করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। ওঁকে একাকী পেয়ে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতুম। তাতে মহারাজ বিরক্ত না হয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিতেন। বলতেন, সরল পবিত্র জীবন খুবই দুর্লভ। তাঁর কৃপালাভ না করা পর্যন্ত নিজেকে কখনও নিরাপদ মনে করবে না। নিত্য প্রার্থনা, স্তবস্তুতি, গীতা-চণ্ডীপাঠ করতে ভুলবে না। নিষ্কলঙ্ক পবিত্র জীবনেই তাঁর কৃপা অনুভব করা যায়। তাঁকেই সর্বস্ব জেনে মনপ্রাণ দিয়ে নিত্য ডেকে যাবে।

এক সময় কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, কল্যাণানন্দের পত্রে তোমার বিষয় জেনে খুশি হয়েছি। এই অল্প বয়সে সংসার ছেড়ে উত্তরাখণ্ডে ছুটে এসেছ; রাজা মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ—সবাইকে দর্শন করে তাঁদের কৃপাশিস নিয়ে এসেছ—এ কম ভাগ্যের কথা নয়। ...এখন নিত্য যাতে সাধন-ভজন করতে পার তার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করবে। শাক-মাছের মতো দাম দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না। কেবল তাঁর দুয়ারে পড়ে থাকবে তাঁরই শরণাগত হয়ে। মন মুখ এক করে তাঁকে ডেকে যাওয়াই সাধন-ভজন। ভাবের ঘরে যেন চুরি না থাকে। ভগবানকে আত্মসমর্পণ করতে পারলেই শান্তি। তাঁর কৃপাই তাঁকে পাবার উপায়। ...তিনি অন্তর্যামী, সবই জানেন, এ বিশ্বাস রেখো। ...সর্বদাই মনে রাখবে আমি ভগবানের আশ্রিত, আমার আবার

ভয় কি? তিনি অন্তরের প্রার্থনা শুনে থাকেন। সব চিন্তার হাত হতে অব্যাহৃতি পেতে হলে সব কাজেই তাঁর ইচ্ছা ও শক্তি দেখার চেষ্টা করবে।

বহুবার ওঁর মুখে শুনেছি গীতার এই উপদেশটি—"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্"—এই অনিত্য ও দুঃখময় সংসারে এসে একমাত্র আমারই ভজন কর, নচেৎ শোক দুঃখের অন্ত থাকবে না। তিনি বারবার বলতেন, "আনন্দ পাও আর না পাও তাঁর চিন্তা করতে কখনও বিরত হবে না। ব্যাসদেব বলেছেন, যাদের পিত্তদোষ থাকে তাদের মুখে চিনি ভাল লাগে না। কিন্তু নিত্য যদি একটু একটু করে চিনি খাওয়া যায় তাহলে পিত্তদোষ কেটে যায় এবং ক্রমে ক্রমে চিনিও ভাল লাগে। সেইরূপ অবিদ্যা দোষেই মানুষের ভজনে অরুচি দেখা যায়, কিন্তু নিত্য যদি শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে তাঁর নাম জপ ও ধ্যানধারণা একটু করা যায় তাহলে অবিদ্যা দোষ দূর হয় এবং ভগবানে টান বাড়ে। ...সব কাজে ধৈর্য চাই। বীজ বুনতে বুনতেই ফল পাওয়া যায় না। অনেক যত্ন নিতে হয় ফল পেতে হলে। নিজে না খাটলে কে কি করে দেবে?"

মহারাজ বলতেন, "দুঃস্থ ও বিপন্ন যারা, তাদের সেবা ও সাহায্য করলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং হৃদয় উন্নত হয়। তবে ঠিক ঠিক ভাবের সঙ্গে করতে হবে। গীতায় শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞা করে বলছেন—'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।' কল্যাণকারীর কখনো দুর্গতি হবে না—আমার ভক্তের নাশ হবে না।"

"দুঃখ জানে, শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো"—ঠাকুরের এই কথাটি হরি মহারাজের মুখে প্রায়ই শুনতাম। আরও একটি প্রসঙ্গ তিনি বারবার করতেন—যিনি মনে করেন শরীর সুস্থ হলে পর ভগবানকে ডাকা যাবে, তার আর কোনকালেই ভগবানকে ডাকা হবে না। ব্যাসদেবের এই শ্লোকটি তিনি বলতেন—

য ইচ্ছতি হরিং স্মর্তুং ব্যাপারান্তর্গতৈরপি।
সমুদ্রে শান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছতি দুর্মতিঃ ॥

সমুদ্রতরঙ্গ শান্ত হলে স্নান করা যাবে—এ কথা যে ভাবে, তার কখনই আর স্নান করা হয় না। তেমনি রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা ও কাজকর্মের অবসানে ভগবানের নাম করার ইচ্ছাও কখনো পূর্ণ হয় না।

হরি মহারাজ থাকতেন কাশী সেবাশ্রমের একধারে অম্বিকাধামে। সুন্দর সৌম্যদর্শন ছিলেন তিনি। কঠিন রোগশয্যাতেও তাঁকে দেখেছি হাসি মুখে থাকতে আর শাস্ত্রের কথা বলতে। মহাত্যাগী তপস্বী সাধু শান্তিনাথ মহারাজকে দেখতাম হরি মহারাজের কাছে—মাঝে মাঝে আসতেন। হরি মহারাজও ঐ বৈদান্তিক তপস্বীকে দেখে বেশ খুশি হতেন।

মহারাজ বলতেন, "মনের ভালমন্দ অবস্থা যাই হোক না কেন হতাশ হবে না। জপধ্যান করতে করতে আবার মন ভাল হয়ে যায়। গীতায় আছে—যে আমার শরণ নেয়, সে এই অবিদ্যা অতিক্রম করে—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।' জানবে, 'ধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ।' মা-বাপ, পত্নী-পুত্র, জ্ঞাতি-স্বজন—এরা কেউই পরলোকের সহায় হয় না। ধর্মই কেবল থাকে। ...তৃষ্ণা বা বাসনাকে ত্যাগ করতে পারলেই শান্তি। আগুনে ঘৃতাহুতির ন্যায় কাম্যবস্তুর উপভোগে কামনার শান্তির পরিবর্তে তা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। 'ন জাতু কামঃ কামানুপভোগেন শাম্যতি।' তাই সব কল্যাণের মূল হলো সর্বদা তাঁর স্মরণ মনন করা। অনুরাগ ও টান তাঁর ওপর যাতে বাড়ে তার জন্য সর্বদা প্রার্থনা জানাবে। 'যেমন ভাব তেমনি লাভ'—ঠাকুরের এ কথা মনে রাখবে। ...কাম তো একপ্রকার দুর্বলতা। এ সময় খুব কেঁদে প্রার্থনা করলেই দূর হয়। যেমন আগুনে কাঠ না দিলে আগুন আপনিই নিভে যায়, তেমনি কাম হলে তার ভোগ থেকে বিরত হলে ওটা আপনি শান্ত হয়ে যায়। ...জানবে, ঈশ্বরে আসক্তিই হচ্ছে পবিত্রতা, আর বিষয়ে আসক্তিই হচ্ছে মলিনতা। হৃদয়ে সৎ ভাব সর্বদাই পোষণ করা চাই। তাঁকে ভালবাসতে পারলেই সব হবে। জানবে, ইনি ছাড়া আর সবই এই আছে এই নাই।"

হরি মহারাজ বলতেন, "মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দিন নয়। যে দিন হরিকথা বর্জিত, সে দিনই প্রকৃত দুর্দিন। মনের জোয়ার-ভাটা দেখে কখনও হতাশ বা নিরাশ

হবে না। যারা তাঁর শরণাগত তাদের ভয় নাই। তাঁর দিকে দশ পা এগুলে তিনি একশো পা এগিয়ে আসেন। সরল অন্তঃকরণে প্রাণের সহিত যে প্রার্থনা, তা তিনি শোনেন।”

হরি মহারাজ গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রের কথা প্রায়ই বলতেন। আবার ব্রহ্মচর্য, নিষ্কামভাবে নরনারায়ণ সেবার কথাও বারবার বলতেন। অহঙ্কার অভিমান ত্যাগ করে এই নরনারায়ণ সেবায় চরম লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়—এ কথাও তাঁর মুখে শুনেছি।

শেষ জীবনে তাঁর পিঠে কার্বাঙ্কল অস্ত্রোপচারের সময় তাঁর অসীম সহ্যশক্তি দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। ঐ সময় তিনি দেহবুদ্ধিশূন্য হয়ে আত্মস্থ হয়েই ছিলেন। দেখেছি তাঁর তিতিক্ষার পরাকাষ্ঠা। উনি যেন একেবারেই নির্বিকার। আচার্য শঙ্করের বাণী মনে পড়েছিল—

সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতিকার পূর্বকম্।
চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে ॥

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই শুক্রবার কাশীধামেই সজ্ঞানে দেহরক্ষা করেন পূজনীয় হরি মহারাজ উপনিষদের কথা বলতে বলতে।

(উৎস ঃ মহাজন স্মৃতি ও ধর্মপ্রসঙ্গ)

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতিকথা

স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ

১৯১৭ সাল। হরি মহারাজ ও রাজা মহারাজ পুরীতে আছেন। তখনও হরি মহারাজের অসুখ হয়নি। গাড়ি বারান্দার সামনে দুখানা আরামকেদারা পাতা থাকত। একখানিতে হরি মহারাজ ও আরেকখানিতে মহারাজ বসতেন। মহারাজের দুপুরবেলার আহার শেষ হয়ে গেছে। মহারাজের হাতে জল দেবার জন্য আমি তখন প্রস্তুত। মহারাজ বললেন, "চল, কাল যে গাছটি লাগানো হয়েছে সেই গাছটার গোড়াতে আঁচাব।" বলেই তাড়াতাড়ি তিনি বাইরের বাগানের দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর সেই গাছের কাছে গিয়ে আঁচাতে আরম্ভ করলেন। খুব কড়া রোদ উঠেছে। হরি মহারাজ বারান্দা থেকে মহারাজকে দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে মহারাজের মাথায় ছাতা ধরলেন আর আমাকে বললেন—"দেখতে পাচ্ছ না, মহারাজের মাথায় রোদ্দুর লাগছে?" আমি তখন খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছি। মহারাজ হরি মহারাজের দিকে চেয়ে বললেন—"আপনি ওটা (ছাতাটা) ওর হাতে দিন, আপনি কেন ধরছেন? আপনি খালি পায়ে এ রকম করে এসেছেন, পায়ে কাঁকর-টাঁকর ফুটিয়ে একটা কাণ্ড করবেন দেখছি।" শশীনিকেতনের রাস্তাগুলি সব কাঁকরে ভরা ছিল। মহারাজ খুব ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে উঠে পড়লেন।

পুরীতে শশীনিকেতনে মহারাজ আছেন। হরি মহারাজও এসেছেন পুরীতে। মহারাজ তাঁকে বললেন, "আপনি রয়েছেন, একটু ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করলে হয় না?" হরি মহারাজ অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, "বেশ তো, হোক না, তা পাঠ কে করবে?" মহারাজ বললেন, "ঈশ্বরই পাঠক হোক।" বিকেলবেলায় পাঠের আসর বসত। স্বয়ং মহারাজ আসনে বসে সেই পাঠ

শুনতেন। অষ্টাদশ জন শ্রোতা। বাইরের ভক্তরাও দুই একজন পাঠ শুনতে আসতেন। দুরূহ স্থানগুলি হরি মহারাজ ব্যাখ্যা করে দিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দের আদি থেকে রাসলীলার কিয়দংশ পর্যন্ত পাঠ হয়েছিল। পরে হরি মহারাজের অসুখ হওয়াতে পাঠ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯১৭ সাল, দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে মহারাজ পুরীতে শশীনিকেতনে আছেন। একদিন তিনি হরি মহারাজকে বললেন, "ঈশ্বর সুন্দর স্তব পাঠ করে, কিন্তু সংস্কৃত ভাল জানে না বলে মানে ঠিক বুঝতে পারে না, আপনি যদি একটু বুঝিয়ে দেন।"

মহারাজ পুরীতে থাকাকালীন হরি মহারাজ প্রায়ই পুরীতে মহারাজের সঙ্গে থাকতেন। একবার পুরীর শশীনিকেতনে হরি মহারাজ অসুস্থ। তাঁর পায়ে ঘা হয়েছে, অস্ত্রোপচার হবে। মহারাজ সে কথা শুনে ভীত হলেন। বালকের মতো চঞ্চল হয়ে একবার ঘরে আসছেন, একবার বাইরে যাচ্ছেন, হলঘরে পায়চারি করছেন। আবার হরি মহারাজের কাছে ছুটে গিয়ে মাথার পাশে দাঁড়াচ্ছেন। অস্ত্রোপচার আরম্ভ হয়েছে। হরি মহারাজ নীরব, ধীর, স্থির হয়ে শুয়ে আছেন। মহারাজ তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে বলছেন, "খুব কষ্ট হচ্ছে, না হরি মহারাজ?" হরি মহারাজ একগাল হেসে বললেন, "না মহারাজ, আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। পিঁপড়ে কামড়ালে যে ব্যথাটুকু হয়, তাও আমি বোধ করছি না। আপনি এ ঘরে থাকবেন না। আপনারই কষ্ট হচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি।" এই বলে হরি মহারাজ, মহারাজের হাতের ওপর হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে বললেন, "আপনি ভাববেন না। সত্যই আমি কষ্টবোধ করছি না।" তারপর মহারাজ নিজের ঘরটিতে এসে ছোট খাটটিতে বসে পড়লেন—বললেন, "আমাকে একটু তামাক দে তো।" মহারাজের চোখ দুটি দেখলাম জলে ভরা।

এই সময় ডাক্তাররা বললেন সিঙ্গি বা কৈ মাছের ঝোল হরি মহারাজকে দিতে। পার্থ চৈতন্যের পিতা কর্তৃক মাস দুই আগে প্রেরিত এবং শশীনিকেতনের চৌবাচ্চায় মহারাজের নির্দেশে রক্ষিত কৈ, মাগুর, সিঙ্গি মাছের ঝোল প্রায় দুই মাস ধরে আমরা হরি মহারাজকে দিয়েছিলুম।

হরি মহারাজ মঠের সাধুদের কাছে তাঁদের গুরুভাইদের পারস্পরিক নিন্দা ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করে একটি গল্প বলেন; আমি অবশ্য নিজে সে গল্প শুনি নি। অন্যান্য সাধুব্রহ্মচারীদের কাছ থেকে শোনা কথা। তাহলেও আমাদের প্রত্যেকের সেটা জানা প্রয়োজন। তাই গল্পের উল্লেখ করলুম। মঠের সাধুব্রহ্মচারীদের মধ্যে অনেকেই গল্পটি জানেন। এই গল্পটি হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানের একটি প্রচলিত গল্প। "এক সাধুর দুই শিষ্য মাধুকরী করে এনে গুরুদেবের সেবা করেন। সেখানকার কোন ভক্ত-গৃহস্থের বাড়িতে তাঁদের মধ্যে একজন মাধুকরী করতে গিয়েছিলেন—গৃহস্থ তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলায় তিনি একটু ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন। পরের দিন অপর সাধুটি মাধুকরীতে গিয়েছেন সেই গৃহস্থের বাড়িতে। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে জানালেন, "পূর্বদিন যে সাধুটি এসেছিলেন তিনি বোধহয় একটু রাগী। আমি তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলায় তিনি একটু রাগান্বিত হলেন।" তা শুনে সেই সাধুটি বললেন, "হরিহরানন্দ, ও তো একঠো গৈ হ্যায়।" গৃহস্থ তো অবাক। আবার আগের সাধুটি মাধুকরীতে এলে তিনি তাঁর গুরুভাইয়ের উক্তিটি শোনালেন। সে কথা শুনে পূর্বেকার সাধুটি বললেন, "ও তো ভইস হ্যায়।" গৃহস্থ-শিষ্য তখন আশ্রমে এসে সে কথা গুরুদেবকে জানালেন। গুরুদেব বললেন, "দেখ তুমি একদিন দুজনকেই নেমন্তন্ন কর এবং একজনকে গরুর খাদ্য অপরজনকে মহিষের খাদ্য খেতে দেবে। তারা কিছু বললে তুমি বলবে—সন্ন্যাসীর কথা তো মিথ্যে হবার নয়, আপনারাই আমাকে এ কথা বলেছেন।" যথাসময়ে গৃহস্থ দুই সাধুকে নেমন্তন্ন করলেন। তাঁরা তখন বেশ সেজেগুজে লাড্ডু মিঠাই খাওয়ার আশায় গৃহস্থের বাড়িতে এলেন। গৃহস্থ সাদরে তাঁদের নিয়ে একজনকে গরুর খাদ্য এবং অপরজনকে মহিষের খাদ্য খেতে দিলেন। তাঁরা দেখে খুব ক্রোধান্বিত হলেন। গৃহস্থ সবিনয়ে জানালেন পরস্পরের সম্বন্ধে তাঁদেরই উক্তি। তখন তাঁদের চৈতন্য হলো। তাঁরা কিছুতেই গৃহস্থ বাড়িতে খেতে চাইলেন না। গৃহস্থ তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁদের খেতে নিয়ে গেলেন এবং পরিতোষ সহকারে খাওয়ালেন।" এই গল্প বলে হরি মহারাজ তাঁদের

গুরুভাইদের পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসারও উল্লেখ করেছিলেন এবং সাধুব্রহ্মচারীদের শিক্ষাও দিয়েছিলেন শুনেছি।

পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। যথাসম্ভব খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটিয়ে মহারাজ ও হরি মহারাজকে সঙ্গে করে আমরা রথে জগন্নাথ দর্শনের জন্য যাত্রা করলুম। এমার মঠের মোহান্তের বাগানে মহারাজ ও আমরা উপস্থিত হলুম। এমার মঠ জগন্নাথদেবের রথযাত্রার গুণ্ডিচাবাড়ি যাবার পথের বাঁ ধারে। এমার মঠের মোহান্ত মহারাজ ও হরি মহারাজের জন্য দু-একখানি আরামকেদারা ও আমাদের জন্য শতরঞ্চির ব্যবস্থা করেছিলেন। সেবার রথযাত্রায় যাত্রীর ভিড় তেমন হয়নি। তিনটি রথের প্রথমটিতে জগন্নাথ, দ্বিতীয়টিতে সুভদ্রা এবং তৃতীয়টিতে বলরামের মূর্তি আরোহণ করানো হয়। অনেকক্ষণ আমরা এমার মঠে বসেছিলুম। তারপর বিপুল জয়ধ্বনি শুনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম দূরে জগন্নাথদেবের রথ আসছে। হরি মহারাজের গায়ে ছিল একটি সাদা ফতুয়া ও একখানি গেরুয়া চাদর। তিনি চাদরখানি কোমরে জড়িয়ে কতকটা মালকোচা ঢঙ-এর করে কাপড়খানি পেছনে গুঁজে ছেলেমানুষের মতো দৌড়ে রথের রজ্জু ধরলেন। মহারাজ আমাদের একজনকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোরা যা, একজন হরি মহারাজের কাছে যা—ভিড়ের চাপে যদি পড়েটড়ে যান। মনে হয় ভূমানন্দ স্বামী ও আরেকজন সাধু দৌড়ে গিয়ে হরি মহারাজকে আগলাতে লাগলেন। মহারাজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। হাত দুটি বুকের কাছে নিয়ে দুই একবার যেন করেতে জপ করলেন মনে হলো। তারপর জোড় হস্তে দাঁড়িয়ে রইলেন। শরীর তার রোমাঞ্চিত হচ্ছিল; মাথাটা ঈষৎ নাড়ছিলেন, না হয় আপনা হতেই নড়ছিল, হাত দুটি জোড়। রথটি যখন নিকটবর্তী হলো, তখন মহারাজ ও আমরা রথের রজ্জুর নিকটবর্তী হলুম ও মহারাজের হাতে রজ্জু ধরিয়ে দিলুম। মহারাজ সামান্য দূরে গিয়ে রজ্জু ছেড়ে দিলেন, হরি মহারাজ কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত রথরজ্জু ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন, এ রকম করে তিনটি রথের রজ্জু ধরে আমরা কিছুক্ষণ চলেছিলুম।

দুদিন পর গুণ্ডিচাবাড়িতে হরি মহারাজ ও মহারাজকে নিয়ে আমরা সাধুরা সবাই গিয়েছিলুম কারণ সেখানে বসে প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। একটি ঘরে জগন্নাথদেবের বিশেষ মহাপ্রসাদ পাণ্ডারা সাজিয়ে দিয়েছিল, একটি বড় করে পলাশ পাতায় অন্ন ঢালা হলো ও অপর একটিতে কণিকা প্রসাদ এবং হাঁড়িতে (দুটি) ডাল এবং অনেক রকমের ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি। মহারাজ ও হরি মহারাজ মাটিতেই বসে পড়লেন আর আমাদের বললেন, "তোরা ধার দিয়ে বস।" মহারাজ ও হরি মহারাজ প্রসাদ খেতে আরম্ভ করলেন ও আমাদের বললেন, "তোরাও খা।" মহারাজের সঙ্গে এক পাতায় বসে খাব এটা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। সঙ্কোচে আমার হাত এগোচ্ছিল না। মহারাজ বললেন, "খা, এক সঙ্গে মহাপ্রসাদ খেতে হয়"। আমরা সকলে মিলে হরি মহারাজ ও মহারাজের কাছে খেতে আরম্ভ করলুম। আমি ও সনৎ সেদিন এত খেলুম যে সবাই দেখে অবাক হয়ে গেল। মহারাজ, হরি মহারাজের সঙ্গে একপাতে খাওয়া—এই স্মৃতি আজও উজ্জ্বলভাবে মনে অঙ্কিত আছে।

পুরীর শশীনিকেতনে মহারাজ আছেন। হরি মহারাজও তখন সেখানে। ১৯১৭ সাল। আমাদের মধ্যে একজনের জ্বর হওয়াতে তাকে দোতলার হলঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছে। আমি নানা কাজের মধ্যে সময় করে তাকে দেখতে যেতে পারিনি। এই সময় হঠাৎ একদিন হরি মহারাজ আমার কাছে সেই সাধুটি কেমন আছে জানতে চাইলেন। আমি সবিনয়ে তাঁকে জানালুম যে সময়াভাবে তাঁর খোঁজ করতে পারিনি। ঐ কথা শুনে হরি মহারাজ বললেন—"তোমাদেরই একটি সাধু অসুস্থ হয়ে পড়েছে আর তার খোঁজ তুমি করনি? কি করে বললে যে সময়াভাবে তুমি তার খোঁজ করতে পারনি? আমি অসুস্থ এখন—না হলে আমি নিজেই যেতুম তার খোঁজ করতে।" এইভাবে তিনি আমাকে একটু শিক্ষা দিলেন। এই রকম নানা কথা তিনি মাঝে মাঝেই আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন।

এই সময়েই শশীনিকেতনে গভীর রাত্রে হঠাৎ অতি ভীষণ একটা বিকট

আওয়াজ শুনে ম্যাজিকের মতো একই সঙ্গে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। ঐ রকম shrill আওয়াজ আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। ঐ আওয়াজে শশীনিকেতনের বিরাট বাড়িটা যেন কেঁপে উঠল। ও রকম আওয়াজ আমরা কখনও শুনিনি। আজও যেন কানে সেই আওয়াজটা শুনতে পাই। সেই আওয়াজ শুনে মহারাজ নিজের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং কোথা থেকে আওয়াজ এল জিজ্ঞাসা করলেন। হরি মহারাজ বরাবরই জেগে ছিলেন—বললেন, "আমার ঘরের বাথরুমের বাইরের দিকের কোণের কারনিসের ওপর থেকে আওয়াজটা এসেছে মনে হয়।" শুনে মহারাজ একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লেন এবং হরি মহারাজের অসাক্ষাতে বললেন—"এটা ভৌতিক ব্যাপার, বড়ই অমঙ্গলসূচক।" হরি মহারাজ তখন রাত তিনটেয় উঠে অমূল্য মহারাজের সঙ্গে গিয়ে মন্দিরে মঙ্গলারতি দর্শন করতেন এবং সমুদ্রস্নান করে ফিরতেন। এই ঘটনার পরই স্নান করবার সময় তাঁর পায়ে ঝিনুক ফুটে ঘা হয় এবং সেই ঘা বিষাক্ত হয়ে ভীষণাকার ধারণ করে। সেইজন্য দু-মাস তাঁকে দেহকষ্ট ভোগ করতে হয়। প্রবাদ আছে ঐ শশীনিকেতন ভূতের বাড়ি। ঐ বাড়িতে মহারাজ ভূত দেখেছেন। অন্যদের কথা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও মহারাজের কথা আমরা অবিশ্বাস করতে পারি না, আর হরি মহারাজের অসুস্থতাই প্রমাণ করে দিল এ কথা।

রামকৃষ্ণবাবুর মা কাশীলাভ করেছেন। শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে বলরাম ভবনের নিতাইবাবু প্রভৃতি অনেকেই কাশী যাবেন ঠিক হয়েছে। নিতাইবাবুর ইচ্ছে আমাকেও কাশী নিয়ে যান। মহারাজের কাছে আমার ইচ্ছে প্রকাশ করায় তিনি বললেন, "তুই নিতাই-এর সঙ্গে কাশীতে যা ও বিশ্বনাথ দর্শন করে আয়। ফিরবার সময় এলাহাবাদ, বিন্ধ্যাচল ও অযোধ্যা দর্শন করে আসিস।" আমরা কাশীতে গিয়ে সেবাশ্রমে অম্বিকাধামে উঠলুম। পূজনীয় হরি মহারাজ তখন অম্বিকাধামেই বাস করছিলেন। আমি ধুলো পায়েই তাঁর ঘরে গেলুম তাঁকে প্রণাম করার জন্য। তিনি বিছানায় অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন। আমাকে দেখেই হঠাৎ উঠে বসলেন ও বললেন—"ঈশ্বর, তুমি! মহারাজ এসেছেন?" আমি

বললুম—"না মহারাজ, আমি বিশ্বনাথ দর্শন করবার জন্য এখানে এসেছি।" হরি মহারাজ বললেন, "আমি ভেবেছিলুম তুমি যখন এসেছ, নিশ্চয়ই মহারাজও এসেছেন। তুমি মহারাজকে ফেলে বিশ্বনাথ দর্শন করতে এসেছ? সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ ছেড়ে 'বিশ্বনাথ' দর্শন!" এই বিশ্বনাথ কথাটির ওপর এতটা জোর দিলেন যে আমি একটু ঘাবড়ে গেলুম ও কোনরকমে একটি প্রণাম সেরে বেরিয়ে এলুম। এই আমার হরি মহারাজের সঙ্গে শেষ দেখা।

(উৎস ঃ স্মৃতিকথা)

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অস্ফুট স্মৃতি

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

সে আজ অনেক দিনের কথা, ১৯১৮ কি ১৯১৯ খ্রিঃ হইবে। জীবনের এক অধ্যায় প্রায় শেষ করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছি। শরীরটি বিকল, উহা সারাইতে হইবে। গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ পূর্ব-পরিচিত দুইটি বন্ধুর সহিত দেখা হইল। তাঁহাদের সহিত কিছুকাল পূর্বে কয়েকবার বেলুড় মঠে যাতায়াত করিয়াছিলাম। দেখা হইতেই বন্ধুগণ আমার ভবিষ্যৎ জীবনধারা কোন্ দিকে প্রবাহিত হইবে জিজ্ঞাসা করেন। এ বিষয়ে তখনও কিছু স্থির করিতে পারি নাই বলায় একজন বলিলেন, "এখানে রামকৃষ্ণ মিশন আছে। আমরা সেখানে যাতায়াত করি। তুমিও ভাই, সেখানে যাইও।" শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখাইয়া উহা আমার পক্ষে বর্তমানে সম্ভব নহে বলিলাম। তদুত্তরে তখনই অন্য বন্ধুটি বলিলেন, "ওহে সেখানে যাইও, সেখানে একজন আমেরিকা-ফেরত সাধু আছেন দেখিবে। তিনি স্বামীজীর সমসাময়িক।"

নানা বিষয়ে আলোচনার পর মিশনে মাঝে মাঝে যাইতে স্বীকৃত হইলাম এবং প্রথম বন্ধুটির সহিত বোধ হয় পর দিনই রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। মিশনে প্রবেশ করিয়া প্রাচীন ও নবীন কয়েকজন সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ-পরিচয়ের পর শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সান্নিধ্যে বন্ধুবর আমাকে লইয়া গেলেন। তিনি তখন অম্বিকা-কুটিরের বাহিরের বারান্দায় বসিয়াছিলেন। দেখিলাম তিনি অতি সৌম্য-মূর্তি, সর্বাঙ্গ হইতে যেন অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্বক আমরা আসন গ্রহণ করিলাম। তিনিও আমাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কাশীতে কেন আসিয়াছি, কত দিন থাকিব এবং কোথায় উঠিয়াছি প্রশ্ন করিলেন। সকল

বিষয়ে যথাযথ উত্তর দিবার পর, তিনি পুনরায় আমাকে তাঁহার নিকট সুবিধামত আসিতে বলিলেন।

মিশনের প্রতি আকর্ষণ ইতঃপূর্বে আমার বিশেষ কিছু ছিল না। দুই একবার বেলুড় মঠে যাতায়াত করিলেও জীবনধারা অন্য পথে প্রবাহিত হইতেছিল। তাই এবারও অনুরূপই হইবে মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এই অদ্ভুত পুরুষের আকর্ষণ তখন হইতেই কেন যেন একটু একটু অনুভব করিতে লাগিলাম। বন্ধুবরও নাছোড়বান্দা। সুতরাং তাঁহার সহিত পরে প্রায় প্রতিদিনই সেবাশ্রমে আসিতে হইল ও শ্রদ্ধেয় তুরীয়ানন্দজীর পুণ্য সঙ্গ, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, লাভ করিয়া ধন্য হইতে লাগিলাম। তিনি তখন খুবই অসুস্থ। কিন্তু রোজই দেখিতাম তিনি ধীরস্থির ভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সমবেত ভক্তগণের নিকট অতি সুন্দর সুমিষ্ট ভাষায় নানা শাস্ত্র হইতে নানারূপ শ্লোক উদ্ধারপূর্বক প্রত্যেকের জীবন-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। তখন আমরা ঘোর সংশয়বাদী, আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান অতি অল্পই ছিল। তাই অনেক সময়েই স্বামীজীর অপূর্ব উপদেশের কিছুই বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার বলিবার অলৌকিক ভঙ্গিমায় মুগ্ধ হইয়া যাইতাম।

স্বামী তুরীয়ানন্দজী হঠাৎ একদিন গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ —৬/৫

এই শ্লোকটি অতি গম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘‘আত্মাকে আত্মা দ্বারাই উদ্ধার করিতে হইবে, তিনিই তোমার বন্ধু। তাঁহাকে না জানিতে পারিলেই তিনি তোমার শত্রু হইয়া পড়েন। তিনি ব্যতীত তোমাকে উদ্ধার করিতে জগতে আর কেহ নাই। আমাদের সকলের তাঁহারই শরণ লইতে হইবে।’’ পূর্বে কিছুদিন হইতে তাঁহার মুখে নানাপ্রকার শ্লোকাবৃত্তি শুনিলেও তাঁহার ঐ দিনের উক্ত শ্লোকটির অপূর্ব আবৃত্তি যথার্থই আমাদের প্রাণে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করিল। ভাবিলাম, সত্যই কি আমাদের ভিতর এইরূপ এক আত্মা রহিয়াছেন যিনি স্বয়ংপ্রকাশ ও সর্বাশ্রয়? তাঁহার ধ্যানচিন্তায় কি আমাদের সর্বপ্রকার দৌর্বল্য বিদূরিত হইয়া যায়?

সেদিনের সেই শ্লোকের ঝঙ্কার আজও কানে বাজিতেছে। তাঁহার ঐ দিনের উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি শুনিয়া সত্যই মনে হইয়াছিল, আমাদের সেই মহান আত্মা রহিয়াছেন। তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে জীবনে সবই বৃথা হইয়া যাইবে। তারপর বহু দিনই তুরীয়ানন্দজীর নিকট গিয়াছি। এ কথা সে কথা বলিয়া, কি আশ্চর্য! মাঝে মাঝে ঐ অপূর্ব শ্লোকটি সেই স্বর্গীয় তেজঃসম্পন্ন ঋষি আমাদের নিকট আবৃত্তি করিতেন। আমাদের তৎক্ষণাৎ মনে হইত, বেদান্তের সাক্ষাৎ মূর্ত ঋষি যেন আমাদের ভিতরে সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করিতে অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু তখন সংশয়াকুল যুবক আমরা। তাঁহার এই গম্ভীর প্রত্যক্ষোপলব্ধির বাণী শুনিয়াও মাঝে মাঝে ঘোর সংশয়ে পড়িতাম। চপলমতি বালকের বুদ্ধি লইয়া কত দিনই না তাঁহার সহিত কত তর্কবিতর্ক করিয়াছি। তিনি কখনও কখনও হাসিয়া হাসিয়া, কখনো বা তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া আমাদের ঐ অলীক সংশয় দূরীকরণের চেষ্টা করিতেন।

মনে পড়ে, এক দিন বৈকালে তাঁহার সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে সেবাশ্রমের নিকটেই দেখিলাম বহু যাত্রী দেশবিদেশ হইতে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। সেদিন পূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণ ছিল। তুরীয়ানন্দজী উহা দেখিয়া আমাদিগকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ দেখ, কি ভক্তি লইয়া কত দূর দেশ হইতে এই সকল যাত্রী আসিয়া একত্রিত হইয়াছে। আজ গ্রহণ, তাহারা গঙ্গাস্নান করিয়া ধন্য হইবে।" ইংরেজি কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম—গ্রহণ বিষয়ে বর্তমান জ্যোতিষশাস্ত্র যাহা বলে, তাহা কিছু কিছু জানিতাম। বিদ্যাভিমানীর মতো বলিয়া উঠিলাম, "মহারাজ, এ তো ঘোর কুসংস্কার! রাহু তো কখনই চন্দ্রকে গ্রাস করিবে না। পৃথিবীর ছায়ামাত্র পড়ে বলিয়াই তো চন্দ্রকে ঐরূপ রাহুগ্রস্ত দেখায়। এতগুলি লোক কেন সেই ভ্রান্ত ধারণায় পড়িয়া চন্দ্রকে রাহুগ্রস্ত ভাবিবে ও গঙ্গাস্নানে আপনাদিগকে পাপমুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে?" তুরীয়ানন্দজী আমার কথা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তুমি কি এই বিষয়ে সবই জানিয়া ফেলিয়াছ? কোন্ অনাদি কাল হইতে এইরূপ কত ভক্ত আসিয়া

এইভাবে তাহাদের মনের ময়লা কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার কি কোন ফলই নাই?" কিন্তু ইংরেজি-শিক্ষিত যুবক আমরা তাঁহার এই কথা নির্বিচারে মানিয়া লই নাই। এই বিষয়ে আমরা যাহা যাহা পড়িয়াছি, সবই নির্লজ্জভাবে তাঁহাকে বলিয়া যাইতে লাগিলাম। তিনি সেই দিন আর কোন কথা না বলিয়া সেবাশ্রমে ফিরিয়া উপস্থিত সাধুদের বলিলেন, "শোন, এই ছেলেটি গ্রহণ সম্বন্ধে কি বলিতেছে!" তাঁহারা আমার কথা শুনিয়া হাসিলেন মাত্র। পর দিন আশ্রমে গেলে তুরীয়ানন্দজী সস্নেহে আমাকে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "গ্রহণ-স্নানের কথা কাল যাহা বলিতেছিলে, উহার অনেক অর্থ আছে। আমাদের ঋষিগণ কোন জিনিসই বৃথা আমাদের শাস্ত্রে লিখিয়া যান নাই। ছোট বালক দেখিয়াছ তো? তাহারা সাধারণত তিন শ্রেণির থাকে। একদল সুবোধ। তাহাদিগকে অভিভাবকগণ বলিলেই পড়িতে বসিয়া যায়। দ্বিতীয় দলকে পড়াশুনা করাইবার জন্য অভিভাবকগণের মিঠাইমণ্ডা প্রভৃতি উপহার দিতে হয়। ঐ শ্রেণির বালকগণ সেই জন্যই পড়ায় মনঃসংযোগ করে। কিন্তু আর একদল বালক আছে যাহারা উহাতেও ভুলে না। তাহাদের জন্য সেই কারণেই বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উহা না হইলে, তাহারা পড়িতে বসিবে না। আমাদের শাস্ত্রকার ও ঋষিগণও দেখিয়াছেন আমাদের ভিতরেও ঐরূপ তিন শ্রেণির লোক আছে। যাহারা বিশেষ ভাগ্যবান, তাহারা শাস্ত্রকথা শুনিয়াই সংসার অনিত্য জ্ঞান করিয়া নিত্যবস্তু লাভের জন্য ধাবিত হয়। কিন্তু এই ভাগ্যবানের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। তাই শাস্ত্রকারগণ অপরদিগের জন্য ঐরূপ মোদক বা পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বলিয়াছেন, প্রকৃতির এই সকল পরিবর্তনের সময় এইরূপ এইরূপ ভজন-পূজন ও অনুষ্ঠানাদি করিলে উহাতে বিশেষ ফল অর্থাৎ অক্ষয় স্বর্গাদি পাইবে। একদল লোক ঐ লোভেই ঐ সকল অনুষ্ঠানাদি পালন করে ও অন্তত সেই সময়টুকু সমগ্র মনপ্রাণ শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও এক শ্রেণির লোক আছে, যাহারা উহাতেও অনিত্য সুখের লোভ ত্যাগ করিতে পারে না। শাস্ত্র তাহাদের জন্যই বেত্রাঘাত বা নরকাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। শাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্য ইহাই, যে কোন প্রকারেই হউক উহারা শ্রীভগবানের দিকে মন সমর্পণ করিবার চেষ্টা করুক।

তাহা হইলে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে। শুধু মিষ্ট কথায় উহাদিগকে বুঝাইলে তো হইবে না। তাই এই সকল পুরস্কার ও শাস্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা। যাঁহারা প্রতিক্ষণ তাঁহার নাম করিতে পারেন, অবশ্য তাঁহাদের এই সকলের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই শ্রেণির লোক কজন আছে বল?''

আর একদিনের কথা। বালকসুলভ চাপল্যহেতু পুনরায় একদিন পূজনীয় হরি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, ''মহারাজ, গঙ্গাস্নান করিয়া কি লাভ হয়?'' তিনি বলিলেন, ''তুমি কি গঙ্গাকে সামান্য নদীমাত্র মনে কর?'' পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রগলভতার বশে বলিলাম, ''না মহারাজ, কাশীতে গঙ্গার যে রূপ দেখিতেছি, তাহাতে ইহাকে নদীও বলা যাইতে পারে না।'' মহারাজজী হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণই গম্ভীরভাবে বলিলেন, ''যাদের লেখা পুস্তকের দুই-চার পাতা পড়িয়া তোমরা আজ তোমাদের দেশের দেবদেবীগণকে এইরূপ অশ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছ, জান কি পূজ্যপাদ স্বামীজী (বিবেকানন্দ) তোমাদেরই শাস্ত্র লইয়া তাহাদিগের (বিদেশীদের) জয় করিয়া আসিয়াছেন? এই গঙ্গার মাহাত্ম্য বলিতে বলিতে তিনি কিরূপ ভাবগদগদ হইয়া পড়িতেন! শুধু তিনি কেন, অনাদি কাল হইতে কত মুনিঋষি এই গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। এমনকি অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্করও ইহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তোমরা দুই-একখানি পাশ্চাত্য পুস্তক পড়িয়াই আজ গঙ্গাকে অনাদর করিতে শিখিয়াছ!''

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর গঙ্গার প্রতি অবিচলিত ভক্তির দুই একটি কথা উল্লেখ না করিলে আমার বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বহু দিন দেখিয়াছি, অতি অসুস্থ শরীর লইয়াও তিনি পদব্রজে প্রায় দুই মাইল অতিক্রম করিয়া গঙ্গা-দর্শনে যাইতেন এবং গঙ্গাতীরে দশাশ্বমেধ-ঘাটে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গঙ্গাদর্শন করিতেন। সেখানে আমাদের সহিত দেখা হইলে অনেক সিঁড়ির নীচ হইতে গঙ্গাজল হাতে করিয়া আনিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিতে বলিতেন। তখন কিছু না বুঝিলেও এখন বুঝিতেছি, সেই বহু ঋষি-পূজিতা গঙ্গাদেবীকে তিনি সত্য-সত্যই দেবী বলিয়া মনে

করিতেন। সেই হেতু তাঁহাকে নিত্য দর্শন-স্পর্শন করিয়া যাহাতে আমাদিগের মতো অবিশ্বাসী যুবকের মনেও ভক্তিরস সঞ্চারিত হয়, তজ্জন্য তিনি এইরূপে অশেষ চেষ্টা করিতেন।

পরমজ্ঞানী হইলেও তাঁহাকে এই সময়ে অসুস্থ শরীর লইয়া অতি কষ্টে কয়েকবার বিশ্বনাথ দর্শন করিতে যাইতে দেখিয়াছি। কাশীধামের মাহাত্ম্যও তাঁহার মুখে এই সময়ে বহুবার শুনিয়া ধন্য হইয়াছি। "কাশীকা সমান নাই পুরী" গানের এই পদটি গাইতে গাইতে ভাবগদগদ-চিত্ত হইয়া বলিতেন, "কাশীর মতো স্থান কি আর ভূ-ভারতে আছে? সম্পূর্ণ শরীর-বোধ-রহিত ত্রৈলঙ্গস্বামীর মতো কত মহাপুরুষই এ স্থানে বাস করিয়া এ স্থানটিকে পরম তীর্থ করিয়া গিয়াছেন!"

শিবরাত্রির দিনে উপবাস করিয়া আমাদের আশ্রমের সাধুদের বিশ্বনাথ-দর্শনে যাইতে দেখিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি বলিতেন, "যাও, তোমরা ব্রতী। তোমরা অদ্যকার দিনে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া ধন্য হও। আমার শরীরে আর সামর্থ্য নাই, তাই আমার পক্ষে উহা সম্ভব নহে।" কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতেই সেই পরমজ্ঞানী তাঁহার হৃদয়ের অলৌকিক জ্ঞানের কথা আমাদের নিকটে এইভাবে প্রকাশ করিয়া বসিতেন, "তোমরা তাঁহাকে সেখানে যাইয়া দর্শন কর। আমি কিন্তু তাঁহাকে এইখানে (নিজ শরীর দেখাইয়া) দর্শন করিতেছি।"

তাঁহার এইরূপ জ্ঞান ও ভক্তির কথা প্রায় একই সময়ে শুনিয়া আমরা অবাক হইয়া যাইতাম। আমরা বুঝিতাম না কোন্‌টির সাধনা করিয়া তিনি এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন। আমাদের হৃদয়ে যাহাতে সেই পরম সত্য উদ্ভাসিত হয়, যাহাতে প্রবল পুরুষকার-সহায়ে আমরা যথার্থ জ্ঞানলাভে ধন্য হইতে পারি তজ্জন্য তাঁহার কত চেষ্টাই না প্রতিক্ষণ অনুভব করিতাম! আমাদিগের অভিমানে আঘাত করিয়া বলিতেন, "তোমরা কি ছেলে?—তোমরা 'পিল্লে' মাত্র।" উপহাসচ্ছলে এই কথাটি উল্লেখ করিয়া আরও বলিতেন, "ছেলে ছিলেন স্বামীজী, যাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন 'পুরুষ-পায়রা', ঠোঁট ধরিলেই

ঠোঁট ছিনাইয়া লইয়া যায়; তেজস্বী বলদ, যাহার ল্যাজে হাত দিলেই তিড়িং বিড়িং করিয়া উঠে। তোমরা কি এইরূপ হইতে পার?"

একদিন ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "মহারাজ, কিছু উপদেশ দিন।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "ওহে চোখে চশমা পরিলে কি হইবে? আগে চোখটি খোল, নতুবা চশমায় কোন কাজই হইবে না।" আবার সেই 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং' শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "আত্মাকে নিজের পুরুষকার দ্বারাই উদ্ধার করিতে হইবে। নতুবা কে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারে বল?"

একটি ছেলে কয়েক বৎসর রাজনৈতিক কারণে সরকারের নির্যাতন ভোগ করিয়া জেল হইতে মুক্ত হইয়া হরি মহারাজজীর নিকট আসিলে, তিনি দুই একটি কথা বলিয়াই তাহার ভিতরের তেজস্বিতার পরিচয় পাইলেন। ইহাতে পরম প্রীত হইয়া পরে আমাকে বলিলেন, "ছেলে হইলে এইরূপ ছেলেই চাই। দেখ না আমাদের মুখের সামনেই বলিয়া গেল, 'যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের আমি বলিব coward (ভীরু), সংসারের দুঃখকষ্টের সহিত তাঁহারা দুঃখ করিলেন না কেন?' ছেলেটি স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়িয়াছিল ও তাঁহার বিশেষ ভক্ত ছিল। তাই তাহার ঐ কথার উত্তরে আমি বলিলাম— তোমার স্বামীজী, তিনিও তো তাহা হইলে এইরূপ coward? ছেলেটি তখন চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু উহার সাহসিকতা দেখ, এইরূপ সাহসী ছেলেরই আমাদের প্রয়োজন।"

যখন কোন কাজকর্ম লইয়া স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে সামান্য সামান্য মনোমালিন্য হইত, তখন দেখিয়াছি হরি মহারাজ তাঁহাদিগকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছেন, "তোরা কিসের ধ্যানভজন করিস? তোরা কি ঠাকুরঘরে যাইয়া মালাজপ করিয়া আসিলি না কলা চটকাইলি? ওরে, সন্তুষ্ট যদি কাহাকেও করিতে হয় তো তোর ভিতরে যে অন্তরাত্মা রহিয়াছেন তাঁহাকেই সন্তুষ্ট কর। তখন দেখিবি সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে। নতুবা, এই সকল কাজ করিয়া তোরা কাহাকে সন্তুষ্ট করিতে যাইতেছিস বল?"

আমার শরীর বহুদিন হইতে খারাপ ছিল। তাঁহার নিকট গেলে তিনি উহার খবর নিত্যই লইতেন। কিন্তু এই শরীরবুদ্ধি যে আমার ধর্মজীবন-লাভের প্রধান অন্তরায় তাহা তখন বুঝিতাম না। তাই সেই পরম-কারুণিক একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, উহার (অপরের) সংসার-আসক্তির কথা বলিতেছ। কিন্তু এই শরীরটিও তো সংসার! কি বল?" তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, হঠাৎ তিনি আজ একি অদ্ভুত কথা বলিতেছেন। এই শরীরটির তো তিনি নিত্য কতভাবে খোঁজ লইতেছিলেন। কিন্তু আজ আবার একি কথা বলিলেন! চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু জলদগম্ভীর স্বরে পুনরায় তিনি ঐ প্রশ্নের আবৃত্তি করিলেন। আমার স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, কে যেন আমার মস্তকে দারুণ আঘাত করিয়া আমার চিরন্তন দেহবুদ্ধির দুর্গ ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি তাঁহার এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়াই বসিয়া রহিলাম। পরে চাহিয়া দেখি আচার্যবর সোৎসুক নয়নে আমার নিকট হইতে এই প্রশ্নের উত্তর চাহিতেছেন। হাত জোড় করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "হ্যাঁ, মহারাজ, এই শরীরটি সত্যই সংসার। আশীর্বাদ করুন যেন আত্মবুদ্ধি আমার দৃঢ় হইতে পারে।"

তারপর কতদিনই না তিনি আমাদিগের ভিতরে সদ্‌বুদ্ধি জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কতদিন বলিয়াছেন, "দেখ, হরিণের নাভিতে কস্তুরী আছে, কিন্তু হরিণ উহার সন্ধান জানে না। তাই বৃথা পাগল হইয়া সে উহার সন্ধানে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া মরে। তোমরাও যখন অন্তরাত্মার সন্ধান পাইবে, তখন আর এইরূপে ঘুরিয়া মরিবে না।" আবার কখনও কখনও তিনি মাথায় কাপড় টানিয়া বলিতেন, "দেখ, শ্রীশ্রীঠাকুরও এইরূপে নিজের মাথাটিকে সামান্য একখানি গামছায় ঢাকিয়া আমাদিগকে বলিতেন, 'তোমরা কি আমাকে এখন দেখিতে পাইতেছ? অথচ সামান্য একটি গামছায় আমার মুখখানি তো আড়াল করিয়া রাখিয়াছি। এইরূপেই মহামায়া তাঁহার সামান্য অবগুণ্ঠন দ্বারা হৃদয়স্থিত সেই পরব্রহ্মকে আমাদের নিকট অজ্ঞাত রাখিয়াছেন। ঐ অবগুণ্ঠনটি সরাইয়া ফেল, চিরদিনই তিনি তোমার অন্তরে বিরাজমান।' "

এই প্রসঙ্গে হরি মহারাজ বলিতেন, "শ্রদ্ধেয় স্বামীজী (বিবেকানন্দ) নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন এক পরিত্যক্ত কুটিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন উহার গাত্রে কবে কোন্ সাধক এই সুন্দর দোঁহাটি লিখিয়া গিয়াছেন—

চাহি চামারি তুহী তু সব নীচ উন্‌কো নীচ।
ইয়ে তু পূরণ ব্রহ্ম থা যব তু নহী হোতী বীচ ॥

ইহার অর্থ এই ঃ "হে চামারি, হে মেথরানি বাসনা, তুই নীচ হইতেও নীচ। আমার ভিতরে যিনি রহিয়াছেন, তিনি তো পূর্ণব্রহ্মই। কিন্তু তুইই তো মাঝখানে দাঁড়াইয়া ইহাকে এইরূপ ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছিস!" দোঁহাটি আবৃত্তি করিয়া হরি মহারাজ বলিতেন, "দেখ, এই সামান্য দোঁহাটিতে বেদান্তের কি অপূর্ব ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে! মহামায়া এইরূপেই আমাদের নিকট হইতে আমাদিগের স্বরূপজ্ঞান লুকাইয়া রাখিয়াছেন।"

আর একদিনের কথা। হরি মহারাজের আদেশ লইয়া আমি বাড়িতে আসিয়াছি, পড়াশুনা শেষ করিতে হইবে। কিন্তু ভিতরে তিনি যে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছেন তাহাতে উহা সম্ভব হইতেছিল না। তাঁহাকে একপত্রে লিখিলাম, "মহারাজ, আশীর্বাদ করিবেন যেন বন্ধনমুক্ত হইতে পারি।" পরম দয়ালু জ্ঞানিবর অমনিই নিজহস্তে উহার উত্তর দিলেন। নানা কথার পর লিখিলেন, "বন্ধন মনে করিলেই তো বন্ধন, নতুবা কে তোমায় বাঁধে? তুমি তো সদাই মুক্ত।"

সাধু শান্তিনাথ তুরীয়ানন্দজীর নিকট এই সময়ে প্রায়ই যাইতেন। শান্তিনাথজী তখন মৌনী, কঠোর সাধন-ভজন করিবার ফলে তখন তাঁহার কিছু কিছু মস্তিষ্কপীড়াও দেখা দিয়াছিল। রোজই মহারাজজী তাঁহার শারীরিক কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন তাঁহার কঠোর সাধন-ভজনের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে সস্নেহে বলিলেন, "দেখ শান্তিনাথ, সবই তো করিলে। কিন্তু জানিও, মহামায়ার কৃপা ছাড়া কিছু হইবার নহে। তাঁহার শরণাগত হও।" জ্ঞানিবরের মুখে সেদিন আমরা এইরূপ শরণাগতির কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।

এইরূপ কত জ্ঞান ও ভক্তির কথা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়া আমরা ধন্য হইয়া গিয়াছি। এখন আমার মনে হয়, সেই পরশমণির পরশ না পাইলে জীবন বৃথা হইয়া যাইত।

তরুণ ব্রহ্মচারীদের কোন ত্রুটি দেখিলে তিনি তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া উহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেন, আবার তাঁহাদের সামান্য মাত্র গুণ দেখিলে বলিতেন ঃ "তোমরা তো সোনার চাঁদ ছেলে হে, আজ স্বামীজী থাকিলে তোমাদিগকে মাথায় করিয়া নাচিতেন।"

চিরদিনের বেদান্ত-তপস্বী হরি মহারাজ, শেষ দিন পর্যন্ত বেদান্তের চর্চা ও তদনুযায়ী কঠোর জীবন যাপন করিয়াই তাঁহার দিনগুলি অতিবাহিত করেন; কিন্তু তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে দেখিয়াছি, স্বামীজীর প্রবর্তিত কর্মযোগের ওপরে তাঁহার কি অবিচলিত শ্রদ্ধা! মিশনের সেবাশ্রমের সাধু-কর্মিগণকে দেখাইয়া বলিতেন ঃ ইহারাই ঠিক ঠিক কাজ করিতেছে। অপরে তো শুধু গুলতান করিয়াই সময়ক্ষেপ করিতেছে।

কিন্তু ইহাদের কার্যগুলিও যাহাতে শ্রদ্ধা ও ভাবসমন্বিত কর্মযোগীর আদর্শানুযায়ী হয়, সে দিকেও তিনি তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন, ঐ সকল কার্যে তাহাদের ভিতরে অহঙ্কারের কিছুমাত্র ফুট দেখিতে পাইলে তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিতেন ঃ "তোমরা কি ভাবিয়াছ, তোমাদের এই সকল কার্যের দ্বারা তোমরা অসামান্য কিছু করিয়া ফেলিতেছ? তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা তো আমি পনের টাকা মাহিনায় মেথর দিয়া করাইতে পারি। আর যাহারা অফিসে কাজ করিতেছ, তাহার জন্য হয়ত বা মাসিক কুড়ি-পঁচিশ টাকার মতন খরচ করিলে তোমাদের অপেক্ষা ভাল লোক পাওয়া যাইতে পারে, ইহার জন্য অহঙ্কারের কি আছে?"

কিন্তু ইহা যে তাঁহার অন্তরের কথা নয় ও উহা শুধু কর্মীদের অহংভাব দূর করিয়া শুদ্ধভাবে কাজ করাইবার জন্যই বলিয়াছিলেন, তাহা পরদিন তাঁহার কথাতেই আমরা বুঝিতে পারিলাম।

মহারাজের ঐ কথা শুনিয়া কাশীর জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিত মঠের জনৈক সাধুকে বলিতেছিলেন ঃ মহারাজ তো ঠিকই বলিয়াছেন, আপনাদের মতো

কৃতী ছেলে সংসারে থাকিলে কত কাজ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া কি সামান্য কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন! পূজনীয় মহারাজের নিকটে উহা বলিলে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন ও বলেন ঃ ও কি করিয়া আমার কথার অর্থ বুঝিবে? ও পণ্ডিত হইলেও সংসারী, শ্রীশ্রীঠাকুর যেরূপ বলিয়াছেন, 'মূলো খেলে মূলোর ঢেকুরই উঠে', উহারও তাহাই হইয়াছে, চিরদিন সংসার করিয়া আজ নিষ্কাম কর্মের অর্থ ও কি করিয়া বুঝিবে? আমি তো ঐভাবে বলি নাই, বলিয়াছি—অহঙ্কারশূন্য হইয়া নিষ্কামভাবে তোমরা সেবা কর, তাহাতেই তোমরা তোমাদের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবে।

জপ-ধ্যান সম্বন্ধেও কাহারও ঐরূপ অহঙ্কারের আভাস দেখিলে তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন ঃ তুমি ঠাকুরঘরে বসিয়া কি করিয়া আসিলে? মালা জপ করিলে, না কলা চটকাইয়া আসিলে? অর্থাৎ ঠিক ঠিক জপ-ধ্যান করিলে এরূপ অহঙ্কার আসে না।

আমাদের সহিত যখন তাঁহার দেখা হয়, তখন তাঁহার তপস্যায় কালাতিপাত করিবার ভাব চলিয়া গিয়াছে, বেদান্তের ভাবানুযায়ী তখন তিনি তাঁহার জীবনকে দৃঢ় করিয়াছেন ও শুদ্ধ আত্মা যে দেহ-মন-বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাঁহার প্রতি কথায় ও আচরণে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। শরীর অশক্ত, অতিকষ্টে হাঁটিতে পারেন, তবুও সর্বদা শাস্ত্রচর্চা ও অপরের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত। কিসে আমাদের ভিতরে একটু চৈতন্যের উদ্রেক হইবে, ইহা লইয়াই সর্বদা চিন্তা, দেহবুদ্ধিযুক্ত আমরা চিরদিন দেহকে সত্য বলিয়া মনে করিতাম ও ইহার সুখে ও দুঃখে যে আমাদেরই সুখ-দুঃখ হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিত না, কিন্তু তাঁহার ঐ কঠিন রোগশয্যাতেও দেখিয়াছি, কিরূপে মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া বলিতেছেন, 'দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো।' আমাদের নিকটে তাঁহার এ গান শুধু কথার কথা বলিয়াই মনে হইত। কিন্তু যেদিন দেখিলাম, তাঁহার হাতের পাতায় একটি দুষ্টব্রণ হইয়াছে ও কলকাতা হইতে বিখ্যাত সার্জেন ডাঃ সুরেশ ভট্টাচার্য আসিয়া উহা অপারেশন করিয়া নিত্য সেই ক্ষত স্থান প্রোব (Probe) দিয়া পরিষ্কার করিয়া

দিতেছেন, আর তিনি উহা ছোট ছেলের মতো আনন্দ করিয়া দেখিতেছেন, তখন উহা উক্ত ডাক্তারের ও আমাদের সত্যই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। কি করিয়া মানুষ এরূপ দেহবুদ্ধিশূন্য হইতে পারে, তাহা বুঝি নাই!

কখনও কখনও মাথা দোলাইয়া মহারাজ গাহিতেন ঃ

গুটিপোকায় গুটি করে,
কাটলেও সে তো কাটতে পারে,
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি
কভু সে তো কাটতে নারে।
এমনি মহামায়ার মায়া
রেখেছে কি কুহক করে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য
জীবে কি তা জানতে পারে।

আবার কখনও বলিতেন ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর কতগুলি ছোট ছোট ঘট দেখাইয়া বলিতেন, 'এই ঘটগুলি একই জল দ্বারা পূর্ণ কর তো, আর উহাদের প্রত্যেকের ওপরে ১, ২ করিয়া বিভিন্ন নম্বর দাও, দেখিবে কিছু পরে মনে হইবে উহাদের প্রত্যেকটি ঘটের জল আলাদা, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ঘটগুলি ভাঙিয়া ফেলিলে সব ঘটেই সেই একই জল দেখিতে পাইবে'—ঐ ঘটগুলিই উপাধি, ঐগুলি দূর না করিলে আমাদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি হয় না।

কখনো বলিতেন, সাধন-ভজন দ্বারা উহা উপলব্ধি হয়। আবার কখনো বলিতেন ঃ তবে সাধন-ভজন কি জানো? উহা শুধু ডানা ব্যথা করা। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন সুন্দর উপমা দিয়া বলিতেন, 'মাস্তুলের পাখি'—জাহাজ কালাপানিতে গেলে যেমন তাহার বাসার খোঁজে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সকল দিকে উড়িয়া গিয়া, বাসার সন্ধান না পাইয়া শেষে মাস্তুলে আশ্রয় লয়। সাধন-ভজন করিলেও শেষে দেখা যায় যে, তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমাদের শেষ আশ্রয় আর কিছুই নাই। কিন্তু উপযুক্ত সাধন-ভজন ব্যতীত উহা বুঝিবার উপায়ও নাই।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৫১ বর্ষ ১১ সংখ্যা
ও ৬৪ বর্ষ ২ সংখ্যা)

হরি মহারাজের কথাপ্রসঙ্গে

স্বামী ওঁকারানন্দ

একদিন হরি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, স্বামীজী যে বলেছেন—"ঠাকুরকে বোঝার আগে আমায় বোঝ, আমি কি ফ্যালনা?"—এটা বললেন কেন? হরি মহারাজ বললেন—"দ্যাখো, ঠাকুর ভগবান, স্বামীজী একজন পারফেক্ট ম্যান। নর ছাড়া নারায়ণকে কে বুঝবে? আর ঐ পারফেক্ট ম্যান-এর কাছে আমরা পিগমি।"

[ঠাকুর সহাস্যে ব্রাহ্মভক্তদের বলছেন—তা সংসারে হবে না কেন? তবে কি জানো—মন নিজের কাছে নাই। মন নিজের কাছে থাকলে তবে তো ভগবানকে দেবে। মন বন্ধক দিয়েছ কাম-কাঞ্চনে। তাই সর্বদা সাধুসঙ্গ করতে হয়। সাধুসঙ্গ কাকে বলে, কিভাবে সাধুসঙ্গ করতে হয়, সেই বিষয়টি ওঁকারানন্দ মহারাজ পূজ্যপাদ মহাপুরুষ-মহারাজের এক উপদেশ বর্ণনা করে বোঝালেন—সাধুর কাছে যাবার সময় তাঁর বা ঠাকুরের বিষয় চিন্তা করতে করতে যেতে হয়—পিছুটান না রেখে; সময়জ্ঞান না রেখে সাধুর সঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গ করতে হয়; এবং ফেরবার সময় পথে ও ঘরে এসে সেই সব কথা মনে মনে স্মরণ-মনন করতে হয় বা আলাপ-আলোচনা করতে হয়। এই প্রসঙ্গে ওঁকারানন্দ মহারাজ একটি দৃষ্টান্ত দিলেন। হরি মহারাজের কাছ থেকে ঘটনাটি শুনেছিলেন।] হরি মহারাজ তখন বলরাম মন্দিরে আছেন। দুটি যুবক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এসেই কিন্তু যাবার জন্য ছটফট করছে তারা। বারবার ঘড়ি দেখছে। হরি মহারাজ তখন তাদের মহাভারতের কাহিনিটি শুনিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। মহা রুদ্র-ঋষি দুর্বাসার দর্শনে যুধিষ্ঠির গেছেন নানাবিধ উপচার নিয়ে। দুর্বাসার কাছে উপস্থিত হয়ে প্রণিপাত করে যুধিষ্ঠির উপচারাদি তাঁকে অর্পণ করলেন। দুর্বাসা সেগুলো তৎক্ষণাৎ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রোষকষায়িত নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। যুধিষ্ঠিরের শোচনীয় অবস্থা,

প্রাণ ত্রাহি-ত্রাহি। কোনক্রমে সেখান থেকে সরে পড়লেন। ঘরে ফিরলেন নিষ্প্রাণ দেহটাকে যেন টেনে নিয়ে। তাঁর অবস্থা দেখে দ্রৌপদী খুব ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসাদি করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির কোন উত্তর দেন না। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে দ্রৌপদী ব্যাপারটা জেনে নিতে পারলেন। তখন দ্রৌপদী বললেন, আমি মুনির কাছে নিজে যাব। যুধিষ্ঠির শুনে আঁতকে উঠলেন। বললেন—সর্বনাশ যা হবার হয়েছে—তাকে আর বাড়িও না। ঐ মহারাগী মুনি আমার যে দুর্দশা করেছেন—সেখানে তুমি নারী, তোমাকে দেখলে আর রক্ষা নেই। দ্রৌপদী কোন কথা শুনলেন না, বললেন, আমি যাবই। তবে কয়েক দিন পরে। আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

সাতদিন পরে দ্রৌপদী উপচারসহ দুর্বাসার কাছে গেলেন। তাঁকে দেখেই মুনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। দ্রৌপদীর হাত থেকে সবকিছু তিনি গ্রহণ করলেন এবং আহার করতে আরম্ভ করে দিলেন।

দ্রৌপদী যতক্ষণ না ফিরেছেন, যুধিষ্ঠিরের দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। দ্রৌপদীকে ফিরতে দেখে উদ্‌গ্রীব হয়ে সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। সব শুনে তিনি বিস্ময়ে হতবাক। আমার অর্ঘ্য যিনি নিলেন না, তিনি তোমার অর্ঘ্য ঐভাবে গ্রহণ করলেন? কারণ কি? তখন দ্রৌপদী বললেন, মহারাজ, আপনি যখন গিয়েছিলেন আপনি নিশ্চয় সমস্ত মন নিয়ে মুনির কাছে যাননি। আপনার কাছ থেকে শোনার পরে গত সাতদিন আমি কেবলই পূজা ও প্রার্থনা করেছি, কেবলই মুনির চিন্তা করেছি। যখন যাত্রা করেছি, তখন ঐ চিন্তা করতে করতেই গেছি। আমার সমস্ত মনপ্রাণ তদ্‌গত হয়ে ছিল। তাই মুনি প্রসন্ন হয়ে আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন।

[ওঁকারানন্দ মহারাজ দ্রৌপদীর তৎকালীন মনোভাব বর্ণনাপ্রসঙ্গে বললেন—'চিন্তয় মম মানস হরি, চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।' দ্রৌপদীর তাদাত্ম্য অবস্থা হয়েছিল। এই রকম ব্যাকুলতা ও আর্তি নিয়েই সাধুর কাছে যেতে হয়। নচেৎ সাধুসঙ্গে দু-চার মিনিট বসে অন্য নানা কথা ভাবলে কি ফল পাবে বলো?]

[২৮।৩।৬৭]

স্বামী ওঁকারানন্দ মহারাজকে লিখিত স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র

শ্রীহরিঃ শরণম্

৺কাশী

১৯।১২।১৯

শ্রীমান অনঙ্গমোহন,

তোমার ডেটহীন ও ঠিকানাহীন একখানি পত্র গত পরশ্ব পাইয়াছি। তোমার পাশের খবর আমি যথাসময়ে জ্ঞাত হইয়া খুব প্রসন্ন হইয়াছিলাম। সুরেনের নিকট হইতে অনেকদিন কুশল সংবাদ না পাওয়ায় চিন্তিত ছিলাম। তোমার পত্রে সুরেন কলকাতায় ভাল আছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। তাহাকে আমার শুভেচ্ছাদি জানাইবে। ক্ষীরোদ আমাকে তাহার কলকাতা পৌঁছানো সংবাদ দিয়া একখানি পোস্টকার্ড লিখিয়াছিল। আমি তাহার উত্তর দেই নাই। তাহাকেও আমার শুভেচ্ছাদি দিবে। নীরদ ভুবনেশ্বরে মহারাজের নিকট গিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। শরৎ মহারাজ প্রায় মাসাবধি হইবে এখানে আসিয়াছেন। সঙ্গে যোগীন-মা, সান্ন্যাল মহাশয় ও ভূমানন্দ আসিয়াছেন। তাঁহারা সব ভাল আছেন। এখানেও অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি পূজা উপলক্ষে বেশ একটি ছোটখাট উৎসব হইয়া গেছে—শতাধিক ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছিলেন। পূজা হোম গীত বাদ্য প্রভৃতি খুব হইয়াছিল। আমার শরীর বেশ ভাল নাই। কিছু না কিছু উপদ্রব লাগিয়াই আছে। সম্প্রতি আবার বাম পদের বুড়ো আঙুলে একটি নখকুনি হইয়া কষ্ট দিতেছে। প্রস্রাবে সুগার পূর্বের মতই আছে। আহারাদির বিশেষ ধরাকাট করায় শরীর দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। মুদ্রা সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহা আমি সম্যক অবগত নহি, তবে উহার ব্যাখ্যা আমি যেমন বুঝিয়াছি তাহা সুরেনকে কোন দিন বলিয়া আসিব। মনে যেরূপ ভাব হয় শরীরে তাহা প্রকাশ হইয়া থাকে। বোধহয় তাহারই যথাযথ বর্ণন মুদ্রা নামে কথিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ যেমন ক্রোধ হইলে মুষ্টিবদ্ধ

রক্তনেত্র প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কেহ কেহ মুষ্টিবদ্ধ ও রক্তনেত্র দেখাইয়া রোষ প্রকাশ করিতে চেষ্টা পান। সেইরূপ সাত্ত্বিক ভাবের যেসব লক্ষণ আছে তাহা আপনাতে ধারণ করিয়া কোন কোন সাধক নিজেতে সাত্ত্বিক ভাব আনয়নের চেষ্টা করেন। বোধহয় ইহার নামই মুদ্রা ধারণ। অভ্যাস করিতে করিতে হয়ত ভাবের উদয় হইয়া সাধককে সেই ভাবাপন্ন করিতে পারে। যাহাই হউক শুদ্ধভাব থাকিলে লক্ষণ (মুদ্রা) আপনিই প্রকাশ পাইবে। ভাবের দিকে মন দেওয়া উত্তম কল্প। লক্ষণ অবলম্বনে ভাবের উদয় চেষ্টা নিকৃষ্ট। ভাব থাকিলে প্রকাশ সহজেই হয় এবং ভগবানের উপাসনা দ্বারা ভাব বৃদ্ধির চেষ্টাই উৎকৃষ্ট উপায়। মুদ্রা ধারণ করিয়া ভাব আনয়ন চেষ্টা সকল সময় সাফল্যলাভ করে না। খুব ভজন কর—তাহা হইলে সমস্ত স্বতঃই উদয় হইবে ও হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইবে। ভজনই সার। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসাদি জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

পুঃ—সনৎ তোমার পোস্টকার্ড পাইয়াছে ও আমাকেই তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করিতে বলিল। তোমাদের সে তাহার নমস্কার ভালবাসাদি জানাইতেছে। ইতি।

(উৎস ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ)

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতিচয়ন

স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ

অনুবাদক ঃ স্বামী চেতনানন্দ

কাশীতে আমি স্বামী তুরীয়ানন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন এবং নানাভাবে আমার জীবন গঠনে সাহায্য করেছিলেন। আমি এমন একজন মহাপুরুষের পাদমূলে বসবার সুযোগ পেয়েছিলাম যে তাঁর উপস্থিতি শক্তি ও ভয়হীনতা বিকীর্ণ করত। তিনি বেদান্তসিংহ ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি ও তেজোদৃপ্ত কণ্ঠস্বর এখনও আমার কানে বাজছে। তিনি আমাদের "অভীঃ অভীঃ"—এই উপনিষদের বাণী বারবার আবৃত্তি করতে উৎসাহ দিতেন। তিনি বলতেন, "একমাত্র ভয়ই তোমাদের দাবিয়ে রেখেছে। ভয় দূর কর, তাহলে দেখবে তুমি এ জগতে যা কিছু ইচ্ছা করতে পারবে।"

তিনি একবার আমাকে এক জায়গায় এক কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারগ্রহণ করতে বলেন [পাটনা আশ্রমের কার্যভার]। আমি তাঁকে বললুম, "মহারাজ, এ কঠিন কাজ আমার দ্বারা হবে না।" আমার কথায় তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "কী! তুমি আমার কাছে আস, আর বলছ তুমি এ কাজ করতে পারবে না। বেদান্তদর্শন এতদিন তোমাকে কি শেখাল যে এখনও পর্যন্ত তুমি মায়ার বশে নিজেকে দুর্বল মনে কর? এগিয়ে পড়। দায়িত্ব নিতে চেষ্টা কর। প্রথমে কৃতকার্য নাও হতে পার। কিন্তু ধরে থাকো—দেখবে ক্রমে এই ভয়-প্রসূত দুর্বলতা চলে গেছে। তারপর যা কিছু করবে তাতে প্রকাশ পাবে তোমার শক্তি, সাহস ও প্রাণের উচ্ছ্বাস।" সত্যি বলতে কি, স্বামী তুরীয়ানন্দ আমার চেতনাকে উচ্চভূমিতে তুলে দিলেন। আমি শক্তি ও সামর্থ্য পেলুম সেই

দায়িত্বপূর্ণ কাজ করবার এবং তাঁর আদেশ ও অনুপ্রেরণা আমাকে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

কখনও কখনও স্বামী তুরীয়ানন্দ তুচ্ছ ব্যাপারেও আমাদের দারুণ বকুনি দিতেন। একবার তিনি আমাকে তাঁর একখানা চিঠি লিখতে বলেন এবং পরে স্ট্যাম্প (ডাকটিকিট) লাগিয়ে তা ডাকে দিতে বলেন। তিনি আমাকে তাঁর সামনে খামে টিকিট লাগাতে বলেন। আমি ভাবলুম যে একটা কাপে জল এনে টিকিটে না লাগিয়ে একেবারে বাইরে গিয়ে জল লাগিয়ে চিঠি ডাকবাক্সে ফেলে দেব। তাই তাঁর কথা না শুনে তাড়াতাড়ি চিঠি ও টিকিট নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। তারপর বাইরে গিয়ে দেখি দু-পয়সার স্ট্যাম্প হারিয়ে গেছে। কী বিপদ! তাঁর ঘরে ফিরতে সাহস হলো না। অথচ আমার কাছে কোন টাকাপয়সা ছিল না। কী করা যায়? আমি একজনের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে টিকিট কিনে চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে তাঁর ঘরে ফিরলাম।

আমি তাঁকে কিছু না বলে চুপচাপ বসলাম। স্বামী তুরীয়ানন্দ হেসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, এত দেরি হলো কেন?" একটা চিঠি ফেলতে তো এত দেরি হবার কথা নয়।" আমার কথা জড়িয়ে গেল এবং তাঁকে সত্যকথা বললাম। তিনি তখন বললেন, "এই নাও তোমার স্ট্যাম্প। এই মেঝেতে পড়ে গিছল।" তারপর তিনি আমার হঠকারিতার জন্য আধ ঘণ্টা বকুনি দিলেন। পরে বললেন ঃ "তুমি কি মনে কর এই দুই পয়সার টিকিটের জন্য এই চিৎকার ও গালাগালি নিরর্থক? আমি ঐ টিকিটের জন্য তোমাকে বকুনি দিচ্ছি না। আমি তোমার ভিতর ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি। এই সামান্য কাজে তুমি যদি এমন অমনোযোগী হও, তাহলে তুমি আধ্যাত্মিক জীবনে কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। মনে রেখ—ধ্যানজপ কালে তুমি যেমন সতর্কতার সঙ্গে মনোযোগ দাও, তেমনি এসব ছোট তুচ্ছ কাজগুলিতেও সাবধান হবে।"

আর একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ একজন ব্রহ্মচারীকে খুব বকুনি দেন। তারপর ছেলেটি চলে গেলে তিনি আমাকে বললেন, "জ্ঞানেশ্বর, তুমি একটা গান গাও।" আমি এই গানটি গাইলুম ঃ

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব শোভন ভব-জলধির পারে জ্যোতির্ময়।
শোক-তাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন;
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত-লোচন কি অমৃত-রস-পানে ভুলিল চরাচর।
কি সুধাময় গান গাইছে সুরগণ, বিমল বিভুগুণ-বন্দন;
কোটি চন্দ্র তারা উলসিত, নৃত্য করিছে অবিরাম ॥

স্বামী তুরীয়ানন্দ আমার গান খুব পছন্দ করতেন। একদিন তিনি আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি স্বর্গে যেতে চাও?" আমি তখনই বললুম, "না।" মহারাজ একটু হেসে বললেন, "তুমি স্বর্গ চাও না কারণ তুমি বিশ্বাস কর স্বর্গ বলে কিছু নেই। কিন্তু আমি যদি তোমাকে প্রকৃত স্বর্গ দেখাই, তাহলে তুমি কি বলবে যে তুমি সেখানে যেতে চাও না?"

স্বামী তুরীয়ানন্দ ছিলেন উচ্চ অনুভূতিবান পুরুষ। একবার তাঁর বড় অপারেশন হয়। ঐ কালে তিনি সজাগ ছিলেন এবং সাক্ষিস্বরূপ হয়ে ঐ সম্পূর্ণ অপারেশন দেখেন। পরে তিনি বলেছিলেন, "আমি শরীর থেকে বেরিয়ে দ্রষ্টা হয়ে ঐ অপারেশন দেখলুম। তাই আমি কোন যন্ত্রণা অনুভব করিনি।" তিনি ছিলেন মহাযোগী, তাই তাঁর পক্ষে ঐরূপ করা সম্ভবপর।

১৯২২ সালে আমি পাটনা আশ্রমে ছিলাম। স্বামী তুরীয়ানন্দের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে আমি কাশীতে গেলাম। তিনি আমার ও পাটনা আশ্রমের সব খবর জিজ্ঞাসা করলেন এবং সব শুনে খুশি হলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি বল? এ শরীর কি এখন যাবে?" আমি বললুম, "কি বলছেন মহারাজ? আপনি এর চেয়েও আরও অধিক ব্যাধি থেকে সুস্থ হয়েছেন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ ঃ "ঠিক বলেছ। স্বামীজীর কাজ সবে শুরু হয়েছে। তাঁর কাজের প্রসার আরও না দেখে কি এ শরীর যাবে?" পরক্ষণেই বললেন,

"আর শরীরটা যদি যায় তাতেই বা কি? ঠাকুর তো আমাদের দেখিয়েছেন এসব কাজ কিছুই না।"

মহারাজ আবার পাটনা আশ্রমের কথাপ্রসঙ্গে বললেন ঃ "মনে সন্দেহ রেখ না। জানবে তুমি যা করছ তা ঠাকুরের কাজ। প্রাণ-মন ঢেলে কাজ কর। এ থেকেই সব হয়ে যাবে। কাজে লেগে যাও। স্বামীজী দার্জিলিং-এ আমাকে বলেছিলেন, 'হরিভাই, এবারে নূতন একটা পথ করে দিয়ে গেলুম। এতদিন লোকে জানত, ধ্যান, জপ, বিচার প্রভৃতির দ্বারাই মুক্তি হয়। এবারে এখানকার ছেলেরা মেয়েরা তাঁর কাজ করে জীবন্মুক্ত হয়ে যাবে।' তাঁর আদেশ সত্য, তাতে সংশয় রেখো না।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ ভয় ও মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে জয় করেছিলেন। মৃত্যুর সম্মুখীন হবার পর তাঁর শেষ কথা ছিল ঃ "ভয় করো না। সব সত্য—ব্রহ্ম সত্য। এ জগৎটাও ব্রহ্ম। ভয়শূন্য হও।" স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যেরা এমন একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উঠেছিলেন যে তাঁদের কোন মৃত্যুভয় ছিল না। আমার জীবনে স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রভাব ভুলবার নয়।

(উৎস ঃ Swami Gnaneswarananda and Yoga for Beginners)

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ

অনুবাদক ঃ স্বামী চেতনানন্দ

১৯১৭ সালে স্বামী তুরীয়ানন্দ পুরীতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। তিনি ওপরে শরৎ মহারাজের ঘরে থাকতেন, আর শরৎ মহারাজ নিচে তাঁর অফিসঘরে শুতেন। রাজা মহারাজ ভুবনেশ্বরে মঠের জায়গা কিনে কলকাতায় আসেন। আমি ঢাকা থেকে তাঁকে দর্শন করতে যাই। ঐ কালে আমি স্বামী তুরীয়ানন্দকেও দর্শন করি। তিনি তখন শয্যাশায়ী।

তারপর ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি কাশী যাই। স্বামী নির্ভরানন্দ (চন্দ্র মহারাজ) তখন কাশী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। আমার পূর্বপরিচিত স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ আমাকে চন্দ্র মহারাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তিনি আমাকে অদ্বৈত আশ্রমে থাকবার অনুমতি দেন।

কাশীতে পৌঁছে আমি কাশী সেবাশ্রমের অম্বিকাধামে স্বামী তুরীয়ানন্দকে দর্শন করি। সনৎ মহারাজ ও স্বামী যতীশ্বরানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দর সেবা করতেন। কাশীতে থাকাকালে প্রতিদিন সকালে আমরা সাধুব্রহ্মচারীরা হরি মহারাজের ঘরে গিয়ে বসতুম এবং তিনি নানা ধর্মীয় ও শাস্ত্রপ্রসঙ্গ করতেন। একদিন সকালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসী শিষ্যদের সঙ্গে সাধারণ মুক্তিকামীদের তুলনা করে বলেন ঃ "একদিন আমি ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে দেখতে গেছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আচ্ছা হরি, তুই কি চাস?' আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, 'মোক্ষ।' ঠাকুর আমাকে বললেন, 'যারা মোক্ষ বা নির্বাণ চায় তারা হীনবুদ্ধি—ভয়তরাসে।' আমি তাঁর দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। আমি ভাবতে লাগলুম বেদান্তশাস্ত্র তো মোক্ষকে জীবনের সর্বোচ্চ

আদর্শ বলে নির্দেশ করেছে। তারপর ঠাকুর বলতে লাগলেন ঃ 'যেমন পাশা খেলায় কেবল চিক খুঁজছে, কিসে ঘরে উঠে যায়, সেই চেষ্টা। ঘুঁটি একবার পাকলে আর নামাতে চায় না। একে বলে কাঁচা খেলোয়াড়। আর পাকা খেলোয়াড় মার পেলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে মারে। আবার তখনই 'কচে বারো' বলে পাশা ফেললেই আবার উঠে গেল। তাদের পাশা হাতের বশ। যেমন বলে তেমনি পড়ে। সুতরাং ভয় নেই, নির্ভয়ে খেলে।' যাঁরা নিত্যমুক্ত তাঁরা পুনর্জন্মে ভয় পান না। তাঁরা বারবার জন্মগ্রহণ করেন অপরকে মুক্তিলাভে সহায়তা করবার জন্য। কিন্তু সাধারণ মুক্তিকামী জীবেরা জন্মমৃত্যুর হাত থেকে চিরদিনের জন্য রক্ষা পাবার জন্য সদা উন্মুখ।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ ঐ সময় বলেছিলেন যে, এমনকি জীবন্মুক্তদের মধ্যেও কেবল কতিপয় ব্যক্তি অপরকে মুক্তিলাভে সহায়তা করতে সক্ষম। এঁরা উচ্চ অধিকারী, ব্রহ্মনির্বাণ চান না। শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের 'নিত্যমুক্ত' বলতেন। তিনি নিজের শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজনকে ঐ থাকের বলে নির্দেশ করেছিলেন, যেমন স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

প্রতিদিন বিকালে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে ভাগবতের বাংলা অনুবাদ পড়তেন। অন্যান্য সাধুব্রহ্মচারীদের সঙ্গে আমি ঐ ক্লাসে যোগ দিতুম। তাঁর শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন কাশী সেবাশ্রমের ময়দানের চারদিকে বেড়াতেন।

২০ জানুয়ারি ১৯২১ রাজা মহারাজ ও স্বামী সারদানন্দ ট্রেনে মোগলসরাইতে ভোর তিনটার সময় পৌঁছান। স্বামী তুরীয়ানন্দ তার আগে উঠে মোটরে সেখানে মহারাজকে অভ্যর্থনা করতে যান। আমি ঐ সময়ে অদ্বৈত আশ্রমের ওপরতলা থেকে তাঁকে যেতে দেখলুম। তারপর সকালে মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ যখন ফিরলেন, তখন আশ্রমে উৎসব লেগে গেল। মহারাজ বললেন ঃ "বারাণসী প্রকৃতপক্ষে শিবের স্থান। আমাদের গাড়ি অসি নদীর সেতু পার হয়ে বারাণসীতে ঢুকলে আমি শিবের মাহাত্ম্য অনুভব করলুম।" কাশীতে ঠাকুরের সন্তানদের দিব্য সান্নিধ্যে আমরা অপূর্ব আনন্দ পেয়েছিলাম।

আর একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ এই ঘটনাটি বলেন ঃ জব্বলপুর থেকে এক ব্যক্তি ঠাকুরের কাছে এসে তাঁর মনোবেদনা জানান। তিনি ছিলেন বিদ্বান কিন্তু নাস্তিক। ঠাকুর তাঁর সব কথা শুনে বললেন, "তুমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। যখন মানুষের এবং জাগতিক সব শক্তি বিফল হয়, তখন ভগবানে নির্ভর ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তুমি তাঁর কাছে প্রার্থনা কর।"

ভদ্রলোক ঃ "আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না।"

ঠাকুর ঃ "তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো না?"

ভদ্রলোক ঃ "না, আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না।"

ঠাকুর ঃ "তবে এক কাজ কর। দেখ, এই বলে প্রার্থনা করতে তো তোমার আপত্তি নেই—ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাক, তবে আমার প্রার্থনা শোন এবং আমাকে এই দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা কর। এরূপভাবে প্রার্থনা করলে তোমার ভাল হবে।"

ভদ্রলোকটি একটু চিন্তা করে বললেন, "না, এতে আমার আপত্তি নেই।"

ঠাকুর বললেন, "এ রকম করে আবার আমার কাছে এসো।"

ভদ্রলোকটি বাড়ি ফিরে ঠাকুরের নির্দেশমত প্রার্থনা করতে লাগল। ক্রমে তিনি মানসিক অশান্তি থেকে মুক্ত হলেন। ভদ্রলোককে তারপরে দেখেছি, সে মানুষ আর নেই। ঠাকুরের পা ধরে কেঁদে কেঁদে বললেন, "আমার প্রার্থনার উত্তর পেয়েছি। আপনি আমায় রক্ষা করেছেন।" ঠাকুর এভাবে কত মানুষের জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

(উৎস ঃ Sri Ramakrishna's Life and Message in the Present Age–with the author's reminiscences of Holy Mother and some Direct Disciples)

স্বামী তুরীয়ানন্দ

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

হরি মহারাজ—স্বামী তুরীয়ানন্দজী সম্বন্ধে যেটুকু আমার মনে আছে তাই এখানে বলছি। ওঁর সঙ্গে ছিলাম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে ১৯২১-এর ৩রা মার্চ পর্যন্ত।

তিনি কলকাতা বাগবাজারে এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন ত্যাগনিষ্ঠ। তাঁর আদর্শ ছিল শুকদেব। উপনয়নের পর থেকেই তিনি স্বপাক হবিষ্যান্ন খেতেন, গীতা, উপনিষদ্ পাঠ করতেন। সেসময়ে একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ঠাকুর তাঁকে বললেন, "কি গো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্ত বিচার করছ? তা বেশ বেশ! তা বিচার তো খালি এই গো—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; না আর কিছু?" হরি মহারাজ অবাক হয়ে গেলেন। বুঝলেন ঠাকুর দু-কথায় বেদান্তের সার বলে দিয়েছেন।

ঠাকুর হরি মহারাজ সম্বন্ধে বলতেন, "গীতোক্ত সন্ন্যাসী।" বাস্তবিক আমরা যখন তাঁকে দেখেছি, তাঁর চালচলন কথাবার্তা—এসব দেখেশুনে মনে পড়ত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ-কথিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণগুলি। তিনিও নিঃসন্দেহে একজন স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ।

তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলছি। তিনি কত বড় ত্যাগী পুরুষ ছিলেন—তাতে তা বোঝা যাবে। একদিন তিনি গঙ্গাতীরে বসেছিলেন। রাত গভীর হয়েছে লক্ষ্য করে একবার ভাবলেন, আশ্রমে ফিরে যাই। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো, একি কথা? আমি সন্ন্যাসী, আমার থাকার কথা গাছতলায়, আমি আবার আশ্রমে যাব—এ আবার কিরকম কথা? ঠিক করলেন, তিনি আর আশ্রমে ফিরে যাবেন না। এই ভাব নিয়ে তিনি অনেকদিন বাইরে ছিলেন, কোন আশ্রয়ে

না থেকে গাছতলায় পড়ে থাকতেন। এ রকম একদিন গাছতলায় শুয়েছিলেন, হঠাৎ কে যেন তাঁকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, 'সরে যাও।' তিনিও তখুনি উঠে সরে গেলেন। আর গাছতলায় যেখানটায় তিনি শুয়েছিলেন সেখানে গাছের মোটা একটা ডাল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ভগবানই তাঁকে সতর্ক করে দিলেন, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। নতুবা ঐ ডালে চাপা পড়ে তিনি মারা যেতেন।

সে সময়কার আরেকটি ঘটনা। যে-সত্রে সব সাধুরা ভিক্ষা করতেন সেখানে একদিন একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সাধুদের খাওয়াবার জন্য নানারকমের সুখাদ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সাধুরা ভিক্ষা নিতে এলে সেই ভদ্রলোক সাধুদের জিজ্ঞাসা করেন, 'বৈরাগ্য কাকে বলে?' প্রশ্নোত্তরে সাধুরা প্রত্যেকেই এক একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন। হরি মহারাজ উপস্থিত হতেই তাঁকেও এই প্রশ্ন করা হলো। তিনি উত্তর দেন, 'বৈরাগ্য কাকে বলে যদি জানতাম, তাহলে কি তোমার কাছে দুটো রুটির জন্য আসতাম?' উত্তর শুনে সাধুরা তাঁর খুব সাধুবাদ করেন। দাতা ভদ্রলোকও বোঝেন বৈরাগ্য কাকে বলে।

একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, পিছনে চলেছিলেন আমাদের সাধুরা। রাস্তার পাশে একটা নতুন সুন্দর দোতলা বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। সেটি দেখে একজন সাধু মন্তব্য করেন, 'বাঃ, বেশ চমৎকার বাড়ি তো!' হরি মহারাজ চট্ করে ঘুরে সাধুটিকে বললেন, 'বাড়ি ভালো, তোমার কি তাতে?' হরি মহারাজের বলার উদ্দেশ্য, সাধুটির মনে হয়ত একটি সুন্দর ভাল বাড়িতে থাকার সুপ্ত বাসনা ছিল। এই কারণে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, এ রকম একটা aspiration (আকাঙ্ক্ষা) থাকাটাও ঠিক নয়। এইভাবে তিনি সবসময়ে আমাদের ভুলত্রুটি দেখিয়ে দিতেন।

হরি মহারাজ যখন উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করছিলেন সে সময়ে স্বামীজী, মহারাজ, এঁদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে তিনি মীরাটে উপস্থিত হয়েছিলেন। মীরাট থেকে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন পথে চলে যান। এদিকে পরিব্রাজক স্বামীজী বোম্বেতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি খেতড়ির মহারাজের সঙ্গে দেখা

করতে যান। ফেরার পথে আবু রোড স্টেশনে হরি মহারাজ ও রাজা মহারাজের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। স্বামীজী হরি মহারাজকে বলেছিলেন, "দেখ হরি ভাই, ভগবৎ-দর্শন-টর্শন বুঝি না। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মদর্শন এসবও বুঝি না। কিন্তু আমার হৃদয় যেন মস্ত বড় হয়ে গেছে। সবার জন্য আমি feel (অনুভব) করি।" তারপরই তিনি লিখে দিলেন, 'God is Love' (ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ)। বাস্তবিকই আমাদের শাস্ত্রে, নারদীয় ভক্তিসূত্রে, আছে ঈশ্বর 'অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ'। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। কি রকম প্রেমস্বরূপ বলা যায় না। তিনি অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ, এইমাত্র। তাই স্বামীজী ঐকথা বলেছিলেন। স্বামীজী দ্বিতীয়বার বিদেশে যাওয়ার পূর্বে হরি মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। হরি মহারাজ কিন্তু পুণ্যভূমি দেবভূমি ভারতবর্ষ ছেড়ে বাইরে যেতে নারাজ ছিলেন। শেষপর্যন্ত স্বামীজী তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'দেখ, হরিভাই, ঠাকুরের কাজ করতে করতে আমার শরীর ভেঙে পড়েছে। তোমরা আমাকে একটু সাহায্য করবে না?' এভাবে appeal (অনুনয়) করে বলাতে হরি মহারাজ রাজী হয়ে গেলেন। তিনি স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকায় গেলেন। স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমাকে এখানে কোন বক্তৃতা করতে হবে না। তুমি শুধু আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন কি, তা দেখিয়ে দেবে। তাহলেই হবে।' স্বামীজী একবার আমেরিকানদের বলেছিলেন, 'তোমরা আমার মধ্যে fighting সন্ন্যাসী অর্থাৎ ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসীকে দেখেছ। এবার তোমরা দেখবে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীকে, তাহলেই ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীর আদর্শ তোমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে।' স্বামী তুরীয়ানন্দ সে রকম আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেছিলেন। তিনি 'শান্তি আশ্রমে' থাকতেন। কোন ভারতীয় আশ্রমে সন্ন্যাসী যেমন থাকেন তিনিও তেমনি থাকতেন। বেশি বক্তৃতাদি করতেন না। আর জপ, ধ্যান, পাঠ এই সমস্ত নিয়েই থাকতেন। একদিন তিনি আশ্রমবাসীদের ক্লাসে বলেছিলেন, 'seriously অর্থাৎ ঠিক ঠিক যদি তোমরা ভগবানকে ডাক, তাহলে তিন দিনের মধ্যেই ভগবৎ-দর্শন হতে পারে।' এই কথাটি শুনে আশ্রমবাসী একটি অল্পবয়সী মেয়ে তিন দিন আর তার ঘর থেকে বেরুল না। সব সময়ে সে ভগবানের চিন্তা করতে থাকল। তিন দিন পরে সে এসে হরি মহারাজকে বললে, "Well Swami,

what you said is true" (আপনি যা বলেছিলেন, সে-কথা ঠিক)। অর্থাৎ তিনদিন ভগবানকে ডেকে ভগবানের দর্শন না হোক একটা কিছু নিশ্চিত অনুভব করেছিল।

আরেকদিনের ঘটনা। একজন ভক্ত এসে তাঁকে বললেন, "Swami, we are going to have a theatre. It is a very beautiful and well-managed play. Let us go" (স্বামীজী, আজ একটি থিয়েটার হচ্ছে, খুব সুন্দর ও সুনিয়ন্ত্রিত থিয়েটার। চলুন আমরা যাই)।

হরি মহারাজ বলেন ঃ "কি থিয়েটার দেখবে, কি stage-management দেখবে? এই জগৎটাই দেখ না একটা রঙ্গভূমি। এ রকম রঙ্গভূমি তুমি কোথায় পাবে? তুমি witness (সাক্ষিস্বরূপ) হয়ে এটা লক্ষ্য কর, দেখবে কি মজা! আর নিজেকে এর সঙ্গে জড়িয়ে ফেললেই যত মুস্কিল। সাক্ষিস্বরূপ থাকতে পারলে দেখবে এই জগৎরঙ্গমঞ্চে কতরকমের খেলা চলেছে। এর চাইতে ভাল প্লে তুমি আর কি দেখবে?" তিনি আরও বললেন, "এসব আলোচনা করে লাভ নেই। এস আমরা একটু গীতা পড়ি।" এই কথা বলে তিনি ভক্তটিকে নিয়ে গীতা পড়তে থাকলেন।

স্বামীজী যখন তাঁকে বিদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন সে সময়কার একটি ঘটনা। হরি মহারাজ একদিন তাঁর টাকাপয়সার purseটি (মনিব্যাগ) টেবিলের উপর রেখেছিলেন। স্বামীজী সেটি দেখে তাঁকে বলেন ঃ 'হরি মহারাজ, একি, তুমি টাকাপয়সা টেবিলে ফেলে রেখেছ কেন?' হরি মহারাজ বলেন, 'কে আর নেবে এখান থেকে? থাকুক না!' স্বামীজী গম্ভীর হয়ে বলেন, 'You have no right to tempt others' (অপরকে প্রলুব্ধ করার কোন অধিকার তোমার নেই)। তখন হরি মহারাজ টাকাপয়সা গুছিয়ে রাখলেন।

স্বামীজী আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর হরি মহারাজ খুব পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি শান্তি আশ্রমে কঠোরভাবে জীবনযাপন করতেন। ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। তাছাড়াও স্বামীজীর স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হয়েছে শুনে তিনি দেশে ফিরে আসার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে

যাত্রাও করেছিলেন। কিন্তু রেঙ্গুনে পৌঁছে পত্রিকা মারফৎ খবর পেলেন স্বামীজী মহাসমাধি লাভ করেছেন। তিনি অত্যধিক মর্মাহত হলেন। মঠে কিছুদিন থেকেই তিনি উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করতে চলে গেলেন। হৃষীকেশ, মুঙ্গের, নাঙ্গল, গড় মুক্তেশ্বর এসব জায়গায় তিনি তপস্যা করেছিলেন। সে সময়ে একজন ব্রহ্মচারী তাঁর সেবা করবার জন্য আগ্রহী হয়েছিল। তাঁর আপত্তি অগ্রাহ্য করে ব্রহ্মচারী সেবা করার চেষ্টা করে। শেষে তিনি বিরক্ত হয়ে তাঁর একমাত্র সম্বল কমণ্ডলু ও লাঠি নিয়ে কুঠিয়া থেকে বেরিয়ে পড়েন। সন্ত্রস্ত ব্রহ্মচারীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'এ কুঠিয়াতে দুজনের থাকা হবে না—হয় আমি থাকবো, নতুবা তুমি।' নিরুপায় ব্রহ্মচারী এবার নিরস্ত হন। তিনি এরূপ কঠোরভাবেই জীবনযাপন করতেন। তিনি কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবনে ছিলেন। সে সময়ে ভোর চারটার সময় উঠে তিনি কুয়োর জলে স্নান করে ধ্যান করতে বসতেন। তিনি আমাদের বলতেন, 'ধ্যান করা কি সোজা ব্যাপার? শীতকালে ভোর চারটায় কুয়োর ঠাণ্ডা জলে স্নান করে ধ্যান করতে বসতাম। আর কিছুক্ষণ পরেই শরীরে ঘাম বেরিয়ে পড়ত।" তিনি বলতেন, "এক ঘণ্টা ধ্যান করা আর চার ঘণ্টা বাগানে মাটি কোপানোতে সমান পরিশ্রম।" আমরা মনে করি চোখ বুজলেই ধ্যান জমে যাবে, আর ভগবান এসে হাজির হবেন। কিন্তু সত্যিকারের ধ্যান করায় যে কত পরিশ্রম তা হরি মহারাজের কথা থেকে বোঝা যায়।

অত্যধিক কঠোরতা করার দরুন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। সেজন্য তাঁকে কনখল সেবাশ্রমে রেখে সাধুরা তাঁর সেবাযত্ন করেছিল। এর পূর্বে তিনি থাকতেন হৃষীকেশে। সেখানেও খুব ভোরে উঠে তিনি প্রতিদিন জপধ্যান করতেন। একজন ধনী ভোরবেলা সাধুদের কুঠিয়া দেখে বেড়াতেন। তিনি লক্ষ্য করে দেখেছিলেন যে, হরি মহারাজই প্রতিদিন খুব ভোরবেলা হতে ধ্যান করছেন। আশপাশের লোকজন হরি মহারাজের প্রশংসায় মুখর। কিছুদিন পরে সেই ধনী হরি মহারাজের কাছে এসে তাঁকে ছয় হাজার টাকা দিয়ে প্রণাম করলেন। হরি মহারাজ বলেন, "এ টাকায় আমার কি হবে? আমার কোনও

দরকার নেই। বরঞ্চ তুমি এই টাকা নিয়ে কনখলে যাও, সেখানে দুটি সাধু (কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দ) দুঃস্থদের সেবার জন্য একটি ছোটখাটো হাসপাতাল করেছে। তাঁদের দিলে এই টাকা অপরের সেবায় লাগবে।"

কনখলে কিছুদিন থেকে তিনি বেলুড় মঠে ফিরে আসেন, মঠ থেকে যান পুরীতে। পুরী থেকে কয়েকটি জায়গায় ঘুরে-ফিরে তিনি শেষ পর্যন্ত কাশীতে গিয়ে থাকেন। তিনি ছিলেন স্বামীজীর সেবা-আদর্শের অনুরাগী। একদিন জনৈক ব্রহ্মচারী হরি মহারাজকে বলে, 'আপনারা সবাই তপস্যা করেছেন, আর আমরা তপস্যা করবো না?' হরি মহারাজ উত্তরে বলেন, "স্বামীজী দার্জিলিং-এ একদিন বলেছিলেন, 'দেখ, এরপর অনেক লোক আসবে সাধু হতে, তাদের অধিকাংশের চব্বিশ ঘণ্টা ধ্যান করার ক্ষমতা থাকবে না। বাদবাকি সময় তারা কি করবে?' সেজন্য একটি সেবার আদর্শ নিয়ে স্বামীজী তাদের কাজে লাগালেন, যাতে দেশের দশের কল্যাণ হয়, তাদের নিজেদেরও কল্যাণ হয়।" হরি মহারাজ বলতেন, "স্বামীজীর এই কাজ যে করবে সে-ই মুক্ত হয়ে যাবে।" তিনি সেবাশ্রমের কাজ খুবই পছন্দ করতেন। ১৯১৯-২০ সালে রাজা মহারাজ কাশীতে গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিলেন শরৎ মহারাজ। শরৎ মহারাজ থাকতেন কিরণ দত্তের বাড়িতে। আর মহারাজ অদ্বৈতাশ্রমের দোতলায়। একদিন মহারাজের সামনে আমরা সবাই বসে আছি, শরৎ মহারাজও আছেন। মহারাজ সেদিন হরি মহারাজ সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন। তিনি বললেন, "দেখ, শরৎ, আমার ইচ্ছা হচ্ছে হরি মহারাজকে প্রণাম করতে। এমন মহাপুরুষ দুর্লভ। দুরারোগ্য ব্যাধির কথা ভুলে তিনি কেমন সুস্থ আছেন।" একথার পর আমরা সব উঠে গেলুম। শরৎ মহারাজ সোজা হরি মহারাজের ঘরে গেলেন। ডায়াবেটিসের জন্য হরি মহারাজ গরম আদৌ সহ্য করতে পারতেন না। ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতেন। শরৎ মহারাজ ঘরে ঢুকে হরি মহারাজকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে না পেয়ে হরি মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন, "কে—কে?"

শরৎ মহারাজ ঃ আমি শরৎ।

হরি মহারাজ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন ঃ আমি রোগে অন্ধপ্রায়, তাই তুমি আমায় অপ্রস্তুত করলে!

শরৎ মহারাজ ঃ ভাই, তুমি এতদিন লুকিয়ে বসেছিলে! আজ মহারাজ আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি।

তাঁর শরীরের উপর ছিল অসাধারণ control (নিয়ন্ত্রণ) তিনি ডায়াবেটিস রোগে খুব ভুগলেও সব সময় আনন্দে থাকতেন। তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত, 'দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো।' আবার বলতেন হিন্দুস্তানীতে একটি কথা, তার তাৎপর্য, শরীর থাকলেই ট্যাক্স দিতে হবে, দুঃখ-কষ্ট থাকবেই। জ্ঞানী সেই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেন, উতলা হন না, কিন্তু অজ্ঞানীরা উতলা হয়ে পড়ে। এখানেই জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর মধ্যে তফাৎ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন অর্জুনকে, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ এসব 'আগমাপায়িনঃ', এসব আসে যায়, চিরকাল থাকে না। 'তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত'—তুমি সে সকল সহ্য কর। সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই। অন্য কোন উপায় থাকলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মতো ভক্ত, যাঁকে তিনি অত ভালবাসতেন, তাঁকে নিশ্চয়ই বলতেন। এই কারণেই হরি মহারাজ শরীর খুব খারাপ হলেও উতলা হতেন না, বিচলিত হতেন না। শেষের দিকে তাঁর পিঠে হলো কার্বাঙ্কল। ডাক্তার অপারেশনের জন্য এ্যানেসথেসিয়া (অনুভূতি বিলোপ) করতে চাইলে তিনি আপত্তি করলেন। তারপরে ডাক্তার ছুরি একটু লাগাতেই তিনি আঁতকে ওঠেন। তিনি ডাক্তারকে বললেন, "আমাকে না বলে ছুরি বসাবে না। আগে বলবে।"

ডাক্তার বলেন, 'আচ্ছা, এবার ছুরি বসাবো।'

হরি মহারাজ ঃ 'আচ্ছা আমাকে একটু সময় দাও।'

কিছুক্ষণ পরেই হরি মহারাজ বলেন, 'আচ্ছা, এবার করো।' ডাক্তার ছুরি দিয়ে কার্বাঙ্কল কাটলেন, টিপে পুঁজরক্ত বের করলেন, ভিতরে গজ ঢোকালেন। হরি মহারাজ কোন উচ্চবাচ্য করলেন না, মনে হচ্ছিল যেন ডাক্তার একটি কলাগাছের উপর কাটাছেঁড়া করছেন। ডাক্তারের কাজ শেষ হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "হয়ে গেছে?"

ডাক্তার ঃ "আজ্ঞা, হ্যাঁ।"

হরি মহারাজের এ রকম সহ্যশক্তি দেখে ডাক্তাররা অবাক হয়ে যান। তাঁরা ভাবেন, যিনি প্রথমে ছুরি লাগাতে আঁতকে উঠেছিলেন, তিনি এত যন্ত্রণা সহ্য করলেন কি করে? দেখে মনে হলো হরি মহারাজ যেন শরীর থেকে প্রাণটাকে বের করে নিয়েছিলেন। দেহ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল তাঁর আত্মা। শরীরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যেমন শুকনো নারকেলের শাঁসের সঙ্গে তার shell-এর সম্পর্ক থাকে না। এই কারণে শরীরের উপর কাটাছেঁড়া হলেও তাঁর কোন কষ্ট হয়নি।

হরি মহারাজ ছিলেন খুবই সদাশয়, সাদাসিধে প্রকৃতির মানুষ। আবার তিনি খুব কঠোরও হতেন, সাধন-ভজনে কোনও রকমের ত্রুটি হলে খুব বকতেন। তিনি খুব punctuality maintain (সময়ানুবর্তিতা রক্ষা) করতেন। তিনি চাইতেন, সব কাজ সময় মতো করতে হবে, নিখুঁতভাবে করতে হবে। একদিনের ঘটনা। তাঁকে চারটার সময় দুধ দিতে হতো। তিনি খাটের উপর বসেছিলেন। দেওয়ালে ছিল একটি ঘড়ি। সেবক দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকলে তিনি লক্ষ্য করলেন ঘড়িতে চারটা বেজে এক কি দেড় মিনিট হয়েছে। তিনি মুখে কিছু বললেন না, শুধু ঘড়ির দিকে তাকালেন। সেবক দুধ নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তখন তাঁর হাত-পা কাঁপছিল। তিনি কিন্তু দুধ খেলেন না। এ রকম ভাবেই তিনি সময় মেনে চলতেন।

আমেরিকাতে তিনি বলতেন, "যারা আমার শরীরের সেবা করে, আমি সেবা করি তাদের আত্মার। আমাকে দেখতে হয়, যাতে তাদের আত্মার কল্যাণ হয়। সে কারণে মাঝে মাঝে ওদের বকতে হয়।" একজন সেবক তাঁর সেবা করছিল খুব ভক্তি করে। সেবকের মনে হয়, এ কি রকম সাধু, এত বকাবকি করেন? সে একদিন বলেই ফেলল, "You are a sannyasi. How is it that you become so restless and you lose your temper?" হরি মহারাজ তাকে বলেন, "দেখ তোমরা ঘরের লোক, তোমাদের কল্যাণের জন্যই আমি বকি। তবে তুমি সহ্য করতে পারছ না—আচ্ছা, ঠিক আছে। কাল থেকে

তোমাকে আর কিছু বলব না।" পরবর্তিকালে সেই সেবক বলত, "এমন আশ্চর্য ব্যাপার। তিনি যে বললেন, তারপর থেকে তিনি আমাকে একদিনও বকাবকি করলেন না। হঠাৎ তিনি যেন একেবারে বদলে গেলেন।" বোঝা গেল, যাঁরা তাঁর সেবা করতেন তাঁদের কল্যাণের জন্যই তিনি বকাবকি করতেন। বকাবকি করা তাঁর স্বভাব নয়, এগুলো তাঁর মনের কথাও নয়।

তিনি আমাদের বলতেন, "আমি কোনদিন ঠেস্ দিয়ে বসিনি। এখন যেমন বসেছি এই armchair-এ, ঠিক এ-রকমই মেরুদণ্ড সোজা করে বসেছি। এখন আমি যে রকম বসেছি এ রকম বসবে।" তিনি বিছানার মাঝখানে বসতেন সোজা হয়ে। তিনি বললেন, "আমি কত বছর ধরে ঠেস না দিয়ে এ রকম আসন করে মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসছি। যেদিন থেকে সাধনভজন আরম্ভ করেছি সেদিন থেকেই এভাবে মেরুদণ্ড সোজা রেখে আসন করে বসছি। কখনও ঠেসান্ দিয়ে বসি না।" শেষ অবস্থাতেও যখন তাঁর শরীর খুবই দুর্বল, তিনি শুয়ে আছেন, তখনও দেখতাম তিনি তাঁকে ঐভাবে সোজা করে বসিয়ে দিতে বলতেন। সেবকেরা ঐভাবে বসাতে সাহস করত না। কারণ তাঁর হার্টফেল করার আশঙ্কা ছিল। তাঁর শেষ দিনে সেবকেরা তাঁকে বসিয়ে দিতে গররাজি হলে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, "দেখছ না, প্রাণ যাচ্ছে আর তোমরা আমাকে বসিয়ে দিচ্ছ না।" হয়ত তাঁর ইচ্ছা ছিল বসে বসেই তিনি শরীর ত্যাগ করবেন।

(উৎস ঃ অমৃতের সন্ধানে)

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতিচারণ

স্বামী ভূতেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ পার্ষদদের অন্যতম হরি মহারাজ—স্বামী তুরীয়ানন্দ। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই তাঁর জীবনব্যাপী কঠোর তপশ্চর্যার কথা মনে পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাবার সময় ব্যাকুলভাবে স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেন ঃ "হরিভাই, আমিই শুধু খেটে খেটে মরব, তোমরা এই কাজে সাহায্য করবে না?" স্বামীজীর সপ্রেম আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরে তপস্বী তুরীয়ানন্দ ভোগপ্রবণ দেশ আমেরিকায় যেতে সম্মত হলেন। আগেই বলেছি, তাঁর সারাজীবন কঠোর তপশ্চর্যার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। শৈশব থেকে যখন যে কাজটি ধরেছেন, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেটি করেছেন। যৌবনের প্রারম্ভে শুধু অধ্যাত্মচর্চা নয়, শরীরচর্চাও করেছেন। দুটিতেই সমান নিষ্ঠা। কুস্তি করতেন, নানারকম ব্যায়াম করতেন। কেউ কেউ বলতেন ঃ "দুশোবার ডন দিচ্ছ, মরে যাবে যে!" কিন্তু তাঁর দৃঢ়তা এমন যে, যা ধরবেন তার চরম না করে ছাড়তে পারতেন না। এই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তা ত্যাগ-তপস্যার ক্ষেত্রেও যেমন, শরীরচর্চার ক্ষেত্রেও তেমনই। তবে এককথায় তাঁর কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসে তাঁর অতি কঠোর তপস্যার ভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে, তাঁর কাছ থেকে সাধন-ভজনের প্রেরণা পেয়ে যখন তিনি কঠোর সাধন করছেন, তখন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ওরে, হরি কেন আসে না?" তখন ভক্তদের মধ্যে একজন বললেন ঃ "আসবে কি! সে এখন বেদান্ত-বিচার নিয়ে মগ্ন।" শ্রীরামকৃষ্ণ আর কিছু বললেন না। তারপর একদিন বলরাম মন্দিরে এসে তাঁকে ডেকে

পাঠালেন। বলরাম মন্দিরের কাছেই হরি মহারাজের বাড়ি ছিল। খবর পাঠাতেই তিনি এলেন। এসে দেখছেন, ঠাকুরঘরের সামনে যে হলঘর, সেখানে ঠাকুর ভক্তপরিবৃত হয়ে গান করছেন। এক-একটি গান করছেন আর দুচোখ থেকে জলের ধারা পড়ছে। সামনের কার্পেটও খানিকটা ভিজে গিয়েছে। গানটির বিষয় হলো—রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন, লব-কুশ সেই অশ্বমেধের ঘোড়া ধরেছেন। ফলে রামের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। লব-কুশ হনুমানকে ধরে সীতার কাছে নিয়ে এসে বললেন ঃ দেখ মা, কত বড় একটা হনুমান ধরে এনেছি। তখন হনুমান বলছেন ঃ "ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?" ঠাকুর তাঁর সুমধুর কণ্ঠে ভাবের আবেগ নিয়ে গাইছেন আর দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে। হরি মহারাজ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে গানটি শুনেছেন। ভিতরে গিয়ে ঠাকুরের ঐ মূর্তি দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ দিয়েও ধারা বইতে আরম্ভ করল। তিনি বুঝলেন, এই গানটি আর কাউকেও নয়, তাঁকেই লক্ষ্য করে ঠাকুর গাইছেন।

আমরা অভিমানবশত মনে করি যে, সাধন-ভজন করে লব-কুশের হনুমানকে ধরার মতো ভগবানকে ধরে ফেলব। কিন্তু তা যে সম্ভব নয়, ঠাকুর এ কথাই তাঁর ঐ অপূর্ব গানের ভিতর দিয়ে বোঝালেন বলে হরি মহারাজের মনে হলো। হরি মহারাজের সাধনের অহঙ্কার চূর্ণ হলো। নির্দোষ অহঙ্কার—সাধনা করব, করে সিদ্ধিলাভ করব। কিন্তু এ-ও অহঙ্কার, তাই ঠাকুর তা দূর করবার জন্য তাঁকে গানটি শোনালেন। পরে হরি মহারাজ বারবার বলেছেন, সাধনের যে অহঙ্কার সাধককে ভগবানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে—তা চূর্ণ করাই সাধনার উদ্দেশ্য। আমাদের ভিতরে একটা সুপ্ত অহঙ্কার থাকে যে, কঠোর সাধনা করে ভগবানলাভ করব। উদ্দেশ্য ভাল, তবুও এটি অহঙ্কার। সাধন যতই করি, ভগবানকে লাভ করার পক্ষে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কথাটি হরি মহারাজের কাছ থেকে অনেকে অনেকবার শুনেছেন। প্রাণপণে সাধন করেও যখন দেখি সিদ্ধি আমাদের নাগালের বাইরে, তখন অহঙ্কার চূর্ণ হয়। বুঝতে পারি, যত চেষ্টাই করি, তিনি সাধনের দ্বারা লভ্য নন। গানে

আছে ঃ "ওহে সাধন দুর্লভ।" অথচ সাধন না করে উপায় নেই। সাধন ব্যতিরেকে মনের শুদ্ধি হবে না, অহঙ্কার-অভিমান যাবে না। কিন্তু সাধন করে তাঁকে লাভ করা যাবে—এ অহঙ্কার থাকলে চলবে না। হরি মহারাজের উপদেশে এ কথা বারবার পাই।

তা বলে তিনি কখনো সাধন থেকে বিরত হননি। বলা যায়, আবাল্য সাধনা করেছেন তিনি। তিনি বিধিমত নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি করতেন, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে বহুক্ষণ জপ-ধ্যানে অতিবাহিত করতেন। স্কুল-কলেজের পড়া বেশিদূর এগোয়নি, কারণ তাঁর মন ছিল অন্য রাজ্যে। কিন্তু তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। বেদান্তচর্চা করতেন, নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্র পড়তেন এবং শাস্ত্রবাক্য জীবনে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন ঃ "শাস্ত্রের কথাগুলি আমি ধ্যান করতাম। এক-একটি শ্লোক নিয়ে আমি ধ্যান করতাম।" শাস্ত্রচর্চা মানে শুধু পড়ে যাওয়া বা সংস্কৃত থেকে অনুবাদ নয়, জীবনে সেইগুলি অনুসরণ করা।

প্রথম জীবনে যখন তিনি ঠাকুরের প্রভাবে এলেও খুব ঘনিষ্ঠ হননি, তখন একদিন গঙ্গায় স্নান করতে নেমে জপ করছেন। হঠাৎ ঘাটে 'কুমীর কুমীর' বলে হৈ হৈ পড়ে গেল। তিনি তখন গঙ্গায় আবক্ষ মগ্ন হয়ে জপ করছিলেন। সবাই জল থেকে উঠে পালিয়ে যাচ্ছে দেখে তিনিও জল থেকে উঠে এলেন। তারপরেই মনে হলো—আমি তো দেহ নই, কুমীরের ভয়ে এ রকম পালিয়ে এলাম! এটি তো শাস্ত্রসম্মত আচরণ হলো না। আবার গঙ্গায় নেমে গিয়ে যেমন জপ-ধ্যান করছিলেন, করতে লাগলেন। ঘটনাটি এইজন্য বলছি যে, তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে শাস্ত্রের উপদেশ অনুসরণ করতেন এবং কিরকম দৃঢ়তার সঙ্গে করতেন এ থেকে তা বোঝা যায়। যেখানে মৃত্যুভয়, সেখানেও তিনি শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের বিপরীত কিছু করতেন না। দেহ যায় যাবে, তাতে কি আসে যায়! আমি দেহ নই—এই বুদ্ধি অবিচল রাখার জন্য জলে কুমীর শুনেও তিনি নির্ভয়ে সেখানে রইলেন।

এ রকম দৃষ্টান্ত আরও আছে। এমন শাস্ত্রীয় জীবনযাপন বাস্তবিক দুর্লভ। পাণ্ডিত্য অনেকের থাকে, কিন্তু ব্যবহারে তার প্রয়োগ খুবই বিরল।

যখন শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে থেকে তিনি সাধন করছেন তখনো ঐ রকম তীব্রতা। আমরা বলি, ভগবানের নাম করতে বা ধ্যান করতে গেলে অন্য চিন্তা মনকে অধিকার করে বসে। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলতেন ঃ "ধ্যান করতে বসবার সময় মনের দরজায় লিখে দাও—'No Admission'—এখন এখানে অন্য চিন্তার প্রবেশাধিকার নেই।" এটি করা কত কঠিন, আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু তাঁর পক্ষে এটি দুষ্কর ছিল না। তাঁর জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি বলছি এইজন্য যে, এগুলির মধ্যে তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে।

তাঁর ডায়াবেটিস ছিল। পিঠে কার্বাঙ্কল হয়েছে, ডাক্তার অস্ত্রোপচার করতে বলায় তিনি বললেন ঃ "কর।" কিন্তু যে রকম গভীর ক্ষত, তাতে অস্ত্রোপচার করতে গেলে অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে ক্ষতস্থানটি অসাড় করে দেওয়া দরকার। সেজন্য ক্লোরোফর্ম দেওয়ার কথা হলো। শুনে তিনি বললেন ঃ "ওসব দরকার নেই, অপারেশন করার আগে বলবে যে, অপারেশন শুরু করছ, তাহলেই হবে।" ডাক্তার হাসলেন। ভাবলেন ঃ যত অবিশ্বাস্য কথা! এত বড় ক্ষত, এ তো শুধু একটা সাধারণ ফোড়া কাটা নয়! এই অপারেশনের ব্যথা কখনো কেউ সহ্য করতে পারে না। যাই হোক, ডাক্তার আর কী করবেন, মহারাজ তো যা বলার বলেই দিয়েছেন! ডাক্তার অস্ত্রোপচার করবার আগে বললেন ঃ "তাহলে আমার কাজ আরম্ভ করি?" হরি মহারাজ বললেন ঃ "কর।" ডাক্তার অস্ত্রোপচার করলেন। মহারাজ স্থির হয়ে আছেন, অচঞ্চল। ডাক্তার অবাক হয়ে গেলেন, ইনি কি মানুষ? এঁর শরীরে কি অনুভূতি নেই? সব শেষ হয়ে গেলে ডাক্তারকে জিনিসপত্র গোছাতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "অপারেশন হয়ে গিয়েছে?" ডাক্তার বললেন ঃ "হ্যাঁ। কিন্তু এত বড় করে কাটলাম, আপনি 'আঃ উঃ' কিছু করলেন না!" মহারাজ ঠিক তখনই 'উঃ' করে উঠেছেন। ডাক্তার অবাক হয়ে বললেন ঃ "এ কি কথা, যখন অপারেশন করা হলো, আপনি চুপ করে রইলেন, এখন সব শেষ হয়ে গেছে, এখন আপনি 'উঃ' করছেন কেন?" মহারাজ বললেন ঃ "তুমি বললে যে!" ডাক্তার বিস্মিত তাঁর অসাধারণ সহনশক্তি দেখে।

আর একদিন ক্ষতটায় ড্রেসিং করতে এসে ডাক্তার দেখলেন, একটুখানি কেটে দিতে হবে। কাটতেই মহারাজ 'উঃ' করে উঠলেন। ডাক্তার বললেন ঃ "সেদিন এত বড় অপারেশন করলাম, আপনি কিছু বললেন না, আর আজকে এইটুকু কাটতেই 'উঃ' করলেন?" তিনি বললেন ঃ "তুমি তো কাটবে আগে বলনি। বললে আমি মনকে ওখান থেকে সরিয়ে নিতাম।" মনকে যে শরীরের কোন অংশ থেকে ওরকম সরিয়ে নেওয়া যায় তা তো চিকিৎসাশাস্ত্রে নেই। অথচ হরি মহারাজের কাছে ওরকম করাটা খুব সহজ, অতি স্বাভাবিক। মনের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল এতখানি!

উপনিষদে আছে, তপস্যার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না, কিন্তু হরি মহারাজের বাস্তব অনুভূতি এটি এবং এই অনুভূতির পাঠ তিনি নিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। যখন কলকাতায় বলরামবাবুর বাড়িতে হরি মহারাজ খুব অসুস্থ, চলাফেরা করা কষ্টকর, রোগযন্ত্রণা তো আছেই, সেসময় আমরা তাঁকে দর্শন করতে যেতাম। তখনো সাধু হইনি, আমরা একদল ছেলে মাঝে মাঝে ঐভাবে তাঁর কাছে যেতাম। তাঁর এমন আকর্ষণ ছিল যে, না গিয়ে থাকা যেত না। তাঁকে কোনদিন কখনো বিষণ্ণ এবং অবসাদগ্রস্ত দেখিনি। যখনই গিয়েছি, দেখেছি তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। আর ছবিতে যেমন দেখা যায় ঐভাবেই সোজা হয়ে বসতেন। তিনি বলেছিলেন, আমি কখনো দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসিনি। যোগীরা যোগ অভ্যাসের জন্য যেমন সোজা হয়ে বসেন সবসময়, সেইভাবে বসতেন—কেবল ধ্যান করার সময় নয়। গীতায় আছে এইভাবে বসার কথা। তাঁর আর একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব ছিল যে, ভগবৎপ্রসঙ্গ ছাড়া তাঁর কাছে আর অন্য কথা তোলবার উপায় ছিল না। সেখানে পরিবেশ এমন হয়ে থাকত যে, অন্য প্রসঙ্গ করবার কথা কারও মনেও উঠত না। সেই সব সৎপ্রসঙ্গের কথার ভিতরে কত তেজ! তিনি যেমন তেজস্বী ছিলেন, কথার ভিতরেও ছিল সেই রকম তেজ। আর যখন চাইতেন—শাস্ত্রে যেমন আছে 'সিংহাবলোকন', সিংহ যেমন দেখে সে রকম—সেই দৃষ্টিতে মহাশক্তিশালী ব্যক্তিও হতপ্রভ হয়ে যেত। তাঁর অন্তরের তেজস্বিতার কাছে কারও মাথা

তোলার সামর্থ্য থাকত না। অথচ তিনি যে সর্বদা ভর্ৎসনা করতেন তা নয়। দেখতাম, তাঁর মন সর্বদা এমন এক উঁচু স্তরে রয়েছে যে, সেখানে সাধারণ মানুষের অন্য কোন ভাব প্রকাশ করার সুযোগ থাকত না। তিনি এই কথাটি বলতেন ঃ

আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েৎ বেদান্তচিন্তয়া।
দদ্যাৎ নাবসরং কিঞ্চিৎ কামাদিনাং কথঞ্চ ন ॥

—যতক্ষণ না মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে বা মৃত্যু হয় ততক্ষণ সমস্ত সময় বেদান্তচিন্তায় কাটাবে, যাতে কাম প্রভৃতি মনের ভিতরে প্রবেশ করবার অবকাশ না পায়। এইভাবে জীবনযাপন করে তিনি শাস্ত্রবাক্যকে যেন সকলের সামনে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। আমরা তাঁর কাছে যেতে দুর্বার আকর্ষণবোধ করতাম এইজন্য যে, তাঁর কাছে গেলে মনের অবসাদ দূর হয়ে যেত, শাস্ত্র সম্বন্ধে মনে শ্রদ্ধার ভাব, সাধন-ভজনের জন্য তীব্র প্রেরণা আসত, ভোগবিলাস তুচ্ছ হয়ে যেত। জীবনটি যে কেবল সাধনার জন্য—এটি বিশেষভাবে অনুভব করতাম। বারবার তিনি একটি কথা বলতেন ঃ "ব্রাহ্মণ শরীর কেবল তপস্যার জন্য।" কেন বলতেন জানি না, সম্ভবত আমাদের দলের অনেকেরই ব্রাহ্মণ শরীর ছিল বলেই বলতেন। আমরাও একটা প্রেরণা পেতাম যে, আমাদের জীবন যেন কেবল তপস্যায় ব্যয়িত হয়।

স্বামীজী হরি মহারাজকে শ্রদ্ধা করতেন তাঁর তপস্বী জীবনের জন্য। সেই তপস্বীর জীবন দেখানোর জন্য তিনি আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন হরি মহারাজকে। তাঁর সম্পর্কে স্বামীজী সেখানকার ভক্তদের বলেছিলেন ঃ "আমি তোমাদের এখানে এসে কাজ করেছি, আমার মধ্যে তোমরা ক্ষত্রিয়ভাব দেখেছ। [তিনি ধর্মের জন্য লড়াই করেছেন, তেজস্বিতার পূর্ণমূর্তি ছিলেন।] আমার মধ্যে তোমরা ক্ষত্রিয়কে দেখেছ, ব্রাহ্মণকে দেখনি; তোমাদের জন্য এবার আমি একজন ব্রাহ্মণকে এনেছি।" স্বামীজী বলতেন ঃ "ব্রাহ্মণত্ব হরি মহারাজের প্রতি রক্তবিন্দুর ভিতরে। তাঁর জীবনটি ঐভাবেই গঠিত।"

একদিন স্বামীজী বললেন ঃ "হরিভাই, তুমি বক্তা হতে চাও?" হরি

মহারাজ বললেন ঃ “না।” স্বামীজী বললেন ঃ “ঠিক বলেছ। বক্তা হবার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি শুধু তোমার মতো জীবনযাপন কর। এখানে আমি অনেক বক্তৃতা করেছি, তুমি তোমার জীবন দেখাও, তাতেই প্রভুর কাজ হবে।” আমেরিকার এক গভীর জঙ্গলের ভিতরে 'শান্তি আশ্রম' বলে একটি আশ্রম তিনি করেছিলেন। মানুষের বসতি থেকে অনেক দূরে সেটি অবস্থিত। ঘরবাড়ি বিশেষ নেই। হরি মহারাজ এবং ভক্তরা সেখানে এক-একটি তাঁবুতে বাস করতেন। সে অঞ্চলে কাজ করবার কোন লোক ছিল না, নিজেরাই রান্নাবান্না থেকে আরম্ভ করে সব কাজ করে নিতেন। হরি মহারাজ তাঁদের কাজে সাহায্য করতেন, আর বাকি সময় ধ্যান-ভজন এবং শাস্ত্রচর্চায় কাটাতেন। দিনের পর দিন এইভাবে চলছিল। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন, পরশমণির স্পর্শের মতো তাঁদের জীবনও সোনা হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন, এমন একজন ওদেশী সাধুর কাছে—স্বামী অতুলানন্দের কাছে—আমরা শুনেছি যে, হরি মহারাজকে দেখে তাঁর জীবনধারা বদলে গিয়েছিল। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারতবর্ষে এসেছিলেন। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ত্যাগ-তপস্যায় তিনি এদেশে কাটিয়েছেন। হরি মহারাজের জীবনের বেশির ভাগই তপস্যাক্ষেত্রে কেটেছে। যখন গুরুভাইদের আগ্রহ-অনুরোধে আশ্রমে এসে থাকতে বাধ্য হয়েছেন, সেখানেও তাঁর জীবনের ধারা একই রকম ছিল। ত্যাগ-বৈরাগ্য সম্পর্কে তাঁর উদ্দীপনাময় কথাগুলি শুনে নতুন সাধুদের ভিতরে স্বাভাবিকভাবে বৈরাগ্যের আগুন জ্বলে উঠেছিল। অনেকে বাইরে তপস্যা করতে চলে গিয়েছিলেন।

একদিন ঠাকুরের সন্তানদের একজন বলছেন ঃ “হরিভাই, তোমার কথায় ছেলেদের এত বৈরাগ্য হলো যে, যে যেখানে ছিল সব তপস্যায় চলে গেল। এখন কাজ চলে কি করে?” হরি মহারাজ হেসে বললেন ঃ “ব্যাটারা এই বুঝল নাকি? কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া, এর নামই কি বৈরাগ্য?” তাঁর কাছে শুনেছি, বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য তা নয়, বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য এই যে, ভগবানকে শীর্ষে রাখতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি কাজ হবে তাঁরই প্রীতির

জন্য, যেখানে নিজের স্বার্থ কোনরূপেই প্রবেশ না করতে পারে। এই হলো বৈরাগ্য। বৈরাগ্য মানে সমস্ত জীবন দিয়ে সেটি অনুভব করা এবং কাজে পরিণত করা।

একজন সাধু তাঁকে একবার লিখলেন ঃ "কাজকর্ম করতে গেলে অভিমান এসে যায়, সেইজন্য ভাবছি আর কাজকর্ম করব না।" হরি মহারাজ তাঁকে উত্তরে বললেন ঃ "আর ভেবেছ বুঝি যে, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেই অভিমান যাবে!" অভিমান দূর করবার পথ যে ওটা নয় এ কথা সাধুটি বুঝতে পারেননি। তাঁর কথা ঃ "মনকে সতর্ক রাখতে হবে, যাতে কোন অজুহাতে স্বার্থ সেখানে প্রবেশ করতে না পারে।" আগেই বলেছি, হরি মহারাজ বলতেন ঃ "মনের দরজায় লিখে দাও 'No Admission'—প্রবেশ নিষেধ। মনের দরজায় লিখে দাও যে, এখানে স্বার্থের কোন অবকাশ নেই।" হরি মহারাজের কাছে যাঁরা থাকতেন, তাঁর সংস্পর্শেই তাঁদের তপস্যা হতো। তিনি কোন দুর্বলতাকে সহ্য করতেন না এবং তাঁর কাছে থাকলে দুর্বলতাও স্থান পেত না। অমন জ্বলন্ত আগুনের কাছে থাকাও বড় সহজ নয়, তাঁর সেবকদের পক্ষেও তা কষ্টকর হতো। তাঁর সেবায় বেশিদিন অনেকেই থাকতে পারতেন না। তাঁর গুরুভাইরা বলতেন ঃ "হরি মহারাজের কাছে থাকা তোমাদের পক্ষে কষ্টকর, কারণ আমাদের জীবন যেভাবে চলে তাঁর জীবন সেরকম নয়। কাজেই তাঁর কাছে থাকা মানেই কঠোর তপস্যা। সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই তপস্যার বেগ সহ্য করা কঠিন। কিন্তু ওঁর কাছে থাকলে তোমাদের জীবন গড়ে উঠবে।"

একটা ঘটনার কথা বলছি। তাঁর এক সেবকের কাছ থেকে আমরা শুনেছি। সেবকটির শরীর বলিষ্ঠ, কিন্তু ওঠা-বসা করবার সময় গায়ের হাড়ে মটমট শব্দ হতো। এটা তো মানুষের নিজের হাতে নয়, শরীরের ভিতর কোথায় কি যন্ত্র, কেন শব্দ হয়, কে জানে! একদিন হরি মহারাজ ঐ রকম দেখে তাঁকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাড় মটমটানি সেরে গেল। অর্থাৎ শরীরও মনের অধীন—এই কথাটি হরি মহারাজের কাছে থাকলে বোঝা যেত। সুতরাং শরীরের বিকৃতি থাকলে মন যদি প্রতিবাদ করে,

তাহলে তা আর থাকতে পারে না। তাঁর এককথায় হাড় মটমটানি বন্ধ হয়ে গেল—এটা বিস্ময়কর ঘটনা বলে মনে হবে। কিন্তু তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, মন ইচ্ছা করলেই শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রশ্ন উঠবে, তাহলে তিনি এত রোগভোগ করলেন কেন? ভোগের কারণ হলো যে, মনের প্রভাবে শরীরকে সুস্থ করা তিনি চাননি। যদি ইচ্ছা করতেন সঙ্গে সঙ্গে শরীরকে সুস্থ করতে পারতেন, সেই সামর্থ্যও তাঁর ছিল, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। কাজেই রোগভোগ করেছেন ক্রমাগত। কিন্তু সেজন্য কোনদিন বিষণ্ণতা বা অবসাদ তাঁর ছিল না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ "ঠাকুরের কাজ আমি কিছু করিনি, এইজন্য বোধহয় এত রোগভোগ করতে হচ্ছে!" আমরা যাকে 'কাজ' বলি সেরকম কাজ করবার অবকাশ তাঁর বেশি হয়নি, কারণ তিনি তপস্যায় সারা জীবনটি কাটিয়েছিলেন। কনখল আশ্রম থেকে তিনি একবার তপস্যার ক্ষেত্রে যাচ্ছেন, আশ্রমের অধ্যক্ষ তাঁকে বললেন ঃ "মহারাজ, আপনার বয়স হয়েছে, আপনার সেবা করবার জন্য একটি ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে দিচ্ছি।" উনি তীব্র প্রতিবাদ করলেন ঃ "আমি যাচ্ছি তপস্যার ক্ষেত্রে, সঙ্গে সেবক নিতে হবে?" অধ্যক্ষের আর কিছু বলবার সাহস হলো না। তারপর যখন যাবেন, সঙ্গে শীতবস্ত্র বেশি নেই দেখে অধ্যক্ষ বললেন ঃ "মহারাজ, আপনি কিছু শীতবস্ত্র এবং দুখানা কম্বল সঙ্গে নিয়ে যাবেন।" কিন্তু হরি মহারাজ কিছুই নেবেন না। তখন অধ্যক্ষ কাতরভাবে বললেন ঃ "একটা ওভারকোট আছে, নিয়ে যান, শীত নিবারণ হবে। আমি মিনতি করে বলছি, আপনি দয়া করে এইটুকু স্বীকার করুন।" তাঁর কাতরতা দেখে হরি মহারাজ ওভারকোটটি নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখেন তার ভিতরে কিছু টাকাও আছে। তখন টাকা তো ফেরত গেলই, সেই সঙ্গে ফেরত গেল কোটটিও। এত কঠোরতা কল্পনা করা যায় না। ভিক্ষা করে একবার মাত্র খাওয়া, কখনো বা তা-ও হতো না। ঐভাবে তিনি কুঠিয়ায় থাকতেন। একদিন কুঠিয়ার কাছে বাঘ এসেছে। তখন ওখানে খুব বাঘের উপদ্রব ছিল। কুঠিয়ায় দরজা না থাকায় তিনি একটা পাথর দিয়ে রেখেছেন, যেন পাথর ঠেলে বাঘ ভিতরে আসতে না পারে। কিন্তু তারপরেই তাঁর মনে হলো ঃ আমি সমস্ত

ত্যাগ করেছি, আমি সন্ন্যাসী, আমিও বাঘের ভয়ে পাথর দিয়ে দরজা আটকে রাখব? তৎক্ষণাৎ তিনি পাথরটা সরিয়ে নিলেন। অবশ্য বাঘ আসেনি। এই রকম সবসময় তাঁর কঠোর দৃষ্টি ছিল, যাতে আদর্শের সঙ্গে আচরণের কোথাও আপস না হয়। বলরাম মন্দিরে একজন ভক্ত আসতেন। তিনি শাস্ত্রচর্চা করতেন। একদিন তিনি আসেননি, হরি মহারাজ যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। বারবার বলতে লাগলেন ঃ "কেন ও এল না এখনো?" ভগবৎকথা ছাড়া, শাস্ত্রবিচার ছাড়া তাঁর যেন অসহ্য মনে হতো। ভক্তটির সঙ্গে শাস্ত্রবিচার করে তিনি তৃপ্তি পেতেন।

সাধুদের ভিতরে কোন রকম দুর্বলতা বা ত্রুটি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একবার 'উদ্বোধন'-এ একটি সংস্কৃত শ্লোকে ছাপার সামান্য একটু ভুল ছিল, দেখেই তিনি 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে যুক্ত একজনকে ডেকে বললেন ঃ "এ কি! তোমাদের পত্রিকায় এই রকম ভুল কেন আছে? এটি কাজের ত্রুটি। তোমাদের কাজে কেন ত্রুটি থাকবে? সবাই বলবে, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সাধুরা মূর্খের দল।" এই রকম কোন বিষয়েই ত্রুটি থাকা তিনি সহ্য করতেন না। লৌকিক ব্যাপারেও তাঁর কত সতর্কতা ছিল, তা বোঝাবার জন্য এসব বলছি। তিনি যখন খুব অসুস্থ, তীব্র রোগযন্ত্রণা, তখনো তিনি নিজের জিনিসপত্র নিজে গুছিয়ে রাখতেন, কোথাও এলোমেলো ভাব ছিল না—না ব্যবহারে, না চিন্তায়। সব জায়গায় শৃঙ্খলা এবং সেই শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবার উপায় কারও নেই—এমনভাবে চলতেন। তাঁর তীব্র বৈরাগ্যের ফলে যে তাঁর কাছে যাবার সুযোগ পেয়েছে, তারই জীবনে বৈরাগ্য উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে থাকবার কারও উপায় ছিল না। আমেরিকার শান্তি আশ্রমে যেমন, মঠে বা তপস্যার ক্ষেত্রেও তেমন—একই রকম তপস্বী। কারও যেন একটু সময়ও বৃথা না যায় সেদিকে সর্বদা তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। শান্তি আশ্রমে তাঁবুতে বাস। খাওয়া-দাওয়ায় যতটুকু সময় লাগে, বাকি সময় শাস্ত্রচর্চা, ভক্তদের সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গ—এইসব করে তিনি কাটাতেন। আর সপ্তাহে একদিন মৌন থেকে নির্জনে ধ্যান করতেন। তাঁর দেখাদেখি তাঁর যেসব

ভক্ত সেখানে ছিলেন, তাঁদের একজন মৌন থাকার চেষ্টা করছিলেন। দুদিন চেষ্টা করে তাঁর মাথার গোলমাল হলো। হরি মহারাজ তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন ঃ একজনের পক্ষে যা পথ্য, অপরের পক্ষে তা নাও হতে পারে। তোমাকে কে বলেছে, সমস্ত দিন ঐ রকম ধ্যান করে কাটাতে? কারও সামর্থ্য ছিল না তাঁকে অনুকরণ করবার।

তাঁর সমগ্র জীবন ছিল তপস্যাময়, তপস্যা ছাড়া তিনি কিছু জানতেন না। কাজকর্ম, আশ্রম পরিচালনা—এসবের অবকাশ তাঁর ছিল না। উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থেকে সকলের সঙ্গে সেইভাবে ব্যবহার এবং তীব্র আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করা—আজীবন তিনি এই-ই করেছেন। এমনকি আমাদের মতো তরুণরা যখন তাঁর কাছে গিয়েছি, তখন আমাদের মধ্যেও যেন তাঁর সেই ভাব আগুনের মতো প্রবেশ করত।

ঠাকুরের এক-একজন সন্তান তাঁর এক-একটি ভাবকে তাঁদের জীবনে পরিস্ফুট করে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে হরি মহারাজ তাঁর ত্যাগ ও তপস্যার জীবনটি যেন দেখাতে এসেছিলেন। শেষজীবনে কঠিন রোগভোগ করেছিলেন, কিন্তু মুখে এতটুকু মলিনতা একদিনও দেখা যায়নি। সর্বদাই উজ্জ্বল থাকত সেই মুখ। দেখলেই বোঝা যেত এই হলো ব্রহ্মবিদের মুখ। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, গুরু শিষ্যকে বলছেন ঃ "ব্রহ্মবিদ্ ইব বৈ সোম্য ভাসি...।" (৪।৯।২) —তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন তুমি ব্রহ্মবিদ্। সেই রকম হরি মহারাজের মুখ দেখলেই মনে হতো, তিনি যেন ব্রহ্মবিদ্। ব্রহ্মের কিরণ তাঁর মুখটিকে উজ্জ্বল করে রাখত। এটি কল্পনা নয়, বাস্তব। একসময় তাঁর শরীর খুব দৃঢ় ছিল। আমরা যখন তাঁকে দেখেছি তখন তিনি রোগগ্রস্ত, কিন্তু রুগ্ণ শরীর তাঁর মনের ওপর কখনো কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দেখতাম, মন তাঁর সর্বদাই সতেজ। শরীরের ওপর মনের এই প্রভুত্ব—তাঁর জীবনে একটি দেখবার মতো জিনিস ছিল। যাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা এটি বিশেষভাবে অনুভব করেছেন এবং আমরা যারা তাঁর সঙ্গে থাকবার সুযোগ পাইনি, কেবল মাঝে মাঝে দর্শন পেয়েছি—আমাদেরও ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, তিনি

যেন তাঁর তীব্র ত্যাগ-বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন জগৎকে দেখাবার জন্য ঠাকুরের সঙ্গে এসেছিলেন।

হরি মহারাজ কোন গ্রন্থ রচনা করেননি, তবে তাঁর লেখা চিঠি 'স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র' নামে প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা না পড়েছেন তাঁদের বইটি পড়তে অনুরোধ করব। অপূর্ব সেই চিঠিগুলি। পড়লে তার থেকে কত প্রেরণা পাওয়া যায়। সেগুলি এক অমূল্য সাধন-সম্পদ। শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি সেখানে কত সরল করে তিনি বলেছেন। প্রতিটি চিঠির মধ্যে ফুটে উঠেছে তাঁর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের ছাপ। যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, যাঁরা পড়েননি তাঁরা পড়লে দেখবেন কথাগুলি কী তেজস্বিতায় পূর্ণ, যেন মৃতকে জীবিত করে দেয়। সেখানে অবসাদের লেশমাত্র অবকাশ নেই, হেরে যাওয়ার কোন মনোভাব নেই। 'আমি পারছি না, পারব না'—এ রকম কোন ভাব নেই। হতাশা, দৈন্যের কোন ভাবের প্রবেশাধিকার তাঁর কথার মধ্যে ছিল না। আবার তাঁর কথা থেকে বোঝা যায় যে, ঠাকুরের কাছে যে শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন—সাধনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না—তা তিনি কোনদিন ভোলেননি। তাঁর প্রত্যেক চিঠিতে দৃঢ় সাধন ও সেইসঙ্গে পূর্ণ শরণাগতির ভাব পাওয়া যায়। বারবার বলেছেন ঃ "শরণাগতি মানুষকে দুর্বল করে না, অসীম শক্তি দেয়।" হরি মহারাজের জীবনের সমগ্র আদর্শ এবং বোধকে এককথায় বলা যায় 'শরণাগতি'। সেইসঙ্গে সর্বপ্রকার অসত্য ও অসংযমের সঙ্গে, মনের দৈন্যের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম। সেখানে কোনরকম দুর্বলতা বা আপসের স্থান ছিল না। তাঁর শুদ্ধ জীবনাচরণ, শুদ্ধসত্ত্ব দেহ ও মন ছিল ভগবানের এক অপূর্ব যন্ত্র, যার ভিতর দিয়ে ভগবানের দিব্যবাণী নিয়ত প্রকাশিত হতো।*

---

* জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরে ২৪ জানুয়ারি ১৯৮৬ তারিখে পূজ্যপাদ মহারাজজীর ভাষণ।—সম্পাদক, উদ্বোধন।

ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ হরি মহারাজ

স্বামী বিজয়ানন্দ

কাশীতে একদিন বিকালে হরি মহারাজের সঙ্গে পথে বেড়াতে গেছি। আমি একটু পিছনে পড়েছি। হরি মহারাজ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। আরও দুজন বাইরের সাধু চলার পথে হরি মহারাজকে দেখিয়ে বলাবলি করছে, "আরে দেখ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যাতে হেঁ।" আমি তাদের কথোপকথন শুনবার জন্য আস্তে আস্তে চলেছি। হঠাৎ হরি মহারাজ আমাকে জোরে ডাক দিয়ে বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছ, না ঐসব আজেবাজে কথা শুনতে এসেছ?"

তারপর মহারাজের সঙ্গে বেড়িয়ে অম্বিকাধামে ফিরে এসে আমি তাঁকে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলুম। হরি মহারাজ হেসে বললেন, "কিরে আজ যে তোর ভক্তি বেড়ে গেল!" তখন তিনি আমাকে কাছে টেনে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন, "দেখ, তোরা যেভাবে ব্রহ্মজ্ঞ ভাবিস, আমি সেভাবে ব্রহ্মজ্ঞ নই। ঠাকুর আমার দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত। ঠাকুরই আমার সব।"

আর একদিন হরি মহারাজ নির্মল মহারাজকে বলছেন, "নির্মল, গত চারদিন একদম ঘুম হয়নি। তুমি মাকে একটু বল, আমার যেন একটু ঘুম হয়।" নির্মল মহারাজ উত্তরে বললেন, "মহারাজ, আপনি ঘুমাবেন কি করে? আপনি তো নিদ্রারূপী মাকে বিদায় করে দিয়েছেন। তাঁকে একদম কাছেই ঘেঁসতে দেন না।" তারপর হরি মহারাজ বলেন যে, সাধনকালে তিনি একটানা বহুকাল ঘুমাননি।

(কাশী অদ্বৈত আশ্রমে ৩ এপ্রিল ১৯৬৮ সালে স্বামী বিজয়ানন্দের স্মৃতিচারণ।
সংগ্রাহক ঃ স্বামী চেতনানন্দ)

তুরীয়ানন্দ-স্মৃতি

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

হরি মহারাজ থাকিতেন সেবাশ্রমের অম্বিকাধামে। বিকালবেলা সাধুদের কেহ কেহ তাঁহার কাছে যাইতেন। অল্প সময়ের জন্য আমিও যাইয়া বসিতাম। তাঁহার খাটের ওপর টানা-পাখা ছিল, উহার রজ্জু ধরিয়া টানিতাম; কথাবার্তা শুনিতাম। পুরা দুই মাস তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি। ৫ শ্রাবণ তাঁহার মহাসমাধি হয়।

তিনি প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছেন, রাস্তা ঝাঁট দিতেছিলাম, দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী কাজ কর?" উত্তর দিলাম, "রোগীর সেবা।" তিনি কহিলেন, "রোগী-নারায়ণের সেবা।"

দশহরার দিন তিনি গাড়িতে করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যান। বলিয়াছিলেন, "কলির শ্রেষ্ঠ তীর্থ গঙ্গা।" বলিয়াছিলেন ঃ "অক্রূর কৃষ্ণ-বলরামকে বৃন্দাবন থেকে মথুরা নিয়ে যান রথে করে; এক মতে, সেই থেকে রথযাত্রা।"

শেষের দিকে দেশের মঙ্গলচিন্তা তাঁহার মধ্যে প্রবল হইয়াছিল, ইংরেজি ও বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র তিন-চারিখানা পড়াইয়া শুনিতেন। "যদি স্বরাজ দেখে যেতে পারতাম!" একদিন বলিয়াছিলেন। দেহরক্ষার দিনকয়েক আগে তাঁহাকে তিনবার "সি আর দাশ" উচ্চারণ করিতে শুনিয়া মনে হইয়াছিল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আশীর্বাদ করিতেছেন।

শুনিয়াছি, একবার তিনি কংগ্রেসের অধিবেশন দেখিতে গিয়াছিলেন। "কংগ্রেসের দ্বারাও দেশের কাজ হবে" বলিতেন। "আপনারা কেন কংগ্রেস নেতাদের মতো বক্তৃতা করেন না?"—একটি ভক্ত মহিলার প্রশ্নের জবাবে

তাঁহাকে বলিতে শুনি ঃ "আমরা কেন এত ছোট কথা কহিব? আমরা সন্ন্যাসী, আমরা আকাশের মতো বিস্তৃত কথা কহিব।"

রথের দিন সন্ধ্যায়, তাঁহার সেবক ফণী মহারাজ (ভবেশানন্দ) জগন্নাথকে পূজা দিতে যান, আমাকে রাখিয়া। আশ্রমের উত্তরপাশের বড় রাস্তায় জগন্নাথের রথ আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। পূজা দিয়া ফিরিয়া আসিতে সেবকের সঙ্গে তাঁহার এইরূপ কথাবার্তা হয় ঃ "রাত হয়েচে।" "আজ্ঞে হ্যাঁ, রাত হয়েচে।" "আর দিন হবে না?" "কাল সকালে আবার দিন হবে।" তিনবার ঐ একই প্রশ্ন, একই উত্তর।

এই সময় তিনি পিঠে ফোড়া হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। বরাবর তিনি মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া বসিতেন; ফোড়া লইয়া পিঠে ব্যাণ্ডেজ করা অবস্থায়ও ঐভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। যখন ফোড়ায় অস্ত্রোপচার হয়, দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন পিঠে একটি কুয়া খোঁড়া হইল; সেই অস্ত্রোপচারের সময়েও তিনি সোজা হইয়া বসিয়া, মুখে বিকৃতির চিহ্নমাত্র নাই! তারপরে যে কয়দিন ছিলেন, কাজের ফাঁকে একবার দেখিয়া আসিতাম; মনে হইত একটি প্রফুল্লমুখ বালক ঘুমাইতেছে।

তাঁহার মহাপ্রয়াণের ত্রয়োদশ দিনে সমষ্টি ভাণ্ডারা হয় সাধুদের। আমি তখন প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী। সেবাশ্রমের কর্তারা যে কাজ করিতে দিয়াছিলেন, তাহাতে বহু জল ঘাঁটিতে হইত, নানা উৎকট রোগীর সংস্রবে যাইতে হইত। জ্বর নিয়া পড়িয়া আছি আর তাঁহাকে চিন্তা করিতেছি। চিন্তাস্রোত সহসা ঊর্ধ্বগামী হইল, আর একটা নিরাকার অনুভূতির আভাস আসিয়া উপস্থিত হইল।

পূর্বোক্ত সেবকের মুখে শোনা কয়েকটি কথা।

হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন ঃ "স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, দেখ হরি ভাই, তুমি আর বাবুরাম দীক্ষা দেবে না; দীক্ষা দিলে তোমাদের চেলাতে আর রাখালের চেলাতে ঝগড়া করবে।"

চেলা বা গ্রন্থ-রচনা না করায় কালে লোকে তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে—এই ভাবের এক কথার উত্তরে বলিয়াছেন ঃ "তা কেন, আমার পত্রগুলি তো রইল, তার ভিতরে লোকে আমাকে ভালভাবেই স্মরণ করবে।"

একদিন বলিলেন ঃ "মা চলে গেলেন, মহারাজও গেলেন, আমিও যাব। ঠাকুরের কাছে স্বামীজী আছেন, মহারাজ আছেন, তাঁরা কত আনন্দে আছেন; আমিও সেখানে থাকব।"

মহাসমাধির প্রায় দেড় বছর পূর্ব হইতে বালকের মতো হইয়া গিয়াছিলেন। এত হাসাইতেন যে, সেবক হাসিতে ফাটিয়া পড়িতেন, হাসির চোটে তাঁহার গায়ের ওপর ঢলিয়াও পড়িতেন।

মায়ের মন্ত্রশিষ্য সতীশ (পরানন্দ) বলিয়াছেন ঃ "হরি মহারাজ একদিন আমাকে বলেন, 'তুমি আমাকে ভালবাস না।' আমি বলি, 'ভালবাসা কোথায় পাব? তবু মনে হয়, আপনারা যদি একটু ভালবাসতেন তাহলে অন্তত সেই ভালবাসাটুকু ফিরিয়ে দিতে পারতুম।' 'তুমি যা শিক্ষা আজ আমাকে দিলে।' তিনি উত্তর দিলেন।"

স্বামী জগদানন্দ বলিয়াছেন ঃ "হরি মহারাজ একদিন কাহারও দুর্বলতার নিন্দা করিতেছেন শুনিয়া ভাবিতেছি, অন্যের তো নিন্দা করচেন, নিজে যে এত ভুগচেন তার কিছু করতে পারেন? আশ্চর্য, অমনি বলিতেছেন, 'এই যে অসুখ, ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে দূর করে দিতে পারি।'"

হরি মহারাজের অসুখের সময় পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) তাঁহাকে দেখিতে আসেন; তাঁহার সঙ্গে যাইয়া কেদারনাথ দর্শন করি। সুস্বরে 'শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্' আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি মন্দির পরিক্রমা করিয়াছিলেন।

(উৎস ঃ জীবন-পরিক্রমা)

স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের কথা

সংগ্রাহক ঃ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দজী উত্তর কাশীতে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তথাকার প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী দেবী গিরিজী এখনও তাঁহার তপস্যার কথা বলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দজী বলিতেন, "সাধু তেইশ ঘণ্টা আমির, এক ঘণ্টা ফকির।" সারাদিনের মধ্যে ঘণ্টাখানেকের জন্য সাধু ভিক্ষাদিতে রত থাকেন—তখন তিনি ফকির, অর্থাৎ ভিক্ষুক। আর বাকি তেইশ ঘণ্টা তিনি ঈশ্বরচিন্তা ও শাস্ত্রাধ্যয়নাদিতে মগ্ন থাকেন—তখন তিনি আমির, অর্থাৎ সম্রাট। পাঞ্জাবের উত্তরে 'কুলু' নামক একটি স্থান আছে। স্থানটির জলবায়ু উত্তম এবং ভিক্ষা সুলভ বলিয়া বহু সাধু তথায় যাইয়া তপস্যা করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দজী গুরুভ্রাতার সহিত কিছুদিন কুলুতে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অসাধারণ তপস্যা ও বিবেক-বৈরাগ্য দর্শনে কুলুবাসীরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

১৯১৭ খ্রিঃ স্বামী তুরীয়ানন্দজী কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শুভাগমন করেন। তিনি আসিয়া স্বীয় গুরুভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দজীকে পাদস্পর্শ-পূর্বক প্রণাম করিলেন। স্বামী প্রেমানন্দজীও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তখন স্বামী তুরীয়ানন্দজী বলিলেন, "নিরভিমানত্বে আপনাকে অতিক্রম করিবার সাধ্য কি আমার আছে?" ইহা বলিয়া তিনি পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) কাশী সেবাশ্রমে কিছুদিন বাস করেন। তাঁহার পায়ে বাত ছিল। শীতকালে ঘরের মধ্যে খালি পায়ে চলিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া বাত বাড়িত। স্বামী শুভানন্দজী বাবুরাম মহারাজকে (স্বামী প্রেমানন্দজীকে) একজোড়া লাল রঙের ক্যাম্বিশ জুতা দিয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজ ঐ জুতাজোড়া হরি

মহারাজকে দিয়া বলিলেন, "আমার তো দরকার হয় না। আপনি এটি ব্যবহার করুন।" হরি মহারাজ জুতাজোড়া মাথায় রাখিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিলেন। এমনি ছিল তাঁহার গুরুভ্রাতৃ-ভক্তি!*

হরি মহারাজ মাঝে মাঝে উপদেশপ্রদ সুন্দর সুন্দর গল্প বলিতেন। এখানে তৎকথিত কয়েকটি গল্প প্রদত্ত হইল ঃ এক স্থানে দুইজন সাধু বাস করিতেন। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। জনৈক শেঠজী একবার তথায় আসিয়া একজন সাধুর নিকট অপর সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি বলিলেন, "ও তো গৌ হ্যায়।" শেঠজী অপর সাধুর কাছে অন্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন, "ও তো ভয়িস হ্যায়।" সাধুদের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব দেখিয়া তিনি মর্মাহত হন। তিনি একবার বহু সাধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। অন্যান্য সাধুর সঙ্গে উপরিউক্ত সাধুদ্বয়ও আসিলেন। শেঠজী সকল সাধুর জন্য উত্তম আহার্য পরিবেশন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দুইজনের জন্য খড়-বিচালি দিলেন। সাধুদ্বয় তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "কেন আপনারা পরস্পরকে গৌ বা ভয়িস বলেছেন?" বহু সাধুর সমক্ষে সেই সাধুদ্বয়ের উত্তম শিক্ষা হইল।

আর একটি গল্প এই ঃ এক স্থানে একজন সাধু বাস করিতেন। স্থানীয় জনৈক শেঠজী স্বপ্নে আদেশ পাইলেন—"এঁকে ডাল-রুটি দাও।" শেঠজী সাধুকে নিত্য ডাল-রুটি জোগাইতেন। সাধু পূর্বাশ্রমে কৃষক ছিলেন এবং খুরপি দিয়া বাগানে ও মাঠে কাজ করিতেন। সাধু তথায় অনেক দিন থাকার পর একজন বিদ্বান সাধু আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। শেঠজী স্বপ্নে আদেশ পাইলেন, "এঁকে পরটা, হালুয়া, রাবড়ি প্রভৃতি ভাল ভাল খাবার দিও।" শেঠজী স্বপ্নাদেশানুযায়ী কার্য করিলেন। প্রথম সাধু কৌতূহলী হইয়া একদিন নবাগত সাধুর আহার দেখিলেন। নবাগত সাধুকে উত্তম আহার দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শেঠজী কহিলেন, "আমি যেমন স্বপ্নে আদিষ্ট হয়েছি, তেমনি করেছি।" প্রাচীন সাধু উত্তর-শ্রবণে বিরক্ত হইলেন। আর একদিন শেঠজী স্বপ্নে

* কয়েকটি ঘটনা স্বামী বাসুদেবানন্দজী-কথিত।

শুনিলেন, "সাধু যদি ডাল-রুটিতে সন্তুষ্ট না হন তাঁহাকে খুরপি নিতে বল।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেঠজী স্বপ্নাদেশটি সাধুকে জানাইলেন। গল্পের মর্মার্থ এই যে—বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই শ্রেয়। যে বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট না হয় সে কষ্টকর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাক।

স্বামী তুরীয়ানন্দজী তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে একবার দীর্ঘ ছয় বৎসর তীর্থভ্রমণ ও তপস্যা করিয়াছিলেন। এই সময় একবার তাঁহারা পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত একটি শিব-মন্দিরে অবস্থান করেন। পাহাড়ের চারিদিকের গ্রামে বৃষ্টির অভাবে খুব জলকষ্ট হইয়াছিল। ঐ সব দেশে অনাবৃষ্টি হইলে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একটা দিন ঠিক করিয়া ঘটি দ্বারা কুণ্ড হইতে জল তুলিয়া শিবের মাথায় ঢালিত। কুণ্ডটি পাহাড়ের প্রায় পাদদেশে। উহার জল খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল। সেই জলই ঘটি ঘটি আনিয়া গ্রামের ছোট বড় সব ছেলেমেয়েরা শিবের মাথায় একদিন ঢালিতে লাগিল। "বাবা বর্ষাও," "বাবা বর্ষাও," বলিয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের সকলে ভোর রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া শিবের মাথায় জল ঢালিতে লাগিল। স্বামী তুরীয়ানন্দজী তাঁহার গুরুভ্রাতা সমভিব্যাহারে মন্দিরের একপাশে বসিয়া জপ করিতে করিতে বৃষ্টির জন্য মহাদেবকে প্রার্থনা জানাইলেন। গ্রামবাসীদের শিব-ভক্তি দর্শনে তাঁহারা প্রীত হইলেন। এত নরনারীর আকুল নিবেদন এবং ঈশ্বরদ্রষ্টা সন্ন্যাসিযুগলের প্রার্থনায় আশুতোষ অচিরে তুষ্ট হইলেন। সে দিনটি বেশ রৌদ্রদীপ্ত এবং আকাশ মেঘমুক্ত ছিল। বৃষ্টি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বিকালে হঠাৎ আকাশের এক কোণে কালো মেঘ করিয়া খুব বৃষ্টি হইল। সকলে ভিজিতে ভিজিতে পরমানন্দে বাড়ি ফিরিয়া গেল। তাহা দেখিয়া স্বামীজীদ্বয়ের আনন্দের সীমা রহিল না। সরল বিশ্বাসে অসম্ভব সম্ভব হয়।

একবার স্বামী তুরীয়ানন্দজী তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দজী-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণের সহিত কিছুকাল পুরীতে শশী নিকেতনে অবস্থান করিতেছিলেন। কলকাতা হইতে রেলওয়ে পার্সেলে পাকা আম আসিয়াছে। পার্সেলটি স্টেশনে পড়িয়া আছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী স্বামী প্রভবানন্দকে পার্সেলটি আনিতে

পাঠাইলেন। স্বামী প্রভবানন্দের ফিরিতে দেরি হইতেছিল। এগারটা বাজিয়া গেল। সকলে অপেক্ষা করিতেছেন, পার্সেল আসিলেই খাইতে বসিবেন এবং আম খাইবেন। আসন করা হইয়াছে। এমন সময় স্বামী প্রভবানন্দ শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'পার্সেল ক্লার্ক বলিলেন—আমি তো ঐ দিকেই যাবো। পার্সেলটি নিয়ে যাবো। আপনি চলে যান।' তাঁহার কথা শুনিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দজী স্বামী প্রভবানন্দকে খুব বকুনি দিলেন। হরি মহারাজ খাইবার পরে তাঁহাকে বলিলেন, 'দেখ শিষ্য তিন প্রকার। যারা গুরুর অব্যক্ত মনোভাব বুঝতে পেরে তা পূর্ণ করে, তারা উত্তম শিষ্য। যারা গুরুর ব্যক্ত আদেশ পালন করে, তারা মধ্যম শিষ্য। আর যারা গুরুর ব্যক্ত ইচ্ছাটিও কার্যে পরিণত করতে পারে না, তারা অধম শিষ্য।'

স্বামী তুরীয়ানন্দজী বৃন্দাবনে তপস্যাকালে কুসুম সরোবরের কাছে থাকিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। উভয়েই কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইতেন। শেষরাত্রি হইতে উভয়ে জপধ্যানাদিতে বসিতেন। একদিন রাখাল মহারাজের শরীর ভাল না থাকায় ভোরবেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া একটি বৈষ্ণব প্রেত আসিয়া তাঁহাকে তুলিয়াছিল। রাখাল মহারাজ তৎক্ষণাৎ হরি মহারাজকে এই অদ্ভুত ঘটনাটি বলিলেন। হরি মহারাজ তাহা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। ইহার পূর্বে স্বামী তুরীয়ানন্দজী বৃন্দাবনে একাকী তপস্যা করিয়াছিলেন। তখন তীব্র শীতকাল। তাঁর গায়ে সুতার কাপড় ও সুতার চাদর ব্যতীত কোন গরম জামা বা চাদর ছিল না। কিন্তু তাঁহার সেদিকে ভ্রুক্ষেপই ছিল না। সেই জন্য রাত্রে শীতে ভাল ঘুম হইত না; রাত ২।৩টার সময় ঘুম ভাঙিয়া যাইত। তখন উঠিয়া তিনি পাতকুয়ার জল তুলিয়া স্নান সারিতেন। পাতকুয়ার জল রাত্রে একটু গরম থাকে, তাই বেশ আরাম হইত। তার পরেই ধ্যানে বসিতেন। ধ্যান জমিলে ঘাম বাহির হইত। শীতের প্রকোপে তাঁহার শরীরের স্থানে স্থানে এবং হাত পা ফাটিয়া রক্ত পড়িত। যেমন কঠোরতা তেমনি তপস্যা! একদিন এক বৃদ্ধ সাধু শুইবার সময় একখানি কম্বল আনিয়া তাঁহার গায়ে দিয়া বলিলেন, "স্বামীজী আপনাকে দয়া করে এই কম্বলটি রাত্রে

গায়ে দিতেই হবে। নচেৎ আপনার অসুখ হতে পারে। আমার আরও ২।৩টা কম্বল আছে। এখানি কাজে লাগে না।" বৃদ্ধ সাধুর আন্তরিকতা ও প্রীতি দেখিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দজী বেশি কিছু বলিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রথমে তিনি "আমার প্রয়োজন নেই" বলিয়া আপত্তি করিলেন। পরে কম্বলটি তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং ইহাতে শীতের রাত্রে আরাম পাইতেন। বৃদ্ধ সাধু খুব ত্যাগী ও প্রেমিক ছিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দজী গুরুদাস মহারাজকে আমেরিকাতে বলিয়াছিলেন, "ধর্মজীবন কখনও নিরাপদ মনে করো না। যতদিন দেহ থাকবে, ততদিন প্রলোভন আসবেই।" তারপর এই গল্পটি* বলিলেন ঃ জনৈক প্রাচীন সাধু গ্রামের ধারে এক জঙ্গলে বাস করিতেন। তিনি ধ্যানজপ শাস্ত্রপাঠেই সময় কাটাইতেন। স্বীয় কুটির ছাড়িয়া বেশি দূরে যাইতেন না। কম লোকেই তাঁহার কুটিরে আসিত। গ্রামবাসীরা তাঁহার কাছে ধর্মোপদেশ লইতে আসিয়া সাধুকে যে ডালচাল শাকসবজি দিত, তাহাতেই তাঁহার আহার চলিত। তিনি গভীর জঙ্গলে থাকায় কোন স্ত্রীলোক ঐদিকে আসিত না। এই জন্য ত্রিশ বৎসর যাবৎ কোন নারী তাঁহার নয়নপথে পতিত হয় নাই। একদিন হঠাৎ নারীহস্তস্থিত কঙ্কণাদির মধুর ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি অজ্ঞাতসারে উঠিয়া নারীমুখ-দর্শনে চলিলেন। তিনি কি করিতে যাইতেছেন তাহা ভাবিবার সময় তাঁহার রইল না ঃ লোহা যেমন চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় তিনি তদ্রূপ নারী-কর্তৃক আকৃষ্ট হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই তাঁহার চমক ভাঙিল, বিবেক জাগিল। তিনি ভাবিলেন, "আমি কি করিতে যাইতেছি? ত্রিশ বৎসর যাহা দেখি নাই তাহা দ্বারাই এই বৃদ্ধ বয়সে প্রলুব্ধ হইলাম?" 'রে পদযুগল, তোমাদের শাস্তি দিব। তোমরা এই দেহ কোথাও বহন করিতে পারিবে না'— এই বলিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন। তিনি যে কয় বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, সেই স্থানেই ছিলেন, একপাও অন্যত্র যান নাই। সাধনার পথে যেমন দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় আছে, তেমনি অদম্য অধ্যবসায় ও ইচ্ছাশক্তি চাই।

---

* "With the Swamis in America" পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৯১৭ খ্রিঃ স্বামী তুরীয়ানন্দজী আলমোড়া হইতে কাশী সেবাশ্রমে আগমন করেন। কাশীর নৃপেন্দ্র ডাক্তারের ভ্রাতা হরি মহারাজের বন্ধু ছিলেন এবং স্বামীজীকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি হরি মহারাজকে বলিলেন, "দেখ, প্রজ্ঞানন্দ (মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী) বলছিল, তুমি যদি অমুককে একটু বলে দাও, মায়াবতী আশ্রমের জন্য কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে। আমারও মনে হয়, তুমি তাঁকে একটু বল, তাহলে ভাল হয়।" স্বামী তুরীয়ানন্দজী বলিলেন, "তুমি সে কি বলছো? আমি জীবনে কারো কাছে একটি পয়সা চাইনি আজ পর্যন্ত! আর প্রজ্ঞানন্দের কথায় মায়াবতীর জন্য টাকা চাইব? তা কি কখনও হয়? আমি জীবনে একবার মাত্র পয়সা চেয়েছিলুম বাধ্য হয়ে, তাও রাখাল মহারাজের কথায় এবং তাঁরই জন্য। আমি ও রাখাল মহারাজ এক সময় ছয় বৎসর একসঙ্গে তপস্যা ও তীর্থভ্রমণ করেছিলাম। তখন একস্থানে জনৈক ভক্ত ব্যবসায়ী আমাদিগকে তৃতীয় শ্রেণির রেলভাড়া দিয়েছিল। রাখাল মহারাজ প্রথমে কিছু বলেননি। পরে আমাকে হঠাৎ বললেন, 'হরি মহারাজ, আপনি গিয়ে ইন্টার ক্লাসের ভাড়া চেয়ে আনুন। থার্ড ক্লাসে বড় ভিড়, কষ্ট হবে। সে খুব ভক্ত লোক, এক কথাতেই দেবে।' আমি বললাম, 'হাঁ, তাই যাচ্ছি।' ভক্তটি তৎক্ষণাৎ বাকি পয়সা দিলে এবং পূর্বে থার্ড ক্লাসের ভাড়া দেবার জন্য ক্ষমা চাইলে। আমার জীবনে এই একবার মাত্র পয়সা চাওয়া হয়েছিল। আর কখনও কাহারও নিকট পয়সা চাইনি। না চাইলেও দেখেছি, পয়সা এসে যায়, অভাব পূর্ণ হয়। সাধুর পয়সা চাওয়া উচিত নয়। প্রজ্ঞানকে বলো, আমার দ্বারা টাকা-পয়সা চাওয়া হবে না।" ভদ্রলোকটি অনেক যুক্তি দিয়া তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু হরি মহারাজ তাঁহার কোন কথাই শুনিলেন না।

সৎ চিন্তা ও সৎ কার্য সাধুর সনাতন স্বভাব—এই ভাবটি বুঝাইবার জন্য হরি মহারাজ এই গল্পটি প্রায়ই বলিতেন ঃ এক সাধু কোন নদীতে স্নান করিতেছিলেন। এমন সময় একটি বৃশ্চিক নদীর জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। সাধু বৃশ্চিকটিকে জলমগ্ন দেখিয়া সদয় হইয়া উহাকে নদীতীরে তুলিয়া

রাখিলেন! তুলিবার সময় বৃশ্চিকটি সাধুর হাতে দংশন করিল। কিছুক্ষণ পরে বৃশ্চিকটি তরঙ্গাঘাতে পুনরায় জলে পড়িয়া গেল। সাধু আবার উহাকে তীরে নিক্ষেপ করিলেন। এবারও বৃশ্চিক তাঁহার অঙ্গুলিতে দংশন করিল। সাধু তিনবার বৃশ্চিকের প্রাণরক্ষা করিলেন, আর তিনবারই তিনি দষ্ট হইলেন। পার্শ্ববর্তী কোন ব্যক্তি সাধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বারবার বৃশ্চিক-দংশনে জর্জরিত হইয়াও উহার প্রাণরক্ষার কাজ হইতে বিরত হইতেছেন না কেন?" সাধু বলিলেন, "প্রাণীর প্রাণরক্ষা করা আমার ধর্ম। দংশন করা বৃশ্চিকের স্বভাব। সাধু দুর্বাক্য শুনিয়া বা দুর্ব্যবহার পাইয়াও স্বীয় স্বভাব হইতে কদাপি বিচ্যুত হইবেন না।" সাধুর সৎ স্বভাবের প্রশংসা করিবার জন্য হরি মহারাজ এই গল্পটি বলিতে ভালবাসিতেন।

১৯২০।২১ সালে হরি মহারাজ যখন কাশী সেবাশ্রমে ছিলেন, তখন জনৈক সাধু পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে তাঁহার তপস্যা ও অনুভূতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। হঠাৎ একদিন তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "কি আর করেছি বা হয়েছে? একবার ইচ্ছা হলো ঘুমটা কমানো যাক এবং সর্বদা ঈশ্বরের অনুধ্যান করি। দিনে আদৌ ঘুমাতাম না; ঘুম আমার এমনি কম ছিল। রাত্রে ঘুম কমাতে লাগলাম। ঘুম কমাতে কমাতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক দেড় ঘণ্টার বেশি ঘুম হতো না। কিছুদিন পরে দেখি, ঘুমের তত প্রয়োজন আর হচ্ছে না, ধ্যান খুব গভীর ও দীর্ঘ হচ্ছে এবং শরীর-মনের বিশ্রাম ধ্যানেই পাওয়া যাচ্ছে। তখন ধ্যান strain (জোর) করে করতে হতো না, আপনা আপনি ধ্যান হতো। তাতে শরীরেও rest (বিশ্রাম) হয়ে যেত। শেষে রাত্রে ঘুম আদৌ হতো না, আমিও চেষ্টা করতুম না। দীর্ঘ সময়ব্যাপী গভীর ধ্যান হতে লাগলো। দিবারাত্রি আদৌ ঘুম নেই, তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানচিন্তার স্রোত চলতো। শরীরেরও ক্লান্তি নেই। প্রথম দুই তিন দিন বেশ চললো। এইরূপে সাত দিন কাটল। সাত আট দিন পরে ভাবনা হলো, ঘুমটা কমাতে গিয়ে ঘুম একেবারেই চলে গেল। তখন স্বামীজীর কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর ভাল ঘুম হতো না, অতি কষ্টে অল্পস্বল্প হতো। সেইজন্য তাঁর খুব strain (ক্লান্তি) হতো এবং শরীর ভেঙে গিছলো।

গভীর রাত্রে একদিন মনে হলো, ঘুমটা একেবারে যাওয়া ভাল নয়, চেষ্টা করে ঘুমুতে হবে। চোখ বুজে ঘণ্টাখানেক শুয়ে রইলুম; কিন্তু ঘুম এলো না, তবে একটু rest (বিশ্রাম) হলো। দু-তিন দিন এইরূপ চেষ্টা করতে করতে অল্প তন্দ্রা আসতে লাগলো। পরদিন একটু ঘুমও এলো এবং দেহের আরও বিশ্রাম হলো। ঘুম চেষ্টা করে বাড়াতে বাড়াতে পূর্বাভ্যাস ফিরে এলো। সেই সময় ধ্যেয় বস্তুতে মনকে সম্পূর্ণ বিলীন করতে চেষ্টা করতাম এবং তার ফলে সমাধির মতো অবস্থা লাভ হয়েছিল। ধ্যানকালে তখন ধ্যেয় ও ধ্যাতার মধ্যে কাচ-ব্যবধান মাত্র থাকতো। সামান্য ব্যবধানের জন্য তাঁকে ধরা যেত না। ঠাকুর যাকে নির্বিকল্প সমাধি বলতেন তাতে কাচ-ব্যবধানও থাকে না, ধ্যেও ও ধ্যাতা একীভূত হন। একবার সেই সময় সে অবস্থাও হয়েছিল। ঠাকুর আমাকে "উঁচু শক্তির ঘর" বলতেন। জীবনে যখন যা ধরেছি তা শেষ পর্যন্ত দেখেছি। কোন বিষয় একটু একটু বা আস্তে আস্তে করতে পারতুম না। খুব পুরুষকার ছিল, সর্বদা sure success (নিশ্চয় সাফল্য) দেখতে পেতাম। চেষ্টা করে কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হইনি।"

তপস্যাকালে স্বামী তুরীয়ানন্দজী অতিশয় কঠোরী ছিলেন; মাধুকরী বা ছত্রে প্রাপ্ত ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। যত্র তত্র শয়ন এবং সামান্য পরিধানেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। সংযম ছিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। কেহ তপস্যা করিতে যাইতে চাহিলে তিনি এই গল্পটি বলিতেন ঃ "রামচন্দ্র যখন বনবাসে ছিলেন তখন একস্থানে গিয়ে থাকবার ইচ্ছা করলেন। স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অনুমতির জন্য তিনি লক্ষ্মণকে পাঠালেন। লক্ষ্মণ অদূরবর্তী এক শিবমন্দিরে প্রবেশ করে দেখেন, একটি বালক স্বীয় লিঙ্গটি ধরে জিভটি কামড়ে নাচছে। তিনি এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বিরক্ত হয়ে এলেন রামচন্দ্রের কাছে। দৃশ্যটির বর্ণনা করলেন। রাম বললেন, 'ভাই লক্ষ্মণ, তুমি ঠিক দেখেছ। জিহ্বা ও উপস্থ সংযত করে পৃথিবীর যে কোন স্থানে থাকতে পার।' তপস্যারত সাধুকে হরি মহারাজ জিহ্বা-সংযম ও কামজয় করিতে উপদেশ দিতেন। এই দুইটিতে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। সংযম-প্রসঙ্গে তিনি এই শ্লোকটি বলিতেন ঃ

পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থনিমিত্তকম্।
জিহ্বোপস্থপরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিং প্রয়োজনম্ ॥

পৃথিবীর সকল প্রাণী কাম ও জিহ্বার বশীভূত। কামজয় ও জিহ্বা-সংযম করিলে পৃথিবী বিজিত হয়।

১৯২১ খ্রিঃ হরি মহারাজ যখন কাশী সেবাশ্রমে ছিলেন, তখন একদিন বিকালে এক্কা চড়িয়া সেবককে সঙ্গে লইয়া বেড়াইয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "রাখাল মহারাজ বলতেন, এক্কার ঝাঁকানিতে ঘুম হয়। মাঝে মাঝে এক্কা চড়া মন্দ নয়।" কিন্তু পরদিন বিকালে আর বেড়াইতে গেলেন না। তাঁহার বাম হাতের অঙ্গুলিতে একটা বেদনা হইল। ২।১ দিনের মধ্যে বেদনার স্থানে যন্ত্রণা হইতে লাগিল। এক্কা জোর করিয়া ধরার জন্য সম্ভবত ব্যথা হইয়াছিল। তাঁহার বহুমূত্র ছিল, তাই অঙ্গুলির ব্যথা ও ফোলা খুব বাড়িয়া গেল। ডাক্তার অমরবাবু অঙ্গুলিতে অস্ত্রোপচার করিলেন। তিনি রোজ আসিয়া অঙ্গুলিটি স্ক্রেপ ও ড্রেস করিতেন। খুব strict dietএ (কড়া পথ্য) তাঁহাকে রাখা হইল, কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলির ফোলা বা ব্যথা কমিল না। অমরবাবু একদিন অন্তর অঙ্গুলিটি স্ক্রেপ করিয়া খানিকটা মাংস কাটিয়া দিতেন ও বলিতেন, abnormal growth (অস্বাভাবিক মাংসবৃদ্ধি) হইয়াছে। স্ক্রেপ করা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ দেহজ্ঞানরহিত স্বামী তুরীয়ানন্দজী কোনদিন স্ক্রেপ করিবার সময় "আহা, উহু" করিতেন না, নির্বিকার থাকিতেন, যেন আর কাহারো হাতে অস্ত্রোপচার হইতেছে। রোজই মাংসবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং রোজই স্ক্রেপ করা হইত। রোজ তাঁহাকে অম্লানবদনে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে দেখিয়া হরি মহারাজের উক্ত অসুখের বিষয় ডাঃ সুরেশ ভট্টাচার্যকে জানাইবার জন্য সেবক কলকাতায় ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষের নিকট পত্র দিলেন। চিঠি পাইয়াই পরদিন দুর্গাপদবাবু ও সুরেশবাবু কাশী গেলেন। দুইজন ডাক্তারকে উপস্থিত দেখিয়া হরি মহারাজ বলিলেন, "দেখেছ, এঁদের কী ভালবাসা! একটু খবর পেয়েই সব কাজ ফেলে চলে এসেছেন। ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপা!"

হরি মহারাজ চিকিৎসকদ্বয়কে পান তামাক দিতে বলিলেন এবং তাঁহাদের

সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করিতে লাগিলেন। ঘণ্টাখানেক গল্প হইল, কিন্তু অসুখের কথা উঠিতেছে না দেখিয়া সেবক অধীর হইলেন। পরে ডাক্তারগণ অঙ্গুলির ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দেখিলেন এবং বলিলেন, এরূপ ঘা স্ক্রেপ করা অমানুষিক অত্যাচার। তালগাছের তাড়ি (yeast) দিয়া ব্যাণ্ডেজ করা হইল। সুরেশবাবু স্ত্রেপ করিতে নিষেধ করিলেন। চব্বিশ ঘণ্টা পরে খোলা হইল। তাঁহারা উহা খোস মনে করিয়া নিম ঘি দিয়া পুনরায় ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলেন। হরি মহারাজের অসাধারণ দেহবোধরাহিত্য দেখিয়া সুরেশবাবুর সেইবার খুব মানসিক পরিবর্তন হইল। তাঁহাকে চেয়ার দেওয়া সত্ত্বেও তিনি মেজের ওপর বসিলেন। মেজের ওপর কম্বল পাতিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু তিনি কম্বলে না বসিয়া মেজেতেই বসিয়া রহিলেন। তিনি বলিলেন, "ঐ ঘা স্ক্রেপ করাতে যে অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছে তা অন্য রোগী সহ্য করতে পারত না, মারা যেতো।"*

পরিব্রাজক-জীবনে স্বামী তুরীয়ানন্দজী উত্তর ভারতের তীব্র শীত বা গ্রীষ্ম উপেক্ষা করিতেন। একবার গ্রীষ্মকালে এলাহাবাদের নিকট কোন আম্রবনে অবস্থানকালে দ্বিপ্রহরে ভিক্ষাটনাদি সমাপনান্তে তিনি স্নান করিতে যান। সেদিন এত গরম ছিল যে, গায়ে ফোস্কা পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। ঐ সময় লু লাগিয়া কয়েকজন লোকের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। স্নানের জন্য গাত্রে জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার সেই মূর্ছা দুই দিন ও দুই রাত্রি স্থায়ী হয়। সংজ্ঞালাভের পর তিনি দেখেন যুক্তপ্রদেশবাসী কোন ভক্তের গৃহে আছেন।** তিনি ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন, তাই ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার জীবন রক্ষা করিলেন।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৫০ বর্ষ ৫ সংখ্যা)

---

* উপরোক্ত কয়েকটি ঘটনা স্বামী প্রবোধানন্দজী-বর্ণিত।

** 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (১৯২২, সেপ্টেম্বর সংখ্যায়) শ্রীম-লিখিত প্রবন্ধে উক্ত।

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়ন

সংগ্রাহক ঃ স্বামী ধীরেশানন্দ

১। স্বামী অনন্তানন্দের নিকট শ্রুত

মহীশূর, ২৫।৯।৪৭—বম্বেতে হরি মহারাজ ঠাকুরের গৃহিভক্ত কালীপদ ঘোষের বাড়িতে কয়েকদিন অতিথি হয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময় কালীপদ হরি মহারাজের সামনেই মদ খেতে শুরু করল। যত নেশা চড়ছে তত সে "জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ" বলতে লাগল। হরি মহারাজ বলতেন, "কালীপদকে দেখে ভাবলুম, এ রকম মদ খাওয়া সার্থক।"

হৃষীকেশে হরি মহারাজের সঙ্গে ছিলাম। তিনি ভোর চারটায় ধ্যানে বসতেন আর সকাল ৭।৮টা পর্যন্ত ধ্যান করতেন। তারপর একটু দুধ খেয়ে বেড়াতে যেতেন। সাধু মঙ্গলনাথ হরি মহারাজকে দেখলে নমস্কার করতেন। আমি যখন ঐ কথা তাঁকে বললাম, হরি মহারাজ বললেন, "আগে যখন হৃষীকেশে ছিলাম, তখন আমার জীবন দেখেছে, তাই শ্রদ্ধা জানায়।" অনেক যাত্রী বিভিন্ন সাধুর কাছে যায়, তাঁর কাছে আসে না বলাতে মহারাজ বললেন, "ওসব মুড়িমুড়কির খদ্দের। ওরা সব কামনা-বাসনা পূরণের জন্য সাধুদের কাছে আসে; কেউ সন্তান চায়, কেউ টাকাকড়ির জন্য আশীর্বাদ চায়। ইচ্ছা হলে এখানে ভিড় লাগিয়ে দিতে পারি।"

কেউ বলেছিল, "ঠাকুর বলেছেন যে ছেঁড়া কাপড় পরা লক্ষ্মীছাড়ার চিহ্ন।" শুনে হরি মহারাজ তেজের সঙ্গে বললেন, "কিসব বাজে কথা বলছ? ঠাকুর ওসব কথা গৃহস্থদের বলেছেন। গৃহস্থদের ছেঁড়া কাপড় পরা লক্ষ্মীছাড়ার চিহ্ন। সাধুর তো উহা ভূষণ। ত্যাগই সাধুর ভূষণ—অলঙ্কার।"

ব্রহ্মচারী রাম মহারাজ একবার কেদারবদ্রীতে যাচ্ছিলেন। পথে তিনি অসুস্থ

হয়ে পড়েন। তিনি সঙ্গীদের এগিয়ে যেতে বলেন কারণ তারা তাঁর জন্য আটকে থাকবে কেন? হঠাৎ রাম মহারাজের একটা revelation হলো—তিনি অনুভব করলেন যে "সবই তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে।" পরে হরি মহারাজ শুনে বলেছিলেন, "এইটা ধরে থাক।" সেই থেকে রাম মহারাজ সারাজীবন "রামের ইচ্ছা, রামের ইচ্ছা" অভ্যাস করেছেন।

হরি মহারাজ বলতেন ঃ "স্বামীজীর ভিতর কোন jealousy (ঈর্ষা) ছিল না। তিনি এত বড় ছিলেন যে, কিসের জন্য তিনি jealous হবেন?"

২। স্বামী ভবেশানন্দের নিকট শ্রুত

৮।১।১৯৪৮—আমি ছিলাম হরি মহারাজের সেবক। একদিন কাশীতে পাশের ঘরে ব্যাণ্ডেজ গুটাবার সময় ভাবছি হৃষীকেশে তপস্যায় যাব। হরি মহারাজ ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠলেন, "গেলেই পার। আমি কাকেও চাই না। কোন সেবকের দরকার নেই। এক মিনিটের মধ্যে মনের কথা জেনে ধমক দিলেন। আর একদিন তাঁকে তেল মাখাচ্ছি এবং একটা বাজে চিন্তা মনে উঠেছে। অমনি ধমকে উঠলেন, "মন কি চঞ্চল! এক মিনিট স্থির থাকে না। এ রকম মনে কি কাজ হয়? একটা কাজ মন দিয়ে করতে পারে না।" আমি বুঝলাম এসব কথা আমাকেই বলা হচ্ছে।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে হরি মহারাজ আমাকে বললেন, "এখানে ছেলেরা থাকে। আমাকে কত দেখতে হয়। সাধু সন্ধ্যার পর আসন ছেড়ে বাইরে থাকবে কেন?" এই জন্য হরি মহারাজের তাড়া খেয়ে এক ব্রহ্মচারী পালিয়ে গেল।

শরৎ মহারাজ হরি মহারাজকে বলেছিলেন, "হরি ভাই, তুমি কাশীতে আছ, তাই আমাদের পশ্চিম দিকটা আর দেখতে হয় না।" রাজা মহারাজের দেহত্যাগের খবরে হরি মহারাজ বললেন, "আমিও যাচ্ছি। আর তিন মাস।" ঠিক তিন মাস পরে দেহত্যাগ।

আলমোড়ার এক বৃদ্ধ বাইরের সাধু আমাদের বলেছিলেন ঃ "হরি মহারাজের সঙ্গে কর্ণবাসে তপস্যা করতুম। কী বৈরাগ্য! কৌপীন পরে

থাকতেন। এক বুক জল ভেঙে নদী পেরিয়ে এক মাইল দূরে এক গ্রামে ভিক্ষায় যেতেন। কৌপীন ছিঁড়ে গেছে। কারো কাছে চাইলেন না। রাস্তা দিয়ে চলতে নদীর ধারে এক শ্মশানে এক মৃত ব্যক্তির কাপড় দেখতে পেলেন। তাই ছিঁড়ে কৌপীন করতে গেলেন, কারণ এতে আর কারুর কাছে চাইতে হবে না। আমি বাধা দেওয়ায় বললেন, 'কেন, দোষ কি? গঙ্গাজলে ধুয়ে নিলেই তো হলো।' তাই করলেন। ঐ কাপড় গঙ্গাজলে ধুয়ে কৌপীন করলেন। তাঁকে ঐরূপ করতে দেখে আমিও ঐরূপ করলুম। এসবই কিন্তু তাঁর আমেরিকা থেকে ফেরার পর। কী বৈরাগ্য!"

৩। স্বামী যতীশ্বরানন্দের নিকট শ্রুত

১০।১১।১৯৫০—পুরীতে জগদ্ধাত্রী পূজা। আমি পূজক, হরি মহারাজ তন্ত্রধারক এবং নীরদ মহারাজ সহকারী তন্ত্রধারক। দীর্ঘ পূজাকালে ন্যাস ও মুদ্রাদি ভাল লাগছিল না, ধ্যান করতে আনন্দ হচ্ছিল। রাজা মহারাজও সেখানে বসেছিলেন। হরি মহারাজ ঃ "আচ্ছা, এবার ধ্যান হয়েছে, এখন পূজা কর।" আবার যখন একটু দীর্ঘ ধ্যান করছি, হরি মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, ধ্যান হয়েছে; এখন পূজা কর। তোমার ধ্যানের জন্য তুমি লোককে বসিয়ে রাখতে পার না।"

পূজার পর হরি মহারাজ আমাকে বলেছিলেন ঃ "তোমার ধ্যান করতে ভাল লাগছিল জেনেও আমি তোমাকে ওরূপ বলেছি, কারণ পূজা শেষ হতে দেরি হলে কত লোকের অসুবিধা হবে। প্রসাদ পেতে দেরি হবে। আমাদের কি জানো? যখন ইচ্ছা মনের কপাট বন্ধ করে দিয়ে ধ্যান, আবার যখন ইচ্ছা মনের কপাট খুলে দিই।"

৪। স্বামী নির্বেদানন্দের নিকট শ্রুত

হরি মহারাজ তখন কাশীতে আছেন। কেউ এসে তাঁকে বললেন, "বেলুড় মঠের পণ্ডিতমশাই বলেছেন যে, স্বামীজী সাধুদের জন্য যে কর্মধারা প্রবর্তন করেছেন, শাস্ত্রে উহার সমর্থন নেই।"

হরি মহারাজ (তর্জনী উঠিয়ে) বললেন ঃ "মঠের পণ্ডিতমশাইকে বলবে যে, যেদিন থেকে স্বামীজী ওকথা বলেছেন সেদিন থেকে নূতন শাস্ত্র তৈরি হয়েছে।"

"স্বামীজী একবার আমাদের বললেন, 'তোমরা আগে আমাকে বোঝো, তারপর তাঁকে (ঠাকুরকে) বোঝবার চেষ্টা করবে।' তখন জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করলেন, 'কেন মশায়, স্বামীজীকে না বুঝলে কি ঠাকুরকে বোঝা যায় না?' এর উত্তরে হরি মহারাজ বললেন ঃ 'দেখ, স্বামীজী আর কিছু না হলেও একটা Perfect Man (সম্পূর্ণ মানব) ছিলেন। এরূপ সম্পূর্ণ মানবের ধারণাই যদি না করা যায় তবে ভগবানের ধারণা করা কি সম্ভব? তাই স্বামীজী বলেছেন—আগে আমাকে বোঝ, পরে ঠাকুরকে বুঝবে।' "

৫। স্বামী অনুভবানন্দের নিকট শ্রুত

তখন গরমকাল। বেলুড় মঠে রোজ বৈকালে ঠাকুরকে নানাপ্রকার ভাল ভাল সরবত নিবেদন করা হতো। হরি মহারাজ তখন মঠে ছিলেন। তাঁকে প্রসাদ দেবার জন্য আমি এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবত তাঁর হাতে দিলাম। তিনি সাগ্রহে নিয়ে এক চুমুক খেয়ে বললেন, "বাঃ।" আর খেলেন না। গ্লাসটি ফিরিয়ে দিলেন। কেন খেলেন না—জিজ্ঞাসা করাতে হরি মহারাজ বললেন, "জিহ্বার লোলুপতা হয়েছিল। লোভ হয়েছিল। তাই আর খেলুম না। জিহ্বাকে আশকারা দিতে নেই।"

৬। স্বামী আত্মবোধানন্দের নিকট শ্রুত

হরি মহারাজ দেহত্যাগকালে বলেছিলেন, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য।" তিনি ঠিকই বলেছিলেন—লীলাও সত্য। তিনি অত বড় জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু অদ্বৈত আশ্রমে ধ্রুব চরিত্র ব্যাখ্যা শুনে হরি মহারাজের চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। ঠাকুরের সন্তানদের জীবন অপূর্ব ভাবময় ছিল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হরিনাথ তাঁর জন্মস্থান বোসপাড়ার সকলেরই প্রিয়। প্রভুর কৃপালাভের পর প্রায়শই দক্ষিণেশ্বর যাইতেন, তবে সাধনপর্যায় শাস্ত্রসহ মিলাইবার ইচ্ছায় কিছুদিন যাইতে পারেন নাই। আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনে ঠাকুর অনেক সময় ভক্তদের অনুসন্ধান লইতেন, তাই বাগবাজার হইতে কোন ভক্ত উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করেন—সেই যে ঝাঁকড়া চুল বলিষ্ঠ যুবাটি আসত, তার খবর জানো?

ভগবান যখন ব্যাকুল, ভক্ত কি আর উপেক্ষা করিতে পারে? একদিন উপস্থিত হইলে প্রভু কহেন, এত ঘন ঘন আসতে, তারপর একেবারে চুপ? লজ্জাবনত দর্শনে কহেন, লোকে মদ খায়, রাঁড় করে, টাকা করে, তুমি না হয় শাস্ত্র করেছ, তাতে লজ্জা কি? তখন ভাবাবেশে গীত করেন, "ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব, ধরা না দিলে পার কি ধরতে।" প্রভুর ভাবদর্শন এবং অভয়বাণী শ্রবণে আত্মসমর্পণচ্ছলে হরিনাথ শ্রীপদে পতিত হন।

বড়ই মেধাবী, গীতা উপনিষদাদি কণ্ঠস্থ, বলিতেন, পুঁথিগত বিদ্যা কার্যকরী নয়। আত্মপ্রসাদলাভে শাস্ত্র প্রসন্নতা হয় বলিয়াই ধর্মের জটিল তত্ত্বগুলি সহজভাবে সমাধান করিতেন। শাস্ত্রে বিশারদ এবং সাধনায় সমুন্নত হইলেও সেবাধিকার সৌভাগ্য ঘটে নাই, যেহেতু, ঠাকুরের অসুস্থাবস্থায় কোন দিনও সেবা করিতে দেখি নাই। প্রভু গান করিতেন—"আমি মুক্তি দিতে কাতর নই রে, শুদ্ধা-ভক্তি দিতে কাতর হই। আমার ভক্তি যেবা পায়, সে যে সেবা পায়, সে যে ত্রিলোকজয়ী।" ইহাতে ধারণা, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সেবকই শ্রেষ্ঠ। সন্ন্যাসগ্রহণে তুরীয়ানন্দ নাম হইলেও আমরা হরিবাবু বলিলে কহেন, প্রভুর কৃপায় সব ছেড়ে তোমাদের দাস হয়েছি, তবুও হরিবাবু!

জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা লইয়াই মানবের জীবন; কিন্তু ইহার পর এমন এক দিব্য ভাব আছে, যথায় আমি তুমি ও দ্বন্দ্বভাবের অবসানে নির্বাপিত দীপশিখার ন্যায় চিত্তে যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দোদয় হয়, তাহাকেই তুরীয়াবস্থা কহে। কাঞ্চনসেবী মার্কিনরা যাহাতে এই দিব্যভাবের আভাস পায়, এই উদ্দেশ্যে স্বামীজী তাঁহাকে আমেরিকায় লইয়া যান এবং বলা বাহুল্য হরিভাই ইহাতে কৃতকার্য হইয়া মঠে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মায়াক্ষেত্রে কঠোর তপস্যায় তুরীয়ভাব উপভোগে নামের সার্থকতা [প্রমাণ] করেন।

ঠাকুর বলিতেন, "ভগবদ্‌ভজনে মন তো আনন্দ পায়, কিন্তু শরীর যে টেক্স আদায় করে কি না, কঠোরতায় অবসন্ন হয়।" তাই স্বাস্থ্যভঙ্গে মহারাজের আবাহনে পুরীতে যান; কিন্তু স্বভাব তো ঘুচে না, সুস্থ হইলে পূর্ববৎ আচরণ অর্থাৎ উগ্র তপস্যা। কুক্ষণে সমুদ্রস্নানে কর্ণে লবণাম্বু প্রবিষ্ট হইলে, এমন বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, অঙ্গচালনেও অসমর্থ। অস্ত্রোপচার জন্য ক্লোরোফর্ম করিতে চাহিলে কহেন, প্রভুর কৃপায় যখন চৈতন্যলাভ হয়েছে, আর কেন অচৈতন্য করিবেন? আমি ভগবানের নাম করিতে থাকি, আপনি অস্ত্রোপচার করুন। ডাক্তার সাহেব বলেন—ভগবানের গুণগানে দেহকে উপেক্ষা, জীবনে এই প্রথম দেখিলাম। কলকাতায়ও ঐরূপ ঘটনায় ডাক্তারবাবু অতীব আশ্চর্য হন।

পরিশেষে বিশ্বনাথ ধামে বিশ্বনাথ ধ্যানে তুরীয়াবস্থায় বিলীন হইলে, প্রাক্তন দেহ কাষ্ঠপুত্তলি[র] মতো পড়িয়া রহিল।

(উৎস ঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত)

স্বামী তুরীয়ানন্দের কথাসংগ্রহ

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব

॥ এক ॥

কাশীধামে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে অম্বিকাধামে স্বামী তুরীয়ানন্দ রহিয়াছেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ অক্টোবর বৈকাল তিনটা। কেদারবাবা (স্বামী অচলানন্দ), ব্রহ্মচারী সনৎকুমার (পরে স্বামী প্রবোধানন্দ), কতিপয় ব্রহ্মচারী, শ্রীচন্দ্রকান্ত ঘোষ এবং ঢাকার এক ভক্ত শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত। মধ্যাহ্নের বিশ্রামান্তে স্বামী তুরীয়ানন্দ বারান্দায় আরাম চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় বিরাজমান। তাঁহার সেবক ব্রহ্মচারী সনৎকুমার ক্ষুদ্র টানা-পাখা টানিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন। বহু বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া পূজ্যপাদ তুরীয়ানন্দজীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তৎসহ বহুমূত্র রোগে ভুগিয়া তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তাই বায়ু পরিবর্তনার্থ তিনি কয়েক মাস যাবৎ কাশীধামে আসিয়াছেন। ঢাকার দুই ভক্ত চন্দ্রকান্তবাবু ও তৎসঙ্গী [প্রফুল্লবাবু] প্রণামান্তে উপবেশনপূর্বক কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাঁরা উভয়ে শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—এখন এক রকম ভালই চলে যাচ্ছে। এখানে এসেই উপর্যুপরি দুইবার ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর হওয়ায় শরীর অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল। ভাগ্যিস এখন ডাঃ (সুরেশচন্দ্র) সর্বাধিকারী, যিনি আমায় কলকাতায় চিকিৎসা করতেন, কোন কার্য উপলক্ষে এখানে এসে পড়েছিলেন। তিনি আমার অসুখ পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, আমার পক্ষে এখানকার Change (জলবায়ু পরিবর্তন) বিশেষ কার্যকরী হবে না। পূর্বের হাঁপানি রোগের চিহ্ন আমাতে দেখা গিয়েছিল।

ভক্ত—আপনাকে ৺অষ্টমী পূজার দিন যেরূপ দেখেছিলাম এখন তার চেয়ে অনেক ভাল দেখছি। Change (হাওয়া বদলানো)-এর ফল আসা মাত্রই তাড়াতাড়ি না হয়ে পরে ক্রমশ হওয়াই বোধ হয় ভাল। দেওঘরে গিয়ে প্রথমে বাবুরাম মহারাজের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়েছিল; কিন্তু পরে তা টিকল না।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—হাঁ! তারপর তাঁকে কলকাতায় আনায় সম্ভবত খারাপ হয়েছিল। রাস্তায় ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে তাঁর Double (ডাবল) নিউমোনিয়া হয়েছিল। যখন কলকাতায় গেলেন, তখন শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) বললেন, "হয়ে গেছে।" শেষে তো পূর্ব রোগে তিনি মারা যাননি।

চন্দ্রকান্তবাবু—আমাদিগকে তো দেখছেন। আমরা সংসার নিয়েই ব্যস্ত। কি করলে তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যায়, দয়া করে বলুন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—ঠিক্ এই করলে তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যাবে এমন কিছু নেই। ঠাকুর বলতেন, "বহু জন্মের পুণ্য ফলে লোকে সরল হয়।" স্বামীজী (বিবেকানন্দ) বেশ বলেছিলেন, "এ কি শাকমাছ পেয়েছ যে, এত কড়ি দিয়ে কিনে নেবে?" ঋষিদের মধ্যে যিনি যেমন ভাবে তাঁকে পেয়েছেন, তিনি সেই পথই শাস্ত্রে লিখে গেছেন। কেউ বলেছেন, এইরূপ ভাবে পূজা করতে হবে। কেউ বলেছেন, এত জপ করতে হবে। নারদ বলেছেন, নদী যেমন সমুদ্রকে পাবার জন্য আর কোন দিকে না চেয়ে এক মনে তার দিকে চলতে থাকে, তেমনি যে ভগবানকে চায়, সে আর সব ফেলে দিয়ে একমাত্র তাঁর দিকেই চলতে থাকবে। গীতায় (৯।২২) ভগবান বলেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

—অনন্যচিত্তে যে জনগণ আমাকে চিন্তা করিতে করিতে উপাসনা করে সেই অনবরত যোগযুক্ত ব্যক্তিগণের অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ আমি স্বয়ং করাইয়া থাকি।

ভক্তি দুই রকম। প্রথমে বৈধী ভক্তি—এত জপ করতে হবে, এমন করে পূজা করতে হবে। তারপর রাগানুগা ভক্তি। তখন ভক্ত ব্যাকুল হয়ে কেবল

তাঁর কথাই চিন্তা করে, তাঁর বিষয় ভিন্ন আর কিছু তার ভাল লাগে না। কিন্তু অধ্যবসায় থাকা চাই। একটু ধ্যানজপ করেই কিছু হলো না বলে ছেড়ে দিলে চলবে না। এই সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। রত্নাকর তপস্যা করতে করতে তার ওপর বল্মীকের স্তূপ হয়ে গেছিল।

চন্দ্রকান্তবাবু—মহারাজ, জপ করা মানে কি?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—জপ মানে মুখে তাঁর নাম করা এবং অন্তরে তাঁর রূপ চিন্তা করা, তাঁর কথা ভাবা, তাঁকে ভালবাসা। তা নইলে মন যদি অন্য জিনিসে আসক্ত থাকে, তাহলে মুখে নাম করলে কি হবে? আসল কথা, যেমন করেই হোক তাঁকে ভালবেসে আপনার করে ফেলা।

ভক্ত—ঠাকুর যেমন বলেছেন, যো সো করে বাবুর সঙ্গে দেখা করা। তা দারোয়ানের ধাক্কা খেয়েই হোক বা পাঁচিল ডিঙিয়েই হোক।

চন্দ্রকান্তবাবু—কেউ যদি ভাবে, ঠাকুরের দর্শন পেয়েছি, আমার আর কিছু করবার দরকার নাই?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—তাদের কথা আমি কি করে বলবো। সে বিষয়ে তারাই ভাল জানে।

ভক্ত—ইনি বোধ হয় mean (ধারণা) করেছেন, আমাদের বিশ্বাস, শ্রীমা যখন আমাদের ভার নিয়েছেন তখন আর আমাদের কিছু করার দরকার নেই। তিনি যখন আমাদের এক হাত ধরে রেখেছেন, তখন অন্য হাতে আমরা যা খুশি তা করতে পারি। আমাদের মুক্তি করতলগত।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—ঠিক ঠিক সেরূপ বিশ্বাস যদি কারো হয় তাহলে তো তার সব হয়ে গেছে! কিন্তু ওরূপ হওয়া কি সোজা কথা? এরূপ স্থানে কেহ self-deluded (আত্ম-প্রতারিত) না হয়, দেখতে হবে। ভগবানের ওপর যারা সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে তারা যদি পূর্বে মহাপাপও করে, তাহলেও তাঁর কৃপায় এক মুহূর্তে সে পাপ দূর হয়ে যায়। পর্বত-প্রমাণ তুলার মধ্যে এক ফিনকি আগুন ছেড়ে দাও দেখি! সমস্ত তুলা হু হু করে পুড়ে যাবে। হাজার

বছরের অন্ধকারের মধ্যে আলো জ্বাললে কি একটু একটু করে আঁধার যায়? তৎক্ষণাৎ চলে যায়। গীতায় (৯।৩০-৩১) ভগবান বলেছেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

—যদি অতি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যা ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করে তাহাকে সাধুই মনে করা উচিত, যেহেতু সে শুভ সংকল্প আশ্রয় করিয়াছে! সে শীঘ্র ধার্মিক হয় এবং চিরশান্তি লাভ করে। হে কুন্তিপুত্র, ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, আমার ভক্ত কখনো বিনষ্ট হয় না।

সুদুরাচারও যদি একমাত্র তাঁর শরণাগত হয়ে থাকে তবে তাঁকে সাধু জানতে হবে। আর সে 'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা।' তাঁর কৃপায় সে আর দুরাচার থাকে না, ধার্মিক হয়ে যায়। যে নাচতে জানে তার পা পিছলে পড়ে না। পূর্বে বহু পাপ করে থাকলেও শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করার পরে কি আর তার দ্বারা পাপ কাজ সম্ভব হয়?

গিরিশবাবু না করেছেন এমন পাপ কাজ নাই। তিনি একবার আমাদিগকে বলেছিলেন, আমি যত মদ খেয়েছি সেই বোতলগুলি খাড়া করে একটার ওপর একটা রাখলে মাউন্ট এভারেস্ট (হিমালয় গিরিশৃঙ্গ) এর সমান উঁচু হয়। তিনি কবি কিনা; তাই এরূপভাবে বলেছিলেন। সত্য সত্যই তিনি এত মদ খেয়েছিলেন। সেই গিরিশবাবুকে ঠাকুর সকাল সন্ধ্যায় ভগবানের নাম করতে বলায় বললেন, "তা বলতে পারি না। আমি তখন কোথায় কোন্ খেয়ালে থাকবো জানি না।" তারপর ঠাকুর তাঁকে শুধু খাওয়ার সময় নাম নিতে বলায় তিনি বললেন, "তাও আপনার কাছে বলতে পারি না। কত মোকদ্দমা, কত বাজে ভাবনা নিয়ে থাকি, এও পারবো না।" তখন ঠাকুর বললেন, তবে বকল্মা* দে। পরে গিরিশবাবু বলেছিলেন, "তখন তো বকল্মা দিয়ে এলুম।

---

* বালকের ন্যায় সমস্ত ভার অর্পণ করা, কোন বিষয়ে নিজের কর্তৃত্ববোধ না রাখা।

পরে বুঝেছি, বকল্‌মা দেওয়া কি শক্ত কাজ! দিনান্তে একবারও তাঁর নাম করতে পারবো না বলেছিলাম। কিন্তু পরে দেখি, প্রতি মুহূর্তে এতটুকু কাজ তাঁকে স্মরণ না করে করার জো নাই।" গিরিশবাবু পনের বছরের আফিং খাওয়া অভ্যাস একদিনে ছেড়ে দিলেন! বলেছিলেন, "প্রথম তিনদিন বড় কষ্ট হয়েছিল, গা যেন আড়ষ্ট হয়ে আসত। চতুর্থ দিনেই সে ভাব চলে গেল।" শেষে তামাকটুকু পর্যন্ত খেতেন না।

চন্দ্রকান্তবাবু—সাধক তাঁর কাছে এগুচ্ছে কিনা তার প্রমাণ কি?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—সে নিজেই তা মনে মনে বুঝতে পারবে। আর অন্যেও টের পায়। তার কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগুলি কমে যাবে, বিষয়ের ওপর আসক্তিও কমবে। আর প্রাণে শান্তি আসবে।

ভক্ত—মহারাজ, ভগবান দর্শনের আগে তো আর শান্তি আসছে না।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—হাঁ, শান্তি আসা অনেক দূরের কথা; কিন্তু তার ভোগবাসনাগুলি কমে আসছে, সর্বভূতে প্রীতি আসছে—দেখলেই বুঝতে পারবে, সে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। শুধু জপ করলে হবে না। হৃদয়ের বাসনা থাকলে সব জপের ফল সেখান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এক কৃষক সমস্ত দিন ক্ষেতে জল সেচেছিল। সন্ধ্যার সময় দেখল, একবিন্দু জলও ক্ষেতে যায়নি, সব জল ঘোগ (ছিদ্র) দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এই বিষয় নাগমহাশয়* বেশ একটি কথা বলেছিলেন। আমি তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলুম। তাঁর বাপ পাশে এক স্থানে বসে জপ করছিলেন। নাগমহাশয় আমায় হাত জোড় করে বলেছিলেন, "আশীর্বাদ করুন, যেন বাবার ভক্তি হয়।" আমি বললাম, "ভক্তি তো তাঁর খুব আছে, সর্বদা ভগবানের নামজপ করছেন। আবার কি?" নাগমহাশয় উত্তর দিলেন, "নঙ্গর ফেলাইয়া দাঁড় টানলে কি হইব? উনি আমারে বড় ভালবাসেন। জপ করলে কি হইব?" আমি বললাম, "আপনার মতো ছেলেকে ভালবাসবেন না তো কাকে ভালবাসবেন?" নাগমহাশয় সসঙ্কোচে উত্তর দিলেন, "ও কথা

* নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রামের ৺দুর্গাচরণ নাগ, সাধু নাগমহাশয় নামে পরিচিত। ইনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসাধারণ গৃহিশিষ্য ছিলেন।

রুন কেন? আমার ওপর ভালবাসা যাতে যায় সেই আশীর্বাদ করুন।" আহা! নাগমহাশয় কি লোকই না ছিলেন! "নঙ্গর ফেলে দাঁড় টানা" মানে কি জানো? কতগুলি লোক মদ খেয়ে মাতাল হয়ে অন্ধকার রাত্রে নৌকায় বেড়াতে ইচ্ছুক হয়েছিল। নদীর ঘাটে গিয়ে নৌকায় উঠেই তারা সকলে দাঁড় টানতে আরম্ভ করল। সকাল হলে দেখল, নৌকা সেই ঘাটেই রয়েছে। রাত্রে মদের নেশায় নঙ্গর তুলতে তারা ভুলে গিয়েছিল।

॥ দুই ॥

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর বৈকাল ৪টায় কাশীধাম রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে কেদারবাবা (স্বামী অচলানন্দ), স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ, ব্রহ্মচারী সনৎকুমার, সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি সাধু ও ভক্ত উপস্থিত। স্বামী তুরীয়ানন্দ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক স্যার জন উড্রফ প্রণীত Is India Civilised? (ভারত কি সভ্য) নামে পুস্তক সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে এই বইখানা প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা অনেক বড় হয়েছে। প্রথম সংস্করণ পড়িয়া অনেক সাহেব উহার adverse criticism (প্রতিকূল সমালোচনা) করেছিলেন। এবারে গ্রন্থকার সেগুলির খুব কড়া জবাব দিয়েছেন।

ভক্ত—ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সার জন উড্রফের কাছে একখানি রিপোর্ট পাঠিয়ে তাঁর সব বই চাওয়া হয়েছিল। তিনি সেগুলি তো দিয়েছেন; আবার Future publications (ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য পুস্তকাবলী) দিবার জন্য Publishers (প্রকাশকগণকে) নির্দেশ দিয়েছেন। ভারতের ওপর তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান বলে এই দেশে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান ঠিক ঠিক কাজ করছে তা ফস করে তিনি ধরে ফেলতে পারেন।

কেদারবাবা—তিনি হাইকোর্টের জজ। বিচার করা, রায় লেখা ইত্যাদি এত কাজ তাঁকে করতে হয়। তার ওপর এত বই লেখার সময় পান কি করে?

ভক্ত—এতে যে এক সুবিধা আছে। যেটুকু লিখলেন সেইটুকুই এগুলো। রোজ একঘণ্টা করে লিখলেই এক বছর পরে দেখা যায়, অনেক লেখা হয়ে

গেছে। আর সাধন-ভজনের বেলায় দশ বছর রোজ দুই তিন ঘণ্টা জপ-ধ্যান করেও কিছুই progress (অগ্রগতি) দেখছি না। মনে হয়, পূর্বেও যা ছিলাম এখনও তাই আছি।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—ও কি কথা বলছ? সাধন-ভজন করে ফল হয় না? কে বললে? নিশ্চয়ই হয়। এতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। একটু খাটলে জগতের লোকে মজুরি দেয়; আর ভগবানের জন্য খাটলে তিনি কি এমন নিষ্ঠুর যে, তার জন্য মজুরি দেবেন না? তবে ঠিক ঠিক খাটা চাই, বাজে খাটুনি খাটলে হবে না। একটা পাগল ভাটিখানার কাছে থাকত। মদ জ্বাল দিয়ে মেটে হাড়িগুলো যেখানে ফেলে দেয়, সে রোজ দুপুরে সেখানে গিয়ে একটা লাঠি দিয়ে সেই হাড়িগুলি একটা একটা করে ভাঙত। আর রোদে গলদঘর্ম হয়ে বলত, "ও! আর পারিনে!" তারপর একটু বিশ্রাম করেই আবার গিয়ে ঐগুলি পূর্ববৎ ভাঙত। এমনি করে খাটলে হবে না। সারাদিন জল সেচলে কি হবে? সন্ধ্যাবেলায় সেচক ক্ষেতে গিয়ে দেখে, একটুও জল যায়নি! সব জল ঘোগ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বাসনাই ঘোগ। বাসনা-ঘোগ দিয়ে সাধনের শক্তি বেরিয়ে যায়, নষ্ট হয়।

ভক্ত—কোথায় ঘোগ আছে না দেখলে কি করবো, মহারাজ? গুরু যদি দয়া করে দেখিয়ে দেন তবে তো হয়? ঠাকুর বলতেন, "কেউ যদি জগন্নাথ দর্শন করবে ভেবে পশ্চিমে না গিয়ে পূর্ব দিকে রওনা হয়, তাহলে একদিন না একদিন কেউ তাকে দেখিয়ে দেবে, এদিকে যাও।" যারা ভগবানলাভের উদ্দেশে কোন কাজ করে তারা ভুল পথে থাকলেও তাঁকে লাভ করাই যে উদ্দেশ্য তাতে তো আর সন্দেহ নাই। তবে কেন তাদের খাটুনি বাজে খাটুনি হবে?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—হ্যাঁ, যদি কেউ ঠিক ঠিক ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বেরোয় এইরূপ লোক আজ হোক, কাল হোক, তাঁর কৃপার ইঙ্গিত পাবেই পাবে। তাঁর জন্য কেউ এক পা এগুলে তিনি যে একশত পা এগোন এ শুধু কথার কথা নয়। যে তাঁর কৃপালাভের জন্য একটু চেষ্টা করেছে সেই এটা বুঝতে পেরেছে। (কেদারবাবার দিকে চেয়ে) কি বল?

কেদারবাবা—আজ্ঞে হাঁ, তা নিশ্চয়ই পায়।

ভক্ত উত্তেজিত হইয়া মনে করিতেছেন, কেদারবাবাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি জীবনে এরূপ উপলব্ধি করেছেন কিনা।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—সন্ত তুলসীদাস বলেন—

সত্য কথা, অধীনতা, পরস্ত্রী মাতৃ সমান।
অ্যায়সে হরি না মেলে ত তুলসী ঝুট জবান ॥

সত্য কথা আজকাল কে বলছে? অধীনতা মানে তাঁতে সম্পূর্ণ নির্ভরতা। পরস্ত্রীকে মার মতো দেখা। এইসব যে অভ্যাস করবে তার ঈশ্বরলাভ না হলে তার জন্য তুলসীদাস জামিন। সন্ত কবীরও বলেন—

যো পরবিত্ত হরে সদা, সো বহু দান কিয়া ন কিয়া।
যো পরদার করে সদা, সো বহু তীর্থ গিয়া ন গিয়া ॥
যো পর আশ করে সদা, সো বহু দিন জিয়া ন জিয়া।
যো পর চুকলী করে সদা, সো হরিনাম লিয়া ন লিয়া ॥

পরের টাকা চুরি করে নিয়ে দান করলে কি হবে? যে পরস্ত্রী গমন করে তীর্থ তার পাপ নাশ করতে পারে না। পরান্নভোজী হয়ে বেশিদিন বেঁচে থাকা আর না থাকা সমান। আর চুকলি (পরনিন্দা) করে হরিনাম নিলে কোন ফল হয় না। তাই তো যিশুখ্রিস্ট বলেছিলেন, প্রার্থনা করার আগে যার মনে কষ্ট দিয়েছ, তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে এসো।

ভক্ত—মহারাজ, এইসব শুনতে ভাল; কিন্তু "ধুনতে লবে জান।" এইগুলি theoretically (কল্পনায়) বেশ বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু practically (কার্যত) করাই কঠিন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—Theoretically বোঝাই কি কম? এ রকম বোঝাও কেবল এই দেশেই সম্ভব। কতগুলি ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ এদেশে জন্মেছিলেন। তাই তাঁদের উপলব্ধির ফল এ দেশের মানুষের মজ্জাগত হয়েছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এত সহজে এই তত্ত্ব বুঝতে পারছে।

কেদারবাবা—ভগবানের সগুণ নির্গুণ এই দুই ভাব একসঙ্গে বোধ হয় আর কোন দেশের লোকেই উপলব্ধি করতে পারেনি।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—না। নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি কেবল এই দেশের ঋষিদের হয়েছিল। পাঞ্জাবের অন্তর্গত মূলতানের মনসুর নামে একজন মুসলমান কেবল 'আনাল হক' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমিই আল্লা বা ব্রহ্ম) অনুভব করেছিলেন; কিন্তু এরূপ বলায় মোল্লারা সব তাঁর ওপর খেপে গেছিল। মোল্লারা আলির বংশধর বলে মুসলমানদের পুরোহিত। তারা সব দ্বৈতবাদী। বাদশাহের মেয়ের খুব সাংঘাতিক ব্যারাম হয়েছিল। কোন চিকিৎসকই তা আরাম করতে পারলে না। তখন একজন বললে, "মনসুর খুব শক্তিমান সাধক। সে নিশ্চয়ই একে আরাম করতে পারবে।" তখন তাঁকে আনানো হলো। তিনি এসে বললেন, "আল্লার নামে বলছি, তোমার রোগ ভাল হয়ে গেছে। তুমি ওঠ।" এতে কিছুই ফল হলো না। তারপর যখন তিনি বললেন, "আমি স্বয়ং বলছি, তোমার রোগ নাই, ওঠ।" তখন সে আরাম হয়ে গেল। এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে বাদশাহ খুব সন্তুষ্ট হলেন; কিন্তু মোল্লারা বলতে লাগলো, "দেখলে! এ আল্লা থেকেও বেশি শক্তিশালী বলে গর্ব করছে!" তার পর মনসুরের বিচার হলো। মোল্লারা জ্যান্ত অবস্থায় তার গায়ের চামড়া তুলে ফেললে! সেই ভয়ঙ্কর চর্মহীন মূর্তিতে তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার জন্য গেলেন! কিন্তু সকলে দরজা বন্ধ করে দিল, কেউ তাঁকে কিছু দিলে না। একজন কসাই তার সামনে এক টুকরা মাংস ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। তারপর সেই মাংস পোড়াবার জন্য মনসুর আগুন চাইতে কেউ দিলে না। তিনি তখন ওটা সূর্যের দিকে ধরলেন। সূর্যদেব তখন বেশি উত্তাপ দিবার জন্য নিচে নেমে এলেন! তাই তো লোকে বলে, মূলতানে সূর্য অনেক কাছে।

জনৈক ব্রহ্মচারী—কোন্ সময় এই ঘটনা হয়েছিল, মহারাজ?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—About fifteenth century (পঞ্চদশ শতাব্দীর কাছাকাছি কোন সময়ে) তখন এ দেশে মোগল রাজত্ব চলছিল।

ভক্ত—তাহলে তো এই ঘটনা ভারতবর্ষে হয়েছিল; আর দিল্লির সম্রাটদের সময় হয়েছিল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—হাঁ।

জনৈক ব্রহ্মচারী—যিশু তো বলেছিলেন, "I and my Father are one." (আমি ও আমার স্বর্গীয় পিতা অভিন্ন।)

স্বামী তুরীয়ানন্দ—তিনি বিচারালয়ে খুব সতর্কতার সহিত জবাব দিয়েছিলেন। বিচারক যিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি বলছ, তুমি এই দেশের রাজা?" যিশু উত্তর দিলেন, "সে তো তুমি বলছ। আমি কেন বলবো?" যিশুর দিব্যশক্তি দেখে যাজকগুলি সব খেপে গিয়েছিল; কারণ তাদের পকেটে হাত পড়ছিল। তিনি যাকে যা বলছিলেন সেই তা শুনছিল। তিনি জেলেদের বলেছিলেন, "ওহে কি করছ, এক আমার কথা শুন।" জেলেরা উত্তর দিল, "আমরা মাছ ধরছি; কি করে যাবো?" যিশু—"এসো, তোমাদের আর মাছ ধরতে হবে না। আমি তোমাদিগকে মানুষ ধরতে শিখিয়ে দিব, I will make you fishers of men." অন্য কেউ বললে, "আমাদের বাড়িতে লোক মরেছে, কবর দিতে হবে।" "Let the dead bury the dead. Come unto me. মৃতের সৎকার ধর্মত মৃতেরা করুকগে। তোমরা আমার কাছে এস।" প্রিস্টরা (পুরোহিতরা) যখন দেখলে যিশু তাদের সর্বনাশ করতে বসেছেন, তখন তারা তাঁর নামে নালিশ করলেন। শেষে তিনি বিচারককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, Do you convict me of any sin? (তুমি কি আমায় কোন দোষে দোষী সাব্যস্ত করলে?) বিচারক বলেছিলেন, "I wash my hands clean. (আমি এতে নেই।) আমি কি করবো? এরা তোমার প্রাণদণ্ড চায়।" তারপর সেদিন কোন বিশেষ ব্যাপার উপলক্ষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এক অপরাধীর খালাস হবার কথা ছিল। কিন্তু সবাই বলতে লাগল, যিশুকে খালাস না দিয়ে অপরজনকে (সে একজন দস্যু ছিল) খালাস দেওয়া হোক।

ভক্ত—কিন্তু তার বিশ্বাসী শিষ্যেরা ভেবেছিল, সত্য সত্যই স্বর্গের পিতা নেমে এসে মর্ত্যে স্বর্গরাজ্য প্রস্তুত করবেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—কেন? তিনি তো তাদের বলেছিলেন, "Kingdom of Heaven is within you—স্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরেই বিদ্যমান।" এই খ্রিস্ট-বাক্যে বেদান্ত-বাণী প্রতিধ্বনিত।

ভক্ত—খ্রিস্টানদের মধ্যে সেন্ট ফ্রান্সিসের জীবন কী অদ্ভুত ছিল!

স্বামী তুরীয়ানন্দ—যিশুর ধ্যান করতে করতে তাঁর হাতে পায় ঘা হয়ে গেছিল, ক্রুশবিদ্ধ যিশুর গায় যেখানে যেখানে পেরেক পুঁতেছিল। সেই ঘায়েই ফ্রান্সিসের দেহত্যাগ হলো।

ভক্ত—মুসলমান ধর্মেও অনেক সাধক মহাপুরুষ জন্মেছেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—হাঁ, তা বৈ কি। প্রত্যেক ধর্মেই সিদ্ধপুরুষগণ জন্মে তত্ত্ব উপলব্ধি করেন বলেই তো সব ধর্ম এত দীর্ঘকাল লোপ পায় না। স্বামীজী বেশ বলতেন, "সবাই এসে কেবল জিজ্ঞেস করে, মহারাজ পন্থা বাতাও, পন্থা বাতাও।" কেউ কিন্তু কিছু করবে না! ঠিক ঠিক ডাকলে তাঁকে পাবে না, একি কাজের কথা! একটি বালক "দাদা মধুসূদন" বলে ডেকে তাঁকে পেয়েছিলেন। তার নামটি কি?

ভক্ত—জটিল বালক।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—হাঁ, হাঁ, জটিল। বনের মধ্য দিয়ে গুরু মহাশয়ের বাড়িতে যেতে সে ভয় পেত। তার মা বললে, "মধুসূদন নামে তোমার এক দাদা আছেন। তাঁকে ডাকলে আর ভয় থাকবে না।" সরল বালক মায়ের কথায় বিশ্বাস করল, নিশ্চয়ই তার মধুসূদনদাদা আছেন। বনের মধ্যে ভয় পেলেই সে দাদাকে ডাকে; আর তিনি এসে পথ দেখিয়ে দেন। তারপর গুরুমশাই জানতে পেরে যখন বললেন, আমায় দেখাতে পারিস? জটিল সহাস্যে বললে, "কেন পারবো না?" বনের মধ্যে গিয়ে সে ডাকতেই মধুসূদনদাদা এলেন; কিন্তু গুরু আর দেখতে পেলেন না। শুধু বুঝি, নুপূরধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। তার মা, তাও শুনতে পেলে না। ছেলেকে বলে দিয়েছিলেন তার ভয় ভাঙাবার জন্য। নিজে তো আর ঠিক ঠিক বিশ্বাস করেনি।

গয়লানির ভবসাগর পারের গল্প জানত? এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়িতে গয়লানি দুধ দিত। নদীর ওপার থেকে তাকে আসতে হয়। রোজ ঠিক সময়ে খেয়া পার হতে পারে না বলে মাঝে মাঝে খুব বেলা হতো। ছেলেপিলের বড় কষ্ট হয় বলে পণ্ডিত একদিন গয়লানিকে খুব গালাগালি করলে। গয়লানি বললে, "আমি কি করবো? খেয়া নৌকা রোজ সময়মত পাই না বলে দেরি হয়।" পণ্ডিত খুব শাস্ত্র পড়েছেন কিনা! তাই অমনি বললেন "সেকি? তুই এতটুকু নদী পার হতে পারিসনি! তাহলে সেই অপার ভবসাগর পার হবি কি করে?" মূর্খ গয়লানি ভবসাগরের নামই শোনেনি! তাই হাঁ করে চেয়ে রইল। তখন পণ্ডিতজী তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, শ্রীভগবান হরির নাম নিলে অনায়াসে সংসার-সমুদ্র পার হওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র নদী তো অতি তুচ্ছ। তখন গয়লানি খুব খুশি হয়ে চলে গেল। এই ঘটনার পর সে রোজ ঠিক সময়ে দুধ দিয়ে যায়; একদিনও দেরি হয় না। একদিন পণ্ডিত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হাঁরে, এখন রোজ যে বড় ঠিক সময়ে আসছিস? নদী পার হোস কি করে?" গয়লানি বললে, "কেন দাদাঠাকুর, আপনিই তো আমায় পথ দেখিয়েছেন। এখন আর আমায় বসে থাকতে হয় না, বা খেয়ামাঝিকে পয়সাও দিতে হয় না।" পণ্ডিত চমৎকৃত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "বলিস কি রে? কে তোকে পার করে দেয়?" গয়লানি উত্তর দিল, "কাউকে আর পার করে দিতে হয় না। আমি বরাবর নদীর ধারে বসে হরিনাম করতে থাকি; আর অমনি জলের ওপর দিয়ে চলে আসি।" পণ্ডিত চমৎকৃত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমায় তা দেখাতে পারিস?" গয়লানি—"কেন পারবো না? চলুন না।" পণ্ডিতজী ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না, বিস্মিত হয়ে গয়লানির পেছু পেছু চললেন! নদীর কাছে গিয়ে গয়লানি হরিনাম করতে করতে জলের ওপর দিয়ে সটান হেঁটে চলল, যেন নদীর কোথাও হাঁটু জলের বেশি নাই। ওপারে গিয়ে পেছু ফিরে দেখলে, পণ্ডিতজী এপারে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে কি ভাবছেন। তখন সে পণ্ডিতজীকে ডেকে বললে, "ওকি? দাঁড়িয়ে আছেন কেন? হরিনাম করতে করতে চলে আসুন না?" তখন চমকে উঠে, পণ্ডিতজী মন্ত্রমুগ্ধবৎ হরি হরি

বলতে বলতে জলে নামলেন। আর জল ক্রমশ বাড়ছে দেখে দুই হাতে কাপড় তুলতে লাগলেন। বিশ্বাস থাকলে তো? মুখে হরি বললে কি হবে? পণ্ডিতের এই দুরবস্থা দেখে গয়লানি বললে, "ও! আপনি হরিও বলছেন, আর কাপড়ও তুলছেন! তাহলে কেমন করে হবে?" একটু স্থির হয়ে চিন্তা করলে সব জানতে পারা যায় হে! আমি তো এবার দেহের ভিতর এক অদ্ভুত লড়াই প্রত্যক্ষ করলুম। এবার আমার যে ব্যারাম হয়েছিল, তাতে দেহে কিছুই ছিল না। এই যে muscles (পেশি) দেখছ (হাত-পায়ের মাংস হাত দিয়ে দেখাইয়া) এর কিছুই ছিল না। সব পরে হয়েছে নূতন করে।

ভক্ত—এখানকার ইনফ্লুয়েঞ্জায়?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—না, পুরীতে। তখন দেহে হাড় কয়খানা ও চামড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হাত পা তুলতে বা পাশ ফিরতে পারতুম না। ছিল কেবল কথা বলার শক্তি। একদিন দেখলুম, দেহের ভিতরের প্রাণটা বাইরের আর একটার সঙ্গে তুমুল লড়াই করছে। দুইজনে লুটোপুটি হলো অনেকক্ষণ। একবার এ জিতেছে, একবার ও। বাইরেরটা চাচ্ছে, প্রাণটাকে দেহের ভিতর থেকে নিয়ে চলে যেতে; কিন্তু দেহস্থ প্রাণ যেতে চাচ্ছে না। শেষে দেখলুম, বাহিরটা হেরে চলে গেল। কাজেই দেহস্থ প্রাণটা দেহের মধ্যেই রয়ে গেল। কিন্তু লড়াইয়ে না পারলে তার সঙ্গে চলে যেতে হতো, আর এদিকে দেহটা পড়ে থাকতো, আমার মৃত্যুও হতো। আমি অবাক হয়ে যেন দূর থেকে এই লড়াই দেখলুম। বাহিরের ওটা হেরে চলে যেতেই আমি ওদের ডেকে বললুম, "ওরে এবার বেঁচে গেলুম। এখন মরব না।" তারপর আমার শরীরে নূতন করে মাংস ও পেশি ধীরে ধীরে হয়েছে। এর আগে কি পরে, ঠিক মনে হচ্ছে না, স্বামীজী, আর কোন কথা নেই, শুধু বলছেন, "ওকি হে? ওঠ।"

ব্রহ্মচারী সনৎকুমার—এর আগে।

এইরূপ কথাবার্তার পর স্বামী তুরীয়ানন্দ গৃহমধ্যে গেলেন। অনন্তর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বেড়াইতে যাইবেন। কেদারবাবা—"দেখলেন তো এঁর কিরূপ

প্রত্যক্ষ উপলব্ধি? আর এঁর কথাগুলিতে কি জোর? আমি সৌভাগ্যক্রমে বহু বর্ষ এঁর দিব্য সঙ্গ লাভ করেছি। মহারাজের (ব্রহ্মানন্দজীর) পূত সঙ্গেও দীর্ঘকাল ছিলাম। প্রত্যহ এঁদের কাছে এরূপ জ্বলন্ত উপদেশ শুনে সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান-ধারণা করলে সাধনরাজ্যে খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হওয়া যায়। আমি ইহা নিজে উপলব্ধি করেছি। আর দুর্ভাগ্যের বিষয় দেখুন, এখানে এত তরুণ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী রয়েছে তাদের জীবনে এই-ই ব্রত। তথাপি এমন অমূল্য রত্ন কাছে থাকতেও তারা এসে এসব কথা শোনার অবসর পায় না! পুরীতে যখন ওঁর একদিনে বারটা অপারেশন (অস্ত্রোপচার) হলো তখন ডাক্তাররা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছলেন। কিন্তু এই মহাপুরুষ একবারে স্থির হয়ে রইলেন, দেহ ছেড়ে অন্য কোন রাজ্যে চলে গেলেন। ক্লোরোফর্ম (ঔষধবলে অজ্ঞান) না করে এতগুলি অপারেশন কখনও শুনিনি।”

কিয়ৎকাল পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ একটু বেড়াইতে বাহির হইয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে চলিলেন। ভক্ত তাঁহার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া সম্মুখে এদেশী রমণীর ক্রোড়স্থ শিশুর লাল টুকটুকে পা দুইখানি দেখিয়া বলিলেন, “একে দেখে গোপালের মা-র কাঁধে-চড়া গোপালের দোদুল্যমান পা দুখানির কথা মনে পড়ে।”

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আবার পিতলের মূর্তি রামলালার সঙ্গে ঠাকুর কত কাণ্ডই না করেছেন। সেসব অদ্ভুত কথা আমাদের কাছে যখন তিনি বলতেন আমরা কিছুই বুঝতে পারতুম না। রামলালা নাইতে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে নাচতে নাচতে অনেক জলে গিয়ে পড়ত। ঠাকুর তাকে উঠতে বললে কথা না শুনায় তার গালে এক চড় মারলেন। “একদিন মা কৌশল্যা যার মুখে ননী তুলে দিতেন আমি তার মুখে খই দিয়েছিলুম। তার মধ্যে একটা ধান ছিল”—এই বলতে বলতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সজল নয়নে কাঁদতে লাগলেন। সে কি কান্না! আমরা দেখে অবাক।

ভক্ত—ঐরূপ দর্শনাদি যাতে আপনাদের লাভ হয় তার জন্য আপনারা তাঁকে বলতেন না?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আমার তখন অন্যরূপ ভাব ছিল। অনেকে চেয়েছিলেন। তাঁরা ঐরূপ দর্শন পেয়েছিলেন বৈকি!

ভক্ত—হাঁ, শুনেছি। আপনি তখন খুব বেদান্তচর্চা করতেন।

॥ তিন ॥

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর অপরাহ্ণ চারটায় কাশীধামে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে অম্বিকাধামে কেদারবাবা, স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ, স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দ, ভক্ত প্রভৃতি উপস্থিত। স্বামী তুরীয়ানন্দ পূর্ব-পরিচিত ঘরে বসিয়া প্রেরণাপদ ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেছেন। স্বামী ধ্রুবেশ্বরানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "ডাক্তার, তোমার ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস হয়?" ধ্রুবেশ্বরানন্দজী নিরুত্তর রহিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আমার একবার অবিশ্বাসের ভাব হয়েছিল।

ডাক্তার—আমারও মহারাজ এক একবার মনে হয় ভগবান-টগবান কিছুই নাই।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আমি বলতে বুঝি সাহস হলো? আগে বুঝি ভেবেছিলে, বলে ফেললে এতগুলি লোকের মধ্যে exposed (দোষী প্রতিপন্ন) হবে? তা নয়। এরূপ অবিশ্বাস অনেকেরই জীবনে আসে। সাধকজীবনে এও একটা অবস্থা বলে জানবে। আমারও একবার নাস্তিক ভাব এসেছিল এক শালার বই পড়ে।

জনৈক ব্রহ্মচারী—European author (ইউরোপীয় গ্রন্থকার)-এর লেখা কি?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—তা বৈকি? তখন কি যন্ত্রণাই হয়েছিল! কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। কিন্তু এই ভাব দুই একদিন মাত্র ছিল। বইটার আগাগোড়া materialistic ideas (জড়বাদমূলক চিন্তারাশিতে) -এ ভরা। তারপর অনেক চেষ্টায় ক্রমশ এই ভাব দূর হয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দেরও এই ভাব এক সময় এসেছিল। সে ঘোর বেদান্তবাদী ছিল কিনা? গীতাতে (২।১৯) আছে—

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥

—যে এই আত্মাকে হন্তা বলিয়া জানে এবং যে ইহাকে হত বলিয়া মনে করে, তাহারা উভয়ে আত্মস্বরূপ বিজ্ঞাত নহে। কারণ আত্মা আকাশকল্প নিরাকার বলিয়া কাহাকেও হনন করে না বা অন্য কর্তৃক হতও হন না। উক্ত ভাবে আরূঢ় হয়ে কালী মহারাজ কেবল মাছ মারত। ঠাকুর তাকে একদিন কাছে ডাকলেন। সে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আরে তুই মানুষ মারতে পারিস?" কালী মহারাজ উত্তর দিলেন, "কেন পারবো না, খুব পারি।" ঠাকুর—"তাতে মনে কোন পাপবোধ হবে না?" কালী মহারাজ—"কেন হবে? কে কাকে মারছে?" ঠাকুর—"বেশ চলছে, থাক। এও একটা অবস্থা—যেমন এক ঘরের ভিতর দিয়ে অন্য ঘরে ঢুকতে হয়। কিন্তু এখানে আসিসনি। আসলেই সর্বনাশ। আর এই ভাব নিয়ে সংসার করিসনি যেন।" ভগবানলাভ বড় কঠিন। একটু বাসনা থাকলে ও হবার যো নাই। ঠাকুর তাই বলতেন, "একটু আঁশ থাকলেও সুতো সূচের মধ্যে যাবে না।" ঠাকুরের অন্তিম অবস্থায় স্বামীজী তাঁকে ধরে বলেছিলেন, "আপনি তো কখন চলে যাবেন, ঠিক নাই। আমায় পাইয়ে দিয়ে যান।" তখন ঠাকুর বললেন, "হবে। আগে তোর বাড়ির একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ে আয়।" তারপর স্বামীজী বললেন, "আপনি মাকে বলে ওদের মোটা ভাত-কাপড়ের বন্দোবস্ত করে দিন।" তখন ঠাকুর তাকে মার কাছে ঐসব চাইতে পাঠালেন। স্বামীজী কিন্তু কালীঘরে গিয়ে আর কিছু চাইতে পারলেন না। চাইলেন বিবেক-বৈরাগ্য। ভিতরে ওসব নাই। কি করে চাইবেন? কালীঘর থেকে ফিরে এসে ঠাকুরের কাছে ও কথা বলতে তিনি আমাদিগকে বললেন, "দেখলি, কি উচ্চ আধার! মার কাছে বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া আর কিছু চাইতে পারলে না।"

এইসব কথা হচ্ছে। এমন সময় বুড়োবাবা (স্বামী সচ্চিদানন্দ) এসে উপস্থিত হলেন। পরস্পর প্রণাম ও প্রতিপ্রণামের পর তিনি উপবেশন করলেন। স্বামী সারদানন্দের কথা উঠিল। তিনি লিখিয়াছেন, কাশীতে যাইয়া কিছুদিন থাকার

ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পূর্ববঙ্গে ঝড়ের জন্য তথায় সেবাকার্য খোলায় সেই কাজে ব্যস্ত আছেন। এর পর ১৪ কার্তিক ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠের গৃহ-প্রতিষ্ঠা হবে। এজন্য পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুরোধে তাঁকে তথায় যেতে হবে। তাই বোধ হয়, এবার আর তাঁর কাশীতে আসা হবে না।

বুড়োবাবা—দেখলেন মহারাজ? আপনি আমায় বলতেন, তুমি কাজের জন্ম দাও। এখন দেখুন, এঁরাও কাজের জন্য এত ব্যস্ত যে, কাশীতে এসে একটু বিশ্রাম করার অবসর পাচ্ছেন না। কাজে হাত দিলে এমনি হয়। স্বামী তুরীয়ানন্দ (একটু গম্ভীরভাবে)—এঁরা যে কর্ম করেন তাহা অকর্ম।

॥ চার ॥

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর অপরাহ্ণ প্রায় চারটায় কাশীধাম রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে অম্বিকাধামে কেদারবাবা, স্বামী গিরিজানন্দ, স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ উপস্থিত। পূর্বদিন স্থানীয় রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে কোন ভদ্রলোক তাঁহার নয় বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। উক্ত বালক কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী কর্তৃক রাঁচিতে স্থাপিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমে থাকে এবং তত্রস্থ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। তাহাকে একখানি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা পড়িতে দিলে সে উহা অনায়াসে পড়িয়া গেল। তাহার কথাবার্তা শুনিয়া ও বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া সেবাশ্রমে বেশ সাড়া পড়িল। দুই-একজন ব্যতীত সকলেই সম্মত হইয়া স্থির করিলেন, সেবাশ্রমের পার্শ্বে একটি ব্রহ্মচর্যাশ্রম খুলিতে হইবে। সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজ সম্প্রতি ছয়শত টাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন পরিকল্পিত আশ্রম স্থাপনার্থ। উহার পরিচালক সমিতির সভ্যদের নামগুলি পর্যন্ত লেখা আরম্ভ হইল। অন্য দিকে ব্রহ্মচারী ত্যাগীকর্মী সংগ্রহের চেষ্টাও চলিল।

এই আন্দোলনের সংবাদ পাইয়া পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "আশ্রম করলেই তো হয় না? চালাবে কে?"

কিয়ৎকাল পর নিজ দেহের দিকে চাহিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "দ্যাখ,

দ্যাখ, আমার শরীরের চামড়াগুলি কেমন কুঁচকে গেছে! এইসব বার্ধক্যের লক্ষণ। রাজা যযাতিরও এই রকম হয়েছিল। তিনি নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, তাঁর গায়ের চামড়া এই রকম কুঁচকে যেতে লাগল, চুলগুলি সাদা হয়ে গেল, দেহে জড়তা এল।"

ভক্ত—কেন মহারাজ, হঠাৎ তাঁর এরূপ হলো?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—মহাভারতোক্ত যযাতির উপাখ্যান জান না বুঝি? তবে শোন। রাজা যযাতি একবার মৃগয়ায় বেরিয়ে এক স্থানে মানুষের চিৎকার শুনতে পেলেন। একটু এগিয়ে দেখলেন, একটা কূপের মধ্য থেকে ঐ শব্দ আসছে। একটি মেয়ে উক্ত কূপের ভেতর পড়ে গেছে। তাকে তুলে দেখলেন, সে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের একমাত্র কন্যা দেবযানী। দেবযানী পিতার বড় আদরের মেয়ে। সে পিতার নিকট গিয়ে আবদার করে বললে, "বাবা, অসুরদের রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা খেলতে খেলতে আমায় ধাক্কা মেরে কুয়ার ভিতর ফেলে দিয়েছিল। রাজা যযাতি আমায় তার মধ্য থেকে তুলেছেন। শর্মিষ্ঠাকে শাস্তি দিতে হবে, সে আমার দাসী হবে। আর রাজা যযাতির সাথে আমার বিয়ে দেওয়া চাই।" শুক্রাচার্য এইসব কথা শুনে বললেন, "ওকি বলছিস?" খেলতে খেলতে ছোটদের ও রকম হয়। তার জন্যে কি অত রাগ করতে আছে? তা ছাড়া সে রাজকন্যা। তাকে দাসী করা উচিত কি? ওদিকে রাজা যযাতি হলেন ক্ষত্রিয়। আর তুই ব্রাহ্মণ কন্যা। তাঁর সঙ্গে তোর বিয়ে হওয়া যে অশাস্ত্রীয়! দেবযানী জিদ করে বললে, "না বাবা, ও হবে না। আমি যা বলছি তা করতেই হবে।" আদরের মেয়ে গোঁ ধরেছে! কি করেন! বৃদ্ধ পিতা শুক্রাচার্য দৈত্যরাজের কাছে গিয়ে বললেন, "তোমার মেয়ে শর্মিষ্ঠা এরূপ অন্যায় কাজ করেছে। তাই তার শাস্তিস্বরূপ তাকে দেবযানীর দাসী হয়ে থাকতে হবে।" দৈত্যরাজ কি করবেন? গুরুর শাপের ভয়ে অগত্যা স্বীকৃত হয়ে বললেন, "যে আজ্ঞে।" তারপর শুক্রাচার্য যযাতির কাছে গিয়ে বললেন, "তোমায় দেবযানীকে বিয়ে করতে হবে।" এদিকে যযাতির সঙ্গে শর্মিষ্ঠার গান্ধর্ব বিবাহ হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু ব্রহ্মশাপের ভয়ে তিনিও অনিচ্ছা সত্ত্বেও

দেবযানীকে বিয়ে করতে সম্মতি দিলেন। বিবাহান্তে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা উভয়ে রাজা যযাতির প্রাসাদে একত্রে বাস করছেন—একজন রানীরূপে, অন্যজন দাসীরূপে। কিন্তু হাজার হলেও শর্মিষ্ঠা রাজকন্যা। স্বভাবতই তার ওপর যযাতির প্রণয় গাঢ়তর হলো। দেবযানী ব্রাহ্মণ কন্যা ও অতিশয় অভিমানিনী। যদিও যযাতি ভয়ে ভয়ে তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন, তথাপি তেমন তার সঙ্গে খাপ খায় না। তিনি চুপি চুপি শর্মিষ্ঠার কাছে যেতেন। শেষে শর্মিষ্ঠার গর্ভে একটি ছেলে হলো। দেবযানী তা জানতে পেরে মহারাগ করল। পুনরায় বাপের কাছে অনুরোধ জানাল যযাতিকে ভয় দেখাতে। মেয়েরা সব যন্ত্রণা সইতে পারে; কিন্তু স্বামী অন্য নারীর কাছে যায়, এটা আদৌ সইতে পারে না। শুক্রাচার্য কি করেন? মেয়ের অনুরোধে যযাতিকে বললেন, "সাবধান! আর কখনো শর্মিষ্ঠার কাছে গিয়ে আমার মেয়েকে রাগিও না। সে বড় অভিমানিনী! আমিও তাকে এত ভালবাসি যে, তার অন্যায় আবদারও ফেলতে পারি না। ব্রাহ্মণের রাগ জানত?" যযাতি ভয় পেয়ে বললেন, "যে আজ্ঞে!" কিন্তু তিনি পূর্ববৎ গোপনে গোপনে শর্মিষ্ঠার কাছে যেতে লাগলেন। তার একে একে পাঁচটি ছেলে হলো, দেবযানীর একটি সন্তানও হলো না। শেষে দেবযানী কেঁদেকেটে বাপের কাছে গিয়ে নালিশ করল, রাজা যযাতিকে এই অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

আদুরে কন্যার অনুরোধে শুক্রাচার্য ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, "কামুক পামর! আমার মেয়েকে অবহেলা করলি? এখন জরাগ্রস্ত হয়ে ভোগশক্তিহীন হও।" এই কথা বলতে না বলতেই শাপের ফল ফলতে লাগল। যযাতি বসে আছেন। হঠাৎ দেখলেন, তাঁর গায়ের চামড়াগুলি ঢিলে হতে লাগল। দেখতে না দেখতে তাঁর চুলগুলি পেকে গেল, তাঁর দাঁতগুলি এক একটা করে নড়তে ও পড়তে লাগল। যযাতির গাত্রদাহ ও অঙ্গকম্পন হতে লাগল। ভাবতে ভাবতে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। দেবযানী এসে দেখল, তার পিতার শাপ অচিরে ফলেছে। কিন্তু নিজের স্বামীর এই দুর্দশা দেখে "একি হলো গো" বলে সে কাঁদতে লাগল। যত হোক, মেয়ে মানুষ তো! সে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে

বাপকে ধরে বলল, "যা হবার হয়েছে, বাবা। আমার পতির এরূপ দুরবস্থা দেখতে পারছি না। যেমন করে হোক তাকে ভাল করে দাও।" তখন শুক্রাচার্য চটে গিয়ে বললেন, "আচ্ছা মেয়ে দেখছি তো? তোর আবদারে অস্থির হলুম। তোর অনুরোধেই তো শাপ দিয়েছি। আবার এখন বলছিস শাপ ছাড়িয়ে নিতে। তা কি করে হয়?" তারপর একটু ধ্যান করে তিনি বললেন, "না। আমি যা বলছি, তা মিথ্যা হতে পারে না। তার ছেলেদের মধ্যে কেউ যদি এই জরা নিতে রাজি হয় তাহলে সে তার যৌবন ফিরে পেতে পারে। একজনকে এই দুর্ভোগ ভুগতেই হবে।"

এই বলতে বলতে শুক্রাচার্য যযাতির কাছে গিয়ে বললেন, "বাপু হে, তোমায় তো আমি আগেই সাবধান করে দিয়েছিলুম যে, ব্রাহ্মণ কন্যাকে চটিও না। যা হোক, এখন তুমি এক কাজ কর। তোমার ছেলেদের ডেকে জিজ্ঞাসা কর, তারা যদি কেউ তোমার এই জরা নিতে রাজি হয়, তাহলে তুমি আবার তোমার যৌবন ফিরে পাবে।" তখন যযাতি তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডেকে তাঁর জরা নিতে বললেন। সে অনেক ভেবেচিন্তে বললে, "দেখেছি, বার্ধক্য বড় কষ্টকর অবস্থা। এতে ক্ষুধামান্দ্য হয়ে যায়, ভোগের ইচ্ছা থাকলেও তা তৃপ্তির ক্ষমতা থাকে না। সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে পড়ে। জরাগ্রস্ত লোকের কাছে ঘৃণাভরে কেউ বসতেই চায় না। অতএব আমি এই জরা নিতে পারি না।" পুত্রের কথা শুনে যযাতি রেগে বললেন, "তুমি আমার কুপুত্র! আমার কথা না শুনলে রাজত্ব থেকে বঞ্চিত হবি।" পুত্র বলল, "তাও শ্রেয়।" এই বলে সে পিতার জরা নিতে অস্বীকার করলে। অনন্তর দ্বিতীয় পুত্র এসে আরও অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে পিতার জরা গ্রহণে অসম্মতি জানাল। এইরূপে ক্রমে চার পুত্র অস্বীকৃত হলে পঞ্চম পুত্র পুরু এসে দশ হাজার বছরের জন্য পিতার জরা গ্রহণ করতে রাজি হলো। তখন যযাতি তার ওপর খুব খুশি হয়ে তাঁকে রাজা করবেন বললেন ও নিজের জরা তাকে দিয়ে পূর্ব যৌবন ফিরে পেলেন। তারপর দশটি হাজার বছর ধরে তিনি যত রকমে যৌবন সম্ভোগ করতে পারা যায় করলেন। কিন্তু ভোগ করে কেউ কখনও তৃপ্ত হতে পারে না। মহাভারতে আছে—

ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্ধতে ॥

—কামীদের কামনা কদাপি উপভোগ দ্বারা প্রশমিত হয় না। হবিঃ (ঘৃত) সংযোগে কৃষ্ণবর্ত্ম (অগ্নি) যেমন বর্ধিত হয়, তদ্রূপ কামনা, ভোগ দ্বারা বহু গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভোগ ত্যাগ করিলে কামনা নিবৃত্ত হয়।

এইরূপে দশ হাজার বৎসর কাল নানাভাবে যৌবন সম্ভোগ করে রাজা যযাতি যখন দেখলেন যে, তাঁর ভোগস্পৃহা মোটেই কমেনি, বরং বেড়ে গেছে তখন তাঁর মনে তীব্র বৈরাগ্য এল। জরাগ্রস্ত পুত্র পুরুকে ডেকে যযাতি তার যৌবন তাকে ফিরিয়ে দিলেন। আর নিজে বৈরাগ্য অবলম্বন করে ব্রহ্মচিন্তায় মনোনিবেশ করলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—যে কোন কাজে successful (সিদ্ধকাম) হতে হলে সেই কাজকেই ইষ্ট বলে জানতে হবে। স্বামীজীও বলেছেন, "Whatever you do, let that be your worship for the time being—যখন যে কাজ করবে তখন সেটাকে তৎকালীন আরাধনা বলে মনে করবে।" দুইদিন শখের বশে কাজ করলুম, তারপর ভাল না লাগলে ছেড়ে দিলুম। এরূপ হলে চলবে না। শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) দেখিয়ে গিয়েছেন, কিরূপে কাজ করতে হয়। প্রায় পনের বৎসর একস্থানে একভাবে কাটিয়ে গিয়েছেন। মাঝে মাঝে তিনি এমন কষ্ট পেতেন যে, স্বামীজীকে, এমনকি ঠাকুরকেও অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতেন। সেসব ভাষা মুখেও আনা যায় না। কিন্তু তবু ছাড়েননি! স্বামীজী বলতেন যে, শশীর bull-dog tenacity (ডাল-কুত্তার মতো কামড়ে লেগে থাকার সামর্থ্য) আছে।

কেদারবাবা—একবার স্বামীজীর কাছে কথা উঠেছিল, জ্ঞান ও ভক্তি এবং কর্ম ও যোগের মধ্যে কোন্‌টা বড়? তিনি বললেন, "যেটাই বড় হোক না কেন, একটা ভাল করে ধর দেখি! যেটা হয় একটা ধরে সেটা ভালভাবে করত!"

ইতোমধ্যে দুটি বৃদ্ধা স্ত্রীভক্ত এসে প্রণামান্তর হরি মহারাজের শারীরিক

কুশল প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন। তাঁর পা একটু সামান্য ফুলেছে শুনে তাঁরা বললেন, "শীতকালে উহা বাড়ে।" তাই বৈকালে আকন্দ পাতা গরম করে তাহা ছড়াইয়া ফ্লানেল বা তুলার দ্বারা পা বাঁধিয়া রাখিতে তাঁরা অনুরোধ করিলেন। এঁদের আগমনে কথার স্রোত অন্য দিকে পরিবর্তিত হওয়ায় মনে হয়েছিল, কর্মযোগ সম্বন্ধে কথা সেদিন আর উঠবে না; কিন্তু হরি মহারাজ নিষ্কাম কর্মের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। চারদিকে দুঃখ-দারিদ্র্যের সংবাদ পাইয়া তিনি প্রায়ই সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদিগকে নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবা দ্বারা কৃতার্থ হবার জন্য তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় উৎসাহিত করেন। উক্ত স্ত্রীলোকদ্বয় চলিয়া গেলেই তিনি বলিতে লাগিলেন, "কাজ করতে হলে সেটাকেই ইষ্ট বলে ধরতে হবে। সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান, সেই কাজকে জীবনের উদ্দেশ্য করতে হবে। আর সে কাজ সফল কি নিষ্ফল হলো, সে দিকে আদপেই লক্ষ্য করবে না।"

তারপর স্বামী তুরীয়ানন্দ সাত্ত্বিক কর্তার বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মচারী সনৎকুমারকে তাঁর সংস্কৃত গীতাখানা আনিতে বলিলেন। গীতা আনীত হলে উহা নিজেই পড়িয়া এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। গীতায় আছে—

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ —১৮/২৬

মুক্তসঙ্গঃ (মুক্তঃ পরিত্যক্তঃ সঙ্গঃ আসক্তি যেন) অনহংবাদী (গর্বোক্তি-রহিত) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (ধৃতি ধৈর্য্যং উৎসাহঃ উদ্যমঃ, তাভ্যাম্ সমন্বিতঃ যুক্তঃ—তার উৎসাহ চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (ক্রিয়মানস্য কর্মণঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌঃ চ) নির্বিকারঃ (হর্ষবিষাদশূন্যঃ) কর্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে।

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ —১৮/২৭

—রাগী (পুত্রাদিতে প্রীতিমান) কর্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্মফলকামী) লুব্ধঃ (পরস্বাভিলাষী, পরের ভাল জিনিস দেখলে লোভ) হিংসাত্মকঃ (যার স্বভাব পরকে দুঃখ দেয়) অশুচিঃ (শৌচশূন্য, বাহিরে ও ভিতরে অপরিষ্কার)

হর্ষশোকান্বিতঃ (কাজ সফল হলে খুব খুশি হয়ে হয়ত নাচতে থাকে; আর নিষ্ফল হলেই একবারে বিষণ্ণ হয়ে যায়) কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ —১৮/২৮

অযুক্তঃ (অসমাহিত) প্রাকৃতঃ (বিবেকশূন্য) স্তব্ধঃ (অনম্র, লোকে যেমনই ভাবুক না কেন, নিজে নিজে ভাবছে, আমি খুব বড়লোক। কারুর সঙ্গে কথা কইবে না) শঠঃ (মায়াবী, কাজ করার খুব শক্তি আছে কিন্তু দেখাবে, যেন কিছুই পারে না। পরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার মতলব) নৈষ্কৃতিকঃ (পরাপমানকারী) অলসঃ (কর্মে অপ্রবৃত্তিশীল) বিষাদী (সদা অবসন্নচিত্ত) দীর্ঘসূত্রী চ (যৎ অদ্য শ্বো বা কর্তব্যং তৎ মাসেনাপি যো ন সম্পাদয়তি— আজ কি কালই যা করা যায় তা একমাসেও যে করবে না) তাদৃশশ্চ কর্তা তামসঃ উচ্যতে।

॥ পাঁচ ॥

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ ১৫ অক্টোবর। বৈকাল প্রায় চারটায় কাশীধাম রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উল্লিখিত বাসগৃহে কেদারবাবা এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ উপস্থিত। আজ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর একটু অম্ল হয়েছে। তাঁর যকৃৎ একটু দুর্বল হওয়ায় কোষ্ঠ পরিষ্কার প্রায়ই হয় না। তাঁর জিহ্বা বহুদিন থেকে সাদা হয়ে আছে।

কেদারবাবা—ওরা বলছিল যে, আজ আপনি অনেক খেয়েছেন, পাতে কিছুই পড়ে ছিল না। অন্য দিন নাকি পাতে কিছু কিছু পড়ে থাকে; আজ সবটা খেয়েছেন, শুনলাম।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—না, কে বললে? আমি রোজ যেমন খাই, আজও তেমন খেয়েছি। কপি, পটল ও বড়ি দিয়ে ডালনা করেছিল। তার মধ্যে পটলগুলি সব পাতে পড়েছিল। বড়ির জন্যই বোধ হয় পেটের অসুখ করেছে। চিংড়ি মাছের বড়া করেছিল। তা আবার পুড়িয়ে ফেলেছে! আমি তার দুই তিনটার

বেশি খাইনি। একজন মানুষের জন্য রাঁধবে এতগুলো? মানা করলেও শোনে না! কপি এনেছে দুটো দশ পয়সা দিয়ে। তা একদিনেই তরকারিতে দিয়ে দিয়েছে। ঘরে জিনিস এলে আর কথা নাই। সব সাবাড় করতে পারলেই যেন বাঁচে। বড় উড়ুন-চড়ে স্বভাব। পটল খাই না জানে। তবু তাই আনবে। বেশি দাম কি না। ওদের তো গায় লাগে না; কিন্তু আমি তো জানি, পয়সা আনা কি কষ্টকর। রোজ দুই সের করে দুধ খাই। দুধের দর টাকায় ছয় সের। তাতে মাসে দশ টাকা লাগে। এত টাকা কোত্থেকে আসে! একটু গৃহস্থালিভাবে চলতে হয়। সেবাশ্রম থেকে দুধ আনা হয়। সেখানে রোজ দেড় মণ দুধ রাখা হয়। গোয়ালা সকালে বৈকালে আশ্রমে গাই নিয়ে এসে সেবকদের সম্মুখে গাভী দোহন করে। পূর্বে দুধ টাকায় দশ সের দর ছিল। ক্রমে কমে এখন টাকায় ছয় সেরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তথাপি সেবকদের সম্মুখেই গোয়ালা দুধের সঙ্গে জল মিশায়। বাধা দিলে তুমুল ঝগড়া করে। এতদ্ভিন্ন বাড়িতে গাইগুলিকে খুব নুন খাওয়ায় এবং তজ্জন্য তারা খুব জল খায়। ফলে দুধ অত্যন্ত পাতলা, লবণাক্ত এবং আস্বাদহীন হয়। কিন্তু দুধ বেশি দেয়। অন্য গোয়ালা নিয়মিতরূপে এত দুধ রোজ সরবরাহ করতে পারবে না। এই ভয়ে সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষ বর্তমান গোয়ালাকে জবাব দিতে সাহস পান না এবং তার সমস্ত অন্যায় নীরবে সহ্য করেন। সেবকের অভাব এবং ঝঞ্ঝাট মনে করে আশ্রমে গরু পালন করাও তারা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না।

দুধ এত লবণাক্ত লাগে কেন আগে বুঝতে পারিনি। আর দুধে কখনো সর পড়ে না। তারপর শুনলুম, গরুগুলিকে নুন খাওয়ায়। শুনেছি, কলকাতার ওদিকে ফুঁক দিয়ে গরুর দুধ বাড়ায়। ও দুধ খেতে আমার ঘেন্না করে। অন্য দুধ না পেলেও ঐ দুধ আর খাব না। উপমন্যুর এ রকম দুধ খাবার শখ হয়েছিল। সে মাসির বাড়িতে গিয়ে দুধ খেয়ে এসেছিল। বাড়িতে এসে সে মাকে ধরলে দুধ দিতে হবে। বিধবা মা দুধ কোথায় পাবে? সে পিঠালি গুলে দুধ বলে তাকে খেতে দিল। উপমন্যু তা খেয়ে দেখলে, এটা সেই দুধের মতো সুস্বাদু লাগছে না। মা বললে, "এই তো দুধ।" কিন্তু উপমন্যু কিছুতেই না

মানায়, শেষে তার মা কাঁদতে লাগল। বললেন, "আমি দুঃখিনী। আমি কোথায় পাব, বাবা। শিব হচ্ছেন ধনদাতা। তুমি যদি তপস্যা করে তাঁকে তুষ্ট করতে পার, তাহলে তাঁর বরে দুধ পাবে।" তখন উপমন্যু কঠোর তপস্যা লাগিয়ে দিলেন। বহু কাল তপস্যার পর মহাদেব প্রসন্ন হয়ে তাকে দেখা দিলেন ও বর চাইতে বললেন। উপমন্যু যে শুধু দুধের বর চেয়েছিলেন তা নয়। মহাভারতের মধ্যে তিনি এক বিখ্যাত মুনি ছিলেন।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীদের মধ্যে জাম্ববতীর (শাম্বের মাতার) পুত্র হয়েছিল না। একদিন তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, "প্রভো, আপনার কৃপায় আমাদের সকলেই পুত্রবতী হয়েছেন। আমি অভাগিনী পুত্রহীনা। দয়া করে একটি পুত্র দিয়ে আমার বাসনা পূর্ণ করুন।" তখন শ্রীকৃষ্ণও ভেবেচিন্তে দ্বারকা ছেড়ে গিয়ে উপমন্যু ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং তাঁর কাছে দীক্ষিত হয়ে তাঁর উপদেশ অনুসারে দীর্ঘকাল শিবধ্যানে মগ্ন হলেন। অনন্তর শিবের কৃপায় জাম্ববতীর গর্ভে শাম্ব জন্মগ্রহণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত পুত্রলাভের জন্য শিবের উপাসনা করতে হয়েছিল। মহাভারতে আরও অনেক জায়গায় শিবের উপাসনার কথা দেখা যায়। তাই তো স্বামীজী বলতেন, মহাভারতের দেবতা শিব, শ্রীকৃষ্ণ নন।

আমি মোষের দুধ খেতে পারি না। ওতে কেবল চর্বি বৃদ্ধি করে। গাই দুধের মতো কি দুধ আছে! যুধিষ্ঠির ছোট কাল থেকে গাই দুধ ভালবাসতেন, আর দুর্যোধন মোষের দুধ ভালবাসতেন। উভয়ের স্বভাব কত পৃথক দেখ। যে কোন দ্রব্য বৃথা নষ্ট করা অত্যন্ত অন্যায়। একজন লেবুর বুকা বেশি করে কেটে ফেলেছিল বলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে কেমন বকেছিলেন, জান তো ?

ভক্ত—মহারাজ, কিন্তু লেবুর বুকা যত বেশি করে কাটা হবে, তত বেশি রস পাওয়া যাবে। (এই কথা কাহারো মনোযোগ আকর্ষণ করিল না।)

স্বামী তুরীয়ানন্দ—কাহারো পাতে ভাত পড়ে থাকলে শশী মহারাজ অত্যন্ত চটে যেতেন।

কেদারবাবা—হ্যাঁ কেউ যদি বলত, কুকুরে ঐ ভাত খাবে, তাহলে তিনি রেগে বলতেন, "কি? দেবতার ভোগ কুকুরের জন্য?"

এইসব কথা হইতেছে, এমন সময় স্বামী মহিমানন্দ আসিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে প্রণামান্তে উপবেশন করিলেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—কেমন আছ?

স্বামী মহিমানন্দ—বেশ আছি মহারাজ। কাশীর মতো কি আর স্থান আছে? আমি কাশীর মাহাত্ম্য আগে এত জানতুম না। তারপর "কাশী খণ্ড" পড়ে যা দেখলুম তাতে কাশী ছেড়ে আর কোথাও যাবার ইচ্ছা নাই।

ভক্ত—মহারাজ, বেলুড় মঠের গভর্নিং বডি এঁকে রামকৃষ্ণ মিশনের হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু ইনি কনখল ও বৃন্দাবন সেবাশ্রমের সব শাখার হিসাব পরীক্ষা করে এখানে এসে বসেছেন; আর নড়ছেন না। আমাদের আশা ছিল, ইনি ক্রমে ঢাকায়ও যাবেন।

স্বামী মহিমানন্দ—আর ঢাকা! কাশী ছেড়ে আর কোথাও যাচ্ছি না।

কেদারবাবা—তা বৈ কি। আহা! কাশীর মতো কি আর স্থান আছে! এখানে থাকলে মনটা স্বতই স্থির হয়ে বিশ্বনাথের পায়ে যুক্ত হয়। রাত তিন-চারটা থেকে লোকে "বাবা বিশ্বনাথ" "বাবা বিশ্বনাথ" বলতে বলতে ছুটতে থাকে।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—তা বৈ কি। এখানে থাকাই তো এইজন্য—রোজ রোজ গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ দর্শন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত পায়ে ব্যথা হওয়ায় বিশ্বনাথ দর্শন হচ্ছে না। কেবল একদিন হয়েছিল।

স্বামী মহিমানন্দ—মহারাজ, আমার তো রোজ বিশ্বনাথ দর্শন করতে করতে এমন একটা টান হয়ে গেছে যে, একদিন কোন কারণে তাঁকে দর্শন না করতে পারলে মনটা ভারী খারাপ হয়ে যায়।

ভক্ত—মহারাজ, কিন্তু আমার কপাল-দোষে এসব কিছুই অনুভব হলো না। আমি ওখানে গিয়ে কেবল বিশ্বনাথকে শিলারূপেই দেখি। আপনাদের মতো কোন টান তো অনুভব করি না।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—ইয়া! ওকি বলছ! সবাইয়ের হয়, আর তোমার হয় না?

ভক্ত—না মহারাজ। প্রাণের ভিতর ঠিক ঠিক অনুভব না করে শুধু মুখে বললে কি হবে? এতকাল ধরে লাখ লাখ লোক ছুটে আসছে ব্যাকুল হয়ে বিশ্বনাথ দর্শনের জন্য। এর একটা ফল আছেই। এ কথা বুঝলে কি হবে? প্রাণে অনুভব না করলে কি করবো বলুন?

স্বামী তুরীয়ানন্দ—মানুষের এমনি ভক্তি না হলে চোখে তেল-আবির গুঁজে দেয়। চৈতন্যদেবের সময় একজন বাস্তবিকই তাই করেছিল। শ্রীবাসের আঙিনায় কীর্তনের সময় সকলেরই চোখে ভক্তিতে দরদর করে জল পড়ত। একজনের চোখে কোন দিনই জল বেরত না। তাই সে মনের দুঃখে চোখে আবির দিয়ে কাঁদছিল। কতক্ষণ পরে চৈতন্যদেব তা জানতে পেরে অমনি এসে তাকে কোল দিলেন। এই ভেবে যে, চোখে জল না আসায় এর মনে যখন এত দুঃখ হয়েছে তখন এর মধ্যে নিশ্চয়ই খুব ভক্তি আছে।

কেদারবাবা—ইনি sincerely (সরলভাবে) বলছেন। প্রাণের ভিতর অনুভব না করায় এর নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছিল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—হবে, হবে। তাঁর কৃপায় আপনিই হবে।

॥ ছয় ॥

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর। অপরাহ্ণ প্রায় চারটায় কাশীধাম রামকৃষ্ণ মিশনের পূর্বোক্ত গৃহে কেদারবাবা, স্বামী ধ্রুবানন্দ, ব্রঃ যুক্তিচৈতন্য, শিবরাম প্রভৃতি উপস্থিত। স্বামী তুরীয়ানন্দ উক্ত গৃহে বসিয়া রেঙ্গুন হইতে আগত চিঠিখানা পড়িতেছেন! ঐ চিঠি ক্ষুদুমণি* নামে পরিচিত একটি ব্রহ্মচারী লিখেছেন। সেখানকার দুর্ভিক্ষে ও বন্যায় পীড়িত লোকদিগকে সাহায্যার্থ রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য খোলা হইয়াছে। উহাতে মাসে প্রায় একহাজার টাকা খরচ হইতেছে। ইহা ছাড়া একজন লোক চার শত মণ চাল দিয়েছেন। স্থানীয় কমিশনার সাহেব এবং ওখানকার সেবাশ্রম মিলিতভাবে সেবাকার্য

১ পরবর্তী কালে স্বামী শ্যামানন্দ নামে পরিচিত এবং রেঙ্গুন সেবাশ্রমের সর্বাধ্যক্ষ।

করিতেছেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী ক্ষুদুমণিই সেবাকার্যের পরিচালক এবং আর এক ব্রহ্মচারী তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। কার্যক্ষেত্র একশত বর্গমাইল ব্যাপী বিশাল। ষোল সতের মাইল দূরের প্রার্থীও সাহায্য পাইতেছে।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—ক্ষুদুমণি বেশ লিখেছে, "যার কৃপায় ক্ষুদুমণি এই অদ্ভুত কাজ করছে, দুঃখের বিষয়, তিনি এখন নশ্বর দেহে বর্তমান থেকে এইসব দেখলেন না।" বাবুরাম মহারাজের কথা সে লিখেছে। তিনিই ওকে মঠে এনেছিলেন কি না! বেশ লিখেছে, "নশ্বর দেহে দেখলেন না।" অর্থাৎ দেখছেন; কিন্তু নশ্বর দেহে নয়। ওর আগের অবস্থা জান তো? পঞ্চরঙ নেশাখোর ছিল। না করেছে এমন নেশা নাই; কিন্তু এখন খুব কাজের লোক। এত বড় কাজটা একা একা করেছে। কি পরিবর্তন!

ভক্ত—তিনি খুব খাটতে পারেন। আর কাজে হাত দিলে দেখা যায়, তাঁর কৃপায় টাকার অভাব কখনও হয় না। কুড়িয়ে আনলেই হলো; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কুড়াবার লোকই পাওয়া যায় না। আমিও তো যত জায়গা দেখেছি, এসব কাজের জন্য কোথাও টাকার অভাব হয় না, লোকেরই অভাব হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—হাঁ। কনখলের ঋষিকুল আশ্রম যখন হলো দেরাদুনের লোক অনন্ত নারায়ণ চার মাসের ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে আড়াই লাখ টাকা নিয়ে এল, শুধু মাড়োয়ারীদের কাছ থেকে। কনখলের সেবাশ্রম যখন আরম্ভ হলো, তখন পুঁজি মাত্র একশ পঞ্চাশ টাকা। প্রথম তিন চার টাকার ভাড়াটে বাড়িতে সেবাশ্রম ছিল। তারপর জায়গাটা হলো। এক সাধুর সঙ্গে এদের জানাশোনা ছিল। কোন শেঠ সেই সাধুকে খুব শ্রদ্ধা করত। সে একবার এলে কথায় কথায় উক্ত সাধু তাকে এমন সব hints (ইঙ্গিত) দিলেন যে, তিনি স্পষ্ট অনুরোধ না করলেও সে বুঝে নিলে। তারপর সে একেবারে সেবাশ্রমে এসে হাজির। তখন ওরা চালার ঘরে থেকে সেবা-শুশ্রূষা করত। এদের কি অভাব আছে, শেঠ জিজ্ঞাসা করতে কল্যাণানন্দ প্রভৃতি বললে, এই ঔষধপত্র বানরে এসে নষ্ট করে। তাই পাকা ঘরের দরকার। ঠিক যত টাকা লাগবে এস্টিমেট (আন্দাজ) করতে বলে সে সেদিন চলে গেল। কিন্তু ওদের আর

এস্টিমেট করা হয়ে উঠছে না। শেষে সে আর একদিন এসে বললে, "আপনারা দেরি কচ্ছেন। এ ভাল নয়। আমরা গৃহী লোক। এখন মন হয়েছে তাই টাকা দেওয়া খুব সোজা। কিন্তু এর পরে ঘরে চলে গেলে মন ঘুরে যাবে। তখন টাকা বের করা কঠিন হবে। যা হয় শীঘ্র করুন।" তারপর হরিপ্রসন্ন মহারাজকে (স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে) আনিয়া ওদের থাকবার ঘর আর ডিসপেন্সারিটা ছয় হাজার টাকায় করিয়ে নিলে। এক সাবজজ মাসিক পনের টাকা দামের আটা, ঘি প্রভৃতি ওদিগকে দিত। কে তাকে গিয়ে লাগালে, ওরা কিছুই করে না। একবার সে কনখলে এসে কিছু না বলে ওদের আশ্রমে এল। দেখলে, ওরা পুরনো ঘা ধোয়াচ্ছে—তাতে পোকা পড়েছে। তাই টেনে টেনে বার করছে। এই দেখেই সে বললে, "আমি এই জন্যই এসেছিলুম। যা দেখলুম, তাতে বুঝলুম, আপনারা ধন্য, আর আমার দান সার্থক।" তখন ওরা খুব খাটত, নিশ্চয়ানন্দ প্রভৃতি। ওদের সেবাশ্রম বেশ জায়গায় হয়েছে। কাছেই খালের ওপারে ঋষিকুল আশ্রম। ঋষিকুলের পরে গুরুকুল ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়। তা বেশ ভালরকম চলছে। ফি বছর মেলার সময় তিন দিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা তারা তোলে। লেকচার প্রভৃতি হয়; আর ছেলেরা বেদ-মন্ত্র আবৃত্তি করে। এখানেও কেদারবাবা প্রভৃতি অল্প পুঁজি নিয়ে সেবাশ্রম আরম্ভ করেছিলেন।

ভক্ত—ইনি এখনও এতে থাকলে, এত দিনে যা হয়েছে তার চেয়ে আরও ভাল হতো।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—তার অসুখ হলো যে! এর জন্য খেটে খেটেই তো এর শরীর এমন খারাপ হয়ে পড়েছিল। অদ্বৈতাশ্রমের একজন ক্ষেত্রী* পাঁচশত টাকা দিয়েছিলেন। তাই নিয়ে মহাপুরুষ মহারাজ আশ্রম আরম্ভ করে পাঁচ বৎসর আশ্রমে পড়েছিলেন। তিনি মাঝে দুবার—একবার আলমোড়ায় অন্যবার আর কোথায় গিয়েছিলেন। সেও এর জন্য টাকা তুলতে। যখন আমরা আলমোড়ায় ছিলুম, তখন তিনি একবার পূর্ববঙ্গের বন্যার জন্য দোকানদারদের কাছে ঘুরে ঘুরে কয়েকটা টাকা তুলে পাঠিয়েছিলেন।

---

২ ভিঙ্গার রাজা

কেদারবাবা—অদ্বৈতাশ্রমে প্রথমে আমিও ছিলুম, মহারাজ। বৈকালে মোট পাঁচখানা রুটি দিয়ে ঠাকুরের ভোগ হতো। আমরা দুজন ছিলাম। তাই ভাগে আড়াইখানা করে রুটি পড়ত। শেষে সেই টাকাও ফুরিয়ে গেল।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—আমার ইচ্ছা হয়, এখানে একটা আশ্রম-টাশ্রম খুলে দিই।

ভক্ত—ওরা তো অদ্বৈতাশ্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রম খুলবেন, ঠিকই করেছেন। আর আপনার আশীর্বাদই তো ওদের ভরসা। তাহলে তো সেই আশ্রমই আপনার হলো। শিবরাম একটা স্কুল তৈরি করেছেন। সেটা নাকি খুব সুন্দর হয়েছে।

একজন সাধু—ব্রহ্মচর্যাশ্রম, কি বিদ্যালয় করবে—এখনও ঠিক হয় নাই।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—যা সুবিধা মনে করে তা আরম্ভ করুক। তারপর যা হয় হবে।

এইসব কথা হইতেছে এমন সময় স্বামী মহিমানন্দ আসিয়া প্রণামান্তে উপবেশন করিলেন। আরও কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর সকলে বিদায় লইলেন।

(উৎস ঃ শ্রীগুরু-প্রসঙ্গ)

শ্রীশ্রীহরি মহারাজের স্মৃতিকথা

অমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

পূজ্যপাদ হরি মহারাজকে আমি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে বেলুড় মঠে প্রথম দর্শন করি। ঐ দর্শনের মূলেও পূজনীয় কেদারবাবার প্রেরণা। সুদূর ময়মনসিংহ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের সময় মঠে আসিয়া হরি মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করিলাম। তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "কেদারবাবা আপনার সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়াছেন।" হরি মহারাজ এই কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হন এবং বলিলেন, "কেদারবাবা, বেশ বেশ।" সেদিন আর কোন কথা হইল না।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল কি মে মাস। বাগবাজার উদ্বোধন মঠে হরি মহারাজ তখন অসুস্থ। তিনি পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের ঘরের দক্ষিণ দিকের দরজার নিকট তক্তপোশে শায়িত ছিলেন—হরি মহারাজের সেবকদ্বয় (সনৎ মহারাজ ও প্রিয় মহারাজ) আমাকে বারবার সাবধান করিয়া দিলেন—আমি যেন ঘরে ঢুকিয়া কোন কথা না বলি। তদনুসারে আমিও প্রণাম করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সামান্য কুশল প্রশ্নের পর আমি প্রণাম করিয়া বিদায় নিলাম।

এই সময় আমি কালীঘাটে থাকিতাম। কালীঘাট হইতে প্রায়ই হরি মহারাজকে দর্শন করিতে বাগবাজার মঠে যাইতাম। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "তুমি রোজ কালীদর্শন কর তো?" আমি বলিলাম, "হাঁ, মহারাজ। নাটমন্দির ও মূল মন্দিরের মধ্যে যে সরু রাস্তা আছে, সেখান হইতে কালীমাকে দর্শন করি।"

হরি মহারাজ—মন্দিরে কেন যাও না?

আমি—মন্দিরের বারান্দায় গেলে পয়সা নেয়, তাই যাই না। (সেই সময় মন্দিরে ঢুকিতে দর্শনী দিতে হইত, এখন উঠিয়া গিয়াছে।)

হরি মহারাজ—কত বাজে পয়সা তোমাদের খরচ হয়, দুপয়সা খরচ করে মন্দিরে গিয়ে দর্শন করাই ভাল।

আমি—আচ্ছা, মহারাজ, এখন হইতে যাইবার চেষ্টা করিব।

ঐদিন আমার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল—শ্রীশ্রীঠাকুরই স্বয়ং কালী কিনা? কিন্তু বেশি কথা বলা নিষেধ, তাই মনের প্রশ্ন মনেই গোপন রহিল, জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পাই নাই। এমন সময় গোলাপ-মা আসিয়া উপস্থিত। আমি একটু সঙ্কোচ করাতে গোলাপ-মা ও হরি মহারাজ উভয়েই বলিয়া উঠিলেন, "থাক, থাক। তোমাকে সঙ্কোচ করতে হবে না।"

গোলাপ-মা আমার পাশেই বসিলেন।

গোলাপ-মা বলিলেন, "দেখ, হরি ভাই! তোমাকে একদিনের ঘটনা বলছি—আমরা তখন যুবতী, শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রায়ই যাই। একদিন ঠাকুরের ভাবাবেশ হয়েছে। আমরা একঘর মেয়ে বসে আছি। তিনি হঠাৎ আমাদের সামনে এসে একেবারে দিগম্বর হয়ে দাঁড়ালেন। পরিধানের কাপড় বগলে। এসেই বললেন, "তোরাও যা, আমিও তা; কেবল দাড়িগুলি রয়েছে—এইত; এইত।" ক্রমে তিনি ভাব সংবরণ করে বিছানায় গিয়ে বসলেন। "দেখ, হরিভাই, আমরা তো সকলেই তখন যুবতী, কিন্তু ঠাকুরকে দেখে কাহারও কোন লজ্জা হতো না। অন্য কেউ এ রকম উলঙ্গ হয়ে এলে আমরা তখন কোথায় পালাতুম ঠিক ছিল না। কিন্তু ঠাকুরকে দেখে কোন সঙ্কোচ এলো না। এখনই যত সঙ্কোচ হচ্ছে।"

হরি মহারাজ—শ্রীশ্রীঠাকুরই সেই আদ্যাশক্তি। স্ত্রী-শরীরে আসেননি, তার কারণ—প্রচারের অসুবিধা হতো। তিনি কালী ভিন্ন আর কে?

আমার প্রশ্নের সমাধান এই ঘটনাতেই হইয়া গেল। আমিও শুনিয়া অবাক। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য জয়রামবাটী যাইব ঠিক করিয়াছি। হরি

মহারাজকে এই কথা নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ। অত কষ্ট করে কেন যাবে? শরৎ ভাই (শরৎ মহারাজ) মাকে কলকাতায় আনতে গেছে। এখানেই তুমি তাঁর (শ্রীশ্রীমার) দর্শন পাবে।" আমি তাঁহারই নির্দেশমত সে যাত্রায় আর জয়রামবাটী যাই নাই। অল্পদিন পরেই মা অসুস্থ অবস্থায় শরৎ মহারাজের সহিত কলকাতায় আসিলেন। আমিও খবর পাইয়া আমার গর্ভধারিণী মাকে লইয়া মাতৃদর্শনে আসিলাম। মায়ের দর্শনের পর আমি হরি মহারাজকে দর্শন করিতে যাই। প্রণাম করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কেমন, শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন হলো তো?" আমি বলিলাম, "হাঁ, মহারাজ। দর্শনের তো কোন আশাই ছিল না, আপনার আশীর্বাদ ও শ্রীশ্রীমার অহেতুকী কৃপায় সম্ভব হইল।"

পরবর্তী দর্শন ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে। হরি মহারাজ তখন কাশী সেবাশ্রমে। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। আমিও এই সময় আমার গর্ভধারিণীর সহিত কাশীতে তীর্থোপলক্ষে আসিয়াছি। সেবাশ্রমের অদূরেই আমাদের বাসা। রোজই বৈকালে হরি মহারাজের নিকট যাইতাম। কাশীতে তখন অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে—১২০° পর্যন্ত তাপ উঠিতেছে। হরি মহারাজের উপস্থিতিতে জ্ঞানেশ্বর মহারাজ, ললিত মহারাজ গীতা বা ভাগবত পাঠ করেন। হরি মহারাজ মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের শ্রীমুখের বাণী দ্বারা এই সকল শাস্ত্রের সরল ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। এইভাবেই গীতাপাঠ চলিতেছিল। একদিন জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলিলেন—আজ বড় গরম ১২০°। পূজনীয় হরি মহারাজ গীতার 'মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং-স্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥' (২/১৪)—শ্লোকটি উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "দেখ, শ্রীকৃষ্ণও এমন কথা বললেন না যে, দুঃখ হবে না, বরং বললেন—তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত, অর্থাৎ সহ্য কর। সহ্য করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, তাই তিনি সহ্য করতেই বললেন। আমাদের ঠাকুরও বলতেন—'সহ্য কর, সহ্য কর।' মানুষ কিন্তু সহ্য করতে চায় না। কেমন ফাঁক খোঁজে, কি করে দুঃখের হাত থেকে মুক্ত হবে। বাস্তবিক মন উচ্চাবস্থায় থাকলে দুঃখ কাহাকেও

অভিভূত, দুঃখিত করতে পারে না। যে মনে দুঃখ হবে, সে মনই যখন উচ্চাবস্থায় থাকে, তখন আর কি করে তাকে দুঃখ দিবে! সহ্য করতে অভ্যাস করা দরকার। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'যে সয়, সে রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়।'" আবার পাঠ আরম্ভ হলো। হরি মহারাজ নিজেই গীতার শ্লোক পড়িতে লাগিলেন; মহারাজের মুখে গীতার শ্লোক এমনই মর্মস্পর্শী মনে হইল যে, এমন সুললিত সংস্কৃত-আবৃত্তি জীবনে আর শুনি নাই। সকলেরই মন নিবিষ্ট হইল। কোথায় রহিল গরম? গ্রীষ্ম যেন সেই সময়ের জন্য আমাদের উত্তপ্ত করিতে ভুলিয়া গেল। পাঠান্তে সেদিনের মতো বিদায় লইলাম।

আর একদিনের কথা, সেদিন আমার মা সঙ্গে ছিলেন। মা তখন অত্যন্ত শোকার্তা ছিলেন, কারণ আড়াই মাস পূর্বে আমার একমাত্র ভগ্নীপতির মৃত্যু হয়। পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রণাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে মা কাঁদিতে লাগিলেন। হরি মহারাজ মাকে বলিলেন, "মা, তুমি কেঁদো না। আমি এর নিকট (আমাকে দেখাইয়া) দুঃসংবাদ শুনেছি। তুমি কাশীতেই থেকে যাও। এখানেই তোমার শান্তি হবে।" বাস্তবিক তাঁহার আশীর্বাদে মায়ের মনে ক্রমে শান্তি আসিল এবং দীর্ঘদিন কাশীবাস করিয়া কাশীতেই মা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

হরি মহারাজ ২০ জুলাই ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। স্থূল শরীরে তাঁহার দর্শন আমার ভাগ্যে আর মিলে নাই।

(উৎস ঃ শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদগণের স্মৃতিকথা)

স্বামী তুরীয়ানন্দ-স্মৃতি

গুরুদাস গুপ্ত

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিবেকানন্দ সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশনের দিন মঠে নানারূপ দার্শনিক প্রবন্ধ পাঠ হইতেছিল। সবই শুষ্ক, নীরস বোধ হইতে লাগিল। সময় বৃথা যাইতেছে মনে করিয়া বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। কয়েকদিন পূর্বে মঠে, কোন এক বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে খুব ভোরে উপস্থিত হইয়া দেখি, গঙ্গার দিককার বারান্দায় উপনিষদ্ পাঠ হইতেছে। দিব্যকান্তি এক যুবক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। অঙ্গে গৈরিকবাস, দীর্ঘাকৃতি অতি রমণীয় মূর্তি! চমৎকার উচ্চারণ, যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গীর কথোপকথন বিষয়ক। মনে একটি অস্বস্তির ভাব লইয়া গিয়াছিলাম। সাময়িক একটু ভাল বোধ করিলেও উহা স্থায়ী হইল না। ইতস্তত ঘুরিয়া কলকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। মনের অস্বস্তিবোধ পূর্ববৎ রহিয়া গেল। আজ বিশেষভাবে সুস্থির হইয়া যাইতে পারিব আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু নীরস প্রবন্ধ পাঠ শ্রবণে কোন উপকার বোধ হইল না। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে একটি সন্ন্যাসী উঠিয়া কয়েকটি কথা বলিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, তাঁহার স্বল্প কয়েকটি কথায় আশাতীত ফল পাইলাম। বক্তার বক্তৃতায় বিদ্যার আড়ম্বর নাই, ভাষার অসাধারণ লালিত্য নাই, অথচ বক্তৃতার ভাব মর্মস্পর্শ করিল। সন্ন্যাসী প্রবরের মুখাকৃতিতে কোন বিশেষত্ব ছিল কিনা তখন বোধ করিতে পারি নাই। বরং তাঁহাকে সাধারণ রকমের লোক বলিয়াই তখন মনে হইয়াছিল। বিশেষত পূর্বদিনের উপনিষদ্ পাঠকের সুন্দর বদন ও সুমিষ্ট ভাষণ মনে লাগিয়া থাকায় ইঁহার চেহারায় তেমন আকর্ষণ হয় নাই। ইনি দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে দু-চারটি কথা মাত্র বলিয়াই দার্শনিক বিচার শেষ করিলেন। তাঁহার কথায় বুঝিলাম যে বিশিষ্টাদ্বৈত দ্বৈত এবং অদ্বৈতের মধ্যবর্তী বাদ, জগৎ এবং

জীব ব্রহ্মের শরীর বলিয়া বিভিন্নও নহেন অথচ একও নহেন—যেমন খোলা, শাঁস ও বিচি লইয়া বেল। তিনি বলিলেন, "সকল মতাবলম্বীরাই উপাসনার পক্ষপাতী, বিবাদ ভুলিয়া যাইয়া উপাসনাপরায়ণ হও। ঈশ্বরের সমীপস্থ হইতে চেষ্টা কর। মা সম্বোধনে তাঁহাকে ডাক। পিতা বলিলেও কাঠিন্যভাব আসিতে পারে। মা বলিলে একেবারে কোমল হইয়া গেল! সঙ্কোচ দ্বিধার লেশও রহিল না! মহাসমন্বয়াচার্য রামকৃষ্ণদেবের ইহাই শিক্ষা। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

আমি খুব আশা ভরসা লইয়া ফিরিলাম। অনেক দিন পরে জানিয়াছিলাম, উক্ত বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে হরি মহারাজ নামে সুপ্রসিদ্ধ সাধু।

অতঃপর একদিন মঠে স্বামী সুবোধানন্দ স্নেহ করিয়া অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং পূজনীয় হরি মহারাজের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি নিজেও তাঁহাকে আমার কথা লিখিয়া জানাইলেন। হরিদ্বারে গত পূর্ণকুম্ভমেলার কিছু পূর্বে তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। তিনি তখন কনখলে অবস্থান করিতেছেন। ইচ্ছা, কুম্ভমেলায় গিয়া তাঁহার চরণ দর্শন করি। পত্রদ্বারা কুম্ভ দর্শনে আসিতে উৎসাহিত করিলেন, কিন্তু তিনি তখন উত্তর-কাশীতে যাইবেন জানাইলেন। আমি হরিদ্বারে গিয়া তাঁহার দর্শন পাইলাম না। কিছুকাল পরে জানিলাম তিনি পূজার সময় বলরাম মন্দিরে অসুস্থ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। প্রণাম ও দর্শনান্তর তাঁহার নিকট কিছুকাল থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বলিলেন, "যখন মঠে বা কাশীতে থাকিব তখন হইবে।" পরে একবার গ্রীষ্মকালে কাশী গিয়া সেবাশ্রমে তাঁহার দর্শন মিলিল। রাজনৈতিক বিষয়ক কথা অনেক কহিলেন এবং নিভৃতে আমাকে ডাকিয়া কি সাধন করি জানিতে চাহিলেন। যাহা করি বলিলাম, তখন আমাকে আমিষ (মৎস্য) আহার পরামর্শ দিলেন। যে সাধন করিতাম তাহা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "ঐরূপ সাধনে অনেকে বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া যায়, তুমি ব্রহ্মচারী, তাই তোমার কোন অনিষ্ট হয় নাই।" আমি দুর্ভাগা, তখন তাঁহার নিকট হইতে কোন সাধন প্রার্থনা করিবার কথা আমার মনে উঠিল না। তিনি খুব সম্ভবত প্রার্থিত হইলে, বিশেষ উপদেশাদি প্রদান করিতেন। যাহা হউক, যে কয়দিন কাশী ছিলাম, মধ্যে মধ্যে

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিতাম। এই দর্শনের ছয় মাস পরে, ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে কাশী গিয়া প্রায় তিন মাস থাকিবার সুবিধা হইয়াছিল। প্রত্যহই হরি মহারাজের নিকট যাইতে লাগিলাম। একদিন গীতার একটি শ্লোকের অর্থ বুঝিতে চাহিলে, সেই দিন হইতে গীতা পড়াইতে লাগিলেন। একদিন দশম অধ্যায়ের—

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥
তেষামেবানুকম্পার্থম্ অহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

—গীতা, ১০।৯-১১

শ্লোকগুলি পড়িয়া "আত্মভাবস্থঃ"র ব্যাখ্যা করিতেছেন। বলিলেন, "স্বামীজী ঠাকুরের নিকট গীতার এই শব্দের অর্থ বলিতেছেন, 'ভগবান অন্তরে থাকিয়া অজ্ঞান দূর করিয়াছেন।' গিরিশবাবু বলিতেছেন, 'তিনি সশরীরে অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞান নাশ করেন।' যখন উভয়ের মধ্যে এইরূপ তর্ক হইতেছে তখন স্বামীজীকে উৎসাহিত করিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, 'বল না, আমি তোর সঙ্গে আছি।'"

অন্য একদিন "সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী। নবদ্বারে... ইত্যাদি।" "ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্মফলসংযোগং ইত্যাদি।" "নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ইত্যাদি।" (গীতা, ৫। ১৩-১৫) পড়াইতে পড়াইতে বলিতেছেন—'বশী' শব্দ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইন্দ্রিয়েরা বশে থাকিলেই প্রলোভনের আক্রমণ নিবারণ সম্ভবপর। ইন্দ্রিয়বশ করাই আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। যখন সকল ইন্দ্রিয় বশীকৃত, তখনই 'নৈবকুর্বন্ ন কারয়ন্' ইতি বোধ—তখনই 'ন কর্তৃত্বং' ইত্যাদি উপলব্ধির বিষয় হয়। বশী, প্রভু, বিভু—পরপর শ্লোক দেখ। উহারা একই অর্থবোধক। এসকল

কথা বোঝানো যায় না—"বোঝে প্রাণ বোঝে যার।" ভিতর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বাহিরের পুড়ুনি জ্বলুনি দেখ কেন? ভিতর যে বরফ হইয়া রহিয়াছে!

অন্য একদিন "তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ। পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্" (গীতা, ৩।৪১)—শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—

"আদৌ" অর্থাৎ আক্রমণের প্রারম্ভেই, কামাদির চিন্তা উদিত হইবা মাত্রই—অর্থাৎ কর্মকৃত হইবার পূর্বেই। অনেকেরই কর্মকৃত হইবার পরে হুঁশ হয়। তোমাদের মনে বাসনার অনল জ্বলিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা নিভিয়া যাওয়া চাই।

"জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনং"—এমনি কামের প্রভাব যে সামান্য জ্ঞানের কি কথা, অনুভূতিজনিত আত্মপ্রত্যয় বা বিজ্ঞানকেও পরাভূত করিয়া ফেলে।

উপরি উদ্ধৃত শ্লোক পাঠ কালে "আদৌ" শব্দের ওপর বিশেষ জোর দিয়া পড়িয়া, হরি মহারাজ, ঐ শব্দের প্রকৃত মর্ম বুঝাইয়া দিতেন।

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ পড়াইতে গিয়া বলিলেন, কি চমৎকার, এরূপ হতে ইচ্ছা করে না?

মহামায়ার প্রভাব বুঝাইবার কালে তিনি অনেক সময় রাবানীর উপমা দিতেন। মাছ বেশ আনন্দে ভাসিয়া আসিয়া রাবানীতে প্রবেশ করিল। একটু বুদ্ধি করিয়া ঘুরিয়া গেলেই হয়—কিন্তু তা হইবে না—সে হতবুদ্ধি হইয়া রাবানীর মধ্যেই এদিক ওদিক করিতে করিতে ধরা পড়িয়া যায়! ইহা বলিয়াই গাহিতেন—

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা জানতে পারে॥
বিল করে ঘুণী পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
যাতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পালাতে নারে॥
গুটিপোকায় গুটি করে, কাটলে সে তা কাটতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি আপনার নালে আপনি মরে॥

এই প্রসঙ্গে একদিন আর একটি উদাহরণ দিলেন—"পাখি ধরিবার এক

রকম কল এদেশে আছে। একগাছা দড়ি মাটির সহিত সমান্তরাল করিয়া বিস্তৃত রাখে। দড়ির নিচে খাবার রাখিয়া দেয়। পাখি ঐ দড়ির উপর পড়িবা মাত্র উল্টাইয়া যায় এবং কি জানি কেন, উল্টাইয়া গিয়াই, ঐ দড়ি অতিশয় জোরে কামড়াইয়া রাখে। দড়ি ছাড়িয়া দিলেই সে মুক্ত—কিন্তু তা করে না। তখন ব্যাধ আসিয়া ধরে। দেখ, অজ্ঞানের কত প্রভাব! 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।'" (গীতা, ৫।১৫)

দৈব ও পুরুষকারের কথা বলিতে গিয়া একদিন কহিলেন—হিন্দি মহাভারতে আছে—একদিন জনমেজয়ের নিকট ব্যাসদেব আসিয়াছেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাস প্রমুখ মহাজ্ঞানীদের বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইল? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলেই তো দেশ নির্বীর্য ও বীরশূন্য হইয়া গেল।" ব্যাস তখন তখন উত্তর না দিয়া, রাজাকে কয়েকটি কার্য করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া, বৎসরান্তে তাঁহাকে স্মরণ করিলে পুনরায় আসিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর ব্যাসবর্ণিত সুন্দর সুন্দর অশ্ব সকল আসিল। তাঁহার উক্তি ও নিষেধ ভুলিয়া রাজা ঘোড়া কিনিলেন—অশ্বারোহণ পূর্বক ব্রহ্মহত্যা করিলেন এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া বৎসরান্তে ব্যাসদেবকে স্মরণ করায় তিনি আসিলেন। রাজা বুঝিলেন, সবই ভুলিয়া গিয়াছিলেন! দেখ মহামায়ার কুহক।

"কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যসি অবশোঽপি তৎ।" —গীতা, ১৮।৬০

অতএব, "তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।" —গীতা, ১৮।৬২

গীতা পাঠ করিতে অত্যন্ত উৎসাহিত করিতেন। তিনি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। গীতা পাঠ করিয়া তুমি স্বাভীষ্ট লাভ কর। সৎসঙ্গ অতীব দুর্লভ, ইহাই তো বিশেষ কষ্টের কথা। 'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে' (গীতা, ৭।৩) ইত্যাদি শ্রীভগবান বলিয়াই রাখিয়াছেন। ভোগেই সকলের চিত্ত ধাবিত হয়; সংসার ছাড়িতে কে চায়? মতলব, সব সুখভোগ, দুঃখ না হয়। কিন্তু এটা মনে আসে না যে দুঃখ সংভিন্ন সুখ কখনই সম্ভবে না। মহামায়ার এমনি মায়া কিছুতেই চৈতন্য হতে দেয় না। তুমি গীতার

ধ্যান অভ্যাস করিও। যাহা পড়িবে, তাহাই মনে মনে আলোচনা করিবে; উঠতে, বসতে, খেতে, শুতে, সর্বদাই। তাহলে গীতার মর্ম হৃদয়ে প্রস্ফুরিত হবে, তাহাতেই শান্তি পাবে। সেবা করিলে মোয়া মিলিবে ইহা অতি ঠিক অবিসম্বাদী সত্য। চতুর্দশ অধ্যায়ের গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে পারিলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে গুণাতীতের লক্ষণ, তাহার উপায় ইত্যাদি বেশ পরিষ্কার ভাবেই বিবৃত আছে। 'মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥' (গীতা, ১৪/২৬) ইহার কারণও দিয়াছেন—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥''' (গীতা, ১৪।২৭) অতএব এই চতুর্দশ অধ্যায় উত্তমরূপে অভ্যাস ও ধারণা করিতে পারিলে আর কিছুই আবশ্যক হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, চতুর্দশ অধ্যায়ে তাহাই বিভিন্ন প্রকারে বলিতেছেন। দ্বাদশ অধ্যায়েও 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং' ইত্যাদি অধ্যায় পরিসমাপ্তি পর্যন্ত আবার ঐ উভয় লক্ষণাক্রান্ত ভক্তের কথাই উত্তমরূপে বর্ণনা হইয়াছে। আপনার সহিত মিলাইয়া লইবার জন্যই এই সকল লক্ষণ ভগবান পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন জানিবে।

"'অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিনীং' ইহা হইতে ভবরোগের শান্তি হয় নিশ্চয়। তিলক প্রণীত গীতারহস্য আমি পড়িয়াছি। বাংলায় নয়। হিন্দিতে মাধব সাপ্রে অনুবাদ করিয়াছেন। তিলক নিরপেক্ষ বিচার করেন নাই, ইহাই আমার ধারণা। যাহা হউক খুব পরিশ্রম করিয়াছেন ও সময়ের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

'গীতা ভবদ্বেষিণীম্', গীতা ভগবানের হৃদয়। গীতার তুলনা নাই। যাহারা বোঝে না, তাহারাই শঙ্করের দোষ দেয়। শঙ্কর জ্ঞানের অবতার; তাঁহার দোষ-দর্শনে মহা অপরাধ।

'অধিকারি-বিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তানশেষতঃ'—এই হচ্ছে সিদ্ধান্ত। গীতার অনুশীলন বা সেবা করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়। সকল বিষয় সম্যক অবধারণের ক্ষমতা জন্মে। পরাশান্তি লাভ হয়।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ —গীতা, ৬।৩৫

ইহা পাঠ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটি খুব উৎসাহ সহকারে বলিতেন—

উৎসেকং উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈব বিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বৎ ভবেদপরিখেদতঃ ॥—মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩।৪১

হরি মহারাজের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি শাস্ত্র তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কোন তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া তিনি প্রায়শই উপযুক্ত শ্লোক বলিয়া বোদ্ধব্য বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখাইতেন এবং উহার সহায়ে তত্ত্ব বিশদ করিয়া প্রকাশ করিতেন। যেমন, যখন বুঝাইতেছেন যে ইষ্ট হইতে মন ভ্রষ্ট হইলে ক্রমশ কত নিম্নে গিয়া দাঁড়াইতে হয়, তখন নিম্নলিখিত শ্লোক বলিতেছেন—

লক্ষ্যচ্যুতং চেদ্ যদি চিত্তমীষদ্
বহির্মুখং সৎ নিপতেৎ ততস্ততঃ।
প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ
সোপানপংক্তৌ পতিতো যথা তথা ॥—বিবেকচূড়ামণি, ৩২৫

অর্থাৎ "মন বহির্মুখ হইয়া ক্রমশ নামিতে নামিতে শেষে চরম পতনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অসতর্ক হওয়ায় হস্ত হইতে খেলার বল (কেলিকন্দুকঃ) কোন সোপান শ্রেণির উপর পড়িলে, উহা লাফাইতে লাফাইতে একেবারে নিচে পড়িয়া যায়—ঠননং—ঠননং—ঠননং—ঠঃ অর্থাৎ পতনের শেষ জায়গায় গিয়া দাঁড়ায়।" আবৃত্তি করিয়া শেষে বৈরাগ্যের মহিমা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিলেন—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংচ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুস্বাপ পিঙ্গলা ॥ —ভাগবত, ১১।৮।৪৪

হরি মহারাজ অনেক সময় অজ্ঞানাবৃত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার দৃষ্টান্ত দিবার কালে নিম্নের গানটি গাহিতেন—"মন, গরিবের কি দোষ আছে।" ইত্যাদি। সে যে মহামায়ার হাতের পুতুল মাত্র।

হরি মহারাজের শরীরে বহুবার অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল। শুনিয়াছি তিনি ঐ সময় ক্লোরোফর্ম করিতে দিতেন না। কি করিয়া অস্ত্রোপচারের অসহনীয় কষ্ট তিনি সহ্য করিতেন—আদৌ কষ্টই বোধ করিতেন না, না কষ্ট সহ্য করিতেন?—এই কথা কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"গীতার 'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥' (গীতা, ৬।২২) শ্লোকটি জানো? গুরুণা দুঃখেন অর্থাৎ শস্ত্র পাতাদি-জনিত-দুঃখেন।"

"ভালমন্দ আমাদের মনের সৃষ্টি। তাঁর একান্ত শরণ লইতে পারিলে উভয় হইতেই নিষ্কৃতি হয়। 'শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ—এই ইঙ্গিত করিতেছেন।'"—গীতা, ৯।২৮

তামসী ধৃতির কথায় বলিলেন—"অনুতাপ ও গ্লানির প্রথম প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু অধিক হইলে, উহা লইয়া পড়িয়া থাকিলে কিছু লাভ নাই—বিশেষ ক্ষতি। সুতরাং উহা ত্যাজ্য। ইহা তামসী ধৃতি। 'যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং'"—গীতা, ১৮।৩৫ ইত্যাদি।

ঠাকুরের দেহরক্ষার পরেই হরি মহারাজ প্রবল বৈরাগ্যের প্রভাবে একবস্ত্র ও একখানি লেপের ওয়াড় উত্তরীয়স্বরূপ লইয়া আসাম অঞ্চলে শিলং পর্যন্ত ঘুরিয়া আসেন এবং ফিরিয়াই অত্যন্ত রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। একবার লাটু মহারাজের সহিত অনেক ভ্রমণ করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হন। লাটু মহারাজ সেখানেই রহিলেন। হরি মহারাজ একাকী চলিলেন। চিত্রকূটে গিয়া 'লু' লাগায় এক আমবাগিচার মধ্যে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাখাল বালকেরা তাঁহাকে আমপোড়ার সরবত পান করাইয়া এবং আমের শাঁস গায় মাখাইয়া সুস্থ করে। ঐ সময়ে একজন শেঠ গরুরগাড়িতে যাইতেছিল। তিনি তাঁহাকে নিকটবর্তী রেলস্টেশনে পৌঁছাইয়া দেন। হরি মহারাজের মুখে শুনিয়াছি তিনি খুব কঠোর করিয়াছিলেন।

পরিব্রাজক অবস্থায় ভ্রমণকালে কোন্ জায়গা তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন—গোদাবরী তীরে যখন ছিলাম, তখনই সবচেয়ে

ভাল লাগিয়াছিল। অন্য সময়ে বলিয়াছিলেন—একবার ভুবনেশ্বর খুব ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার সেখানে গেলে তত ভাল লাগে নাই। শ্রীশ্রীমহারাজ নাকি ভুবনেশ্বরকে 'গুপ্তকাশী' বলিতেন। হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন—"সেখানে কিছু না থাকিলে কি আর মহারাজ অমনি মঠ করিয়াছেন?" ভ্রমণকালীন ইতিবৃত্ত বলিতে বলিতে তিনি কহিয়াছিলেন—"পাহাড় পর্বতে বেড়াইলে 'কালের প্রভাব' খুব লক্ষ্য হয়। কালের প্রভাবে বৃক্ষ ও পর্বতসকল মহাকায় ধারণপূর্বক আকাশে মাথা উঠাইয়া দণ্ডায়মান! কোন কোন বৃক্ষ পতনোন্মুখ, কাহারও বা পত্রসকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। যেখানে সমুদ্র ছিল, সেখানে পর্বত আকাশে মাথা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে ইত্যাদি। জানো না, গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ' (গীতা, ১১।৩২)—ইত্যাদি। Eternal time–Eternal space! দেশ কাল ও নিমিত্তই মায়া—তাহাদের অতীত যিনি, তিনিই অব্যয়! উহাদের প্রভাবেই নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।"

চতুর্দিকে বিলাসিতার ভাব এবং নিষ্কিঞ্চন ভাবের অভাব দৃষ্টে একদিন বলিলেন—"তোমায় সত্যি বলছি, জীবনে একদিন ভিন্ন, একটা পয়সাও কাহারও নিকট চাহি নাই। একবার একজনের বাড়ি হইতে বিদায়কালীন, তিনি অর্থের আবশ্যকতা আছে কি না জিজ্ঞাসা করায়, মহারাজের নিকট প্রশ্ন করিয়া জানিলাম (তিনিই পয়সাকড়ি রাখিতেন) একটা টাকা হইলে গাড়ি ভাড়া কুলাইয়া যায়; তাই উক্ত ভদ্রলোকের নিকট একটি টাকা চাহিয়াছিলাম। সম্পূর্ণভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কেহ আজকাল কিছু করিতে চাহিতেছে না। আমি তো পলাইয়া পলাইয়াই বেড়াইয়াছি—অবশেষে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ায়, লোকমুখে অবগত হইয়া কল্যাণ (স্বামী কল্যাণানন্দ) আশ্রমে লইয়া আসিল। তারপর তো আর উঠিতেই পারিলাম না। কি বলিব, নিজেরা পরের উপর নির্ভর করিয়াছি, ছেলেরা কুশিক্ষা পাইতেছে।

পূজনীয় বুড়োবাবার নিকট শুনিয়াছি, হরি মহারাজ নির্বিকল্প সমাধি লাভার্থ দীর্ঘকাল 'করপাত্র' হইয়া (অর্থাৎ দুই হাত জোড় করিয়া যে স্থান হয় তাহাতেই

ভিক্ষান্ন খাইতেন এবং আহারান্তে ঐ স্থানেই জলপান করিতেন) কাল কাটাইয়াছেন।

ঠাকুরের প্রসঙ্গে একদিন হরি মহারাজ বলিয়াছিলেন—মাস্টার মহাশয়কে একখানা কাপড় আনিতে বলিয়াছিলেন—উনি একজোড়া আনিলেন। ঠাকুর জিদ করিয়া এবং একটু বিরক্তি প্রকাশপূর্বক একখানা ফিরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "এখানে ওসব সঞ্চয়-টঞ্চয় হবে না।" যতটুকু দরকার তদতিরিক্ত কিছুই লইবে না। একজনকে লক্ষ্য করা চাই—ধ্রুবতারা ঠিক রাখ—নতুবা কোথায় এই প্রবল ভোগাকাঙ্ক্ষার অবসান হইবে?

শেষ জীবনে কাশী অবস্থানকালে, একটি ভক্ত খুব পীড়াপীড়ি করিয়া হরি মহারাজের জন্য একটা বড় কোট তৈয়ারি করিয়া দিলেন। মহারাজের একটি কোট পূর্বেই ছিল। তিনি ভক্তের অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন, এজন্য কিছুক্ষণ খুঁতখুঁতি প্রকাশ করিলেন এবং ঐ কোট না লওয়াই উচিত ছিল, ইহা বলিলেন।

সেবা লওয়া সম্বন্ধেও হরি মহারাজ বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করিতেন। কাশী অবস্থানকালে দ্বিপ্রহরে গরমের সময় পাখা টানিতে গিয়া ইহা বেশ পরিষ্কার বোঝা গিয়াছিল। প্রথমটা আপত্তি করিতেন, পীড়াপীড়ি করিলে গালি দিতেন। অবশ্য সেবকের আন্তরিকতা অনুযায়ী এই ভাবের ব্যতিক্রমও হইত, ইহাও লক্ষ্য করা যাইত। কাশীতে প্রবাসী এক বৃদ্ধা দেশ হইতে অতি অল্প অর্থ পাইতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে চুষিপিঠা হরি মহারাজের জন্য তৈয়ার করিয়া আনিতেন। মহারাজ তাঁহার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা জানিতেন এবং পুনরায় ঐরূপ করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও ফল হইত না দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"কি ভক্তি! বৃদ্ধা বলিয়াছে, 'পিঠাগুলি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে তৈয়ার করিতে থাকি।' আমি আর এখন নিষেধ করি না। যা করে করুক।"

অর্থ দ্বারা হরি মহারাজের সেবা করাও বেশ কঠিন ছিল। "কোথা হইতে তাঁহার ভরণ-পোষণ হয়" ইহা সেবকেরা বলিতে চাহিতেন না এবং অতিরিক্ত অর্থের আবশ্যকতা নাই ইহাই বলিতেন।

যাঁহারা সেবা করিতেন তাঁহাদের প্রতি হরি মহারাজের আশ্চর্য যত্ন ছিল! একদিন দুপুরে তাঁহার ঘরে বসিয়া আছি। জনৈক সেবক সেবা করিতেছেন। তাঁহাকে বলিতেছেন—"তোমরা কেন আমার কাছছাড়া হও? তোমরা আমার সেবা করিতেছ, তোমাদের প্রতি আমারও তো কর্তব্য আছে? সর্বদা নিকটে না পেলে কি করে সে কর্তব্য সম্পাদন করিব?"

শেষ জীবনে হরি মহারাজ খুব দেশের খবর রাখিতেন। নিত্যই সংবাদপত্র অনেকক্ষণ ধরিয়া মনোযোগপূর্বক পড়িতেন এবং দেশ সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা করিতেন। মহাত্মা গান্ধীর Young India পত্রিকা মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। একাধিকবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—"গান্ধী যোগযুক্ত হইয়া লিখিতেছেন। উনি যাহা বলিতেছেন তাহা নির্ভুল।"

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী কাশীতে আগমন পূর্বক, Central Hindu Collegeএ, ছাত্র ও অধ্যাপকদিগকে সম্বোধনপূর্বক এক বক্তৃতা দেন। যতদূর স্মরণ হয়, ভোর ছটায় ঐ বক্তৃতা হয়। হরি মহারাজ উহা শুনিবার জন্য যথাসময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চাঁদপুরের কুলী ধর্মঘটের সময় শুনিয়াছি হরি মহারাজ কুলিদের দুর্দশার অবস্থার কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া অত্যন্ত করুণস্বরে পুনঃপুনঃ "রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম" আবৃত্তি করিয়াছিলেন। শ্রোতার মনে তখনকার মতো বেদনার ভাব জাগিয়াছিল। বস্তুত জাতীয় জাগরণের প্রচেষ্টায় তিনি কতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিই তাহা বুঝিয়াছিলেন। মিশনের একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার নিকট শুনিয়াছি হরি মহারাজই তাঁহাকে উক্ত কার্যে ব্রতী হইবার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বর্তমানে জাতীয় শিক্ষার ভার ক্রমশ মিশনকে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা তাঁহার অভিমত ছিল।

হরি মহারাজ মহাজ্ঞানী ও মহাভক্ত সাধু হইলেও তাঁহার মধ্যে সকল কাজেই খুব আঁট ছিল। তাঁহার সকল কাজকর্ম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে—কোনরূপ এলোমেলো বা গোলমেলে ভাব কখনও তাঁহার মধ্যে দেখি নাই।

সবই যেন স্পষ্ট, ঝাপসা ভাব কোন ব্যবহারেই ছিল না। যাহা কিছু বলিবেন, লুকোচুরি নাই—আড়ম্বর নাই—একেবারে স্পষ্ট কথা—যেন খাপখোলা তলোয়ার। ঢিলেমি তাঁহার ধাতে ছিল না। অপরের উপর ঠেস দেওয়া, অন্যকে কিছুমাত্র কষ্ট দেওয়া, নিয়মবিহীনতা কদাপি তাঁহাতে দেখা যাইত না। সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করিবার অভ্যাস তাঁহার মজ্জাগত ছিল। একদিন এক ভদ্রমহিলার কথা হইতেছিল। হরি মহারাজ তখন মায়াবতীতে। তিনিও সেখানে গিয়াছেন। তিনি বলেন "—আমরা তখন নিজেদের সকল কাজকর্ম নিজেরাই করিয়া লইতাম। আমাদের ঐরূপ ব্যবহারদৃষ্টে উনি খুব সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ, আমাদের পক্ষে ঐরূপ করা আর সম্ভবপর নয়। বাল্যকালে এমন অভ্যাস করাইয়া দিয়াছে যে, তাহা এখন পরিত্যাগ করা অসম্ভব।' খবরের কাগজ পড়িতেছি। হাত থেকে একখণ্ড কাগজ নিচে পড়িয়া গিয়াছে—উহা কুড়াইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছি এমন সময় মা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ও কি করিতেছ, বেয়ারাকে ডাকছ না কেন?'" ঐ মহিলাটি অবিবাহিত ছিলেন। বিবাহের ইচ্ছা হওয়ায় তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "কেন ওপথে চলিতে চাহেন? কত সন্তানের মা আপনি হইয়াই রহিয়াছেন?"—কি জান, ভর না দিয়া থাকা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভবপর।

হরি মহারাজ স্বামীজীর কথা বলিতে খুব উৎসাহ বোধ করিতেন। একদিন বলিতেছেন—স্বামীজী তখন বোম্বাইয়ে এক ব্যারিস্টারের বাড়িতে। খুঁজিতে খুঁজিতে আমি ও রাজা মহারাজ সেখানে উপস্থিত। তামাক খাইতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া হুঁকো হাতে করিয়াই ছুটিয়া আসিলেন—মুখে একটি শ্লোক—

অহঙ্কারঃ সুরাপানং গৌরবং ঘোর-রৌরবম্।
প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্ত্বা সুখীভব ॥

শ্লোকটি শুনিয়া আমার নিশ্চয় ধারণা হইল যে স্বামীজী উক্ত দোষত্রয় বিমুক্ত হইয়াছেন। অতঃপর নানা কথার পর, আমাদের সঙ্গেই সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। বলিতে লাগিলেন, "ভাই, ধর্মকর্ম কতদূর কি হলো জানি না, কিন্তু বড্ড feel কচ্ছি, সকলের জন্যই প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইতেছে।" উহা শুনিয়া

আমাদের বুদ্ধদেবের কথা মনে হইল। স্বামীজীর শরীর তখন সারিয়াছে, চেহারা অতি সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীশ্রীহরি মহারাজ বলিলেন—স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভিড়ে দুই তিন জায়গায় দেখা হইল না। G. C. (গিরিশবাবু)-কে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দিলেন না। বলিলেন, "উহাতে আমার অকল্যাণ হবে।" মাস্টার মহাশয়ের দাড়ি নাড়িয়া দিলেন।

কত সময় বলিয়াছেন, "এমন সব ভাব দিয়া গেলাম যাহাতে দুশো বৎসরের মধ্যে আর কিছু করিতে হইবে না—কেবল দাগা বুলাইয়া গেলেই চলিবে।"

অনেক সময় বলিতেন, "এত খেটেখুটে মন প্রস্তুত হলো, কিন্তু মা কেবল বলছেন, 'চলে আয়—চলে আয়।' কাজের কিছুই করা হলো না।"

"—মহাশয়" প্রভৃতি চিকাগো ধর্মসভায় গিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী বলিতেন, "ওসব কিছু না—কিছু না। যা কিছু ব্যাপার হবে তা কেবল (নিজের বুকে আঙুল রাখিয়া) ইহার জন্য।"

স্বামীজী, ঠাকুরকে আপনার মা ভাইয়ের জীবিকার ব্যবস্থা করিবার জন্য, মা কালীকে অনুরোধ করিতে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বললেন, "বলিস কি, আমার এসব কথা মাকে বলতে নেই।" বড়ই পীড়াপীড়ি করায় কহিলেন, "যা তুই কালীঘরে গিয়া প্রার্থনা কর, যা চাইবি, তাই পাবি।" নিজে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন—বড়ই উদ্বেগ, নরেন কি চায়—অতিশয় উৎকণ্ঠিতভাবে অবস্থান করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীজী বাহির হইয়া আসিতেছেন। "কিরে কাঁদিস কেন? চেয়েছিস তো? কি চাইলি, বল দেখি?"—রোরুদ্যমান স্বামীজী বলিলেন, "আর কিছু চাইতে পারলাম না, বললাম, মা, জ্ঞান দাও, বিবেক দাও, ভক্তি দাও।" ঠাকুর শুনিয়াই স্বামীজীকে দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করিলেন—অতিশয় খুশি হইলেন। এরপরে ঠাকুর আমাদের নিকট বলেছিলেন, "দেখ দেখি কী অধিকারী পুরুষ! আর কিছুই চাইতে পারল না। ভিতরে গলদ নাই—বাহিরে গলদ কোথা হইতে আসিবে?"

দেখ, স্বামীজী কতটা মহাপ্রাণ ছিলেন! ঠাকুর এক ব্যক্তির চরিত্রে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সকলকে তাহার বাড়িতে আহারাদি করিতে নিষেধ করেন। অপরের নিকট হইতে উহা অবগত হইয়া, তিনি দুইজন গুরুভাইকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাড়িতে আহারাদি করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া সকল ব্যাপার ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। ঠাকুর মহা রুষ্ট হইলেন—স্বামীজী কাঁদিতে লাগিলেন। অতঃপর একদিন এক ব্যক্তিকে ঠাকুরের নিকট আনিয়া, "উহার উন্নতি হউক—ধর্মজীবন এই জীবনেই লাভ হউক", এরূপ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। ঠাকুর বলিলেন, "এ জন্মে হবে না।" পুনরায় ধরপাকড়—স্বামীজী বলিতেছেন, "আপনি না করিয়া দিলে এ যাবে কোথায়?" ঠাকুর—"কি করব, বলছি হবে না।" পুনরায় অনুরোধ—পীড়াপীড়ি। "আপনি ছাড়িলেও দাঁড়ায় কোথায়?" ঠাকুর তখন বলিতেছেন, "যা, যা, এখন যা" তারপর বলিলেন, "যা, মৃত্যুকালে মুক্তিলাভ হবে।"

স্বামীজীর ধ্যান ধারণার ফল করায়ত্ত হইতেছে না দেখিয়া একদিন ঠাকুরকে অনুযোগ করিলেন, "কিছু হইতেছে না, কি করি" ইত্যাদি। তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "সে কিরে, আমি তোকে ভাল মনে করতাম। খানদানি চাষা যে, সে হাজাশুকো মানে না। তার স্বভাবই চাষ করা, তা জল হোক বা না হোক, ফসল হবার নিশ্চিত আশা থাকুক বা না থাকুক—সে চাষকার্য ছেড়ে অন্য কিছুই করতে পারে না।"

স্বামীজী তামাক খান, নিরামিষাশী নহেন, এজন্য আমাদের মধ্যেই একজন স্বামীজীকে বলিয়াছিল, "দেখ, তোমার অভ্যাসগুলি শোধরানো দরকার, নতুবা আমাকে তোমার জন্য অনেক লোকের নিকট জবাবদিহি হইতে হয়।" সে মনে করিয়াছিল, স্বামীজী খুব খুশি হইয়া উহাতে কৃতজ্ঞতা জানাইবেন, কিন্তু তিনি অতিশয় শান্তভাবে বলিলেন, "তুই তোর কাজ কর। আমাকে defend (সমর্থন) করিবার কোন আবশ্যক নাই।" স্বামীজী কেমন স্বস্থ—খাড়া হইয়া রহিয়াছেন। কাহারও উপর ঠেস দেওয়া, কাহারও recommendation-এর (সমর্থন) ওপর আপনাকে জিয়াইয়া রাখা, তাঁহার ধাতে ছিল না।

কোন একটা স্টেশনে যখন স্টেশনমাস্টার কয়েকজন সাহেবের জায়গা করে দেবার জন্য স্বামীজীকে দ্বিতীয় শ্রেণির গাড়ি থেকে নামাবার চেষ্টা করেছিল, তখন স্বামীজী তাকে বলেছিলেন, "আমাকে নাবিয়ে দিতে তোমার লজ্জা হয় না—আমি বিবেকানন্দ। ওদের নাবিয়ে দাও।" বেচারা স্টেশন-মাস্টার সেই ধমকের ফলে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইল।

একবার প্লেগের আক্রমণ খুব বেশি হইয়াছিল। স্বামীজী মঠ বাড়ি ও জায়গা প্রভৃতি বিক্রয়পূর্বক রোগীর পরিচর্যার জন্য অর্থদানে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং বিজ্ঞাপনাদি দেওয়া হইয়াছিল। বলিয়াছিলেন, "আমরা তো গাছতলায় থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, পুনরায় গাছতলায় থাকিব।"

বৃন্দাবনে পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে একটি কুটিরে প্রবেশ করিলেন। অগ্রবর্তী হইতে না পারিয়া সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল। মনটা খুব ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবত ঐ কুটিরে কোন সাধু অবস্থান করিতেন। স্বামীজী দেখিলেন, দেওয়ালের গায় কয়লা দিয়া লেখা আছে—

চাহ চামারি চুহারি অতি নীচন কি নীচ্
ম্যায় তো ব্রহ্ম হুঁ যদি তু ন হোতে বীচ্।

অর্থাৎ হে বাসনা (চাহ্) তুই চামারনি—মেথরানি (চুহারি), তুই অতি অধমেরও অধম। তুই যদি আমার মধ্যে আসিয়া না পড়িতিস, তা হইলে আমি তো ব্রহ্মই ছিলাম।

এই লেখা পড়িয়া স্বামীজীর খুব উৎসাহ হইয়াছিল।

একদিন হরি মহারাজ, কেন দ্রুত উন্নতি হয় না, ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"রসবোধ জন্মিলেই উন্নতির জন্য আর চিন্তিত হইবার কারণ থাকে না। যতদিন কাজে রসবোধ জন্মে না, ততদিনই ব্যাগার ঠ্যালার মতো সব করিতে হয়। যাহার কাজে রসবোধ জন্মে নাই, তাহাকে পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিতে হয়, কালে রসবোধ জন্মে। কি কুস্তিগিরি, কি রোগীর সেবা, কি ব্রহ্মচর্য—যতদিন রসবোধ না জন্মে ততদিনই drudgery (ব্যাগার ঠ্যালা ভাব)।"

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটি বলিলেন—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা,
পিত্তোপদুষ্টরসনস্য ন রোচকৈব।
কিন্ত্বাদরাদ্ অনুদিনং খলু সেবয়ৈব,
স্বাদ্বীপুনর্ভবতি তদগদমূলহন্ত্রী ॥

কোনরকমে ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে হয়। কালে তাঁহাকে পাওয়া যায়। সকাম হইয়াও তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে নিষ্কাম হওয়া যায়—উদাহরণ ধ্রুব। আলমোড়ার এক সাধু আমাদিগকে বলিতেন, "আমি কোন সময়ে ঠাকুরের ঝাড়ুদার কিংবা কিছু ছিলাম, তাহারই ফলে আপনাদের সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছি।" ভগবানের জন্য কোন কিছু করিবার অভ্যাস আবশ্যক। একজনের রোগি-শুশ্রূষার কথা জানি। সে বলিয়াছিল, "বাহ্যেমাখা শরীর পরিষ্কার করিতে করিতে এমন এক আনন্দের স্রোত বহিয়া যাইত, তাহা আর কি বলিব!" রোগী শুশ্রূষায় রসবোধ এই প্রকারের।

ঠাকুর বলিতেন, "উকিল, দালাল ও ডাক্তারের ধর্ম নাই। —বু ক্ষেত্রীর মহারাজের নিকট হইতে ব্যয় লইয়া, ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য বিলাত গিয়াছেন। স্বামীজী তখন সেখানে। উহাকে কিছুতেই উকিল হইতে দিলেন না—পত্র দ্বারা ব্যয় পাঠানো বন্ধ করাইলেন। —বুও খুব ছোকরা—একগুঁয়ে। অন্য কিছু না পারায়, নানা দেশ পরিভ্রমণের পর বাড়ি ফিরিলেন। ইতঃপূর্বে সংসারের অভাব অনটনের বিষয় স্বামীজীকে জানাইতে বরাহনগর মঠে গেলে, স্বামীজী —বুকে গালি কটূক্তি করিয়া বিদায় করিলেন। আমাদের বলিলেন, 'মা ভাই না খেয়ে মরে সেও স্বীকার, দেখি ঠাকুরের পথে চলতে পারি কিনা।'"

হরি মহারাজের জিজ্ঞাসুকে উৎসাহিত করিবার ভঙ্গি সাধারণের চেয়ে ভিন্ন রকমের ছিল। একজনকে বলিতেছেন, "তোমার ভাবনা কি? তুমি বিবাহ না করিয়া (সম্মুখের দিকে উর্ধ্বে হস্ত প্রসারিত করিয়া) ঐ উচ্চে অবস্থান করিতেছ।" অপর একজন বিবাহ করিবে কিনা ইতস্তত করিতেছে। তাহাকে

বলিতেছেন, "আবার কার দাস হইতে চলিতেছ? ভগবান ভিন্ন অপরের দাস কেন হইবে?"

হরি মহারাজের বাল্যে ও যৌবনকালে উত্তম স্বাস্থ্য ছিল। ইহা বার্ধক্যেও তাঁহাকে দেখিয়া বুঝা যাইত। শেষ জীবনে তিনি খুব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেন এইরূপ হইল জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমেরিকায় থাকার সময় (দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দৃঢ়ভাবে খাড়া করিয়া) এইভাবে থাকিতে হইয়াছিল, তাই শরীরটা ভাঙিয়া গেল।"

একবার ঠাকুরের জন্মতিথির দিন (১৯২০ সাল) কাশীতে হরি মহারাজকে ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করায় কহিয়াছিলেন—আমিও স্বামীজীকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন, "ঠাকুরের কথা আর কি বলিব? তিনি L O V E personified." ঠাকুর নিজের কথা নিজে বলিতেন, "আমি কর্মনাশা," "আমি ফরাস ডাঙা।"

কর্মনাশা অর্থাৎ ঠাকুর, ভক্তের কর্মক্ষয় করিয়া তাহাকে মোক্ষের উপযোগী করিয়া দেন। ফরাস ডাঙা—কোন ইংরেজ প্রজা, অপরাধ করিয়া যদি ফরাসি সাম্রাজ্য ফরাস ডাঙায় আশ্রয় লয়, তাহা হইলে ইংরেজ পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারে না—সে সেখানে নিরাপদ। ঠাকুরকে আশ্রয় করিলে শত অপরাধ শত পাপ নষ্ট হইয়া যায়।

বিবাহাদি না করিয়াও কেমন সংসার করা যায়—ইহার উল্লেখপূর্বক বলিলেন, "ঐ দেখ—বাবু বিবাহাদি করেন নাই, সৎভাবেই জীবন কাটাইতেছেন, কিন্তু নিরন্তর ছাত্রদিগকে লইয়া তাহাদের সুখদুঃখের ভাগী হইয়া এক সংসার পাতাইয়া কাল কাটাইতেছেন।"

অসুস্থ শরীর লইয়া অনেক সাধক বিব্রত হইয়া পড়েন। এ সম্বন্ধে হরি মহারাজের উপদেশ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বিভিন্ন লোকের নিকট লিখিয়াছেন—

(১) "তোমার শরীর ভাল থাকে না জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইতে হয়। খুব

ভজন করে যাও। মার কৃপায় সব উপদ্রব কাটিয়া যাইতে পারে। ভজন করা চাই। শরীর সুস্থ থাকুক আর অসুস্থই থাকুক, ভজন বন্ধ করিবে না। পরে দেখিতে পাইবে, সকল বিঘ্ন দূর হইয়া গিয়াছে। চেপে কিছুদিন ভজন কর দেখি, শরীর-টরীর সব ভাল হইয়া যাইবে। মন শুদ্ধ হইলেই শরীরও নীরোগ হইয়া যায়। ভজনেই কেবল মন শুদ্ধ করিতে পারে। ভজন কর, ভজন কর। নিষ্কাম ভজনই ভজনের সার। তাঁহাতে প্রীতি ভালবাসা ভক্তি করিতে হইবে, তাহা হইলেই সব জিনিস থেকে মন আপনিই উঠিয়া যাইবে। শরীরের জন্য তখন আর তত চিন্তা থাকিবে না। মার চিন্তাই কেবল প্রবল থাকিবে। আর তাহা হইলেই আনন্দ।"

(২) অন্যত্র লিখিয়াছেন, "ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি, বলিতেছেন—'দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো।' অর্থাৎ হে মন, শরীরের অসুখাদির জন্য যদি কষ্ট হয়, তাহাতে তুমি অধীর হইও না; যে শরীরের যেমন ভোগ তেমনিই হইবে, তুমি আনন্দে অর্থাৎ সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানে চিত্ত সমাধান কর, শরীরের জন্য ভাবিও না। শরীরের যাহা হয় হউক, তুমি তাহার জন্য যেন ভগবানকে ভুলিয়া যাইও না।"

(৩) "আমার ডাক্তার বন্ধুরা পরামর্শ দিতেছেন—আফিং সেবন করিলে শরীরের উপকার হইতে পারে। আমি কিন্তু—আফিমের বশবর্তী হইতে একেবারেই অনিচ্ছুক। শরীর চিরস্থায়ী নয়, অকারণ কেন একটি কুৎসিত অভ্যাসের প্রশ্রয় দিব।"

(৪) "সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য মহাপুণ্যফলে লাভ হয়।

'রোগ-শোক-পরিতাপ-বন্ধন-ব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধ-বৃক্ষাণাম্ ফলান্যেতানি দেহিনাম্ ॥'

"এই শাস্ত্রকথা। তবে ভগবানের শরণাগত হয়ে 'দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো' বলে তুড়ি দিতে পারলে অনেকটা বেঁচে যাওয়া যেতে পারে। কারণ হা-হুতাশ করে তো কোন ফল হয় না, কেবল কষ্ট ভোগই সার, আর পরমার্থ ভুলিয়ে দেয়—এই উপরিলাভ। ভোগের ইচ্ছা ভিতরে

থাকলেই শরীর ভাল না থাকলে বড়ই কষ্টবোধ, নচেৎ ভজনের জন্য মন ভাল থাকবার প্রয়োজন, শরীর ভালর তত দরকার নেই। মন দিয়ে ভজন করতে হয়। যদি শুদ্ধ কর্ম করা যায়, তাহা হইলেই মন ভাল থাকে। তা শরীর যেমনই থাকুক না। সেইজন্য কর্ম যাতে শুদ্ধ থাকে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। শরীর তো একটু একটু করে রোজই নাশের দিকে চলেছে, তা তো আর কেউ বন্ধ করতে পারবে না। কিন্তু মন অনন্তকাল স্থায়ী অর্থাৎ শরীর কত যাবে, হবে, মন কিন্তু যতদিন পূর্ণজ্ঞান না হচ্ছে, ততদিন থাকবে আর বারংবার শরীর ধারণ করাবে। অতএব মনের শুদ্ধির জন্য যত্ন করাই হচ্ছে আসল কাজ।"

হরি মহারাজ, ঋষিদিগকে কেন "তপোধন" বলে, তাহা বুঝালেন। কাহারও বিদ্যা, কাহারও কুলশীল, কাহারও অর্থ বা ভূসম্পত্তি, কাহার রূপ ধন-স্বরূপ অর্থাৎ ঐ সকল বিষয়ই তাহাদের জীবনযাত্রার সম্বলস্বরূপ। সাধু-সজ্জনের সেইরূপ তপস্যাই একমাত্র সম্বল।

ভৃত্যেরা প্রায়ই ফাঁকি দেয়। এই প্রসঙ্গে হরি মহারাজ বলরামবাবুর প্রসঙ্গ করিলেন—"আমরা কয়েকজন বলরামবাবুর বাড়িতেই অনেক দিন আছি। চাকর-বাকর মনোযোগপূর্বক কাজ করে না, তারপর অনবরতই চুরি করে দেখিয়া আমি বিরক্তি প্রকাশ করায় বলরামবাবু বলিয়াছিলেন, 'এখন আমি পরমহংস চাকর কোথায় পাব?'"

হরি মহারাজ উপনিষদের "ধীর" শব্দটির উপর খুব জোর দিতেন। উপনিষদে অনেকবার ঐ কথাটার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

"মহাপুরুষের কৃপায় জ্ঞান লাভ হয়। নারদ ভক্তিসূত্রে আছে 'মহৎকৃপয়া ভগবৎ-কৃপা-লেশাৎ বা'।

"আমাদের সভ্যতার সর্বোচ্চ আদর্শ হচ্ছে সর্বভূতে একত্বানুভূতি।"

গীতায় আছে —

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ —৬।৩২

লাঙোলে অবস্থানকালীন হরি মহারাজ একদিন অতি প্রত্যুষে শৌচ করিতে গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "একখানি পাথরের উপর বসিয়াছি—এমন সময় দেখি খুব বড় একটা বাঘ একটু উঁচুতে উঠিয়া চারিদিক দেখিতেছে। তাহার দৃষ্টি এবং চালচলন এমনই বীরত্বব্যঞ্জক যেন সে দুনিয়ার কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেছে না"—এই পর্যন্ত বলিতেই শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনার ভয় হইয়াছিল না?" —"ভয়, কি হে, আমি মুগ্ধ হইয়া তাহার দৃপ্ত তেজ দেখিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে চোখাচোখি হইবা মাত্র সে কালবিলম্ব না করিয়া নিচে নামিয়া গেল।"

পাহাড়ে তপস্যাকালে হরি মহারাজ যে সকল সাধু দেখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনজন সাধুর খুব প্রশংসা করিতেন—উঁহাদের নাম রামাশ্রম, কেবলাশ্রম ও বিজ্ঞানানন্দ। শেষোক্ত সাধু কৌপীন মাত্র সম্বল হইয়া যথেচ্ছ বেড়াইতেন অথচ তাঁহার ষড়দর্শন সম্যক আয়ত্ত ছিল। উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র ও গীতার শাঙ্করভাষ্য তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কোথাও পুস্তক দেখিতে হইত না। অনর্গল সংস্কৃত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলিতে পারিতেন। ভ্রমণকালে যখন যেখানে থাকিতেন, সাধুরা সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। ইনি টিহিরী রাজার গুরু ছিলেন, কিন্তু বহু অনুরোধ সত্ত্বেও কোন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন নাই। ইঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ভারতবর্ষে তখন কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৩৭ বর্ষ ১, ৩, ৭ সংখ্যা)

স্বামী তুরীয়ানন্দ

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

বালব্রহ্মচারী, যতী, নিত্য সদাচারী,
ব্রহ্মতেজে উদ্‌ভাসিত বদন-মণ্ডল।
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘমাঝে তারকা উজ্জ্বল,
তুরীয় আনন্দরূপী—গীতা মূর্তিমতী।
—গঠিল শরীর দিয়ে—স্বামী উক্তি হেন।
সন্ন্যাসীর বেশে ভবে যাপিলে জীবন;
শাস্ত্রজ্ঞ—ব্রহ্মজ্ঞ—ভক্ত, তিতিক্ষা অসীম
দেখাইলে খলরোগ ধরি দেহে ছলে ॥
হে দেব! কতই কথা জাগিতেছে মনে
পবিত্র-চরিত্র তব করিয়ে স্মরণ।
কোটি কোটি প্রণতি মম তোমার চরণে।
সাশ্রু-অর্ঘ্য লহ এই ভুলিও না দীনে ॥

(উৎস ঃ উদ্বোধন ২৪ বর্ষ ৮ সংখ্যা)

মহাসমাধি

উদ্বোধন

বিগত [২১ জুলাই ১৯২২] ৫ শ্রাবণ, শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬টা ৪৫মিঃ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দের অশেষ আশাভরসা ও জুড়াইবার স্থল, প্রাণস্পর্শী জীবন্ত বাণীর শক্তিকেন্দ্র, তপঃপরায়ণ, শাস্ত্রদর্শী পরম পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) কাশীধামে শ্রীগুরুর নিত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপে সম্মিলিত হইয়া তুরীয়পদে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। দীর্ঘ সাধনার তপোপূত, আকুমার অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের স্বর্গীয় জ্যোতিতে ভাস্বর—তাঁহার পুণ্যশরীর, বিগত দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া কঠিন বহুমূত্র রোগের সহিত সংগ্রাম করিতেছিল। ইহার ফলে সংখ্যাতীত দুষ্টব্রণ ও স্ফোটকাদির তীব্র, মর্মন্তুদ যাতনা তিনি নীরবে সহিয়া আসিতেছিলেন। এবার মাসাবধি পূর্বে একটি সামান্য পৃষ্ঠব্রণ দেখা দিল। কলকাতার ও স্থানীয় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরামর্শে ও যত্নে তিনি উহা হইতে আবার সারিয়া উঠিবেন, ইহাই সকলের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল। বিশেষত ইতঃপূর্বে ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রাণসঙ্কট অবস্থা হইতেও তিনি আরোগ্য হন, ইহা সকলেরই স্মরণে ছিল। ক্রমে ঐ ক্ষুদ্র ব্রণ একটি বৃহৎ দুষ্টব্রণে পরিণত হইল।

বৃহস্পতিবারেও কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে, তিনি কালই আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। কারণ দুই চারি দিন পূর্ব হইতে তাঁহার অবস্থা উহারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভালই হইতেছিল। শরীর ত্যাগের দিন ও পূর্বরাত্রে তিনি যে সমস্ত কথাবার্তা বলিয়াছিলেন তাহার অর্থ তখন সম্যক বুঝা যায় নাই। কিন্তু এখন বেশ বোধ হইতেছে যে, তিনি তাঁহার আশু শরীর ত্যাগের বিষয় পূর্ব হইতেই জানিয়া আমাদিগকে উহার আভাষ দিয়াছিলেন এবং নিজেও উহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার অমানুষিক সহ্যগুণ দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত

ও বিস্মিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্বে রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে সহসা দীপ্ত কেশরীর গম্ভীর স্বরে তিনি বলিয়া উঠিতেন, "আমি এসব (যন্ত্রণা, ক্ষত ইত্যাদি) গায়েই করি না।" "কি হয়েছে!—কার?" সেবক বলিলেন, "না—কিছুই হয় নাই—আপনার কি হবে?"

প্রায় পাঁচ-ছয় দিন পূর্বে বলিয়াছিলেন "আর পাঁচ-ছয় দিন খুব আনন্দ করে নাও।" উঠিয়া বসিতে অনেক সময় তাঁহার ইচ্ছা হইত এবং নিকটে যাহাকে দেখিতেন তাহাকে সম্বোধন করিয়া উঠাইয়া বসাইয়া দিতে বলিতেন। আবার বসাইয়া দিবার পরে তাঁহার দুর্বল অবস্থা দেখিয়া যদি কেহ তাঁহাকে ধরিয়া থাকিত, তাহা হইলে বিরক্ত স্বরে বলিতেন, "ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, আমাকে ধরো না—আমি আপনি বসব—গায়ে হাত দিয়ো না, গায়ে হাত দিয়ো না।" বর্তমান অসহযোগ আন্দোলনের কথা প্রারম্ভ হইতে তিনি আলোচনা করিয়া করিয়া উহার ফলাফল নির্ধারণে চেষ্টা করিতেন। এই সময় কয়েকবার "C. R. Das, C. R. Das" [দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস] নামটি উচ্চারণ করিতে শুনা গিয়াছিল—যেন ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত যাহাই হউন তাঁহার নিঃস্বার্থতার জন্য আজ আশীর্বাণী দিয়া গেলেন।

শরীর ত্যাগের দুই এক দিন পূর্ব হইতেই আহারে তিনি সম্পূর্ণ বীতরাগ হইয়াছিলেন। অসহ্য যন্ত্রণা সহিয়া তিনি মনের অলৌকিক সংযম ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন। Toxin Poisoning সত্ত্বেও অনেক সময় সুস্থ মানুষের ন্যায় কথাবার্তা কহিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি যেরূপ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন ও তাঁহার তন্দ্রার ভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাতে আমাদের সকলের আশঙ্কা হইয়াছিল—বুঝি বা শেষে তাঁহার দেহ অজ্ঞানাবস্থায় চলিয়া যায়।

কিন্তু মহাপুরুষের মনের অবস্থা যে কিরূপ, তাহা অশুদ্ধ অন্তর লইয়া আমরা কি করিয়া বুঝিব? শরীর ত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্বে তিনি সহসা যেন অন্য লোক হইয়া গেলেন এবং সমস্ত রোগযন্ত্রণা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া সুস্থ মানুষের ন্যায় ভগবানের নাম করিতে করিতে মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন।

শরীররক্ষার পূর্বরাত্র-শেষে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "কাল শেষ

দিন—কাল শেষ দিন”—আবার ইংরেজিতে—“Last Day”। তখন সে কথা কেহ সত্য বলিয়া ভাবিল না।

অদ্য প্রাতে তাঁহার গুরুভ্রাতা গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) নিত্য প্রাতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া “সুপ্রভাত” বলিতেন এবং তিনিও “এস দাদা, এস ভাই, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত” এইরূপ উত্তর দিতেন। পরে “আমরা মায়ের—মা আমাদের” “মা আমাদের—আমরা মায়ের—বলো, বলো।” এইরূপ বারংবার বলিতে লাগিলেন এবং “সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে” ইত্যাদি বলিয়া মহামায়ীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। শুনা যায় দুপুরে ও বিকালেও এইরূপে প্রণাম করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে “বড় যন্ত্রণা হচ্ছে”—এই কথা প্রকাশ করিয়া—“তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে, লোকে জানতে পাচ্ছে না।”

অদ্য শুক্রবার তিনি সেবকদের কাহারও কোন কথা শুনিতে চাহিতেছিলেন না এবং বিরক্তস্বরে সকলকে বাহির হইয়া যাইতে বলিতে লাগিলেন। আমাদের মনে হয় তাহাদিগের উপর তাঁহার যে বহু দিনের স্নেহ মমতার বন্ধন ছিল মহাপ্রস্থানের পূর্বে তাহাই ছিন্ন করিবার জন্য তিনি ঐরূপ করিতেছিলেন। কারণ ঐ দিন সনৎ মহারাজকে (স্বামী প্রবোধানন্দ) বলিয়াছিলেন—“তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, তাহলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি।” উক্ত সেবক তদুত্তরে—“আমরা ছেড়ে দিয়েছি। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।” উহার একটু পরেই বলিলেন—“সব হয়ে গেছে?” উত্তরে সেবক বলিলেন—“আজ্ঞে হাঁ।” তিনি বলিলেন—“তবে যাই, তবে যাই।” সেবক চুপ করিয়া রহিলেন।

ঐ দিন কোনরূপ খাদ্য মুখে দিলেই তিনি থুথু করিয়া ফেলিয়া দিতে থাকেন ও ঔষধ একেবারেই খাইতে চাহেন নাই। তাঁহার ঐরূপ আচরণে সেবকেরা গঙ্গাধর মহারাজকে ডাকাইলে তিনি তাঁহাকে বলেন—“আমার বন্ধন খুলে দাও—বন্ধন খুলে দাও—কি এসব?” এবং তৎক্ষণাৎ ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দেওয়া হইলে শান্তভাবে সেবককে বলেন—“খুলে দিয়েছ—বেশ করেছ—একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দাও।” গঙ্গাধর মহারাজের অনুরোধে এই সময়ে একবার ঔষধও খান।

বৈকালে Dressing হইবার পর তিনি আপন মনে মাঝে মাঝে ইংরাজিতে কথা বলিতে লাগিলেন। "গুরুদাস, গুরুদাস" (আমেরিকান সন্ন্যাসী স্বামী অতুলানন্দ)। গঙ্গাধর মহারাজের এবং আরও কাহার কাহার নাম করিতে শোনা গেল। এই দিন বৈকালে কয়েকবার "শরৎ, শরৎ" (স্বামী সারদানন্দ) বলিয়াছিলেন। তাঁহাকে এইরূপ কথা কহিতে দেখিয়া গঙ্গাধর মহারাজ বলিলেন, "আপনি একটু ঘুমান।" উত্তরে বলিলেন—"Yes, I want that"। কিছুক্ষণ পরে পার্শ্বে উপবিষ্ট জনৈক সেবককে ডাকিয়া বলিলেন—"Can you make me get up?" তখন সেবক বলেন—"মহারাজ, আপনার কষ্ট হবে।" "That's a mistake on your part"—এই কথাটি বলেন। আবার বলিলেন—"আর কে আছে?" তখন সনৎ মহারাজের নাম করায় তিনি অতি গম্ভীর স্বরে 'সনৎ' বলিয়া ডাকিয়া (সুস্থ অবস্থায় যেরূপ ভাবে ডাকিতেন) বলিলেন—"আমায় বসিয়ে দাও।" তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল—কিন্তু বসিতে পারিলেন না। মাথা ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন বলিলেন—"Can't you give me *strength*, Can't you give me *strength*? আমায় তুলে ধর, তুলে ধর।" নিজে সোজা হয়ে বসিতে চেষ্টা করিলেন এবং অসমর্থ হইয়া "মহামায়া" নামটি দুইবার উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ঊর্ধ্বদৃষ্টি দীর্ঘশ্বাসের লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। অল্পক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পর তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—"প্রভু, প্রভু!" তখন গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহাকে—'দাদা, দাদা' বলিয়া সম্বোধন করায় বলিলেন—"ঠাওর করতে পারছি না।" পরে বলিলেন—"হরের্নামৈব, হরের্নামৈব। ওঁ রামকৃষ্ণঃ, ওঁ রামকৃষ্ণঃ—আমায় বসিয়ে দাও।" ইতোমধ্যে ডাক্তার বি. কে. বসু আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি উঠাইতে নিষেধ করিলেন এবং সেবককে একটু ব্রান্ডি খাওয়াইতে বলিলেন। কিন্তু হরি মহারাজ উহা খাইলেন না। ডাক্তার স্বয়ং খাওয়াইতে যাইলে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। তাহার পর বলিলেন—"কই, বসিয়ে দাও, বসিয়ে দাও, বসিয়ে দাও।" বেশ বোধ হইল যেন আসনে বসিয়া শরীরত্যাগ করিবার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল না, তখন বলিলেন—"সব

বোকা—কেউ বুঝতে পাচ্ছে না। শরীর যাচ্ছে, প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। পরে বলিলেন পা টেনে সোজা করে দাও।" একটু টানিয়া দেওয়া হইলে বলিলেন—'টান—টান, ভাল করে টেনে সোজা করে দাও ও হাত তুলে ধর—হাত তুলে ধর—তোলো—তোলো—তোলো—আরও তোলো।" ঐরূপ করা হইলে দুই হাত জোড় করিয়া "জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া প্রণাম করিলেন। আমরা অন্তিম অবস্থা বুঝিয়া এই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণামৃত দিলে নিরাপত্তিতে দুইবার পান করিলেন; এবং বলিলেন—"সব সত্য—ব্রহ্ম সত্য, সংসার সত্য, জগৎ মিথ্যা নয়—সব সত্য, সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, হাত তুলে ধর—জয় গুরুদেব, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ—বলো, বলো, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ।" তখন গঙ্গাধর মহারাজ বলিলেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। ইহা শুনিয়া যেন খুব আনন্দের সহিত বলিলেন—"হুঁ ঠিক—বলো।" তখন গঙ্গাধর মহারাজ আবার "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিলেন এবং তিনিও উহা উচ্চারণ করিলেন। তখন গঙ্গাধর মহারাজ আবার বলিলেন। তিনি কেন উহা উচ্চারণ না করিয়া বলিলেন "ব্যস"—এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাধিমগ্ন হইলেন। মনে হইল যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন। শরীরে বিকৃতি বা যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র আর দেখা গেল না। মুখমণ্ডল স্বর্গীয় প্রসন্নতায় ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সারারাত্র ভজন-পাঠাদিতে কাটাইয়া শনিবার প্রাতে নয়টার সময় ভক্তমণ্ডলী তাঁহার পুণ্য শরীর আরাত্রিকাদির পর মণিকর্ণিকায় জলসমাধি দিয়াছিলেন।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ২৪ বর্ষ ৮ সংখ্যা)